বিক্রমপুরের ইতিহাস

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রকাশক
শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী
৫এ, শান্তিনগর বাই লেন,
পোঃ ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া),
জেলা—হুগলী
৭১২২৩২

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
১২৪বি, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

ভূমিকা

বিক্রমপুরের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রথম অভিযাত্রীর নাম শ্রী অম্বিকাচরণ ঘোষ। তিনি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থান ও কীর্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ ঘোষের এই বিচ্ছিন্ন রচনাগুলোই ১২৭৫ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ) নামে। ঢাকা সুলভ যন্ত্র থেকে এটি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন ঈশানচন্দ্র শীল। এটি কেবল বিক্রমপুর অঞ্চলের নয়, পূর্ববঙ্গের ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের মর্যাদা পেতে পারে। এর ৪১ বছর পরে ১৩১৬ সালে (১৯১০) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের বিস্তৃত তথ্য, দলিল ও চিত্র সংবলিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। তারও ২২ বছর পর প্রকাশিত হয় হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের 'বিক্রমপুর ১ম খণ্ড' (১৯৩২)। ছয় বছর ব্যবধানে প্রকাশিত হয় 'বিক্রমপুর ২য় খণ্ড' (১৯৩৬) ও 'বিক্রমপুর ৩য় খণ্ড' (১৯৪০)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থে প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় বিক্রমপুর জেলার রাজনৈতিক প্রশাসনিক ইতিহাসের পাশাপাশি বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোর বিবরণ এবং কীর্তিমান মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের উদ্যোগেও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মুন্সিগঞ্জ জেলার সাম্প্রতিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ওই গ্রন্থ তিনটি ছাড়াও ডক্টর তপন বাগচী সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড' গ্রন্থে বিক্রমপুরের তথ্য পাওয়া যায়। বইটি এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। 'বইপত্র' এটি একসঙ্গে প্রকাশ করে। ডক্টর তপন বাগচীর উদ্‌যোগে ১ম খণ্ড পূর্ণ হয়েছে এবং ২য় খণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। বিক্রমপুরের তথ্য এতে রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থেও বিক্রমপুর বা মুন্সিগঞ্জের তথ্য রয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও অনুরাগ বেশি পরিলক্ষিত হয়। কলকাতার দেজ পাবলিশিং 'বিক্রমপুর-রামপালের ইতিহাস' নামে অম্বিকাচরণ ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হিরণবালা দেবী এবং হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চারটি গ্রন্থ একত্রে প্রকাশ করেছে। তবে হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিশালাকৃতির গ্রন্থের পুরো অংশ যে পুনর্মুদ্রণ করা হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা পাঠককুলের চাহিদার কথা বিবেচনা করে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তবে প্রকৃত ইতিহাসের স্বার্থেই আমরা অম্বিকাচরণ ঘোষের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থটিও যুক্ত করেছি। দুটি গ্রন্থের নাম একই বিধায় যৌথ গ্রন্থের নামকরণে পরিবর্তন আনতে হয়নি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে অম্বিকাচরণ ঘোষের নামও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রকাশ করা হলো। বিক্রমপুরের

ইতিহাস রচনার অগ্রণী পুরুষ অম্বিকাচরণ ঘোষ আজ থেকে ১৪১ বছর আগে থেকে বিক্রমপুরের তথ্য সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হন। ১৩৯ বছর আগে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। অম্বিকাচরণের গ্রন্থটি বিক্রমপুরের মানুষের কাছেই কেবল নয়, বাংলাদেশ তথা বাংলাভাষী মানুষের কাছেই কৌতুহলের বিষয় হবে বলে আমাদের ধারণা। রচনা ও প্রকাশের সময় বিবেচনা করে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের আগেই অম্বিকাচরণ ঘোষের গ্রন্থটিকে স্থান দেয়া হলো। প্রায় সার্ধশত বছর আগের গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করতে পেরে আমরা স্বস্তি বোধ করছি। ইতিহাসমনস্ক পাঠকের কাছে এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত কথারূপ লাইব্রেরি'র মো. কামাল হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বানানশুদ্ধির ব্যাপারে সহযোগিতা নিয়েছি সাংবাদিক সত্যপ্রকাশ মিত্রের। এদের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় গ্রন্থটি আলোর মূখ দেখতে পেল। এখন এটি পাঠকের ভালোবাসা পেলে আমার শ্রম ও উদ্যোগ সফল হতে পারে।

আবুল বাশার

সূচিপত্র

AN
ANCIENT AND MODERN HISTORY OF VICRAMPUR IN BENGALI

বিক্রমপুরের ইতিহাস

প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ

শ্রী অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত



মহামায়া—কাগজীপাড়া

বিজ্ঞাপন

বিক্রমপুর বিস্তীর্ণ স্থান। ইহাতে বিবিধ সম্প্রদায়স্থ লোকই বাস করিতেছে। ইহার প্রাচীন সময়ের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে এখন যারপরনাই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ফলতঃ বিক্রমপুরের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থান অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কী পরিতাপের বিষয়? এতাদৃশ জনসঙ্কুল উন্নত বিক্রমপুরের একখানা ইতিহাস নাই। যদিও পলাশী প্রভৃতি সমর বিখ্যাত স্থানের ন্যায় বিক্রমপুরে কোন প্রসিদ্ধ যুদ্ধঘটনা সংঘটিত হইয়া না থাকুক— যদিও এখানে অন্যান্য স্থানের মত রাজাসন লইয়া নিরন্তর বিবাদ বিসংবাস উপস্থিত না হউক, তথাপি ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, বিক্রমপুর ঐতিহাসিক বিবরণ কিছুই নাই। এখানে অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ কীর্তিকলাপ স্থাপন কবিয়া গিয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে অন্যান্য স্থানীয় ইতিহাস যেমন সময় লইয়া লিখিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের তদ্রূপ কোন সাময়িক ইতিহাস হইবার যো নাই। ইহাতে আধুনিক বিবরণ থাকাও আবশ্যক।

আমি এই সকল চিন্তা করিয়া, প্রায় তিন বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহার পুরাকালের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমাবস্থায় যতদূর জানা আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিতে ক্রটি করি নাই। কিন্তু যতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বিবরণের প্রায় সমস্ত ভাগই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। তখন ভরসা করিয়াছিলাম না যে, উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধবের প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহা 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নাম দিয়া প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম। এখন ইহা সদাশয় দেশহিতৈশী মহোদয়দিগের প্রীতির নেত্রে পতিত হইলেই সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল বোধ করিব। পুস্তকে কোন বিষয়ের ক্রটি দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন।

অনন্তর কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঢাকা কলেজের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পুস্তক খানার ভাষা দেখিয়া দিয়াছেন। এবং মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ বসাক, বাবু রামপ্রসাদ সেন, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে অর্থানুকুল্য করিয়াছেন। অতএব এই সকল মহাত্মার নিকট বাধ্য রহিলাম।

সূচিপত্র

বিক্রমপুরের ইতিহাস

অম্বিকাচরণ ঘোষ



দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান [তিব্বতীয় চিত্রপট হইতে]



নটরাজ



বিষ্ণুমূর্ত্তি পাঁচ গাঁ



বাসুদেব, বাঘ্‌রা



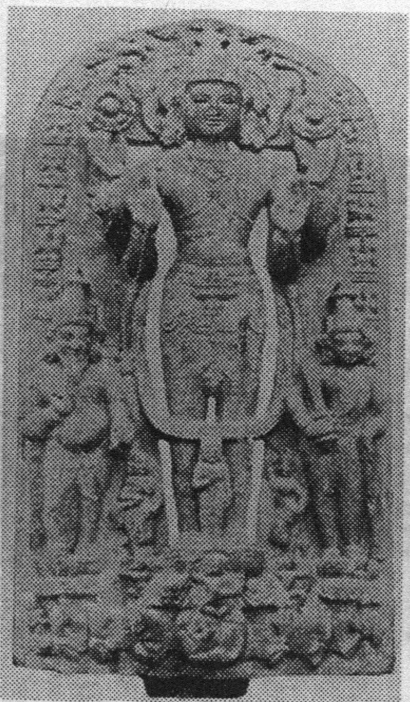
গারুড় গাঁ



অর্দ্ধনারীশ্বর



বিষ্ণুমূর্ত্তি–টঙ্গিবাড়ি



দ্বাদশাদিত্যশোভিত সূর্য্যমূর্ত্তি



নৃসিংহ মূর্ত্তি-টঙ্গিবাড়ি



অষ্টভুজা-মহিষমর্দ্দিনী



তারা



সরস্বতী



সদাশিব মূর্ত্তি

উপক্রমণিকা

প্রায় বিংশ শতাব্দী অতীত হইল উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বঙ্গভূমিতে উপনীত হয়েন। কিয়দ্দিন পরে কার্যোপলক্ষে অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে এইস্থানে আগমন করেন। তাঁহার সেই শুভাগমন ও নামানুসারে এই স্থান বিক্রমপুর এই বিখ্যাত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এমত কিংবদন্তী যে নৃপকুঞ্জর বিক্রমাদিত্য বজ্রযোগিনী ও রামপাল এ দুয়ের অন্যতর স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুত একথা অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। আজিও ওই সকল স্থানে সুরম্য হর্মাবলীর অনেক ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এখন উল্লিখিত ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ নিতান্ত বনাকীর্ণ মধ্যে মধ্যে বিরল বাস দৃষ্ট হয়। নৃপবর অত্যল্পকাল বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিক্রমপুরকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া যান। তখন আধুনিক সমৃদ্ধিশালী নগরনিচয় তাহার নিকট নিতান্ত নিস্প্রভ, শোভাশূন্য এবং বিষণ্ন ভাবধারণ করিত। তৎকালে বিক্রমপুরের আয়তন যে নিরতিশয় অল্প ছিল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

প্রবাদ আছে যখন নৃপবল্লভ বিক্রমাদিত্য এখানে সমাগত হন, তখন এ স্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎ ছিল। বৃক্ষ গুল্মাদির প্রচার নিতান্ত বিরল ছিল। পরে ক্রমোন্নতি সহকারে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। একদা এই বিক্রমপুর বঙ্গভূমির রাজধানী ছিল। তখন রাজশ্রী বৈদ্যকুলের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। প্রকৃতি সুন্দরী যে, নিতান্ত শান্তিদায়িনী ও একান্ত শুভকরী হইয়াছিলেন, এতদ্বারা তাহার বেশ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রকৃতিবৃন্দ তখন অনল্প সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত, সন্দেহ নাই। এমনকি, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই বিক্রমপুরই একমাত্র সৌভাগ্য ও সম্পদের আস্পদ ছিল। সুশাসন রাজ্যধুরন্ধর এখানেই বাস করিতেন। তখন ইহা কী আশ্চর্য মহীয়সী শ্রীই ধারণ করিয়াছিল! কিন্তু দুরন্ত কৃতান্ত নিষাদের কী তীক্ষ্ণ শর! কি ভয়ঙ্করী মূর্তি; এখন বিক্রমপুরের আর সেদিন নাই, তাহার আর সেই বিক্রম নাই সমস্ত মহত্ব ও সৌন্দর্য এককালে প্রস্থান পর হইয়াছে–রাজপদরজঃ এখন ইনি কর প্রসারণ করিয়াও প্রাপ্ত হইতেছেন না। রাজলক্ষ্মী ইহার প্রতি যেন চিরকালের নিমিত্ত অপ্রসন্না হইয়াছেন। কাল! তোমার দংশন, কী সুতীক্ষ্ণ! হস্ত কী কঠোর! তুমি বিক্রমপুরকে এককালে জর্জরিত করিয়াছ; ইহার যত বড় বড় কার্যক্ষম সন্তান প্রিয় পুত্র ছিল, তোমার হৃদয় কী নির্মম! কী কঠিন! তুমি তাহাদের সমুদায়কে চর্বিকৃত ও উদরস্থ করিয়াছ। আর কি ইহার উন্নতির প্রত্যাশা আছে? যে ভূষণে বিভূষিত হইয়া এই বিক্রমপুর নিখিল ভারতের একমাত্র গৌরব ভাগিনী ছিল– অপর সমুদায় স্থান ও নগরী যাহার নিকট নিস্তেজ দীপশিখার ন্যায় নিস্প্রভ লক্ষিত হইত, আজি সেই বিক্রমপুরকে তুমি একেবারে ভিখারিনী ও শ্রীহীন করিয়াছ, তাহার রাজছত্র কোনস্থানেই স্থাপন করিয়াছ। আর কি কখন বিক্রমপুরের হৃত বিক্রম প্রত্যাবর্তন করিবে? আর কি ইহার মৃত প্রিয় সন্তানগণ অনাথা জননীর দায় দারিদ্র্য বিমোচনার্থ পুনর্জীবিত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে? অথবা এইরূপ আশা করা শুদ্ধ দুঃখ ও বিড়ম্বনার কারণ।

সীমা

বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী ও ইছামতী স্রোতস্বতী; পূর্ব সীমা মেঘনা নদীর দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর ও ভরবাজুস্থিত কতিপয় গ্রাম। বিক্রমপুর বিস্তৃতায়ত উপ-প্রদেশ (পরগনা)। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের বিভিন্নতা অতিশয় অল্প হইবে।

ভূমির আকৃতি

বিক্রমপুর সমতল ভূমি নহে। অনেক স্থান অতিশয় উচ্চ। এমন কি তৎসমুদায় বর্ষা মুখ দেখিতে পায় না বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রামপাল, ব্রজযোগিনী, ইছাপুর প্রভৃতি পল্লী নিচয় ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে তদিতর সমস্ত স্থান নিরতিশয় নিম্ন ভূমি বলিয়া বর্ষার জলে এককালে প্লাবিত হইয়া যায়।

জলবায়ু :

সত্য বটে, বিক্রমপুরের প্রায় স্থানের জলবায়ুই উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যজনক। কিন্তু আবার এমন অনেক স্থানও দৃষ্ট হয় যে তথায় ক্রমাগত কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে মাতঙ্গ কল্প সুস্থকায় বীরপুরুষকে পীড়াগ্রস্ত এবং দিন দিন ক্ষীণ দেহ ও হত বীর্য হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইতে হয়। আইরল, মলধা, ধীপুর, রাইতভোগ, যশোলঙ্গ, কাঠাদিয়া, কেয়ার, নয়না, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। এই নিমিত্তই উল্লিখিত স্থানগুলি অত্যন্ত বিরল বসতি হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ অল্প জলাকীর্ণ স্থানেও বিকট মূর্তি পীড়া দেবীর মন্দ প্রভাব লক্ষিত হয় না। এমন গৃহ অতি অল্প যাহাতে দুই একজন রুগ্ণ, এবং শয্যাগত ও শান্তি সুখ বঞ্চিত দৃষ্ট না হয়। অনেকে বলেন গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষোদগত বায়ুই এতাদৃশ অস্বাস্থ্যের কারণ; পার্শ্ববর্তী সহকার, পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি পাদপ নিচয়ের পল্লবজাত নিপতিত হইয়া পুষ্করিণী পানি নিতান্ত দুর্গন্ধময় সুতরাং অব্যবহার্য ও রোগমূলক করিয়া তুলে। অস্পর্শনীয় সত্ত্বেও অনন্যোপায় হইয়া সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়।

উত্তুঙ্গ বিস্তীর্ণ শাখা তরু শ্রেণী ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মির প্রবেশাভাব ও নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বনাকীর্ণতা স্বাস্থ্যনাশের অন্যতর কারণ, সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের তৃতীয়াংশ তারা, ইকর এবং কাশ প্রভৃতি বনরাজিতে একেবারে সমাচ্ছন্ন। পল্লীবৃন্দ অরণ্যময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল স্থানে রৌদ্রের মুখ অতি অল্প লোকের গৃহ প্রাঙ্গণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য পুষ্করিণীরাজির পানি যে নিতান্ত বিকৃত ও বিবিধ রোগ নিদান, তাহা বলাবাহুল্য। সুতরাং তৎসমুদায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু উল্লিখিত বনোদ্‌গীরিত বায়ুযোগে যে একান্ত অবিশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের বিষয় কি? মহানুভব অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট লায়েল মহোদয় নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে বন পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অনেক যত্ন প্রকাশ করেন। বোধ হয় অল্পকাল পরেই স্থানান্তর গমন নিবন্ধন তাঁহাকে কার্য সম্পাদনে বিরত থাকিতে হয় যাহা হউক এখন বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, যাহাতে শান্তিনাশক এই সমুদায় অন্তরায়ের

এককালে নিরসন হয়, গবর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া তৎপ্রতি নিজের উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান স্থানীয়বৃন্দের একান্ত কর্তব্য। অন্যথা অচিরে উল্লিখিত স্থানগুলি "বিজন গ্রাম" বলিয়া পরিগণিত ও সাধারণের যারপরনাই খেদের কারণ হইবে, তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই।

এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তনশীল বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমপুর বর্ষাপ্রধান স্থান। এইকালে খাল, বিল, সরসী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়সমূহ পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া বিক্রমপুরকে শিলাচ্ছাদিত শৈলের ন্যায় ধবলিত করিয়া থাকে। তখন অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিবাসীদিগের আর ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। অনেকের অন্তঃপুর, চত্বরে এমন কি গৃহের মেঝেয় পর্যন্ত পানি উঠিয়া মহান কষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয়। গৃহস্থগণ তখন বংশ কাষ্ঠাদি বিনির্মিত মঞ্চোপরি বাস করিতে বাধ্য হয়। এই রূপ ক্লেশ ও অসুবিধা তাহাদিগকে ক্রমাগত প্রায় দুই মাস কাল সহ্য করিতে হয়। উহার পর বর্ষাকাল আরও ২/৩ মাস কাল অবস্থান করে। অতি বর্ষা নিবন্ধন ধান্যাদি শস্যরাজি নষ্ট হওয়াতে অত্রত্য প্রাণীমণ্ডলী, বিশেষত কৃষিবলদগণ, সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে এই সময়ে নৌকা ব্যতিরেকে বিক্রমপুরবাসীদিগের গমনাগমনের আর সাধ্য থাকে না। এখানে 'আরলবিল' নামক একটি প্রসিদ্ধ বিল আছে। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজপাড়া, কোলাপাড়া, উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারইখালি এবং শেকেরনগর; পশ্চিমে নারিশা গ্রাম, পূর্ব প্রান্তে দয়হাটা, হাসাড়া, গাদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল প্রভৃতি পল্লী গ্রাম। পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ মাইল (৬ ক্রোশ) এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ ৭ মাইল (৩ সাড়ে তিন ক্রোশ) হইবে। অতি প্রাচীনকালে সমগ্র বিক্রমপুর এই বিলের গর্ভস্থ ছিল। এখন অনেক স্থান গ্রাম রূপে পরিণত হইলেও আরলবিল বিক্রমপুরের, প্রায় তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষাকালে কুম্ভীরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং ঝড় উত্থিত হইয়া বিলের জল এরূপ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে যে, পোতস্থিত জনগণের জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হয়। বাস্তবিক তখন নিতান্ত ভীমদর্শন হইয়া থাকে। বিক্রমপুরে বর্ষার বাদল প্রভাব লক্ষিত হয়, গ্রীষ্ম ঋতুরও তদপেক্ষা বড় ন্যূনতা দেখা যায় না।

গ্রীষ্মকালে নদ-নদীব খাল, বিল, সারোবর প্রভৃতি জলাশয়শ্রেণী সূর্যালোকে প্রায় এককালে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন লোকবৃন্দে জলাভাবর্জনিত কষ্টের আর ইয়ত্তা থাকে না। সময়ে উত্তপ্ত ধূলিরাশি বায়ু সহকারে সমুত্থিত ও সমান্দোলিত হইয়া পান্থদিগের নিতান্ত ক্লেশদায়িনী হইয়া উঠে। জলাগারই তখন সকলের প্রিয় হয়। এই কালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থলে প্রবল বর্ষা অজস্র উত্থিত হইয়া খড় নির্মিত গৃহবাসীদিগকে যারপরনাই ব্যাকুলিত ও সশঙ্ক করিয়া তুলে। এমনকি ঝড় উঠিয়া সময়ে সময়ে সুনিহিত মূল পাদপ পর্যন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতিরেকে এখানে বৃষ্টি হইয়া মনুষ্যাদি প্রাণীপুঞ্জের প্রাণ বিনাশও করিয়া থাকে। নীল, আশুধান্য প্রভৃতি শস্যরাজি ঈদৃশ উৎপাতের ভীষণ হস্ত এড়াইতে পারে না। এখানে হেমন্ত ঋতুর তাদৃশ চিহ্ন লক্ষিত হয় না; তখন কেবল আমন ধান্যের কর্তন হয়। শীতেরও মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে সর্বত্র প্রাতঃকাল প্রায় প্রহরৈক পর্যন্ত কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকে।

উদ্ভিজ্জ ও শস্য

ধলেশ্বরী, ইছামতি, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি তরিঙ্গণীমালা প্রতিনিয়ত বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিনী শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দেবরাজও ভূমির উর্বরতা সাধন বিষয়ে অল্প অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্যজাত সমুৎপন্ন হইয়া অধিবাসী বিশেষত কৃষিজীবীদিগের হৃদয়ে নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকে। আশুধান্য অত্রত্য সাধারণ লোকের প্রধান উপজীবিকা। আশুবর্ষ আশুধান্যের অন্যতর পুষ্টিসাধক। এতদ্ব্যতীত হৈমন্তিক ধান্য (আমন ধান্য, হেমন্তকালে ইহার কর্তন হয় বলিয়া 'হৈমান্তিক' বলে) সর্ষপ, দ্বিদল কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, পাট, ছেটে, কার্পাস, কালিজিরা, ধনিয়া, তামাক, গুবাক (সুপারি), মেথি শণ, চিনাই, কায়ন প্রভৃতি জন্মিয়া সকলের মহান উপকার সাধন করে।

বিক্রমপুর হইতে বর্ষে বর্ষে ধান্য, কুসুম্ভ প্রভৃতি শস্য নিচয় দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু এতন্মধ্যে শেষোক্ত বস্তুই বিদেশীয়গণ সমধিক আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। দূর দেশ হইতে প্রধানত তুলা এখানে আনীত হয়। এস্থানে আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, খর্জুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল এবং ফুট, ক্ষিরাই, শসা ও নানা জাতীয় সুমিষ্ট কদলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিল তৈল, সর্ষ তৈল ও ফুলে তৈল অধিক পরিমাণে মিলে। রামপালের কলা সর্বত্র পরিশ্রুত ও বিখ্যাত। আতা, পেয়ারা, কুল, কাউ, লিটকা বৃক্ষালু, দাড়িম্ব ও তরমুজ প্রভৃতির এককালে অসদ্ভাব নাই। পূর্বাঞ্চলে বেতকা, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া, কসবা প্রভৃতি স্থানে, ইক্ষু, অদ্র (আদা), হরিদ্রা অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বজ্রযোগিনী, রাজাবাড়ি, সেরেজাবাদ, তালতলা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে সামান্যত ইক্ষুরসে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে 'আকিগুড়' বলে। ইক্ষুরস গ্রহণ বিষয়ে মন্দ নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় না। খাজুরি গুড়ও এখানে দুষ্প্রাপ্য নহে।

এ স্থানে অরণ্য তরুর মধ্যে জারুল, উড়ি আম, জাম, সপ্ততাল (সাধারণ ভাষায় ইহাকে সায়তান বলিয়া থাকে), পয়াই প্রভৃতি প্রধান। উড়ি আম এবং সামান্যত পয়াই কাষ্ঠে প্রাচ্য বিক্রমপুরবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী নির্মাণ করিয়া বর্ষাকালে গমনাগমনের অনল্প সৌকর্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

অধিবাসী ও ধর্ম

বিক্রমপুরের আয়তন ও আকারানুসারে বসতি সংখ্যা অনেক অধিক। এই স্থানে অন্যূন দেড় লক্ষ লোক বাস করিতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান এই ত্রিবিধ ধর্মাবলম্বী লোকেরই বাস লক্ষিত হয়। ক্রমে তাহাদিগের অবশ্যজ্ঞেয় পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হিন্দু

হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদিম অদিবাসী সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন সময়ে তাহারা এ ভূস্থানে আগমন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই হিন্দু জাতির মধ্যে বৈদ্য ও শূদ্রমণ্ডলী ব্রাহ্মণ জাতি হইতে অধিকতর। দ্বিজ নিচয়ের অধিকাংশ যাজন ব্যবসায়ী। কায়স্থাদি ও শূদ্রবৃন্দ বেশ চাকুরিপ্রিয় (বিষয়লোভী)। স্বাধীন ব্যবসায়কে ইহারা যেন

নিতান্ত অপবিত্র মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই হইতেছে না, বলিলে এককালে অসঙ্গত হয় না।

হিন্দুরা মর্যাদা, বিদ্যা. বুদ্ধি ও চতুরতায় অন্যান্য স্থানবাসীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুবিখ্যাত বল্লাল ভূপতি ইহাদিগের মধ্যে (কি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কি শূদ্র সকলের মধ্যে) যাঁহাদিগকে আচারাদি নবগুণ বিশিষ্ট[১] বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাদিগকে "কুলীন" এই উপাধি প্রদান করিয়া সাধারণে খ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অর্বাচীন হিন্দুগণ তদবধি কৌলিন্য প্রথাকে বংশ মর্যাদার প্রধান চিহ্ন মনে করিয়া তদ্বারা ক্ষণভঙ্গুর অর্থোপার্জনে নিরত রহিয়াছেন। তন্নিবন্ধন কুলীনগণ অর্থগৃধ্রু বলিয়া জনসমাজে পরিচিত।

বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণদিগের যেমন চারি মেল (সমাজ) আছে, কায়স্থমণ্ডলীর মধ্যেও সেইরূপ সাড়ে তিন মেল দৃষ্ট হয়। যথা, মালখানগরের বসুবংশ; পাওলদিয়ার ঘোষ বংশ; রাইসবরের মুস্তফী (গুহবংশ) এবং কাঠালিয়ার দত্ত। শেষোক্তেরা অর্ধ-কুলীন বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত[২]। এই সার্ধত্রি গৃহের সহিত পরিণয়াদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সাধারণের সাধ্যায়ত্ত ও সম্ভাবিত নহে। যিনি ইঁহাদিগের উদর পূর্ণ করিয়া একবার একটি ক্রিয়া করিতে পারিলেন, তিনিই একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া আপামর সকলের সম্মানভাজন হইলেন। কিন্তু কি ঘৃণার বিষয়! ইহাদিগের (কুলীনবৃন্দের) প্রণয় স্থাপন বোধ হয় কেবল অর্থের জন্য। সম্প্রতি এই কৌলীন্য প্রথা অনেকের উপজীবিকা হইয়া মহাকলঙ্ককরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা যে বিষময় ও অহিতকর ফল উৎপাদন করিতেছেন, তাহা স্মরণ ও দর্শন করিলে হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। অনুচিত কুলাভিমানী উত্তমাঙ্গজাত কোন কোন মহাপুরুষ ধনলোভে বিমোহিত হইয়া শত শত কুলবালার পাণিগ্রহণ করিয়া অচিরকাল পরে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক পরিণয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে জীবনান্তেও উহাদিগের তত্ত্ব লওয়া ঘটিয়া উঠে না।

কৌলীন্য প্রথার প্রাধান্য মনে করিয়া কুল ভয়ে অনেকানেক ব্রাহ্মণ পঞ্চবর্ষীয়া বালিকাকে চিরকালের নিমিত্ত স্খলিত দন্ত পলিত কেশ লোলতাঙ্গ অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে শত শত কুলকামিনী—অবলাবালা এককালে বৈধব্যদশায় নিপতিতা হইতেছে। সুতরাং নানাবিধ ব্যভিচার দোষে যে তাহারা দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিবে বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "ঘটক" নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারা শুকের মতো পরের তোষামোদে বিলক্ষণ পাটব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ইহাদিগকে বিবাহাদির ক্রিয়াকালীন কিছু পূজা দিতে পারে, ইহারা তাহাকে চৌদ্দপুরুষসহ স্বর্গগামী করিয়া তুলেন। পরের গুণোৎকীর্তন ঘটকদিগের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। ইহারা কুলীনদিগের বংশাবলী গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখেন।

সাধারণত বিক্রমপুরীয়গণ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ভীরু ও সাহসহীন। পূর্বকালে অত্রত্য হিন্দুদিগের ধর্মবিষয়ে (পৌত্তলিকতায়) প্রগাঢ় বিশ্বাস ও একাগ্রতা ছিল। তখন কেহ অন্য কোন ধর্মের আলাপ করিলে তাহাকে নানা প্রকার অবমাননা সহ্য করিতে হইত। এমনকি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের

বিষয় ছিল না। কিন্তু বলিতে কি, অধুনা তাহাদিগের তাদৃশী আস্থা ও তাদৃশ অনুরাগ নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একজন গোঁড়া হিন্দু বলিয়া প্রতীয়মান হন সত্য, কিন্তু প্রায়ই মুখপাত মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেবা ইষ্টদেবত্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে স্নান আহ্নিক না করিয়া আহার করেন না। ইহারা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। যদিও ইহাদিগের মধ্যে তাদৃশী কুপ্রথা লক্ষিত হয়, যদিও ইহারা পূজাকালীন মুখের এক পার্শ্ব দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ এবং অপরের দ্বারা বৈষয়িক আলাপ করিয়া থাকেন ও তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে বিশেষ একাগ্রতাসম্পন্ন দেখা না যাউক, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ইহাদিগের পূজার কাল নির্ধারিত আছে। ইহা তাহাদের পক্ষে মন্দ শ্লাঘার বিষয় নহে।

যদি অন্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যও নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের আহ্নিক বিষয়ে ও সায়াহ্ন বেলায় গোঁসাইর নাম গ্রহণে ভ্রম হয় না। অধুনা সনাতন ব্রাহ্মধর্মে অনেক যুবকের বিশ্বাস ও প্রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মানুরাগী নব্য কৃতবিদ্যগণ প্রাচীনদিগকে ব্যাঘ্রবৎ অনুচিত ভয় করেন বলিয়া তাদৃশ্য কার্যানুষ্ঠান তৎপর দৃষ্ট হন না। নব্যদিগের ধর্মার্থ ত্যাগ স্বীকাররূপ তরবারি পৌত্তলিকদিগের প্রতি ভয়রূপ মরীচায় এককালে কলঙ্কিত ও নিস্তেজ হইয়া উঠিতেছে। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক মহাত্মা সেই কলঙ্কশ্লিষ্ট-অস্ত্র শাণিত ও পরিস্কৃত করিবার জন্য কথঞ্চিৎ যত্নশাণু অবলম্বন করেন; কিন্তু অর্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীনদিগের প্রদর্শিত সমাজচ্যুতির আশঙ্কারূপ পিচ্ছিলতা নিবন্ধন সেই তরবারে হস্তকর্তনরূপ তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইয়া শঙ্কিত হৃদয় কোমলমতি সুশিক্ষিতবৃন্দ প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং তাহারা ঈদৃশী ধর্মভীরুতাবশত প্রকৃত ধর্মশৈলের কার্য সোপানারোহণ হইতে যে বহু দূরবর্তী রহিয়াছেন, তাহার সংশয় কি? অপর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কোন কোন অপরিপক্ক মতি তরল চিত্ত যুবক এই ধর্মের জন্য এমনই ত্যাগ স্বীকার ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, কতিপয় দিবস পাঠ করিলেই বিদ্যালয়েব শিক্ষাকার্য ও পুস্তকালোচনা ত্যাগ করিয়া বসেন। এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের উন্নতি যে অতি অল্পই হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ান্তর্গত দ্বিজগ্রামের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা এ প্রকার গোঁড়া যে, তাহারা চর্ম পাদুকা ও সিলাই বস্ত্র (অঙ্গরাখা প্রভৃতি) ব্যবহারে নিতান্ত অপবিত্রতা ও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। বচনসর্বস্ব সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর লোক। ইহারা আসামবাসীদিগের ন্যায় পেন্টুলন পরিধান এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম না করাকে ধর্মচ্যুতির (খ্রিস্টান হওয়ার) লক্ষণ মনে করেন। কেবল মনে করিয়া নিরস্ত হন এমন নহে, প্রকাশ্যত বলিয়াও থাকেন।

কুলসর্বস্ব দ্বিজবৃন্দ যেমন শত শত বালার পাণিপীড়ন করিয়া স্ব স্ব অর্থগৃধ্নুতাব পরিচয় প্রদান করেন, সেই প্রকার অত্রত্য শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রায় এককালেই বিবাহজনিত কর্তব্যতা পরিপালনে অসমর্থ হন। তাহাদের অনেকে আজীবন আইবড় ভাবেই লক্ষিত হয়, তাহাকে, বলিতে গেলে, এক বিবাহের নিমিত্ত যথাসর্বস্ব পণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কেবল কন্যাবিক্রয় প্রথার প্রচলনই ঈদৃশ মহানঅর্থের মূলীভূত কারণ।

বিক্রমপুরে হরি, কালী, শিব, দুর্গা, বসুমতী, মনসাগুরু ও বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দির ও সাধক আছে। রাজানগরের হরি[৩] কোমরপুর বা ভাওয়ালের কালী ও দুর্গা (অর্ধ কালী ও অর্ধ দুর্গা)[৪] অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। হেরেমনেশ্বরের কালীও[৫] ন্যূন খ্যাতাপন্ন নহে। প্রাচীন হিন্দুগণ অধিকাংশ কবিরাজ প্রদত্ত ঔষধাদি দ্বারা রোগোন্মুক্ত হইতে না পারিলে হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং "হরিভক্ত" নাম ধারণপূর্বক বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের ন্যায় ললাটদেশে, নাসিকাগ্রে, স্কন্ধ দেশে ও বক্ষস্থলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ও তিলকাদি দ্বারা সুরঞ্জিত হন। ঠাকুরের আদেশানুসারে তিন বেলা স্নান করিয়া থাকেন। হরিভক্তিপরায়ণ হিন্দুগণ সন্ধ্যার সময় মন্দির সমীপে মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে হরি কীর্তন করেন। ইহারা হরিকে যে সকলে উপহার প্রদান করেন, তৎসমুদয় ঠাকুরের উদর পোষনার্থে প্রদত্ত হয় বলিলে লেখনী অত্যুক্তি দোষস্পৃষ্টা হইবে না। দেখিলাম এক ব্যক্তি জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া হরিঠাকুরের আজ্ঞানুসারে তিন বেলা স্নান যাহা ইচ্ছা (দধি, দুগ্ধ, অম্ল ইত্যাদি) ভক্ষণ করিয়া পরদিনেই শমন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আত্মীয়বৃন্দ আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবর্গকে ব্যাকুলিত করিতেছে। তবে ধন্বন্তরীর ঔষধ প্রয়োগের পর আমাদের "কবিরাজ খুড়োর" হাত পাইয়া কদাচিৎ দুই চারি ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন। অনেক ভদ্রলোকের মধ্যেও ঈদৃশী হরিভক্তিপরায়ণতা সংলক্ষিত হয়। এই জন্য উক্ত দেবদেবীর সম্মুখে অনবরত শত শত অজচ্ছেদ হইতেছে।

মুসলমান জাতি

মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির চতুর্থাংশ হইবে। কৃষিকার্য সাধনই ইহাদিগের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় সত্য বটে, ইহাদের মধ্যে পারসি ভাষাজ্ঞ দুই একজন মুন্সি মানুষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রায় সকলেই বিদ্যা শিক্ষায় এককালে বীতস্পৃহ ও অনুরাগী। ধান্য কর্তন, বীজ বপন, গোচারণ ও হাল চালনা প্রভৃতি সাধারণ কার্যে নিপুণ হইলেই ইহারা স্ব স্ব পুত্রদিগকে নিতান্ত কৃত ও গুণশালী বলিয়া মনে করে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধায়িনী বিদ্যাশিক্ষা এককালে অনাবশ্যক, এই তাহাদিগের চিরবোধ। যদিও বাণিজ্য বৃত্তি ইহাদের প্রিয় ব্যবসায় হউক, শিক্ষাভাবে তাহাতেও ইহাদিগকে তাদৃশ উন্নতিশীল ও ধনসম্পন্ন বলিয়া অনুমিত হয় না। কিসে ভূমির উর্বরতা সাধন করে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানে না, এ রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদাবস্থায় তাহারা যে অভিলাষিত বিষয় লাভে পূর্ণকাম ও বিতথ যত্ন হইবে তাহার বিচিত্রতা কি?

অধিকাংশ মুসলমান যারপরনাই হীনাবস্থা। তাহাদের আচরণ নিতান্ত জঘন্য। বোধ হয় তদ্দর্শনে অপবিত্রা হইবেন ভাবিয়াই যেন বিদ্যাদেবী ইহাদিগের প্রতি নিরনুগ্রাহিণী। অপর, ইহারা নাগরিক মুসলমানদিগের ন্যায় তাদৃশ ধর্মানুরাগীও দৃষ্ট হয় না। কার্তিকপুরের মুন্সিগণ এবং অপর কতিপয় প্রধান পরিবার যে উৎকৃষ্টতর অবস্থাপূর্ণ তাহা অবশ্য স্বীকার্য। ঢাকা নবাবীয় স্থান। নগরটির সূত্রপাত হইতেই অনেক মীর মোঘল মহা সমৃদ্ধি ও উন্নতি সহকারে তথায় বসতি করিয়াছেন। বিক্রমপুর তাহার অনতিদূরে

অবস্থিত সত্ত্বেও কেন যে তত্রত্য (বিক্রমপুরস্থ) মহম্মদীয় সমাজ নগরের দৃষ্টান্তে উন্ননিত হইতেছে না, নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বোদর পরিবার প্রতিপালন মাত্রই ইহাদিগের কর্তব্যকর্ম বলিয়া অনুমিত হয়। দুই-তিন বেলা "নমাজ পাঠ" ইহাদের সাধারণ সম্বল। কেহ কেহ ত্রিশ রোজায় কথাঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু চিহ্ন কি নিদর্শনস্বরূপ বিশ্বের কোন মসজিদ নির্মিত নাই।

খ্রিস্টীয় জাতি

বিক্রমপুরের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী লোকেরও অসদ্ভাব নাই। অত্রত্য পোর্তুগিজ সম্প্রদায় উদাহরণস্থলে উল্লেখনীয়। প্রায় শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, উহাদিগের (পোর্তুগিজদিগের) আদি পুরুষগণ বাংলার নবাব মহানুভব শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক মুন্সিগঞ্জের উত্তরাংশে সম্মানিত হয়। তদবধি সেই স্থান "ফিরিঙ্গিবাজার" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। উহা ঢাকা নগরী হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সেই সময় উক্ত নবাব এই স্থানের নিকট একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করান। উহার ভগ্নাবশেষ আজিও পূর্বকালীন গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি পোর্তুগিজবৃন্দ নানা স্থানবাসী হইয়াছে। মোহনগঞ্জের উত্তর-পূর্বে শিকারপুর নামক স্থানেও অনেক ফিরিঙ্গি বাস করে। ইহাদিগকে এখন আর পাশ্চাত্য জাতি বলিয়া অনুমান করা যায় না। দেশীয়দিগের ন্যায় উহাদেরও কৃষিকার্য উপজীবিকা; সন্তোষের বিষয় এই যে, ইহারা ধর্মকে এককালে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। ইহাদিগের ধর্মনুরাগিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় স্বরূপ কয়েকটা গির্জা (উপাসনা মন্দির) সংস্থাপিত আছে। প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাহাদের পাদ্রি (উপদেশক) কর্তৃক স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ জাতিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ফিরিঙ্গিরা তাদৃশ উন্নতমনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীগণ এখানে আসিয়া এদেশীয়দিগকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ও তন্মতানুগত করিবার জন্য অনল্প প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ্য সফল যত্ন ও সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন নাই। তাহাদের দলবল নিতান্ত হীন ও দীনদশাপন্ন ছিল। সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। সত্য বটে অনেকদিন হইল কনকসার নিবাসী সূর্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয় খ্রিস্টধর্মে সুদীক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সাহস সহকারে বলিতে পারি, সূর্যকুমারবাবু খ্রিস্টানদিগের নীচ প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া তদ্ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছানুসারে তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি অল্পকাল গত হইল কয়কীর্তন নিবাসী জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ও মালখানগরের কুলীন বংশ সম্ভূত, পূর্ণচন্দ্র বসু নামক এক অল্প বয়স্ক যুবক খ্রিস্টীয় ধর্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

অত্রত্য পোর্তুগিজদিগের আচারব্যবহার প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় জঘন্যভাব ধারণ করিয়াছে। তাহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি ও জাতীয় রীতিকে এককালে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু দেশীয় মুসলমানদিগের সহিত তাহাদিগের কোন প্রক্রিয়া হইতে দেখা যায় নাই।

বাণিজ্য ও শিল্প

যদি বিক্রমপুরবাসী সমস্ত জাতিই দেশের কল্যাণকর বাণিজ্যকার্যেরত ও মনোযোগবান লক্ষিত হইত। এখনকার মতো যদি তাহারা পরের দাসত্বের নিমিত্ত এতাদৃশী ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিত, চাকুরি প্রিয়তার মোহিনী মায়ায়ই যদি তাহারা বিমোহিত না হইত, তাহা হইলে কি আজি সোনার বিক্রমপুরের এইরূপ অনুন্নত হীনদশা অবলোকন করিয়া, আমাদিগকে ব্যথিতহৃদয় হইতে হইত? আর তাহা হইলে কি ইহার ঈদৃশ নীরস ভাব সঞ্জাত হইত? কখনোই নহে। বিক্রমপুরের সৌভাগ্য সূর্য চিরসমুদিত থাকিয়া অধিবাসীবৃন্দকে সুখরূপ কিরণ জাল নিয়ত প্রদান করিত। কিন্তু হায়! কি ইতর, কি ভদ্র সকলেই ভৃত্যভাবে ধনার্জনে লালায়িত। পরাধীনতায় কাহারও অবমাননা বোধ নাই। স্বাধীনতা বিচ্যুত হইয়া পারতন্ত্রাবলম্বন যেন তাহাদের প্রিয় ও প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান জাতিকেই এখানে বাণিজ্য কার্যে কিছু বিশেষ অভিনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবিধ মঙ্গলকারী বিদ্যা শিক্ষাভাব-নিবন্ধন তাহাদিগকে সমধিক উন্নত দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধান্যানয়ন ও তদ্বিক্রয়েই তাহাদিগকে প্রধানত নিরত বলিয়া লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বন্দর ও হট্টাদিতে তৈল, গুড়, চিনি ও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রভৃতি উল্লিখিত বাণিজ্য বস্তুর সৌলভ্যার্থে মুন্সিগঞ্জে[৬] শ্রীনগর, হলিদা, মীরকাদিম, ধান্যকুরিয়া, লৌহজং প্রভৃতি স্থানে বন্দর আছে। বন্দর ব্যতীত স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হট্ট ও সাময়িক মেলা বিক্রমপুরে অনেক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তালতলা ও খলিপাশার হাট প্রধান।

বিক্রমপুর হইতে ঘৃত, ক্ষীর, বাংলা কাগজ এবং সামান্যরূপ পরিধেয় বস্ত্র অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়া তত্তদবাসীদিগের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। হলিদা, বাহিরঘাটা প্রভৃতি স্থানে দূরদেশ হইতে সমানীতে মুরঙ্গী সুন্দরী কাষ্ঠ অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিক্রমপুর শিল্প দ্রব্যজাতের নিমিত্ত অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। এখানকার কর্মকার, স্বর্ণকার এবং তন্তুবায়গণ বিলক্ষণ পটুতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জনসাধারণ্যে প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্তুবায়ের সংখ্যা এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সন্দেহ নাই। বস্তুত সকলেই স্বীকার করিবেন যে অত্রত্য স্বর্ণকার নির্মিত দ্রব্যরাশি দ্বারাই ঢাকা নগরী বিশেষ খ্যাতিশালিনী। ঝায়টিয়ার বাউ, সামসিদ্ধি ও ষোলঘরের কর্ণাভরণ, কাণ এবং শেষোক্ত স্থানের ডানির (চাদরের) উৎকৃষ্টতা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে চুণকার ও কাগজ নির্মাতার সংখ্যাও ন্যূন নহে। তাম্র, পিতল, টিন, লৌহময় বস্তু ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প প্রশংসনীয় নয়। বিক্রমপুরে কাষ্ঠ-নির্মিত পদার্থ জাতেরও অনেক আদর লক্ষিত হয়।

বাজানগর, সেরাজাবাজ ও ইছাপাশা প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠি আছে। এই সকল কুঠিতে মন্দ নীল জন্মে না। কিন্তু তাদৃশ প্রচুররূপে না হইলেও স্থানান্তরবর্তী লোকদিগের যথোচিত উপকার সম্পাদনা করিয়া থাকে।

রাজ্যশাসন ও বিচারালয়

সুশাসন ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন জন্য বিক্রমপুরের নানা স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিচার মন্দির সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই যে, কর্মচারীবৃন্দের কর্তব্যকর্মে শিথিলতা নিবন্ধই হউক, স্থানে স্থানে অনেক শান্তিভঙ্গ ও নানা বিষয়িনী বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে শ্রীনগর, রাজাবাড়ি এবং মূলপদ্মগঞ্জ এই কয় স্থানে পুলিশ স্টেশন স্থাপিত আছে। এক এক স্টেশনে একজন সাব-ইন্সপেক্টর (অধস্তন তত্ত্বাবধায়ক), দুই-একজন হেড কনস্টেবল ও কতিপয় কনস্টেবল থাকিয়া থাকিয়া দেশের শান্তিরক্ষণকার্যে ব্রতী রহিয়াছেন। স্টেশন ব্যতিরেকে সাবডিভিশন (উপবিভাগ) মুন্সিগঞ্জে একটা ম্যাজিস্ট্রেটি অফিস (শান্তিরক্ষণালয়) সংস্থাপিত আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দশ আইন ও রেজিস্টারির ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। উপপ্রদেশে ফৌজদারি সংক্রান্ত যতবিধ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এই স্থানে (মুন্সিগঞ্জে) তৎসমুদায়ের প্রথম বিচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে ঢাকা তাহাদের আপিল হয়।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। জন ফ্রেঞ্চ নামক একজন ইউরোপীয় প্রথম এই পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করেন। অধুনা প্রায় পঁচিশ বৎসর অতীত হইল এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি অফিসের সৃষ্টি হইয়াছে। এযাবৎ কাল মধ্যে মৃত মীর আবদুল মজিদ, বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, সিবিলিয়ন মে. এল. ক্লে এবং ডি. আর. লায়েল প্রভৃতি মহাত্মগণ ক্রমান্বয়ে প্রোক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে সমাসীন হইয়া সাধারণ্যে উপকার করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য মহোদয় এই শান্তিরক্ষণকার্যে নিয়োজিত আছেন।

এদিকে দেওয়ানি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বহর নামক স্থানে মুনসেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত স্থাপিত আছে। পূর্বে পোড়াগাছা নামক স্থানে মুনসেফী মহকুমা ছিল। বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু তথাকার মুনসেফ ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ মার্চ উক্ত বিচারালয় পোড়াগাছা হইতে ঢাকায় উঠিয়া আসে। গোবিন্দ বাবু তখন এই পদে থাকিয়াই এডিশনল (অতিরিক্ত) মুনসেফ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি বিচারকার্যে মন্দ পটু ছিলেন না। অনন্তর ঢাকার এডিশনল মুনসেফী পদ রহিত হইয়া মফঃস্বলে পুনরায় মুনসেফী পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। এই সময় বাবু নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এডিশনাল মুনসেফ হইয়া আইসেন। ইহাই বহরে মুন্সেফী পদের প্রথম সৃষ্টি। নিত্যানন্দবাবুর পর হাসমতুল্লা নামক একজন মুসলমান এই পদ প্রাপ্ত হন। ইনি অল্পকাল হইল মাদারীপুরে পরিবর্তিত হইলে বাবু হরচন্দ্র দাস মুনসেফ হন। ইনি এখনও এই পদে আসীন আছেন। ইহার কার্যদক্ষতা মন্দ নয়।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বহরে ছোট আদালত সংস্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার ছোট আদালতের জজের প্রতি উক্ত ছোট আদালতের কার্যভার সমর্পিত আছে। বাবু অভয়কুমার দত্ত মহোদয় এখন জজের আসনোপবিষ্ট আছেন। জজের অধীনে প্রধানত একজন হেড ক্লার্ক ও একজন নাজির কাজ করেন।

পদ্মানদীর উত্তর পার্শ্ববর্তী লৌহজং ও কেদারপুর নামক দুই স্থানে দুইটি আউট

পোস্ট (ফাঁড়ি) ছিল। কিন্তু ২য় বর্ষ হইল কনস্টাবুলারি পুলিশের সৃষ্টি অবধি কনস্টেবল শান্তিবিধান করিতেছেন। লৌহজঙ্গে এখন একটি আবগারি আফিস সংস্থাপিত আছে। কিন্তু তত্রত্য এককালে উঠিয়া গিয়াছে।

বার্তাবহালয় (পোস্টাফিস) ও সাধারণ সরণি

সত্য বটে, অধুনা বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে ডাকগৃহ সংস্থাপিত হইতেছে; দেশীয় লোকের পত্রপত্রিকাদি প্রাপ্তি ও প্রেরণ বিষয়িণী সুবিধা সম্পাদন জন্য গবর্নমেন্ট কর্তৃক অনেকগুলি উপায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জ ও তদ্বারা বিলক্ষণ সুখভোগ করিতেছে। কিন্তু বলিতে গেলে, উহা আজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে·না। কর্মসম্পাদকবৃন্দের অমনোযোগিতা ও অনুচিত ঔদাস্য নিবন্ধন উহাদিগের (পোস্টাফিস সমূহের) কার্যকলাপ সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং স্থানীয়দিগের অসুবিধা এককালে নিরাকৃত হইতে পারে নাই। এখানে শ্রীনগর, বহর, জৈনসর, রাজাবাড়ি, মূলপদ্মগঞ্জ, কাঁচাদিয়া এবং সোনারঙ্গ এই কয় স্থানে পোস্টাফিস আছে।

কোন কোন স্থান পঙ্কিল ও জলময়— কোন কোন স্থান বিবিধ জঙ্গলাকীর্ণ থাকা নিবন্ধন লোকবৃন্দের নিয়ত গমনাগমনের অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। নৃপকুঞ্জর বল্লাল এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি মহাত্মনিচয় কতিপয় প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বর্ত্ম নির্মাণ করান সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত এখন কালের করাল হস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে এককালে অসঙ্গত হয় না। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের কথঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহর হইতে তালতলা পর্যন্ত একটি অনতি অল্প পরিসর খাল আছে। উহাতে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস পোতাদি জলযানের গমনাগমন লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে রাজবল্লভের অন্যতর পুত্র রামদাস যখন ঢাকায় নবাবের সহকারী ছিলেন, তখন এক দিবস তিনি (রামদাস) সন্ধ্যার সময়·অনুচরদিগকে জানাইলেন যে, এমন একটি তরণীবর্ত্ম নির্মাণ করাইতে হইবে যে তাহা দ্বারা কালি প্রত্যূষ সময়ে যাত্রা করিয়া, সায়ংকালে গৃহে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তদনুসারে অনুচরবৃন্দের যত্নে এক রজনীর মধ্যেই ঐ খাল প্রস্তুত হয়। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৯/১০ মাইল হইবে। উহাকে লোকে সচরাচর "সুবচনীর" খাল বলিয়া থাকে। খালের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া মৃন্ময় এক উচ্চ পথ আছে। সত্য বটে সম্প্রতি প্রজাহিতৈষী গবর্নমেন্ট বহুল অর্থ ব্যয়ে শ্রীনগর হইতে তালতলা পর্যন্ত এক সরণি প্রস্তুত করাইতেছেন। কিন্তু কার্যকারকবৃন্দের গুণে আশানুরূপ ফল লাভ নিতান্ত অসম্ভব। প্রায় তিন বর্ষ অতীত হইয়া গেল আজিও উহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্ট হইতেছে না। এখন বর্ষাকালে উহার নিরতিশয় জঘন্য অবস্থা সঞ্জাত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যদিও এই পথ নির্মাণে আপাতত কাহার কাহার অপকার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পরিণামে অনেকের ইষ্ট লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বর্ত্ম নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নাই।

ভাষা ও বিদ্যালয়

বিক্রমপুরের ভাষা বিষয়িনী উন্নতি মন্দ দেখা যাইতেছে না। এখানে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। দিন দিন প্রোক্ত ভাষাত্রয়ের সমধিক

উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আপামর সাধারণ সকলেই অধুনা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনল্প আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। এখানে বিএ, এমএ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের এককালে অসদ্ভাব নাই। এই অনতি পরিসর বিক্রমপুরে সম্প্রতি প্রায় বিংশতিটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়, পঞ্চবিংশতিটি বঙ্গবিদ্যালয়[৭] প্রতিষ্ঠিত আছে। একদা বিক্রমপুরবাসী যুবগণের হৃদয়ে উন্নতি বিধায়িনী অনুরাগিতা এতাদৃশী বলবতী দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তখন অনেকের উৎসাহ ও যত্নাতিশয়ে এখানে মাইজপাড়া, কোরহাটি, ষোলঘর, কামারগাঁ, কুমারভোগ, ব্রাহ্মণগাঁ, প্রাণিমণ্ডল এবং হাসাড়া গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরম হিতৈষী বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের (ইনি তখন অত্রত্য বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন) একমাত্র পরিশ্রমশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু দিন দিন শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলির (বালিকা বিদ্যালয়সমূহের) সংখ্যা বৃদ্ধি ও অধিকতর উন্নতি হইবে দূরে থাকুক অধুনা ক্রমশ তাহাদের ক্ষয়সাধন হইতেছে। কোন কোনটি প্রভাতকালীয় দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।

গভর্নমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের মধ্যে কালীপাড়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর, তেয়টিয়া, বজ্রযোগিনী এবং লোহাজঙ্গ স্কুল প্রধান। উল্লিখিত বিদ্যামন্দির ব্যতীত কয়েকটি প্রাইভেট (গুপ্ত) স্কুল এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি দেশহিতৈষিনী বিদ্যোন্নতিসাধিনী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে কালীপাড়ার 'জ্ঞানদায়িনী' ও কোরহাটির 'জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশিনী' সভা প্রধান। সভা দেশের অশেষ মঙ্গলকরী সন্দেহ নাই। কিন্তু একতা এবং একাগ্রতা উৎসাহের অনুগামিনী না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যেখানে প্রোক্তগণত্রয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তথায় অনেক কাজের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশিনী আজ পঞ্চমবর্ষে পাদবিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্মগন্ধ বিদূরিত হইতে না হইতেই এ একটি অনল্প মঙ্গলের কাজ সাধন করিয়াছে। বলিতে কি, বিকাশিনীই তেয়টিয়া ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রসূতি স্বরূপ।

এখন আমরা সংস্কৃত ভাষার আন্দোলন বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার বিগত শোচনীয় অবস্থা স্মৃতিপথবর্তিনী হইলে ইহার উপর দিয়া যে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝানল প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিলে, আমাদের ন্যায় পাষাণহৃদয়েরও শোক উপস্থিত হয়—অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া উঠে। যখন দুরাদ যবনানল ভারত কাননে প্রবেশ করে—যখন ভয়ঙ্কর যবনরাহুস্পর্শে আমাদের হিন্দুসূর্য এককালে ম্রিয়মাণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে— যে সময় ভারতের রাজশ্রী যবনাঙ্কশায়িনী হয়েন— যখন হিংসা, ঈর্ষা, মত্ততা প্রভৃতি বিকটাননা পিশাচীবৃন্দ মহানন্দে ভারত উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই ভারতলক্ষ্মী ও স্বর্ণভূমি ভারতের চূড়ামণি আর্যজাতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আর্যাবর্তের একমাত্র গৌরবের কারণ আমাদের মাতৃভাষা—সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা মৃতপতিতা কামিনীর মত দীন বেশ পরিধান ও হীনভাব ধারণ করিতে থাকেন। ইনি ক্রমশ ছিন্নলতিকার ন্যায় আদরবঞ্চিতা হইয়া দুরন্ত যবনভয়েই যেন প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। পারসি ভাষা তখন সংস্কৃতের স্থলবর্তিনী হয়।

হিন্দুগণ রাজভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা বিদেশিনী পারসি ভাষাকেই সংস্কৃতের বিমল-আসন প্রদান করেন। দুর্ধর্ষ যবনরাজের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, কাহার সাহস, এই সকল ভাব দর্শন করিয়া কাহার মনে বিশ্বাস ছিল যে আমরা পুনরায় সংস্কৃতের দর্শন লাভ করিব? কে জানিত আমরা সেই যবনতাড়িত পবিত্র সংস্কৃত ভাষার মধুর-পীযূষপুরিত আস্বাদন পুনঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব? কিন্তু কি আনন্দ ও সুখের বিষয়! এই প্রচণ্ড যবন-ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহের সময়ে ও আমাদের— হিন্দুদিগের মধ্য হইতে মাতৃভাষা সংস্কৃতের রক্ষণার্থ একদল বীরপুরুষ নির্গত হইলেন। ইহারা বস্তুত শারীরিক বলে তাদৃশ বলীয়ান ও বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। মানসিক বল একমাত্র উৎসাহই ইহাদিগের প্রকৃত বল এবং একীভাব ইহাদিগের প্রধানতম অস্ত্র ছিল। ইহারা এইমাত্র সম্বল লইয়া নিরাশ্রিতা অনাথিনী সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার সম্পাদন পূর্বক তাহাকে স্ব স্ব পর্ণ-কুটিরে আশ্রয় প্রদান করেন।

অনেকে উল্লিখিত উৎসাহশীল পুরুষদিগের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন। ফলত ঈদৃশ উৎসাহবান ব্যক্তিদিগের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে, ইহার স্মৃতি, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ। আজি এই মহাত্মাদিগের সন্তানবৃন্দই "সার্বভৌম" প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া সাধারণ্যে "পণ্ডিত" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষা তদবধি ইহাদিগের পর্ণকুটীরবাসিনী এবং ইহাদিগের যত্নে সংরক্ষিতা হইয়া অদ্য আমাদের এতাদৃশ সন্তোষ বর্ধন করিতেছেন। বলিতে কি, একমাত্র এই দরিদ্র দ্বিজবৃন্দের উৎসাহ-বারি সিঞ্চনেই প্রায় বীতজীবনা সংস্কৃত ভাষা সঞ্জীবিতা রহিয়াছেন। ইহারা এই নিমিত্ত জনসমাজের বিলক্ষণ ধন্যবাদের পাত্র।

বিক্রমপুরে সার্বভৌম, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাভূষণ, শিরোরত্ন, শিরোমণি, শিরোভূষণ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, তর্কবাগীশ, তর্করত্ন, তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক উপাধিপ্রাপ্ত প্রায় তিনশত পণ্ডিত আছেন। পণ্ডিতবৃন্দ সংস্কৃত ভাষার রক্ষণ জন্য এতাদৃশ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যে, শুনিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ফলত তখন তাহাদের নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত শিক্ষা প্রদানানুরাগ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রতি হৃদয়ভাণ্ডার ভক্তিরসে পরিপূরিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রত্যেকের অধীনে এক একটি টোল (চতুষ্পাঠী) আছে। টোলে যে সকল দ্বিজতনয় শিক্ষা করিতে আইসেন, পণ্ডিত মহাশয়গণ তাহাদিগের আহারীয় প্রদান করেন ও নিজ গৃহে বাসস্থান দেন। বলিতে গেলে তাহারা ছাত্রদিগের (পড়ুয়াগণের) একপ্রকার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে সমাহূত হইয়া থাকেন। সভাতে ইহারা তার্কিকতার একশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের অন্তঃকরণে জিগীষা পিশাচীর এরূপ আধিপত্য যে অনেকেই তর্ককালে পরস্পর 'পাছাড়' ধরিবার উপক্রম করেন। শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই ইহার মূলীভূত কারণ।

সম্প্রতি বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ভিন্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। গভর্নমেন্ট ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের ন্যায় কোন কোন সংস্কৃত বিদ্যালয়েও যথারীতি সাহায্য দান করিতেছেন। সত্য বটে অধুনা এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা

নিতান্ত অল্প। কিন্তু এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গভর্নমেন্টের আদেশানুসারে অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের যত বাহুল্য হইবে ততই উহার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত ভদ্রবংশজবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে যাদৃশ আদর ও যত্ন দেখা যাইতেছে—তাহারা স্ব স্ব শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ বদ্ধপরিকর ও মনোযোগবান হইতেছেন, সেইরূপ তাহাদিগের প্রিয় ভ্রাতা গ্রামীণ ও ইতর জনগণের উন্নতি ও শিক্ষার জন্য কিছুই প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। আত্মসুখেই যেন এককালে নিরত রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিবল প্রভৃতি দেশীয় দরিদ্রদিগের নিঃস্বতার প্রতি একটুকুও কটাক্ষপাত করিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা স্বার্থপরতা ও নির্দয়তার কার্য আর কি হইতে পারে? ন্যায়পরতা দেবী ইহাদিগের হৃদয়াসন এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও বোধহয় লেখনী অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইবে না। কৃতবিদ্যগণ! আপনারা আর কতকাল স্ব স্ব উন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুলিত থাকিবেন? কতকাল আত্মসুখে রত থাকিয়া দেশের— মাতৃভূমির অবনতি দর্শন করিবেন? আপনারা কি অবগত নন যে, আপনাদের উপর দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল নির্ভর করিতেছে? বিদ্যাশিক্ষার ফল কি কেবল আপনারাই উপভোগ করিবেন? যে বিদ্যা দ্বারা দেশের নিরীহ প্রকৃতি গ্রামীণ সাধারণের উপকার না হইল তাহার উপভোগ করিয়া আপনাদিগের কি লাভ হইবে? বিদ্যাবলে আপনাদের হৃদয়াকাশ অজ্ঞানতিমির হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃদিগকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতারূপ ভয়ঙ্করী নিশাচরীবৃন্দ হইতে উন্মুক্ত করা কি আপনাদের নিকট উচিত বলিয়া অনুভূত হয় না? এই সাধারণ কর্তব্যবোধ কি এখনো আপনাদিগের চিত্তক্ষেত্রে নিহিত হয় নাই? মহাত্মাগণ! সময় গিয়াছে মনে করিবেন না। এখনো সময় আছে। আজি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্যক্ষেত্রে গমন করুন অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন।

দুর্ভাগিনী বিক্রমপুরের দিন দিন কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতেছে! প্রতিনিয়ত শোকাশ্রু প্রবাহে ইহার বক্ষস্থল ভাসমান হইতেছে! ইহার ভাবী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয় ব্যথিত ও কম্পিত হইতেছে! আমরা যেমন ক্রমশ ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতি শশির সুবিমল মুখচ্ছবি দর্শনের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি, কঠোর হৃদয় কৃতান্ত রাহু তেমনই ভীষণাকার ধারণ সহকারে করাল মুখ ব্যাদানপূর্বক সেই উদয়গিরি আরোহণোন্মুখ উন্নতিশশিকে এককালে কবলস্থ করিতে বসিয়াছে; হতভাগিনী বিক্রমপুর ভূমির শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে কাতর হইয়াই যেন ইহার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বিনাশ সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। ইহার প্রতি দুরন্ত শমনের যাদৃশ প্রকোপ ও শাত্রবভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিতেছে যে, হতশ্রী বিক্রমপুর কখনও পুরাকালীয় গৌরব লাভ করিতে পারিবে কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। বিক্রমপুর সর্বসুখহর যমদেবের আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারে প্রতিদিন যশোবিচ্যুত ও মলিনীকৃত হইতে থাকিবে এরূপ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে ইনি উপযুক্ত প্রিয়সন্তানগণকে হারাইতেছেন। তেজোহীন পাণ্ডুভাব ধারণ করিতেছেন দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না শোকশঙ্কু বিদ্ধ হয়?

যাহাদিগের দ্বারা লোক বিশ্রুত আমাদের সংস্কৃত ভাষার সর্বাধিক অঙ্গ সৌষ্ঠব

পরিবর্ধিত হইতেছিল— যে সকল মহাত্মবৃন্দের প্রযত্নে ইনি (সংস্কৃত ভাষা দেবী) উজ্জ্বল বেশ ও মোহিনী মূর্তি ধারণ করিতেছিলেন, অচিরকাল বিগত হইল সেই সংস্কৃত ব্যবসায়ী বিক্রমপুরের কতিপয় সপ্রধান পণ্ডিত-নক্ষত্র চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রায় অষ্টাধিক বর্ষকাল অতীত হইল, বিক্রমপুরস্থ পণ্ডিত কুলচুড়ারত্ন কমলাকান্ত সার্বভৌম মহোদয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার মরণে বিক্রমপুর যারপরনাই শোক পরিচ্ছদ ধারণ করেন। অত্রত্য আবালবৃন্দ সকলেই ভাবী উন্নতির শিরে অশনিপাত হইল মনে করিয়া নিতান্ত ক্ষুভিত ও খিন্ন হৃদয় হয়েন; পণ্ডিতবৃন্দ তাদৃশ আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশয় ব্যথিতচিত্ত ও একান্ত কাতর হইতে থাকেন। ফলত সার্বভৌম মহাশয় বিক্রমপুরস্থ অপর পণ্ডিতমণ্ডলীর আশ্রয় তরু স্বরূপ ছিলেন; ইনি ষোল আনী বিদায়ের অধিকারী ছিলেন। ইহার যশঃ সৌরভ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে। সুতরাং যমনিকেতনে ইহার অকাল আতিথ্য স্বীকার সাধারণের বিশেষত পণ্ডিত নিচয়ের নিতান্ত বিষাদ ও আক্ষেপের কারণ হইতে বিচিত্র কি?

কিন্তু ইহার বিরহ নিবন্ধন বিক্রমপুর যদিও ম্লান বেশ ধারণ করেন, তথাপি প্রোক্ত সার্বভৌম মহাত্মার ন্যায় না হইলেও ইনি পণ্ডিতরত্নরাজি ভোগে এককালে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন না। অনন্তর চিত্রকরা নিবাসী গোলকচন্দ্র সার্বভৌম, পয়সাগাঁর অলঙ্কার শ্রীযুত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় প্রধানতম বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠেন। কিন্তু কালের কি নির্দয় হৃদয়! কি বিদ্বেষপূর্ণ নয়ন! অল্পদিন হইল উল্লিখিত গোলকচন্দ্র সার্বভৌম, বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, পুড়ার রত্নযুগল দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন ও নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং হোগলা[৮] নিবাসী গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম প্রভৃতি মহোদয়বৃন্দ জীবলীলা সংবরণ করিয়া অল্প লোকের হৃদয়ে শোকশেল প্রদান করেন নাই। ইহাদিগের এইরূপ অসাময়িক মৃত্যুতে সংস্কৃতের উন্নতি আশা ক্রমে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে অপনীত হইতেছে, এইরূপ দৈবদুর্বিপাকজনিত দুর্ঘটনার সমাচার বায়ু কোন মহাত্মার হৃদয়সাগরে না খেদ তরঙ্গের সঞ্চার করিয়া দেয়? পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় যদিও বিগত জীবন না হইয়া থাকুন; কিন্তু তাঁহার যেরূপ পীড়া উপস্থিত, তাহাতে বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে ইনি অচিরেই শমন ভবনে অতিথি সৎকার গ্রহণ করিবেন। হায়! ইহার মরণ হইলে বিক্রমপুর এককালে না হউক অনেকাংশে যে হতভাগিনী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই মহাত্মাও ষোল আনী বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংপ্রতি বিক্রমপুরে সম্পূর্ণ বিদায়াধিকারী অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। তাহারা তাদৃশ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন না হইলেও বিদ্যাবত্তা প্রকাশে এককালে কম নহেন। তর্কশক্তি সকলের সমান নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য সংশয় নাই। কেহ বিচার বিষয়ে বিলক্ষণ পটু, কেহ তাহা অপেক্ষা ন্যূন। মৃত মহাত্মা পণ্ডিতকুঞ্জর কমলাকান্ত সার্বভৌম মহাশয় তর্কশক্তির একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, নবদ্বীপস্থ বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর কেহ কেহও তার্কিকতায় তাঁহার নিকট একপ্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। সার্বভৌম মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ও বিশারদ ছিলেন। তিনি তর্ককালে বীর পুরুষের ন্যায় উত্তর দান করিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বলিতেন "নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর, কমলাকান্ত সার্বভৌম

যাহা বলিলেন তাহা ঠিক ও অভ্রান্ত।" ফলত তাহার তর্কে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। কমলাকান্ত সার্বভৌম মহোদয়ের ছাত্রদিগের বিচার দর্শন করিলে তাহার অধ্যাপনা শক্তিরও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার অধ্যাপনা নিয়ম যে অনল্প বিশদ ছিল তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেক দিন অতীত হইল বিক্রমপুর অপর একটি পণ্ডিত রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহার নাম অভয়াচরণ চমৎকার। ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, শুনিলে যারপরনাই চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই "চমৎকার" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। চমৎকার মহাশয়ও বিচার কালে অতিশয় পটুতা সহকারে তর্কশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বক্তৃতায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিতেন। সকলেই তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। তাঁহার টোলে ছাত্র সংখ্যার যে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল এতদ্বারা তাহার লক্ষণ বেশ লক্ষিত হইতেছে। ইঁহার অবলম্বিত শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতিও সন্তোষপ্রদ ও প্রশংসনীয় ছিল। অধুনাতন টোল সকলের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বিধান জন্য কতিপয় টোলে সদাশয় গভর্নমেন্ট নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছেন।

আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা

বিবিধ মণিপূর্ণ খনি যত খনন করা যায় ততই যেমন তাহা হইতে বহু মূল্য রত্নরাজি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ এই বিক্রমপুরের প্রাচীন মহাত্মাবৃন্দের খ্যাতি ও যশোযোনি সংস্কৃত শাস্ত্ররূপ মহান আকার খনন করিতে করিতে অনল্প মঙ্গলকর আয়ুর্বেদরত্ন আমাদের হস্তগত হইল। যদিও এই রত্ন আজি আমরা লাভ করিলাম, কিন্তু ইহা অনেকদিন হইতেই ইহার উজ্জ্বল আভা দ্বারা বিক্রমপুরকে আলোকিতা ও খ্যাতিশালিনী করিয়া আসিতেছে।

আয়ুর্বেদ ও ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ। সত্য বটে পুরাকালের ন্যায় অধুনা এখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তাদৃশ আন্দোলন দৃষ্ট হয় না— সত্য বটে প্রাচীন সময়ে এতদপেক্ষা ইহার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুচক্ষে দর্শন করিলে আজিও ইহার মন্দ আদর লক্ষিত হইতেছে না দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও অনেকানেক মহাত্মা এই আয়ুর্বেদ শিক্ষা বিষয়ে প্রচুর উৎসাহশীল ও একান্ত অনুরাগবান প্রতীয়মান হন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রের এক প্রধানতম অঙ্গ। নিদান প্রভৃতি মহত্তর শাস্ত্রনিচয় ইহার অন্তর্গত। এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে ব্যাকরণশাস্ত্রে সমীচীন বুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্য ও কলাপাদি ব্যাকরণশাস্ত্রে বিচক্ষণতা না জানিলে আয়ুর্বেদের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা অনেক কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং সম্মানাত্মক প্রধান প্রধান উপাধি লাভে যে অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অত্রত্য চতুষ্পাঠীসমূহের ছাত্রবৃন্দ (পড়ুয়াগণ) যেমন সাধারণত নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয়

ছাত্রগণ যেমন এই বিক্রমপুরে আসিয়া বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে সেইরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র পারদর্শী বৈদ্যদিগকে তাঁহাদের ন্যায় স্থানান্তর গমন করিতে হয় না এখানেই ইঁহাদের নামকরণ হয়। বৈদ্য ভিন্ন আর কেহ এই খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। এখানে আয়ুর্বেদ শিক্ষার মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমশই ইহার উন্নতি আমাদের নেত্রপথবর্তিনী হইতেছে। ইহার আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে যে, বিক্রমপুর অচিরকাল মধ্যেই আয়ুর্বেদ আলোচনার নিমিত্ত পূর্ববৎ এক অতি বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠিবে। কেবল দুই-এক স্থানে নয় এখনো বিক্রমপুরের নানা স্থানে আয়ুর্বেদের বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। এমন পল্লী অতি বিরল, যেখানে দুই-একজন আয়ুর্বেদ বিশারদ বাস না করেন। টোল সম্বল পণ্ডিত মহোদয়দিগের ন্যায় ইহারদিগের অধীনেও দুই চারিজন করিয়া ছাত্র পাঠ করেন।

সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে সোনারঙ নিবাসী কালিদাস কবিরত্ন, পাটাভোগের কালীশঙ্কর কবিভূষণ, বেলতলীর কালীকুমার কবিভূষণ, বটেশ্বরবাসী পীতাম্বর কবিরত্ন, মালকদিয়াস্থ কালীপ্রসাদ কালীসাগর এবং সাওর্গা পল্লীর গৌরীনাথ সেন প্রভৃতি আয়ুর্বেদবিদ্‌গণ প্রধান। ইঁহারা সাধারণের উপকার সম্পাদন সহকারে দেশ-বিদেশে বিপুল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। ইঁহাদের অনেকে কলিকাতা, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া স্ব স্ব চিকিৎসা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। কোঁমড়পুরবাসী গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় কলিকাতা মহানগরীতে চিকিৎসাকার্যে নিরত থাকিয়া নিরতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। যদিও ইনি কোন উপাধি প্রাপ্ত না হউন, তথাপি ইঁহার বিদ্যাবত্তা ন্যূন নহে। এই মহাত্মা অধীত শাস্ত্রের উন্নতি বিধানার্থ নিয়ত প্রয়াস পাইতেছেন। গঙ্গাপ্রসাদবাবু আয়ুর্বেদ বিষয়ে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দেশহিতানুরাগ বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুত গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কালিদাস কবিরত্ন প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী মহোদয়বৃন্দ সঞ্জীবিত থাকিলে বিক্রমপুরের যশোভাণ্ডার নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর অপরাপর সমস্ত দেশের পরাজয় সম্পাদন করিয়াছেন। কালে ইহার সেই জয়শ্রী অপরাজিত রূপে বিরাজমান থাকিয়া লোক লোচনের আনন্দবর্ধন করিবে এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু বিক্রমপুর নিতান্ত হতভাগিনী। ভয়ঙ্কর কাল যেন ইহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দয় নিষাদের ন্যায় ধীরে ধীরে ইহা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতেছে। ইহার করাল আক্রমণে প্রধান প্রধান পণ্ডিতবৃন্দ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছেন দেখিয়া আশা আর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না! আত্মানীরস ভাবধারণ করিতেছে! কাল যে কেবল বিক্রমপুরের পরম শোভাকারী পণ্ডিতরত্ন মালাহরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত ও নিরস্ত রহিয়াছেন এমত নহে। বিবিধ আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ মহাত্মাবৃন্দকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছেন। কত মহোদয়কে ইহার মধ্যে স্বকীয় উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। কালকবলিত কবিরত্ন প্রভৃতির স্মরণ হইলে শোকাবেগ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। অধিককাল বিগত হয় নাই বানরী নিবাসী রাজনারায়ণ কবিরত্ন, রাজপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামদুর্লভ সেন মহোদয়দ্বয় লোকান্তরিত হইয়া সাধারণকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া

গিয়াছেন। এইরূপ কত স্থান হইতে কত মহাত্মা গগনস্থ উল্কাবৎ স্খলিত ও অন্তর্হিত হইতেছেন তাহা কে বলিতে পারে?

এখানে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সমান্দোলন ব্যতিরেকে অপরবিধ চিকিৎসা প্রণালীরও মন্দ উন্নতি লক্ষিত হয় না। ইহারও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। কবিরাজগণ সাধারণ রোগোন্মূলন সময়েও অনল্প কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে কোন কোন মহাত্মা জ্ঞান ও বিদ্যা বিষয়ে সরস্বতীর বরপুত্র এবং ভেষজ বিধানে আমাদের সেই "কবিরাজ খুড়োর" ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ। যাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন প্রায়ই তাহার পক্ষে একবারে কৃতান্ত সহোদর হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু এরূপ চিকিৎসকের প্রভাব এখন আর কার্যকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। ইহাদের দলবল এখন অনেক ন্যূন ও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। এখন কবিরাজবৃন্দ চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন মত পরিবর্তন ও নবপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে তাহারা কৃতকার্যতাও লাভ করিতেছেন। অনেকে আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল প্রদর্শন করিয়া ভয়ানক রোগের উপশম করিতেছেন। কোন কোন শ্বেতকান্তি মহোদয় কবিরাজদিগকে বিদ্যাবিমূঢ় ও হতবুদ্ধি মনে করিয়া ইহাদিগকে চিকিৎসা ব্যাপারে বিরত করিবার জন্য সাধারণে মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীকে অমোঘ জ্ঞান করিয়া সর্বত্র তাহার প্রাধান্য স্থাপনার্থ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত ব্যগ্র। এই শ্বেতকায় মহাপুরুষগণ যে এদেশজাতদিগের উন্নতি ও সৌভাগ্যকাতর তাহা তাহাদের ঈদৃশ বাক্ বিন্যাসে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারা স্বীয় অনভিজ্ঞতা স্বীকারে এককালে পরান্মুখ। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহাতে উল্লিখিত শুভ্রাঙ্গদিগের বাক্যগুলি শুদ্ধ অসূয়া ও হিংসা প্রণোদিত বলিয়া সংলক্ষিত হয়। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের মনে নিরীহ কবিরাজদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর শাত্রবভাব লব্ধ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমরা মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদের কবিরাজবৃন্দের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন যে, তাহাদিগকে জ্ঞানবত্তা ও চিকিৎসা বিষয়ে ইউরোপী চিকিৎসাবিধানজ্ঞ মহোদয়গণ এককালে পরাস্ত করিতে পারেন না বলিতে কি কোন কোন বিষয়ে তাহারা শ্রেষ্ঠতর রূপে দৃষ্ট হন, সুতরাং প্রোক্ত শ্বেতমুখদিগের মত যে নিতান্ত অবিশুদ্ধ ও ভ্রমশঙ্কুল তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীস্থ কবিরাজদিগের মধ্যেও অনেকে কার্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। দেশ মধ্যে তাহাদের মন্দ প্রতিপত্তি নহে।

কৃষিকার্য

অনেকে মনে করেন—মনে করেন কেন বলিয়াও থাকেন যে, কৃষিকার্য কেবল ইতর শ্রেণীস্থ লোকেরই অবলম্বনীয়। উহাতে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ ফল ও উপকার কি? যেরূপ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন মতে একমাত্র হল চালনা করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু যাহারা এরূপ অসার কথা বলিয়া থাকেন, তাহারা ভ্রমেও একবার মনে স্থান দেন না যে সেই হল চালনা কার্যই বা কি প্রকার প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়া উচিত। অধুনা যে রীতি অবলম্বন করিয়া কৃষকবৃন্দ হল চালনা, ক্ষেত্র নিড়ান প্রভৃতি কার্যকলাপ সম্পাদন করিতেছে তাহা যে সর্বাঙ্গীন ফল প্রসবিনী নয়

ইহা কখনো পর্যালোচনা করিয়া দেখেন কি না সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। আমাদের বিক্রমপুরবাসীদিগের মধ্যেও এরূপ বিশ্বাসপন্ন মানুষের অসদ্ভাব নাই। হৃদয়ের অপ্রশস্ত ও সঙ্কুচিত ভাবই এতাদৃশ অনুচিত ও অশুভকর সংস্কারের উৎপত্তির মূল কারণ। কি ভদ্র, কি ইতর যদি সকলেই প্রকৃত উৎসাহ সহকারে সমভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা ও প্রয়াস পাইতেন আপামর সাধারণ সকলেই যদি একমত হইয়া দেশোন্নতির প্রধানতর উপায় কৃষিকার্য অবলম্বন করিতেন; কেহই যদি এখনকার মত পরপ্রত্যাশী হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৃতি লাভের জন্য লালায়িত না হইত, তাহা হইলে আজি কি বিক্রমপুরের এতাদৃশী দুরবস্থা সঞ্জাত হইত? বিক্রমপুর কি ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমুখপ্রেক্ষিণী হইয়া আমাদের— তাহার সন্তানদিগের এত খেদের সঞ্চার করিত? ইহার কি এই দীনভাব দর্শন করিতাম, যদি সকলেই স্ব স্ব করে লাঙল ও কোদাল ধারণ করিয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে স্বর্ণ ফলবতী বিক্রমপুরের এত অধিক স্থান কি অনাবাদ ও অরণ্যময় থাকিত? কখনই নহে। বিক্রমপুর তখন বিবিধ শস্যরত্নে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিত। ইহার অধিবাসীবৃন্দের যথেষ্ট তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া পরকীয় দেশসমূহের জীবিকা নির্বাহ বিষয়েও বিলক্ষণ সাহায্যদায়িনী হইয়া উঠিত।

হায়! এই ভাব যখন হৃদয়ে সমুদিত হয়, তখন অশ্রুজল বিসর্জন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। আমাদের ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া স্বয়ং কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কবিবেন দূরে থাকুক, কিসে ভূমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি সম্পাদন করে, কি রূপ উপায় অনুষ্ঠিত হইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়, কোন প্রকার শস্যের পর কোন প্রকার শস্যের বীজ বপন করিতে হয়, ইতর শ্রেণীস্থ কৃষিবলদিগকে এবং বিধ ভূমির উৎকর্ষ সংসাধিনী প্রণালীর শিক্ষা প্রদানেও তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। ইহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে যেন একটুও ক্লেশ ও লজ্জা বোধ করেন না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজিকালি বিক্রমপুরে কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নহে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিলে অনায়াসে এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ওরূপ আশা করিয়া কি হইবে? বাঞ্ছিত কার্য দর্শনের দিন এখনও অনেক দূরবর্তী রহিয়াছে, এরূপ অনুভূত হইতেছে। ইহাদের হৃদয়েও অশেষ মঙ্গলকর অনুচিত মনে বোধ লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয়ে এই মহাত্মগণও যেন দেশাচারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এরূপ মান বোধ ও কুৎসিত দেশাচারের দাসত্ব স্বীকার নব্য কৃতবিদ্য যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন সমাজের আশঙ্কা করাও বিধেয় নয়। যদি তাহারা অলীক মান বোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রোক্তবিধ কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদেরই এক বিস্তীর্ণ সমাজ ও দেশ হস্তগত হইয়া উঠে। তবে যে দেশাচার তাহাদের নিকট এ বিষয়ে একান্ত অযৌক্তিক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত মানহর দাসত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

সম্প্রতি বিক্রমপুরের যে সকল শস্যজাত[৯] উৎপন্ন হইতেছে তাহা অত্রত্য লোকদিগের জীবিকা নির্বাহ বিষয়েও পর্যাপ্ত নহে। অধুনা যে প্রণালীতে কৃষকগণ কার্য করিতেছে তাহাতে ভূমির উৎকর্ষ সম্পাদন ও শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবে এরূপ

আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে উহার হ্রাসই যেন দেখা যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি আছে? কৃষিজীবীদিগের শিক্ষাভাবই ইহার একমাত্র প্রধান কারণ। মহান অনিষ্টকর এই শিক্ষাভাবের অপনয়ন চেষ্টা পাওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়? আমরা কি এই সময় মৃৎপিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? আমাদের বিবেক কি এ বিষয়ে সায় প্রদান করিবে? কখনই নহে। মাতৃভূমির সৌন্দর্য ও মঙ্গল বিধান আমাদের একান্ত বিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মহাত্মগণ! দুঃখিনী বিক্রমপুরের প্রিয় সন্তানগণ! আপনারা মনোযোগী হউন। যাহাতে কৃষিকার্যের শ্রীবৃদ্ধি সুতরাং দেশের অভাব বিদূরিত হয় তাহার জন্য সত্বর প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন। আপনারা সমবেত হইয়া পরস্পর সাহায্য দানে স্থানে স্থানে এক একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করুন। তাহা হইলে অনেকাংশে অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

বিক্রমপুরের নদী (কীর্তিনাশা) ও বিভাগ

বিক্রমপুরের প্রধান নদী কীর্তিনাশা। ইহার ন্যায় বেগবতী স্রোতস্বতী অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কীর্তিনাশার চিত্ত চমৎকারিণী বিস্তীর্ণতা দর্শন করিলে হৃদয় বিস্মিত ও কম্পিত হয়। ইহার উৎপত্তির বিবরণ অল্প আশ্চর্যবহ নহে। অনেকে বলেন বিখ্যাতনামা রাজবল্লভের নিবাসভূমি রাজনগরের উত্তরাংশে অনতিদীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র খাল ছিল। একদা রজনীযোগে সেই খালের জলপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া তথায় এক ভয়ানক খাত হইয়া পড়ে। কতিপয় মাসের মধ্যে উহা এতাদৃশী বিস্তারশালিনী ও তরঙ্গবতী হইয়া যুগপৎ তেত্রিশখানা প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং অনেকগুলি জমিদারের কীর্তিকলাপ বিলোপ করে বলিয়া ঐ অংশের নাম 'কীর্তিনাশা' হয়। কাহারও বিশ্বাস, প্রায় শতবর্ষ অতীত হইল ব্রহ্মপুত্র নদের বেগ হ্রাস ও ক্রমে স্রোতোরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাতে ঝিনাই ও গঙ্গা প্রভৃতির বারিধারা পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং বর্তমান আইরল খাঁ নদী ঐ সকল প্রবাহ নিঃসারিত করিয়া দিতে না পারাতে জলরাশি প্রবলবেগ ধারণপূর্বক বিক্রমপুরের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কীর্তিনাশার এক শাখা নদী বহরের মধ্য দিয়া ভুজঙ্গাকারে গমনপূর্বক সানিহাটি, তেয়টিয়া, কোরহাটি, ব্রাহ্মণগাঁ প্রভৃতি গ্রাম নিচয়কে কাঞ্চীবৎ পরিবেষ্টন করিয়া সুশোভিত করিয়াছে। কীর্তিনাশার জল সুরস, তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যজনক। ইহার ইলিস মৎস্য অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া নানা স্থানে প্রেরিত ও বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়া নৌকারোহীদিগের অন্তঃকরণে মহান আতঙ্কের উৎপাদন করিয়া দেয়। তখন ইহার স্রোতঃ অতিশয় প্রবল হয় এবং যখন পূর্বদিগ হইতে নিরতিশয় ভীষণ বাত্যাসহকারে ইহার গর্ভস্থ জলরাশি পর্বত সমান উত্তাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে, তখন কীর্তিনাশা ও পদ্মা এমনি ভীমদর্শনা হয় যে, সেই সময় সমুদ্রগামী কোন কোন সুনিপুণ নাবিকও কর্ণধারণে সাহসী হয় না। পদ্মাকে কখন কখন অপার বলিয়া ভ্রম হয়। শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি অপরাপর ঋতুতেও পদ্মার বেগ ও আকার অল্প ভয়াবহ লক্ষিত হয় না। তখনও ঝড় সমুত্থিত হইলে নাবিকদিগকে হাতে প্রাণ রাখিয়া

পাড়ি ধরিতে হয়। পদ্মা, কীর্তিনাশা ভিন্ন এখানে আর কয়েকটি নদী ও শাখা নদী আছে। অপ্রয়োজনীয়তা বোধে তৎসমস্তের বিবরণ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

ভয়ঙ্করী কীর্তিনাশা বিক্রমপুরকে উত্তর, দক্ষিণ প্রধানত দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। দক্ষিণতটে, রাজনগর, দেভোগ, বিলাসপুর, বকসীপুর, মৌশুড়া, পারগ্রাম, বিজারি মহীসার, শিয়ালদহ, আটপাড়া প্রভৃতি পল্লীনিচয় এবং উত্তর পার্শ্বে বহর, রাজাবাড়ি, ধীপুর, বজ্রযোগিনী, টংগিবাড়ি, বালিগাঁ, রাউৎভোগ, আইরল, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া, শ্রীনগর, হাসাড়া, মাইজপাড়া, কনকসার, তেয়টিয়া, কালীপাড়া, ষোলঘর, কোরহাটি, ভাগ্যকুল, সানিহাটি প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। কীর্তিনাশার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া বালিগাঁ, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে তাহা এই উত্তরভাগকে আবার পূর্ব বিক্রমপুর ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ বিভাগ কখনই অসঙ্গত ও বিশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যেক ভাগেই এক একটি স্টেশন (থানা) স্থাপিত আছে। দক্ষিণ ভাগে মূলফতগঞ্জ, পশ্চিমাংশে শ্রীনগর ও পূর্বভাগে রাজাবাড়ি স্টেশন বিক্রমপুরের শান্তি বক্ষণ ব্রতে ব্রতী রহিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুরে ন্যূনাধিক পাঁচশত ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে (কীর্তিনাশার দক্ষিণতটে) তিনশত পল্লী হইবে।

এক একটি বিভাগ অবলম্বনপূর্বক গণ্ডগ্রামসমূহের বিবরণ লিখিবার পূর্বে, বিক্রমপুর যাহাদের দ্বারা এতদূর বিখ্যাত, আমরা সেই কতিপয় প্রধান প্রধান মহাত্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লাল সেন

রামপাল।— মেঘনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে রামপাল নামক স্থানে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তক বৈদ্যবংশসম্ভূত বল্লাল সেন রাজত্ব করিতেন। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বল্লাল' হয়। বল্লালের পিতা বিজয় সেন।[১০] ইঁহার প্রতাপাদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বল্লাল সেনের মহীয়সী শক্তি ও কীর্তিকলাপের ভূরি ভূরি চিহ্ন আজিও প্রকাশমান রহিয়াছে। এরূপ সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, বল্লাল সেন রাজবল্লভের পূর্বে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণোপায় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে স্বীয় জননীর নিকট বল্লাল নরপতি এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে সম্বদ্ধ হয়েন যে, "তিনি (বল্লাল মাতা) একাদিক্রমে অপ্রতিহতভাবে যতদূর গমন করিতে পারিবেন বল্লাল যেন ততদূর ব্যাপিয়া এক দীর্ঘিকা পরিখাত করাইবেন। একবার দাঁড়াইলে আর গমন করিতে পারিবেন না।" প্রতিজ্ঞানুসারে বল্লালের জননী ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি দর্শনে নৃপবর বিবেচনা করিলেন, এরূপ হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিতান্ত দুর্ঘটনা হইবে। অতএব কোন কৌশলে একবার মাতার গতিরোধ করিতে পারিলেই হয়। অনন্তর রাজার পরামর্শনুসারে তদীয় অনুচর এক ব্যক্তি বলিল, "ঠাকুরানি! আপনার পাদদেশে যে শোণিত চিহ্ন দেখিতেছি?" তচ্ছ্রবনে রাজমাতা সচকিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং বল্লাল মাতার গমনারম্ভ হইতে তাঁহার অবস্থিতি পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দীর্ঘিকা খনিত

করিলেন। এই দীর্ঘিকা এরূপ দীর্ঘ যে প্রবাদ আছে তাহার এক পার্শ্ব হইতে দুন্দুভিধ্বনি করিলে অপর পার্শ্বস্থ লোকের তাহা শ্রবণ গোচর হয় না। উল্লিখিত দীর্ঘিকা খনন সময়ে মজুরেরা যখন সায়ংকালে কোদাল ধুইয়া যাইত, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকে অন্য এক স্থানে 'এক কোদাল মাটি কাটিত'। ইহাতে এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা উৎপন্ন হয়, তাহা 'কোদাল ধোয়া দীঘি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এরূপ কিংবদন্তী যে, কোন জ্যোতির্বিদ আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগত পণ্ডিত স্বার্থান্ধতা পরতন্ত্র হইয়াই হউক অথবা রাজাজ্ঞানুসারেই হউক, গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক গলায় বাঁধিয়া রাজা দেহত্যাগ হইবে। এতৎ শ্রবণে বল্লাল সেন পাণ্ডিত্যের নিকট আত্মরক্ষার উপায় (অপমৃত্যু নিবারণের পন্থা) জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্বেত্তা নিষ্কণ্টক বা কোমল মৎস্য ভক্ষণের বিধান করিলেন। এই বিধানানুসারে নৃপতি প্রতিদিন পদ্মা হইতে অনায়াস ভোজ্য কাচকি মৎস্য আনাইবার নিমিত্ত এক পথ প্রস্তুত করান্ তদবধি ঐ পথ 'কাচকি দরজা' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দরজা ফরিদপুর মুখে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আজিও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে তাহার বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী দ্বারপালদিগকে বল্লালের দর্শন প্রার্থনা জানাইলে তাহারা নৃপবল্লভ বল্লালের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা তৎকালে নিদ্রাকর্ষণে বিমোহিত ও বিচেতনপ্রায় ছিলেন। দ্বাররক্ষক ঐ কথা সন্ন্যাসীকে জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী 'রাজাকে আশীর্বাদ দিব' বলিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ প্রার্থনা করিলেন। বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দ্বারপাল! তুমি যাইয়া সন্ন্যাসীকে বল, আমি এখন তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছা হয় তিনি তাহা কোথাও রাখিয়া যাউন। সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পথ প্রান্তবর্তী আলানোপরি আশীর্বাদ রাখিয়া গেলেন। আলানটি গজারি বৃক্ষের ছিল। তদবধি আশীর্বাদ পাইয়া কর্তিত গজারি বৃক্ষ শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখনও জীবিত আছে। এটি কৌতুকাবহ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মহামতি বল্লাল সেন ঢাকা উর্দুর বায়ু কোনস্থ অল্পতর বনাকীর্ণ আবর্জনা সম্পূরিত স্থানকে বাসোপযোগী করিয়া তথায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অনল্প পরিসর পুষ্করিণী খনন করান এবং তাহার আদেশানুসারেই ঢাকেশ্বরী সেবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন।

মনুজনাথ বল্লাল সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াও বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এক আশ্চর্য কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদিগের প্রতি রাজার পূর্বাবধি আন্তরিক কিছু ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল।[১১] একদা বাও আদম নামক কোন যবন শূর স্বজাতির অবমাননায় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রস্তর নির্মিত মুদ্গর হস্তে ধারণপূর্বক বল্লালের বহির্ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাও আদমের ফকিরী ব্যবসায় ও মহম্মদীয় ধর্মে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। সে রাজার অনুচরদিগকে মহাআস্ফালন সহকারে বলিল "কোথায় তোদের বল্লাল রাজা? সে বহুকাল হইতে মুসলমান জাতির প্রতি বিজাতীয়

বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই ফকির বাও আদম তাহারই প্রতিশোধ করিবার জন্য আজি উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমারই ফকিরালী যায়, কি তাহাকেই বল্লালিত্ব হারাইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই।" প্রতিহারিগণ শশব্যস্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান করিল। বল্লাল তচ্ছ্রবণে বিস্মিত চিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আমি নিয়ত প্রজামণ্ডলীর হিতসাধনে ব্যস্ত থাকি; কেহ কখনো মনোবেদনা না পায় আমি এই নিমিত্ত প্রকৃতিপুঞ্জের মুখাপেক্ষী। বিচার বিষয়েও আমার জ্ঞান সত্ত্বেও কাহার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করি নাই। অথবা দ্বারপালেরা যে আমার সহিত, ভয় দেখাইবার জন্য, প্রতারণা করিবে তাহাও মনে করিতে পারি না। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম, বিধি আমার প্রতি আর অনুকূল নহেন। আজি বুঝি রাজশ্রী বল্লালকে পরিত্যাগ করিয়া যবনাঙ্কগতা হইবেন।"

এইরূপ চিন্তার পর মহানুভব ভূপতি পুত্রকলত্রদিগকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, 'অদ্য আমাকে আগন্তুক এক যবনের সহিত সমরে প্রবেশ করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষা রাজার প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য কর্ম। এখন বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিলে কাপুরুষ বলিয়া সর্বত্র আমার অপযশ ঘোষণা হইবে। আমি কোন অনুচর সঙ্গে নিব না, কারণ উপস্থিত যবন একাকী। সুতরাং আমিও একাকী যাইব। আমি তোমাদের সমক্ষে এই কপোতটিকে অঙ্গবস্ত্র মধ্যে করিয়া নিতেছি। যদি জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে পুরীতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইবে; পরাভূত হইলে মুসলমানদিগের আধিপত্য হইবে। তখন তোমাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র বলিতে হইবে। তোমরা এখন হইতেই এক 'অগ্নিকুণ্ড' প্রস্তুত করিয়া রাখ। যখন দেখিবে এই কপোত উড়িয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মনে করিবে, আমি নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সময়ে তোমরা অপেক্ষা না করিয়া কুণ্ড মধ্যে প্রবেশপূর্বক হিন্দুবংশের গৌরব বর্ধন ও আপনাদের কীর্তিপতাকা স্থাপন করিবে।

এই বলিয়া বল্লাল সেন অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে বাও আদমের সমরে যাত্রা করিলেন। রাজবাটীর অনতিদূরে এক বিস্তৃত উদ্যানে সেই যুদ্ধ হয়। প্রত্যুষ সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। হিন্দু ও যবন উভয়েই মহাবীর্য সম্পন্ন ও প্রচুর সাহসী। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোন পক্ষাবলম্বিনী হইবেন তাহার স্থিরতা রহিল না। আবালবৃদ্ধ সকলেই বল্লালের প্রজাবৎসলতাগুণে সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহারই বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে সর্বলোক প্রকাশ কমরীচিমালী মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের কালে ফকির সাহেব রণশায়ী হইলেন। তখন সকলে চতুর্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল,[১২] কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! নৃপচূড়ামণি বল্লাল সেন রণশ্রমে পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতেছেন, ইত্যবসারে হঠাৎ কপোতটি মুক্ত বস্ত্র হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। তখন রাজা ব্যস্ত সমস্ত ও হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্বেই কপোত দর্শন করিয়া আত্মীয়েরা অগ্নি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল পরিজন্ শোকে অধীরে হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিলেন। তাঁহার (বল্লালের) যে শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল, এই তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আপনার ঐশ্বর্যকে তাদৃশ গৌরবের কারণ মনে করিতেন না।

নওপাড়ার চৌধুরী

নওপাড়া। অত্রত্য চৌধুরীগণ নিরতিশয় প্রতাপসম্পন্ন ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বিখ্যাত রঘুনন্দন দাস এই চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেন রাজবল্লভ অপেক্ষা ইহাদের জনবল ও সাহসিকতা অধিক ছিল। যাহা হউক ইহারা সাধারণত লোকের প্রতি অনেক অত্যাচার ও তাহাদের মানহরণ ও অপকার করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কৃতকার্য কলাপের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ করিলে অনায়াসেই তৎসমস্তের প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যখন আরাকানে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন কতিপয় রণপোতারোহণে কয়েক দল পশ্চিমাঞ্চলীয় সিপাই আরাকানভিমুখে গমন করে। পথিমধ্যে নওপাড়ার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের আহারের সময় হয়। নওপাড়ার চৌধুরীদিগের অনেক কদলী বাগান ছিল। সিপাইগণ কদলী পত্রে বাসনের কার্য সম্পাদন করিত। সুতরাং উহার আবশ্যক হওয়াতে তাহারা তীরে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে চৌধুরীগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল সিপাইবৃন্দ তাহাদের কথায় ভীত না হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে পাত কাটিতে থাকে। দ্বারপালগণ চৌধুরীগণকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহারা তাহাদিগকে (সিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের যানসমূহ নদীগর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে চৌধুরীবৃন্দের সেনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক সিপাইদিগের অনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবলী জলমগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যারপরনাই দুরবস্থা করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নওপাড়া উপনীত হইবামাত্র তাহাদের তিনজনকে চৌধুরীবৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বন্দি করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভর্নমেন্টের গোচর করেন। গভর্নমেন্ট তাহাদিগকে এ রূপ অত্যাচারিত মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা, যাহাতে সমূলে চৌধুরীগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আদেশ করিলেন। চৌধুরীদিগের গৃহতোপ দ্বারা জ্বালিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনন্তর গভর্নমেন্ট প্রেরিত সৈন্যবৃন্দ তোপাগ্নিতে চৌধুরীদিগের বাটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যে চৌধুরীগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপবলে দাঙ্গা-হাঙ্গামাদি করিয়া সকলের মনে মহাআতঙ্কের উৎপাদন করেন যাহাদের ভয়ে নদীমার্গ দিয়া বহুমূল্য দ্রব্যপূর্ণ নৌকা শ্রেণীর গমন অসাধ্য হইত, যাঁহারা দেখিবামাত্র সুন্দরী কামিনীদিগকে বলপূর্বক মন মদে মত্ত হইয়াছিলেন, সেই বহু প্রতাপসম্পন্ন নওপাড়ার চৌধুরীগণ এইরূপে একটি সামান্য ঘটনায় একবারে বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যান।

চৌধুরীবৃন্দ আর একটি কার্য করিয়া সর্বত্র অযশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহারা এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে এক রাত্রিতেই শার্ধ সপ্তশত নফর করিতে হইবে। এই অনষ্টকারী প্রতিজ্ঞার ভাবে পরিচালিত হইয়া চৌধুরীগণ দেশ মধ্যে ও চতুর্দিগে লোক প্রেরণপূর্বক ভদ্রলোকসমূহ আনয়ন করিয়া নফরখত লইতে লাগিলেন। এইরূপে ছোট কায়স্থের মধ্যে শত শত উনপঞ্চাশ ঘর নফর করিলেন। আর একঘর অবশিষ্ট থাকে।

তখন ভাবিলেন "নিজ বংশ বৈদ্যগণের মধ্যে করিব না। কায়স্থও (ছোট ভদ্রগোছের) পাওয়া যায় না। অতএব একঘর ব্রাহ্মণকেই নফর শ্রেণীস্থ করা যাউক।" তদনুসারে বলপূর্বক একঘর ব্রাহ্মণ তাহারা নফর করেন। কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!!

মহাতরঙ্গবতী কীর্তিনাশা এখন নওপাড়ার অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত উদরস্থ করিয়াছে। উহার কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়

ফুলবাড়িয়া— স্রোতস্বিনী কীর্তিনাশা তরুণাবস্থায় যে তেত্রিশখানা পল্লীকে উদরসাৎ করিয়া স্বীয় নামের গৌরব ও সার্থকতা সম্পাদন করেন, চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায় নামক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয় তৎসমুদায়ের অন্যতম গ্রাম ফুলবাড়িয়া নিবাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রভূত পরাক্রমশালী ও বদান্য ছিলেন। তাঁহাদের এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে আজিও আশিশু সকলের মুখে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান সময়ে তাঁহাদের নাম শ্রুত হয়। রায়দিগের বিভাগও অনল্প ছিল। ইঁহাদিগের কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী আছে।

এমত কথিত আছে যে, চাঁদ রায় পিতৃব্যপুত্রগণ কর্তৃক অশেষ প্রকারে অত্যাচারিত হইয়া পরিশেষে জমিদারি লাভে এককালে বঞ্চিত হন। মনন্তর চাঁদ রায় নিজ জীবনে বীতৃষ্ণ হইয়া তাহার বিসর্জন মানস করিয়া ভগবতীর আরাধনা ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। দেবীর প্রতি চাঁদ রায়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ভক্তবৎসলা দেবী চাঁদ রায়ের স্তুতিতে নিতান্ত প্রীতা হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন। স্কন্দজননী তাঁহার জীবন পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন, "বৎস"! তুমি জীবিতাশা পরিত্যাগ করিও না। যদিও তোমাকে অত্যন্ত হীনবল দেখিতেছি। কিন্তু এখন হইতে তোমার দলবল প্রবল হইবেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডগিরি তোমার ইষ্ট দেবতা। যাও, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য করিতে থাক। তোমার মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে এই বলিয়া জগদম্বিকা অন্তর্হিতা হইলেন। চাঁদ রায় তদবধি ইষ্টদেবতার নিকট পরামর্শ লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে যে প্রজামণ্ডলীর একজন মাত্রও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী ছিল না, এখন ক্রমে তাহাদের সকলেই চাঁদ রায়ের দলস্থ ও বশীভূত হইল। মহাবল চাঁদ রায় এইরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া দায়াদবৃন্দের পরাজয় সম্পাদন করেন। অনন্তর সমস্ত জমিদারি ইঁহার হস্তগত হয়। সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁহার পিতৃব্য পুত্রদিগের অধিকারে রহিল না। অনেকের মত, চাঁদ রায় অতি প্রাচীনকালের বিখ্যাত বারভূঁইয়ার (ভৌমিক) এক ভূঁইয়া বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। একথা একালের অলীক ও ভ্রমাত্মক বোধ হয় না।

চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়ও একজন অসামান্য লোক ছিলেন। ইঁহাদের বাসভবন নিরতিশয় প্রশস্ত ছিল। ইঁহারা কার্তিকপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে এক বাটি নির্মাণ করান। উহাও অল্প পরিসর নহে। উহার চতুর্দিকস্থ প্রাকার এত অধিক স্থান বেষ্টন করিয়াছিল যে অধুনা তাহার গর্ভস্থ ভূমিতে প্রায় ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, কতটি লোক উহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ বাটি "কেদার বাটি" শব্দে বিখ্যাত। কেদার রায় কীর্তিনাশার উত্তরতটে রাজাবাড়ি নামক

স্থানে অন্য এক বাটি নির্মাণের মানস করেন। প্রথমত তথায় আসিয়া এক অনল্প উচ্চ মঠ দেওয়ান। এরূপ উক্ত আছে যে, মঠ নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হইলে কেদার রায় স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করেন, এই মঠ আরো উচ্চ হইতে পারে কি না? স্থপতি বলিল "টাকা ব্যয় করিলে কেন না হইবে?" কেদাররায়, মঠ এতদপেক্ষা উচ্চ হইল না কেন? ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার (স্থপতির) প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। কোন প্রকারেই ঐ আজ্ঞার রোধ করা গেল না। অবশেষে স্থপতি, বোধহয় অপমরণে গ্লানি জ্ঞান করিয়াই, বলিল "মহারাজ! মঠোপরি আমার কাজের কিছু বাকি আছে। আমি তাহা পূরণ করিয়া আসি; পরে আমার প্রাণ বধ হউক।" কেদাররায় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্থপতি উত্থিত হইয়া যেমন মঠের স্বর্ণচূড়া ধরিল, অমনি তৎসহ ভূতলে নিপতিত হইয়া গতাসু হইল। এই ভগ্নচূড়া মঠ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

এই প্রকার উপন্যাস আছে যে, একদা অর্চনার্থ কালী দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তাঁহাদের বাটিতে আনীত হয়। পুরোহিত প্রবর তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হন। আগত হইবামাত্র রায়গণ বলিলেন, কি পুরোহিত ঠাকুর! আপনি যে পান চিবাইতেছেন? আপনাকে তো পূজা করিতে হইবে। উপবাসী থাকিতে হয় নিয়ম আছে। আপনি বেশ উপবাসী রহিয়াছেন। আপনারাই শাস্ত্র করেন, আবার মহাশয়েরাই তাহার মাথা খাচ্ছেন। পুরোহিত তচ্ছ্রবণে অভিমানান্ধ হইয়া বলিলেন, আচ্ছা! আমি দেখিব, কালী কেমন ভোক্তার হস্তে পূজোপহার গ্রহণ না করেন। আমার কিছু ক্ষমতা নাই, আজি তোমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। অনন্তর পূজায় উপবেশন কালীন ঋত্বিকবর স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবার আশয়ে হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরকা যেমন কালীর জানুদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলেন অমনি, সত্য সত্যই, সেই স্থান দিয়া অবিবল শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সমাগতলোকবৃন্দ যারপরনাই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় রহিলেন। সকলেই পুরোহিতকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে মহাসমারোহে পূজার কার্য নির্বাহিত হইল।

অপর এক দিবস সেই পুরোহিত মহামতিই কোন আপন হইতে পানাশয়ে সুরা ক্রয় করিলেন, সঙ্গে অর্থ ছিল না। তিনি বিক্রেতাকে বলিলেন, আমি মদীয় যজমান চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বাটি হইতে তোমার প্রাপ্য লইয়া আসিতেছি। তখন দিনমণি প্রায় মস্ত কোপরি আরোহণোন্মুখ হইয়াছিলেন। দ্বিজ বলিলেন, "হে ব্যবসায়িন! আমি বলিতেছি যে, সূর্যদেব এখন যে স্থানে অবস্থিত আছেন। এই স্থান হইতে স্থানান্তর হইতে না হইতেই আমি তোমাকে মূল্য আনিয়া দিব।" বিপান স্বামী তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন স্থিরতা রহিল না। সুরাপায়ী একপ্রকার উন্মত্ত সন্দেহ নাই। কতক্ষণ যায় দ্বিজ সত্তম আর প্রত্যাবৃত্ত হন না। সুরা বিক্রয়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রায় নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। চাঁদ রায় কেদার রায় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভাল আমরাই তোমার প্রাপ্য দিব, শৌণ্ডিক প্রত্যাবৃত্ত হইলে ঐ পুরোহিত বহু বিলম্বে আসিয়া তাহাকে সুরার মূল্য প্রদান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মণ আসিবামাত্রই সূর্যদেব পূর্ব নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান

করিলেন। রজনী তখন দেড় প্রহর প্রায় হইয়া উঠিল; নক্ষত্র জগৎ সুপ্রকাশিত করিয়া নভোদেশ পরিশোভিত করিল; চন্দ্র শান্তিপ্রদ কিরণাবলী বিস্তারপূর্বক জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্ধন করিতে লাগিল। আমরা পাঠ করিয়াছি, বীরেন্দ্র পবন তনয় লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধমাদন গিরি হইতে ঔষধ আনয়নকালে ভানুদেবের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনচ্ছলে তাঁহাকে স্বকক্ষস্থ করিয়াছিলেন এবং কার্য সিদ্ধ্যনন্তর রবিকে কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া দিলে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছিল। সর্বতোভাবে এ কার্যটি ঠিক তদনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যুতে অঞ্জনাকুমার অপেক্ষা উল্লিখিত দ্বিজের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রস্তাবটি যারপরনাই কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই।

রাজা রাজবল্লভ

রাজনগর বৌলাসার, শুকসার, চাপেরবাড়ি, নারিকেলতলা, আঁকসাইল, খিলগাঁও, ফরায়গাও, পশ্চিমপাড়া, পশাইল, শিবেরদিঘির পাড়, খার চাকা, গরঘর প্রভৃতি পল্লী বাজনগবের অন্তর্নিবিষ্ট। এই স্থানে সুবিখ্যাত রাজবল্লভ প্রভূত পরাক্রম সহকারে বাস করিতেন। মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। ইনি তত বড় প্রতাপসম্পন্ন ছিলেন না। মজুমদার মহাশয় কাননগুইর সেরেস্তার মোহরের ছিলেন। মালখানগরের বসু বিশেষ তখন কানগুই বলিয়া পরিচিত হন। রাজবল্লভ অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলেন[১৩]। ইনি প্রথমত মুর্শিদাবাদস্থ প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠের কার্যালয়ে অল্প বেতনে একজন সামান্য মোহরের ছিলেন। প্রবাদ আছে একদা নবাব পরিভ্রমণ কালে জগৎশেঠের কার্যালয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাজবল্লভ তখন সেই গৃহে নিদ্রিত থাকেন। নবাব গমনকালে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পদতলে পদ্মচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। নবাব গৃহে যাইয়া রাজবল্লভকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন। শেঠগণ "প্রোক্ত আদেশে নবাব ভ্রমণ কালীন তাহাদের মোহরেরকে নিদ্রিত দেখিয়াছেন। অতএব ইহার প্রাণ বধ করিবেন" এই স্থির করিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। রাজবল্লভ নবাবের আদেশে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার প্রতি পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, জগৎশেঠ তোমাকে যত বেদন দেন, তদ্ব্যতিরেকে আমি তোমাকে মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া বেতন দিব! নবাবের সম্মুখস্থ সকল লোক তদর্শনে বিস্মিত হইয়া নবাবকে ধন্যবাদ ও রাজবল্লভকে প্রশংসা করিতে লাগিল। নবাব আরও রাজবল্লভের অধ্যয়ন জন্য তাঁহার বাটিস্থ মুন্সিকে আদেশ দেন। তদনুসারে রাজবল্লভ তথায় শিক্ষানিরত হইয়া মনোযোগ সহকারে অল্প দিন মধ্যেই পারসি ভাষায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইয়া উঠেন।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার উন্নতিও লক্ষিত হইতে থাকে। অনন্তর প্রায় ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আপনার আত্মীয় পুত্র মুরাদ আলীকে যখন ঢাকা প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর করিয়া প্রেরণ করেন, তখন রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার হইয়া আসেন। ইহারা উভয়েই প্রজাপীড়ন করিয়া রাজ্যশাসন ও ধনোপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে যশোবন্ত সিংহ ঢাকায় সরফরাজ খাঁর ডেপুটি নায়েব নাজিম ঘালিব আলির দেওয়ান ছিলেন। তিনি মুরাদ ও রাজবল্লভের তাদৃশ দৌরাত্ম্য

দর্শনে বিরক্ত হইয়া স্বপদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহাদের দুর্ব্যবহার এতাদৃশ প্রবল হয় যে, তাহাতে সমস্ত দেশ যারপরনাই বিপন্ন ও দুরবস্থ হইয়া উঠে। ভাটি অঞ্চলস্থ বোজের গোমেদপুর লইয়া রাজবল্লবের জমিদারির সূত্রপাত হয়। পরে তিনি সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূসম্পত্তিরও বৃদ্ধি করিয়া অসামান্য রাজস্ব সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মহীয়সী কীর্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য ছিল। অনেক ইতিহাসে রাজবল্লভের নাম অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একদা সমস্ত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আশ্রিতা এবং বহুকাল অচলা ছিলেন। আজিও আবালবৃদ্ধ সকলে রাজনগরের রাজদিগের নামোল্লেখ ও তাঁহাদিগের কার্যাবলী স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রমপুরস্থ জমিদার ও তালুকদারদিগের গৃহে এখনও তৎসাময়িক দলিল দস্তাবেজাদি চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলত আমরা রাজবল্লভের ন্যায় প্রতাপশালী ও কীর্তিমান ভূপতি অতি অল্পই দর্শন করিয়া থাকি। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের যশোরাশির অনেক নিদর্শন আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের করাল হরণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে।

নৃপতির বহির্বাটিস্থ সিংহদ্বারোপরি উচ্চুঙ্গ চূড়াসম্বলিত এক বিংশতি রত্ন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বার ধনুর আকারেই টক নির্মিত। অনেকে ঐ রত্নরাশি গণনাকালে ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সচরাচর সাধারণ লোকে উহাকে "একুশ রত্ন" শব্দে অভিহিত করে। রত্নরাজি প্রোক্তাবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া নানা দেশীয় ভ্রমণকাবী ও দর্শকবৃন্দের মনোনেত্র আশ্চর্যরস পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দূরে ইষ্টকগঠিত একটি দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে। দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে, তাহার চূড়ার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। দোলটি সপ্তদশ রত্নে মণ্ডিত ও সুশোভিত। মূল প্রদেশের চতুষ্কোণে চারিটি, তদনন্তর দোলমঞ্চের প্রথম স্তম্ভের (যাহাকে সচরাচর "থাক" কহে) চারি কোণে চারিটি তৎপর মধ্য স্তম্ভে চারিটি, তদূর্ধ্ব স্তম্ভদেশে অপর চারিটি রত্ন এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট রত্নটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্বোচ্চ শিখরোপরি উত্থিত হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পথবর্তী গমনশীল লোকদিগকে ক্ষুদে বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না, এবং ঈদৃশী তরঙ্গময়ী সুবিস্তৃতা পদ্মাকেও একখানি ক্ষুদ্রপরিসর ধৌত উত্তরীয় বসনবৎ ভ্রম হয়। বস্তুতৎ একুশ রত্ন হইতে সপ্তদশ রত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আর্যদর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে গোপনপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই-তিন বার বিশ্রাম করিতে হয়। প্রতি বৎসর এই ইষ্টক নির্মিত দোলমঞ্চেই মহারাজ রাজবল্লভ মহাসমারোহে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। উৎসব সময়ে ঋষিত্বগণ বোঝায় বোঝায় "লক্ষ্মীনারায়ণের" বলিয়া অভিহিত হয়। উত্থাপনান্তে ঠাকুরকে এত অধিক পরিমাণে আবীর দেওয়া হইত যে, তাহাতে সমুদায় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্রুত আছে, নৃপতিপুঙ্গব রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয় পণ্ডরি (ত্রিশ সের) সুবর্ণ দ্বারা একটি কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়। প্রতিদিন মহা আড়ম্বর সহকারে উহার অর্চনা কার্য নির্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্নও আছে কিনা সন্দেহস্থল। রাজবাটীর অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্র জন্তু নিচয়ের আবাসভূমি

হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জনে নিকটস্থ হওয়া কাহার সাধ্য? রত্নাবলী নানাপ্রকার জঙ্গল লতায় আচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা রাজবলীর বিয়োগশোকে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বল্লীরূপ মলিন বসন এবং দ্রুমরূপ শ্মশ্রু ধারণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, এবং কার্মুকাকারে অবস্থিত থাকিয়া যেন দুরন্ত কৃতান্তের চরণে প্রণত রহিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যান। তৎসমুদায়ের এক একটি এরূপ দীর্ঘ যে, এক তট হইতে বন্দুক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পাইত না। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন তাহার নাম "রাজসাগর"। রাজ্ঞীদিগের স্নান দীর্ঘিকার নাম "রানীসাগর"। ধাত্রীদিগের স্নান জন্য খনিত দীঘি "ধাইসাগর" এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে শুকপক্ষীকে স্নান করাইত তাহা 'শুকসাগর' বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটির চতুর্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না। উল্লিখিত জলাশয় সমূহের অধিকাংশই পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে কেবল স্থানে স্থানে ভগ্নাংশ মাত্র রহিয়াছে।

রাজার বহির্বাটির নিকট হইতে রাজাবাড়ি কেশারমার দীঘিরপাড়[১৪], মাকোহাটি বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া ঢাকা নগরীর সম্মিলিত একটি সুপ্রশস্ত পথ নির্মিত হয়। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে বৃক্ষ শ্রেণীরোপিত ছিল। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঐ "রাজদরজার" চিহ্নরাশি নয়ন পথের আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকে।

রাজবল্লভের সাত পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস। ইনি ঢাকার নবাবের সহকারী ছিলেন। ইনি শৈশব কালাবধিই অত্যন্ত সাহসী-চতুর ছিলেন[১৫] কিন্তু অনুচিত চপলতার জন্য অনেক লোকের অপ্রীতিভাজন হন। রামদাস সাধারণ লোকের কামিনীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার অনুজ কেবলকৃষ্ণ কোন কার্য করিতেন না; ইঁহারা উভয়েই পিতা জীবিত থাকিতে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস, ইনি রাজোপাধি লাভ করেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বাহাদুর। ইনিই বাংলার নবাব দুর্বৃত্ত সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরেজ কর্মচারী ডে সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজবল্লভের পঞ্চম তনয় রায় গোপালকৃষ্ণ, এই মহোদয়ই কার্তিকপুরের মুন্সিদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ রায় রাধামোহন ও কেবলমাত্র। রায় রাধামোহনও নবাব সরকারে কাজ করেন। গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর। ইনি জমিদারি উপভোগ সহকারে কালক্ষেপ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র, অভয়চন্দ্র, নবকুমার ও ঈশানচন্দ্র নামধেয় তাহার এই পাঁচ পুত্র জন্মে। আজি তাঁহাদিগের বংশ প্রভাতকালীন চন্দ্র কিরণের ন্যায় নিষ্প্রভরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

রাজা রাজবল্লভ যে উল্লিখিত রূপ যশো বিস্তার করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এমত নহে। অন্যান্য বহুবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠানের জন্যও তাঁহার বিলক্ষণ কীর্তি আছে। তিনি আপনার অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে ভূপতি সর্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ প্রথমত কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর সমীপে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রার্থী হন। তাঁহারা রাজপ্রেরিত অধ্যাপকদিগকে মহা সমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের আগমন কারণ তত্রত্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পণ্ডিতনিচয় বিধবা বিবাহের ঔচিত্য বিধায়িনী ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। এবং ঈদৃশ উন্নমনস্কতার কার্যে রাজবল্লভের তাদৃশী উৎসুকতা দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা নেপালে উপনীত হইয়া সম্ভ্রম সহকারে সমাদৃত হইলেন। তত্রত্য ব্যবস্থাপকগণ প্রথম তাঁহাদিগের (ব্যবস্থা জিজ্ঞাসুদিগের) অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু মনের কি আশ্চর্য পরিবর্তন, কি বিচিত্র ভাব! তথাকার হিন্দু ধর্মানুরাগী আত্মাভিমানী লোকের অনুরোধেই হউক[১৬] অথবা কুৎসিত দেশাচারের প্রভাবেই হউক, তাহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে উপহার স্বরূপ একটি গোবৎস আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন "বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আপনাদিগের রাজা চেষ্টিত হইয়াছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত সন্দেহ নাই। কিন্তু একুশ দিনের গোবৎস ভক্ষণ যেমন শাস্ত্রানুমোদিত তাহা কলিতে প্রচলিত নাই, সেইরূপ বিধবা বিবাহ যুক্তিসম্মত শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দেশাচার মতে অবিধেয়। যদি আপনারা এই গোশাবক ভক্ষণ করিতে পারেন; তাহা হইলে আমরা বিধবা বিবাহে মত ও যোগ দিতে পারি। নৃপ প্রেরিত দ্বিজগণ তৎদর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। তাহারা অন্যত্র গমন করিবেন কি? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অনেকে বলেন এই বিষয়ে এক ব্যবস্থাপত্র হয়, তাহাতে নানা দেশীয় অধ্যাপকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আশ্চর্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, নরেন্দ্র রাজবল্লভও উক্ত কার্যে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক পূর্বেও এখানে সত্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অদূরদর্শী যে সকল আত্মাভিমানী বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয়দের মানসিক ভাব কোন কালেও তাদৃশ উন্নত ছিল না, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজবল্লভ কোন দেশীয় ছিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এরূপ মনের ভাব হইল? তিনি কি পূর্ব বাংলার নন? দেশের উন্নতির জন্য যে তাঁহার মন অনল্প ব্যাকুলিত ছিল, এই বিবরণটি পাঠ করিয়া সাধারণে তাহা সুন্দর রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উন্নতির আশা যে এককালেই তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

একদা আগারাজা রাজবল্লভের গৃহ লুঠ করিয়া বহুল ধনসম্পত্তি লইয়া যায়। এই ডাকাইতির সময় ঐ ব্যক্তি অনেক অত্যাচারও করে।

এমত প্রবাদ আছে যে ভূপাল "অগ্নিস্টোম" নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বহু দেশীয় পণ্ডিতসমূহ তাহাতে সমাহূত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য জানাইলেন। তচ্ছ্রবনে তাঁহারা বলিলেন, "হে নৃপেন্দ্র! যাহাদিগকে এক মাস পর্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয় এবং যাহারা দিনের মধ্যে দুই বেলা অন্ন গ্রহণ করে, এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহাদিগের অধিকার নাই। তৎকালে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। রাজবল্লভ তাঁহাদিগের বাক্যকে প্রারব্ধ কার্যের অন্তরায় মনে না করিয়া অকুতোভয়ে তৎসম্পাদন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে

স্বধন ব্যয়ে সমুদায় বৈদ্যকে উপবীত দান এবং তাহাদিগকে এক মাস না হইয়া একপক্ষ অশৌচ ভোগ করিতে হইবে বলিয়া সর্বত্র আজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি বৈদ্যগণ দিনে দ্বি-ভোজন করেন না। অনন্তর অতি সমারোহ সহকারে উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। রাজবল্লভের কতদূর প্রতাপ ও প্রজারঞ্জনকারিতা গুণ ছিল, এতদ্দারা সকলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রাজবল্লভের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এমন লোক অতি বিরল। প্রায় ১৭৬৩ সালে মুঙ্গেরের নিকট দুরাত্মা নবাব মীরকাসিমের আদেশে রাজবল্লভের প্রাণদণ্ড হয়। যেরূপে ইঁহার মৃত্যু হয় তাহা নিরতিশয় শোচনীয় ও অনল্প খেদজনক। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সমগ্র বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিলে যে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে তাহার আর সন্দেহ কি?

কার্তিকপুরের মুন্সি

কার্তিকপুর-অত্রত্য জমিদারবৃন্দ বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী লোক। তাহারা মুসলমান জাতীয়; মুন্সি বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত। রাজা রাজবল্লভের সময়েও কার্তিকপুরের মুন্সিদিগের নিরতিশয় প্রতাপ ছিল। রাজা রাজবল্লভের সহিত ইঁহাদিগের অল্প প্রতিযোগিতা ছিল না। একদা উভয়ের কলহ উপস্থিত হইলে পরস্পর উভয় পক্ষ হইতেই বহুতর যষ্টিধারী বীর-পুরুষ বিবাদমল্ল হইয়া সংগ্রামস্থলে সমাগত হয়। তাহাতে এত অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় যে, সমীপবর্তিনী তরঙ্গিণীর জল তৎকালে শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। মুন্সিদিগের প্রতিই জয়লক্ষ্মীর কিছু রুচি দৃষ্ট হয়।[১৭] অনতিবিলম্বে তাঁহারা (মুন্সিরা) মহাসমারোহ সহকারে এক বৃহৎ কালীমূর্তি নির্মাণ ও তাঁহার পূজা করেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ মূর্তি এখনও সংস্থাপিত আছে। আজিও অনল্প সমারোহে উহার অর্চ্চনাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দূরবর্তী নানা স্থানে মুন্সিদিগের অনেক হট্টাদি বন্দর আছে। ইহারা জমিদারিতে অনেক লাভ করেন। এখানেও প্রতি বৎসর একটি মেলা মিলিয়া থাকে।

জপসা

এখানে অনেক বৈদ্যের বাস। অত্রত্য লালাগণের কীর্তি সমস্তের কিছু কিছু চিহ্ন আজিও লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাও বৈদ্য কুলোৎদ্ভূত মহাসম্ভ্রমশালী লোক ছিলেন। ইহাদের প্রতাপ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া ইহাদের বিখ্যাত নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতর সহোদর এই জপসাতে আসিয়া বাস করেন। তাহা হইতেই তাহার বংশীয়গণের ক্রমে উন্নতি হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরে রাজনগর, কার্তিকপুর, ফুলবাড়িয়া, জপসা, বকসীপুর, মহীসার, কাঞ্চনপাড়া, মগড়া, পোড়াগাছা, শিয়ালদহ, প্রভৃতি গ্রাম প্রধান।

বকশীপুর, মহীসার, কাঞ্চনপাড়া, প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসই অপেক্ষাকৃত অধিক। মৈশুড়া, দেভোগ শিয়ালদহ, হোগলা, কার্তিকপুর, পণ্ডিতসার প্রকৃতি পল্লী নিচয় বৈদ্যসমূহের আবাস স্থান।

পশ্চিম বিক্রমপুরে শ্রীনগর, ষোলঘর, হাঁসাড়া, বীরতারা, বয়রাগাদি, মালখানগর,

ফুসাইল (ফুল্লশালী), পাঐলাদিয়া, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া, কনকসার, ব্রাহ্মণগাঁ, লৌহজঙ্গ, বহর, সানিহাটি, তেয়টিয়া, কোরহাটি, কুমারভোগ, তারপাশা, কালীফাড়া, মাইজপাড়া, ভাগ্যকূল, কাঁচাদিয়া প্রভৃতি পল্লী গণ্ডগ্রাম নামে পরিচিত হইতে পারে।

শ্রীনগর

শ্রীনগরের পূর্ব নাম রাইসবর। অত্রত্য জমিদার মৃত লালা কীর্তিনারায়ণের পিতা কংসনারায়ণ বসু বেজগাঁ হইতে এখানে আসেন। তখন কংসনারায়ণের তাদৃশ ধন-সম্পত্তির প্রভাব ছিল না। এক প্রকার নিঃস্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিনারায়ণ পিতার দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বকীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে পারসি ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ইনি নবাব সরকারের প্রবেশ করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে থাকে। এই সময়েই তিনি "লালা" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। কলিকাতাবাসী হরিরাম মল্লিক যখন কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন, লালা কীর্তিনারায়ণ তৎকালে তাহাদের পেস্কার রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কার্য নিষ্পন্ন করেন। এইরূপে ইনি অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেন।

অনন্তর রাজনগরের রাজার যে সকল স্থান দেয় অপরিশোধহেতু কালেক্টরির অন্তর্গত হয়, তিনি তৎসমস্তের অনেকাংশ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধিই ইহাদিগের জমিদারির ক্রমশ উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহারা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বলিয়া অধুনা আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট পরিচিত।

অনেকে বলেন লালা কীর্তিনারায়ণ[১৮] কর্মোপলক্ষে আপনার এক ভৃত্যকে রাজনগরের[১৯] রাজবাটিতে প্রেরণ করেন। ভৃত্য উপস্থিত হইলে নৃপকুঞ্জর রাজবল্লভ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে তুমি কোথা হইতে আসিলে? ভৃত্য বলিল, মহারাজ শ্রীনগর হইতে এ দাসের আগমন। রাজা কহিলেন, কি শ্রীনগর নাম তো কখনও শুনি নাই! ভাল রাইসবর আর শ্রীনগর কত অন্তর? ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল, মহাশয়! বলিতে ভয় হইতেছে। যেমন বিলদাওনিয়া, রাজনগর, সেইরূপ রাইসবর শ্রীনগর। ভৃত্যের তাদৃশ বাগবিন্যাসে সম্মুখস্থ জনগণ মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও শোধপরবশ হইবেন। কিন্তু মহানুভব রাজবল্লভ তুচ্ছবণে বিষণ্নচিত্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য এক জুড়ি শাল খেলাত দিলেন। এদিকে ভৃত্য গৃহে সমাগত হইলে লালাবাবুও তাহাকে এক সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহাতে অনুমিত হইতেছে যে, রাজনগরের উন্নতি সময়ে শ্রীনগরের অনেক প্রতিপত্তি ছিল।

কীর্তিনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত সর্বদা অসুখে কাল ক্ষেপণ করিতেন। পরে এক দত্তক পুত্র রাখেন। তাহার নাম কৃষ্ণকুমার বসু। কৃষ্ণকুমার বসু জমিদারি রক্ষণে মন্দ পটু ছিলেন না। বাবু জগবন্ধু বসু তাহারই পুত্র। ইহারা বহুদিন হইতেই অতিথি সেবা করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছেন। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য বদান্য নিচয় বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রবৃন্দের উপকার বিষয়ে কিছু কিছু শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের এতাদৃশী দানশীলতা যে, ইহারা সেই সময়ে নিয়মিত ফুৎকার (পান্থগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একবেলা ভোজন প্রদান) অপেক্ষা অতিথিদিগকে প্রতিগমন কালে পাথেয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত জমিদারগণ

সাধারণের ধন্যবাদার্হ সংশয় নাই।

অত্রত্য ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়টি দিন দিন মন্দ শ্রী ধারণ করিতেছে না। জগবন্ধুবাবু ও শ্রীনাথবাবু প্রভৃতি মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন থাকিলে উহার আরো উন্নতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অনেকদিন যাবৎ শ্রীনগরে একটি থানা ও একটি পোস্টালয় সংস্থাপিত আছে।

ষোলঘর

বিক্রমপুরস্থ অপরাপর পল্লীগ্রাম অপেক্ষা আয়তনে এই গ্রাম অনেক বৃহৎ। বসতি সংখ্যাও ন্যূন নহে। এই স্থান নানা শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থানভূমি। অনেকানেক সম্ভ্রান্ত পদবীস্থ লোক এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক স্থানে এত অধিক ধনী থাকা সত্ত্বেও ষোলঘরকে তাদৃশ উন্নত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই ষোলঘর ঢাকার পরিমাপন বিভাগের ভূতপূর্ব ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জন্মভূমি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতি সাধন পক্ষে তাঁহাকে তূষ্ণীভূত বলিয়া লক্ষিত হয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, ঘোষজ মহাশয় মাসিক ৬০০ ছয় শত মুদ্রা বেতন পাইতেন। অধুনা ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োজিত ও শ্রীনগর স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিজ বাটিতেই কাছারি করিতেছেন। দুর্গাপ্রসাদবাবু একজন দক্ষ ও সুবিচারক লোক। ইহারই পুত্র বাবু চন্দ্রমাধন ঘোষ কলিকাতাস্থ উচ্চতম আদালতের (হাইকোর্টের) একজন প্রধান উকিল। ইঁহার খ্যাতি মন্দ নয়।

হাঁসাড়া

এখানে পাল চৌধুরী পরিবার বহুকালাবধি সর্বত্র বিশেষ পরিচিত। পূর্বকালে ইহাদের জমিদারি অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অধুনা তাহা নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের শিথিল যত্নে উহা সময়ে সময়ে তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন বোধ হয় না। মহামতি স্যার সিসিল বীডন, হাঁসাড়ায় একটি ডিস্পেন্সারি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ সহকারে অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন কোথায়? এখন তাহার (ডিস্পেন্সরির) নামগন্ধও তো উপলব্ধ হয় না। কৈলাসবাবু যত্ন করিলে অনায়াসে একটি ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের অনেক উপকার করিতে পারেন। অত্রত্য সেন পরিবার মন্দ খ্যাত নহে।

বীরতারা

পূর্বে এখানকার মজুমদারগণের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও কতিপয় ব্যক্তির মন্দ ঐশ্বর্য নহে। এই মজুমদার পরিবার অতিশয় বিস্তৃত, দেশমধ্যে মজুমদারবৃন্দের বেশ নাম আছে। অত্রত্য মৃত জয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিপত্তির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সুধারাম পরিমাপন বিভাগের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। এই বীরতারা গ্রামে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য ব্রাহ্মধর্মানুরাগী বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের

নিবাসস্থান। গিরিশবাবুর ধর্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ইহার পিতা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি তাদৃশ বিপৎপাতে কাতর না হইয়া অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে অবলম্বিত ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

বয়রাগাদি

এস্থানে মৃত রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের আবাস ভূমি। ইনি কৃষ্ণনগর আলাসদর আমীন ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে মাসিক সাত শত টাকা বেতন পাইতেন। তথায় অনেকদিন পর্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্য ও প্রতিপত্তি সহকারে কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য বিষয়ে পারদর্শিতা অবলোকন করিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের আবালবৃদ্ধ সকলেই রামলোচনবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা অবস্থান সময়ে প্রসিদ্ধ ধর্মানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার নিতান্ত সদ্ভাব জন্মে। পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর এরূপ প্রণয় সঞ্চার হয় যে, উভয়েই পরস্পরের অদর্শনে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ করিতেন। এমনকি, সদাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুর রামলোচন রায় বাহাদুরের পরামর্শ ও অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

রামলোচনবাবু বার্ধক্য নিবন্ধন পেনশন গ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা কলেজের উন্নতির আশয়ে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা তাহার দানশীলতার মন্দ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুই বর্ষের অধিককাল অতিবাহিত হইল রামলোচনবাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞবর মনোমোহনবাবু ইহারই জ্যেষ্ঠপুত্র। অনেকে জানেন মনোমোহনবাবু ইংলন্ড গমনপূর্বক তত্রত্য পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়া সম্প্রতি "বারিস্টার" হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। সত্য বটে ইনি নিজ গৃহে একবার উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেশানুরাগিতার সহিত ইহার কতদূর পরিচয়, বিক্রমপুর তাহা এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং আমাকে তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকিতে হইল।

বহুদিন পরে যদি করিয়া স্মরণ,
আইলি স্বদেশ পানে রে মনোমোহন।
দুখিনী জননী তোর এ বিক্রমপুর
ভাসিছে নয়নাসারে হয়ে শোকাতুর।
মায়েরে দর্শন বাছা দেওরে আসিয়া
সূর্যের মতন কিন্তু থেক না ভুলিয়া।
তোমরা আমার ধন ভাবি অনুক্ষণ
অম্বিকার আশা, পুর অম্বার বদন॥"

অল্পদিন হইল মনোমোহনবাবুর বাটিস্থিত ইংরেজি বিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে। বাংলা বিভাগটি এখনও আছে সত্য, কিন্তু নিতান্ত হীন অবস্থা।

মালখাঁনগর

এই গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীনবৃন্দের বাসস্থান। ইহারা ঢাকার অন্তর্ভূত নারিন্দা নামক স্থান হইতে এখানে সমাগত হন। এখনও তথায় 'বসুরনগর' বলিয়া এক স্থান আছে। ইহারা তাহাতেই বাস করিতেন। ইহারা এখন যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন তাহাকেও অনেকে মালখাঁনগর না বলিয়া প্রায়ই 'বুসরনগর' বলে। এই বসুগণও অনেকদিনের প্রধান তালুকদার। ইহাদের তালুকসমূহ 'তালুক গোপাল ধর' নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য আছেন। অনেকে নানা স্থানে গভর্নমেন্ট স্থাপিত অনেক উচ্চ পদে সমাসীন থাকিয়া নিরতিশয় সম্মান লাভ করিতেছেন। অত্রত্য বাবু রামকুমার বসু মহোদয় ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইঁহারা যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে কার্য করিতেছেন তাহা অনেকের অবগতি আছে। রামকুমারবাবু ঢাকা হইতে কৃষ্ণনগরে, তদনন্তর তমোলুকে পরিবর্তিত হন। অল্পদিন হইলে তিনি চব্বিশ পরগনায় আসিয়াছেন। তিনি গ্রাম্য লোকের উপকারার্থে নিজ বাটি হইতে তালতলার হাট পর্যন্ত একটি মৃন্ময় পথ নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি যেন এই কার্যটিকেই দেশোন্নতির শেষ মনে করেন না। কৌলিন্য প্রথার কি মোহিনী শক্তি! সুশিক্ষিতগণও ইহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে এককালে সমর্থ হন সা। ইহারাও সময়ে সময়ে অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। নিজ পল্লীস্থ বিদ্যালয়টির প্রতি বসু মহোদয়দিগের সমুচিত যত্ন লক্ষিত হয় না সুতরাং তাহার যে তাদৃশী উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না বলাবাহুল্য।

ফুরসাইল (ফুল্লশালী)

ফুরসাইল মৃত মহাত্মা রামকানাই রায়ের আবাস পল্লী। ইনি অনেক ধনসম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার জমিদারিও আছে। লোকের উপকার সাধনার্থ ইহার মন্দ দয়া দৃষ্ট হয় নাই। প্রোক্ত রায় মহোদয় অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা খনিত করাইয়া যান। সুতরাং সাধারণের জলকষ্ট অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে।

পাঐলদিয়া

পাঐলদিয়াকে দুই ভাগ করিয়া বলা হয়। বড় পাঐলদিয়া ও ছোট পাঐলদিয়া। এই পাঐলদিয়া গ্রামে কুলীনবর ঘোষ বংশজগণের অবস্থান। ইহাদের মন্দ নাম নয়। এই ঘোষজগণ ব্যতিরেকে এখানে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প। এমনকি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘোষ মহোদয়দিগকে দেশের উপকারজনীন কোন সৎকার্যানুষ্ঠানে বড় উৎসাহিত দেখা যায় না।

জৈনসার

এই গ্রামে ঢাকার ছোট আদালতের বর্তমান জজ শ্রীযুতবাবু অভয়কুমার দত্ত মহাশয়ের গৃহ সংস্থাপিত। ইনি একজন বিচারদক্ষ, বিচক্ষণ লোক। ইহার পরিশ্রমশীলতায় অনেকেই প্রীত আছেন। এমন অনেক উচ্চ পদবীস্থ লোক আছেন যে তাহারা নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিয়া গভর্নমেন্টের কার্য করিতে চাহেন

না। সর্বদা নির্বাচিত পাঁচ ঘণ্টা কালকেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময় বলিয়া স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু অভয়বাবু সে প্রকৃতির লোক নন। ইনি দিবসের (দ্বাদশ ঘটিকার) মধ্যে প্রায় আট নয় ঘটিকা গভর্নমেন্টের কার্য সাধনে পর্যাবসান করিয়া তাহাদিগের সমীপে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেছেন। একথা আমরা নিঃস্বার্থ রসনায় বলিতেছি। অভয়বাবু প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহের নিমিত্ত বহর ছোট আদালতে আসিয়া বিচার সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য গভর্নমেন্ট সহস্র মুদ্রার উপরে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

অভয়বাবু দেশীয় লোকের উপকারার্থ নিজালয়ে একটি ডিস্পেন্সারি (ঔষধালয়) সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইচ্ছানুসারে তাহারা তথা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার বাটিতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তথা হইতে 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। গ্রাহক সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। পত্রিকা প্রায়ই বিনামূল্যে দেওয়া হইত। অভয়বাবু স্বয়ংই সমুদায় ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এতদ্বারা দত্তজ মহাশয়ের দেশানুরাগিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হতভাগিনী বিক্রমপুরের কি অদৃষ্ট ফের! কয়েক মাস বিগত হইল পল্লীবিজ্ঞান প্রচার এককালে বন্ধ হইয়াছে! বিক্রমপুরবাসীগণ পল্লীবিজ্ঞানের জন্মদর্শন করিয়া যেমন পুলকিত হইয়াছিলেন, উহার মরণ সংবাদে তেমনই ব্যথিত ও বিষণ্ন হইয়াছেন। পল্লীবিজ্ঞান উঠিয়া গেল ইহা তত দুঃখের নয়। অধিকতর খেদ ও দুঃখের বিষয় এই যে, অপর লোকেই এই সৎকার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে অচিরকাল পরেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন মধ্যবিৎ লোক মণ্ডলী যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও, দেশের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ও বিরত হইবেন, তাহার বিচিত্রতা কি?

পশ্চিমপাড়া

এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। চট্টোপাধ্যায়, মুখোচি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিজবৃন্দ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন। মুখোচি মহাশয়গণ এই গ্রামের আদিম নিবাসী এবং চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের স্থাপয়িতা। এই পল্লী মৃত মহাত্মা কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের আবাসভূমি। ইনি ঢাকার জজ আদালতের একজন প্রধান ব্যবহারজীবী ছিলেন। কিরূপ নৈপুণ্য সহকারে ইনি কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই অবগতি আছে। এই মহোদয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের আশ্রয় ভূমি ছিলেন। নিজেও এই ধর্মের অতিশয় সম্মান করিতেন। একদা ইনি হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য রক্ষার্থে অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবং তাহারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে হিন্দু ধর্ম, যদিও সর্বতোভাবে না হউক, অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম ঢাকা নগরীতে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে না পারে, এমনকি যতবিধ উপায় অবলম্বন করিলে উহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় ইনি তদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। ইহার চরিত্রগত বিশুদ্ধতাও অনেক ছিল। ইনি হৃদয়ের অনল্পমহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কাহারও তোষামোদ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। প্রায় দুই বর্ষ হইল ঢাকায় যে হিন্দুধর্ম রক্ষণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি তাহার এক প্রধান উদ্যোগী ও সংস্থাপক; কাশীকান্তবাবু এবং অন্যতর উকিলবাবু বরদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের উৎসাহ ও

অধ্যবসায়বলেই প্রোক্ত সভা হইতে হিন্দু হিতৈষিণী নাম্নী একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকে। সেই সময় হিন্দুদিগের যে প্রবল দলবল ছিল, তাঁহা মৃত্যু নিবন্ধন অধুনা তাহার যেন নিত্য নিস্তেজভাব লক্ষিত হইতেছে। তখনকার ন্যায় এখন তাহাদিগের (হিন্দুদিগের) মধ্যে বড় উৎসাহ দেখা যায় না। বস্তুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরহে অনেকে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন।

হিন্দুগণ বহু পরিবার সম্মিলিত হইয়া বাস করিতে একান্ত সুখ অনুভব করেন। ফলত তাহারা তাহাদের এই অকৃত্রিম প্রীতির নিমিত্ত সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এখানকার (পশ্চিমপাড়াস্থ) একটি পরিবার দর্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দ ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়াছি। অত্রত্য কোন মুখোটি মহাশয়ের পরিবার নিতান্ত বিস্তৃত ও বহুজনসঙ্কুল উহা সপ্ততিতম গৃহে বিরচিত। এই পরিবার এত দীর্ঘ কালায়ত যে, অধুনা পরিবারস্থ লোকদিগকে ত্রিরাত্রির অধিক, জ্ঞাতি মরণজনিত অশৌচের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

কনকসার

এই গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা মন্দ নয়। এই ক্ষুদ্র পল্লী সুবিখ্যাত গুণী সূর্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্মস্থান। ইঁহার পূর্ব বিবরণ শ্রবণ করিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা অবগত আছি ইনি শৈশবকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। ইহার পিতা এমন কোন বিশেষ সংস্থান রাখিয়া যান না যে, গ্রাসাচ্ছাদনান্তর উদ্বৃত্ত সম্পত্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে তাহার অধ্যয়ন চলে। তথাপি কোন সুযোগ বিধান করিয়া তিনি পাঠ আরম্ভ করেন। কতিপয় বৎসর এই রূপে গত হইলে কোন ইংরেজ মহামতির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উক্ত মহোদয় তাহার অধ্যয়ন বিষয়ে সহায়তা করিবেন বলিয়া সূর্যবাবুকে কলিকাতা লইয়া যান। তখন তাঁহার মনে স্বদেশানুরাগ কিছু কিছু নিহিত ছিল। অনন্তর তিনি তথায় পাঠ কার্যে নিরত থাকিয়া ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইতিমধ্যে সূর্যকুমারবাবু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হন। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত সাহেব মহোদয়ের মৃত্যু হয়। অনন্তর সূর্যবাবু ইংলন্ড গমন করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তিনি ফ্রান্স দেশীয় কোন ভদ্র পরিবার সম্ভূতা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পরিশেষে বহুল পরিশ্রম সহকারে তিনি মেডিকেল বিদ্যায় (চিকিৎসা শাস্ত্রে) এতাদৃশী পারদর্শিতা লাভ করিয়া আজি একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময়েও তিনি গৃহের প্রতি এককালে প্রীতিহীন ও অনুরাগশূন্য হন নাই। বাটিতে বর্ষে বর্ষে অর্থ প্রেরণ করিতে থাকেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থ দুর্গোৎসবে পর্যবসিত হয় তখন তিনি অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন। সূর্যবাবু যদি ধর্মচ্যুত না হইতেন তাহা হইলে আজি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের সীমা কি ছিল? কিন্তু প্রকৃত হিতৈষণা থাকিলে ধর্মান্তরতায় কিছু করিতে পারে না, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

ব্রাহ্মণগাঁ

এই পল্লী পূর্ব ব্রাহ্মণগাঁ ও পশ্চিম ব্রাহ্মণগাঁ এই দুই ভাগে সংবিভক্ত। পূর্ব ব্রাহ্মণগাঁ কেবল ব্রাহ্মণ্যের পরিপুরিত। কুলীনের সংখ্যা অল্প নয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম ব্রাহ্মণগাঁয় উহার (ব্রাহ্মণের) বিন্দুবিসর্গও নাই বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তত্রত্য

জমিদারবাবু কৃষ্ণকুমার ঘোষ মহোদয়ের যত্নে একটি সার্কেল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সার্কেল হইতে একদা যারপরনাই আহ্লাদজনক ফল প্রসূত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকালি উহার তাদৃশী উন্নতি লক্ষিত হয় না বলিয়া বড়ই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ঘোষজ মহাশয়গণ প্রায় দুই-তিন বর্ষকাল হইল প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ 'গ্রামহিতৈষিণী' নাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সভার জীবন ও অবস্থা এরূপ সমুন্নত ছিল না যে, তদ্দ্বারা উদ্দিষ্টফল সম্যক লাভ করা যাইতে পারে। বাবুদিগের সমুচিত উৎসাহ ও যত্নাভাবে গ্রাম হিতৈষিণী আজি বিগত জীবনা হইয়াছে।

লৌহজং

এই স্থান কীর্তিনাশা নদীর উত্তর তটে অবস্থিত। ইহার আয়তনের ন্যায় বসতি সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। সম্প্রতি কীর্তিনাশা লৌহজংকে এককালে উদরস্থ করিয়াছে। লৌহজংয়ের ধনী প্রধান পালবৃন্দ সর্বত্র পরিচিত। পূর্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদিগের প্রাচীন কার্যকলাপ স্মরণ করিয়া মধ্যকালে আমাদের অন্তঃকরণে খেদের আবির্ভাব হইত। কিন্তু আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া অনুমান হইতেছে, ইহাদের অস্তমিত যশোরবি পুনরুদিত হইবে। পালদিগের প্রযত্নে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। অত্রত্য কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই বিদ্যালয়ে 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' নাম্নী একটি সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অল্পকাল হইল লৌহজংয়ে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে গভর্নমেন্ট উহার স্থায়িত্বের জন্য সাহায্য প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন। তাহারা বলেন এক গ্রামে তিন শ্রেণীস্থ বিদ্যালয় স্থাপন তাহাদের উদ্দেশ্য নয়।

পাল মহোদয়দিগের বাটির সন্নিকটে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলা প্রায় সমস্ত ভাদ্র মাসব্যাপিয়া থাকে। ইহাতে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে বহুবিধ বণিক আগমনপূর্বক আপন স্থাপন করিয়া বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যজাত ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। মেলায় দর্শকও অনেক সমাগত হয়। এই মেলায় দর্শকবাবুরা নাট্য, সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদ উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করেন।

লৌহজংয়ে বাণিজ্যাবলম্বিদিগের সংখ্যা মন্দ নহে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই সুন্দররূপে চলিতেছে। পালগণও ইহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। বহু দূরবর্তী স্থান লইয়া ইহাদের লবণ, বস্ত্রাদির ব্যবসায় হইয়া থাকে। অনেকের তৈল, তিল, গুড়, চিনি, তামাক, সরিষা প্রভৃতির কারবার আছে। কলিকাতা, পাটনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ সাহবাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে ইহাদের বাণিজ্য চলিতেছে।

বহর

বহর গ্রামের হৃদভেদ করিয়া কীর্তিনাশার শাখা নদী উত্তরাভিমুখে গিয়াছে সুতরাং বহর পশ্চিমপাড়া ও পূর্বপাড়া বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানে বসু বংশসম্ভূত

অনেক জমিদার আছেন। তাহারা চৌধুরী বলিয়া পরিচিত। অনেকে বলেন তাহারা বংশজ কুলীন নন। বসুগণ আপনাদিগকে পর্য্যায় সম্পন্ন বলিয়া গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি চৌধুরীদিগের জমিদারি নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের পূর্বের ন্যায় তত প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় না। এস্থানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক অল্প। অত্রত্য ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ্য যত্ন না দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। মুন্সেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত উক্ত শাখা নদীর পূর্ব তটে অবস্থিত। চৌধুরীগণ সমবেত হইয়া দশবিদ্যার[২০] প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন।

প্রবাদ আছে, চৌধুরীগণের কাহারও প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, মন্দির সমীপে পূজা করিয়া একটি নরবলি প্রদান করিতে হইবে। নতুবা যারপরনাই অমঙ্গল ও অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। ইহা সকলের (অপরাপর চৌধুরীদিগের) কর্ণগোচর হইলে নরান্বেষণ আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন ধীবর জাতীয় কোন একটি শিশুকে নানা ছল অবলম্বনপূর্বক ক্রয় করিয়া বলি দেওয়া হয়। আবার কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট নিবাসী এক ভৃত্যকে আনিয়া দশবিদ্যার সমীপে বধ করা হয়। ইহা কিরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা আপামর সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এমন কোন পাষাণ হৃদয় আছে যে, তাহার শুষ্ক নেত্র হইতে অশ্রুজল বিগলিত না হয়? তদবধি দেশ মধ্যে "ঐ ছেলে নিতে এল, ঐ ছেলে নিতে এল" বলিয়া এক জনরব উঠিয়া গেল। সকলের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেহই তাহার সন্তানদিগকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে দিত না। যদি কখন কোনক্রমে নয়নান্তরালবর্তী হইত তাহা হইলে জননী হাহতোস্মি স্বরে উন্মাদিনী প্রায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেন। অজনন মমতাশীলা মাতার ঈদৃশ স্নেহভাব কখনই আবিশ্বাসনীয় নহে। পুত্রস্নেহ কি মহান পদার্থ! এই স্নেহের পরতন্ত্রা হইয়া যে জননী স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত এমন স্বর্গীয় প্রতিমা জননীর প্রতি কাহার না ভক্তি হয়? এবং যে সন্তানের প্রতি মাতার যারপরনাই আশা-ভরসা রহিয়াছে ও যাহার প্রতি স্নেহ স্বভাবত হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে, ঈদৃশ পুত্রের প্রতি তাদৃশ মমতা ও বাৎসল্য বিচিত্র নহে।

সানিহাটি

এই স্থানে বহুবিধ জাতির বাসস্থান দৃষ্ট হয়। অত্রত্য মৌলিকবৃন্দ এখানকার আদিমনিবাসী। ইহাদের আগমনের পরে এখানে অন্যান্য লোকের সমাগম হয়। এই নিমিত্তই তাঁহারা মৌলিক খ্যাতি লাভ করেন। ফলত ইহারা অনেকদিনের ভদ্রলোক। অত্রত্য সরকারগণও মন্দ প্রতিপন্ন নন।

তেয়রটিয়া

ইহা মৃত মুন্সি মৃত্যুঞ্জয় দত্তের আবাস স্থান। ইনি বহুদিবস পর্যন্ত ঢাকার দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার পদে নিয়োজিত থাকিয়া অনেক নৈপুণ্য সহকারে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরীর অনেক লোক ইহার প্রতি প্রীতি যুক্ত ছিল। দত্তবর সময়ে সময়ে দেশীয় লোকের উপকার করিয়া তাহাদেরও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া গিয়াছেন। বস্তুত ইহার মরণে অনেকে ব্যথিত চিত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দত্তমহাশয় বিদ্যালয়

স্থাপন প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কোন বিষয়ে কিছু যত্ন করেন নাই। হিন্দু ধর্মে ইহার মন্দ অনুরাগ ছিল না। মুন্সি মহাশয় অনেক অর্থ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া সংসার লীলা সংবরণ করেন। প্রায় তিন বর্ষ অতিবাহিত হইল তাহার পুত্রবৃন্দের প্রযত্নে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য মন্দ চলিতেছে না। পেস্কার মহোদয়গণ কৃতবিদ্যা লোক সন্দেহ নাই। ইহারা তাদৃশ আড়ম্বরপ্রিয় নন। কিন্তু লোকানুরাগ প্রিয়তা ইহাদিগের হৃদয়েও মন্দ বলবতী নয়। সুতরাং কার্যে প্রবেশকালীন কিছু কিছু সঙ্কোচিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কোরহাটি

এই স্থান পূর্বে অতি বিস্তৃত ছিল। কীর্তিনাশা ইহার প্রায় সব ক'টি পর্যন্ত গ্রাস করে। কিন্তু কালের কি চমৎকারিণী শক্তি অধুনা নদী গর্ভস্থ অনেক স্থান শীর্ষোত্তোলনপূর্বক ক্রমশ বর্ধিতকায় হইয়া উঠিতেছে। সেই সমুদয় স্থল কোরহাটির অন্তর্গত হইয়াছে। তাহাদের সমষ্টির নাম "চড় কোরহাটি"।

কোরহাটি সম্প্রতি ক্ষুদ্র পল্লী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তথায় অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। অত্রত্য ঘোষ ও বসু পরিবারদ্বয় মন্দ পরিচিত নয়। এখানে সুশিক্ষিত লোকও আছেন। ইহাদের দেশোন্নতির পক্ষে একদা যারপরনাই উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাদৃশ সম্পন্ন নন বলিয়া ইহাদিগকে কোন প্রধানতর কার্যে বড় যত্নশীল দেখা যায় না। সকলেই সাধারণত এক প্রকার নিঃস্ব। ইহারাও প্রাচীনদিগের অনুচিত ভয়ে ধর্ম বিষয়ে বড় একটা অগ্রসর হইতে যত্ন করেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই লোকানুরাগপ্রিয়তার বশংবদ। কোরহাটি গ্রামে কতিপয় সুশিক্ষিত মহাত্মার প্রযত্নে একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত উহা প্রাচীন দিগের বিদ্বেষসমূহ অপ্রতিহত প্রভাব সহ্য করিয়াও করালকালের ভীষণ গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অন্যতম শিক্ষক মৃতমহোদয় আনন্দমোহন বসুই উহার প্রধান উদ্যোগী ও স্থাপয়িতা ছিলেন। দুরন্ত কৃতান্ত তাহাকে অকালে হরণ করিয়া কোরহাটির ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এখন পূর্বের ন্যায় কাহারও হৃদয়ে অদৃশ উৎসাহ লক্ষিত হয় না।

কুমারভোগ

বিক্রমপুরে যতটুকু বাংলা ভাষার উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, এই কুমারভোগ নামক ক্ষুদ্র পল্লীকেই তাহার আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। বিক্রমপুরের মধ্যে কুমারভোগই সর্বপ্রথমে সার্কেল বিদ্যালয় প্রসব করে। যাহাদের উৎসাহে এইরূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং যাহাদিগের যত্নবারিসিঞ্চনে ঐ বিদ্যালয় আজিও জীবিত থাকিয়া অনেক বালকের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত করিতেছে তাহারা মহান হিতৈষী। তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহাদিগের অধ্যবসায় থাকিলে তাহা পরিণামে যে আরও কত সুফল বিতরণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সময়ে শ্রীযুতবাবু দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয় (ইনি সম্প্রতি মান্দারিপুর মহকুমায়

ডেপুটি শান্তিরক্ষকের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের) পদে স্থায়ী আছেন। ঢাকা জেলা ও বিক্রমপুরস্থ বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণগাঁয় অপর একটি সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই স্থানে স্থানে পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বিক্রমপুরের যে কিছু সৌভাগ্য সূর্যের আলোক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কুমারভোগে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারস্থ লোকের বাস আছে।

কিছুদিন পূর্বে এই স্থানে ভাস্কর্য বিদ্যারও প্রভাব মন্দ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজ গ্রামে চুরি হইতে দেখা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন দলবদ্ধ তস্করদিগের মধ্যে বন্দোবস্ত থাকে যে, তাহাদের দল সংসৃষ্ট ব্যক্তি যে কোন গ্রামবাসী হউক না কেন, তথায় তাহারা আশুতোষিনী চৌর্যবিদ্যা প্রকাশ করিবে না। দেশীয় ভদ্র মহাত্মাদিগ হইতে ক্লেশ প্রাপ্তির ভয়, রাজদ্বারে প্রেরিত ও অবশেষে দেশ হইতে বহিস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা, এই সমুদায়ই এতাদৃশ বন্দোবস্তের কারণ। এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে, দেশীয় মহাত্মারা ঈদৃশ চৌর্য ক্রিয়ার সমস্ত অবগত থাকিয়াও শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র অবহিতমনা হন না। ইহাতে কি তস্করদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? প্রতিবাসী বন্ধু-বান্ধবদিগের ধনাপহরণ দর্শন করিয়া কি তাহাদিগের মনে একটুও দুঃখের উদ্রেক হয় না? আমরা কেবল এই স্থানে এইরূপ দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এমন নহে। বিক্রমপুরের আরো অনেক স্থানে এতাদৃশী দুষ্ক্রিয়ার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। দিন দিন যতই কেন সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হউক না, যতই কেন আমরা বড় বড় উপাধি লাভ করিয়া বিখ্যাত হই না, কিন্তু যতদিন ইতর লোকদিগের হৃদয় বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত না হইবে, ততদিন বিক্রমপুরের প্রকৃত উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তারপাশা

তারপাশা অত্যন্ত আয়ত স্থান। এই গ্রাম সর্বত্র মন্দ পরিচিত নহে। অত্রত্য মহাশয়গণ নানাবিধ সাধু কার্যানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ও মহান ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহারা "মহাশয়" এই সম্মানাত্মক উপাধি লাভ করিয়া সাধারণ্যে তাদৃশ বিখ্যাত হন। আজিও মহাশয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের নিজ বাটি উত্তুঙ্গ সৌধমালায় পরিশোধিত। বিচিত্র কারুকার্যসম্পন্ন সিংহদ্বার প্রভৃতি কতকগুলি অট্টালিকা আজিও আমাদিগের নেত্র যুগলের আতিথ্য পালন করিয়া থাকে। মহাশয়দিগের বাটি নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে সিংহদ্বারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলি অধুনা জঙ্গল লতায় পরিপূর্ণ হইয়া কালের চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাশয়গণ বাটির চতুর্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার নির্মাণ করান। তাহাদিগের পরিবার মধ্যে এরূপ শাসন ছিল যে, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এমনকি অন্তঃপুরস্থাকামিনীদিগের অল্প বয়স্ক কোন ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাকে ইহারা ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। তাহাকে যথারীতি বহির্বাটিতে অবস্থান করিতে হইত। এরূপ রীতি যদিও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী

বলিয়া প্রতীত না হয়, কিন্তু মহাশয়গণ ইহাকে যারপরনাই সম্মান ও সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

মহাশয়দিগের জমিদারি নানা স্থলে বিদ্যমান ছিল। মহাশয়গণ অতি বিস্তৃত শ্যামপুর ও ভুলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। অধুনা তাহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও কীর্তিরাশি লক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আজি তাহাদিগের বংশগণ তেজোহীন হইয়া রহিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী যে, তারপাশা গ্রামে পূর্বে কুলীন ব্রাহ্মণের নামমাত্রও ছিল না। মহাশয়গণ বহুল ধন ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া বেইঘে হইতে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া নিজ পল্লীতে স্থাপিত করেন। তদবধি এই তারপাশা গ্রাম অন্যতর কুলীন প্রধান স্থান হইয়া সর্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

বেইঘে

বেইঘে প্রসিদ্ধ কুলীন দ্বিজগণের আবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। প্রাচীন সময়ে সময়ে ইহার প্রতিপত্তি বহুদূর ব্যাপিনী ছিল। এরূপ জনশ্রুতি যে, তৎকালে অত্রত্য ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ প্রভূত ধনসম্পত্তির পরিচায়ক বহুবিধ কার্যানুষ্ঠান করেন। দ্বিজগণ বদান্যতার নিমিত্তও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! অধুনা তাদৃশ খ্যাতিসঙ্কুল বেইঘের শুদ্ধ নামমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ভূচিহ্নও আজি লক্ষিত হয় না। এখন কোথায় তাহাদিগের (ব্রাহ্মণদিগের) সেই প্রচুর প্রতিপত্তি, কোথায় তাহাদিগের সেই দিগন্ত ব্যাপিনী মহীয়সী কীর্তিমালা? এবং কোথায়বা তাহাদিগের বংশধর সন্তানগণ? আজি তৎসমুদায়ের বিরহজনিত শোকাবেগ কাহার চিত্তকে না ব্যাকুলিত করিয়া তুলে? বস্তুত তাদৃশ মহোদয়দিগের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনুভব করা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। দ্বিজবৃন্দের জমিদারির প্রভাবও মন্দ ছিল না।

এই গ্রামে অতি প্রাচীন কালীয় কয়েকটি পুষ্করিণী ও একটি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা আছে। কিন্তু তদ্বারা পল্লীবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারিত হয় না। অধুনা দীঘিটি একেবারেই শুষ্কতায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উহা এরূপ দীর্ঘ যে পূর্বে উহার একপার হইতে পারান্তর দর্শন গোচর হইত না। এখন উহা মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া পারভূমির সমান হওয়াতে মধ্যস্থল লোকের বাসস্থান হইয়াছে। আজিও দীঘির অংশদ্বয়ের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য বড় ন্যূন হইবে না।

কাচাদিয়া

অত্রত্য সেন পরিবার বিশেষ খ্যাতাপন্ন। এখানে ব্রাহ্মণেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিদ্বধরবাবু গুরুপ্রসাদ সেন এম. এ. মহোদয় এই গ্রামের প্রধান অবতংস। গুরুপ্রসাদবাবু পূর্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অল্পদিন পরেই পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশপূর্বক কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বিজাতীয় ভাষায় (ইংরেজি ভাষায়) মন্দ পরিপক্ব নন। সত্য বটে ইনি বিদ্যাবুদ্ধিতে একজন সুনিপুণ মানুষ এবং ইনি সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশানুরাগ এখনও ইহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই–

দেশের উন্নতি সাধনে একপ্রকার বিরত রহিয়াছেন বলিলে লেখনী বোধ হয় সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। এই সেন পরিবারস্থ শিবচন্দ্র সেন অনল্প খ্যাত কবি ছিলেন। তাহার রচিত "সারদামঙ্গল" নামক পুস্তক তাঁহার কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রদান করে।

কালীকিঙ্কর সেন একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশারদ ছিলেন। অনেকে বলেন তাঁহার ন্যায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ লোক অতি বিরল। গৌরীকান্ত সেন নামে অন্য এক ব্যক্তি শিল্পকার্যে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ষাধিককাল অতীত হইল এই কাচদিয়া গ্রামে একটি পোস্টালয় ও "শুভকরী" নাম্নী একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অফিসটির কার্য বেশ চলিতেছে। শুভকরীও সাধ্যানুসারে দরিদ্রোপকার ব্রত পালনে নিরত রহিয়াছে।

সাহাবাজনগর

এই গ্রামে কুলীন দ্বিজ গ্রামে একপ্রকার পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি নদীবেগ প্রপীড়িত কাঁচাদিয়া নিবাসী সেন মণ্ডলীর অনেকে এই সাহাবাজ নগরে বাস করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীনগণ প্রসিদ্ধ কুলীন স্থান বেইঘে হইতে এখানে সমানীত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত সংখ্যাও মন্দ নহে। শিক্ষিত বলিয়া যে ইহার কৌলীন্য প্রথার মোহিণী মূর্তিতে বিমোহিত না হন এমন বলা যাইতে পারে না। ইহারাও সময়ে সময়ে কুলগঞ্জে অন্ধীভাব ধারণ করেন।

এখানে কায়স্থাদি ভদ্রগণের বাসও মন্দ দেখা যায় না। কিন্তু ভয়ঙ্করী পদ্মার দুর্ধর্ষ আক্রমণে অনেক ব্যক্তি স্থানান্তর গমন করিতেছেন। দুরন্ত তরঙ্গিণী সাহাবাজনগরের প্রায় অর্ধাঙ্গ গ্রাস করিয়াছে। আজিও ইহার যেরূপ পরাক্রম ও অত্যাচার লক্ষিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয়, অচিরেই এই স্থান তাহার বিশাল উদরসাৎ হইবে।

এই গ্রামে অতি প্রাচীনকালীয় কয়েকটি পুষ্করিণী ও একটি সুপ্রশস্ত দির্ঘিকা আছে। কিন্তু তদ্দারা পল্লীবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারিত হয় না। অধুনা দিঘিটি একেবারেই শুষ্কতায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উহা এরূপ দীর্ঘ যে পূর্বে উহার একপার হইতে পারান্তর দর্শনগোচর হইত না। এখন উহা মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়া পারভূমির সমান হওয়াতে মধ্যস্থল লোকের বাসস্থান হইয়াছে। আজিও দিঘির অংশদ্বয়ের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য বড় ন্যূন হইবে না।

কালীপাড়া

কাওলী (কাপালী)বৃন্দ এখানকার আদিবাসী বলিয়া এই গ্রামের নাম প্রথমে "কাওলীপাড়া" হয়। পরে ভদ্রলোকের বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহার নামের পরিবর্তন হইয়া অধুনা এই স্থান "কালীপাড়া" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অত্রত্য জমিদারদিগের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা ইহাদের ক্ষমতা অধিকই দৃষ্ট হয়! ইহারা হীন প্রতাপ হইয়াছেন ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাঁচেরপাশা[২০] গ্রাম হইতে আগমন করিয়া এই কালীপাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করান। ইনি নিতান্ত দরিদ্রবস্থায় কালযাপন করিয়াছেন। তাহার পুত্র

সূর্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ভাটি অঞ্চলস্থ কাদিরাবাদ পরগণাস্থিত রঙ্গাভঙ্গা নামক স্থানের স্বামিত্ব লইয়া ইহার সহিত ইদলপুর নিবাসী রামকান্ত রায় প্রভৃতি চৌধুরীগণের ভয়ানক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গায় এত অধিক লোকের জীবন নষ্ট হয় যে, রুধিরে সমীপবর্তী খালের জল এককালে রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই জয়শ্রীর অনুকম্পা লক্ষিত হয়।

অনন্তর ঘটনাক্রমে কলিকাতা নিবাসী অন্যতম জমিদার গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। গোকুলবাবু সূর্যনারায়ণের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতায় বেশ প্রীত হন। তাহার নীলাম ক্রীত চিরলী মধুরদী নামক স্থানের স্বামিত্ব স্থাপন সম্বন্ধে তত্রত্য তালুকদারদিগের সঙ্গে অত্যন্ত হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তিনি কোন প্রকারেই কৃতকার্যতা লাভ করিতে না পারিয়া সুচতুর সূর্যনারায়ণবাবুকে তথায় (চিরলীমধুরদীতে) প্রেরণ করেন। সূর্যবাবু অনেক যষ্টিধারী পুরুষ পরিবৃত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্বক ঐ স্থান আয়ত্ত করেন। ইহাতে গোকুলবাবু তাহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন।

সূর্যবাবু এই কার্য দ্বারা বহুল ধন সম্পত্তি উপার্জন করেন। অনন্তর তিনি প্রোক্ত অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। রঙ্গাভাঙ্গা অংশ লাভই তাহাদিগের জমিদারির সূত্রপাত। সূর্যবাবু গৃহে আসিয়াই একে সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনিত করান। অনেকে বলেন এই দীঘি খননকালে তিনি মোহরপূর্ণ কতিপয় কলস প্রাপ্ত হন। তাহার দুই পত্নী ছিল। প্রথম কামিনীর গর্ভে বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী অপুত্রবতী ছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেন। তাহার নাম কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার পরলোক গমনের.পর ইহাদের মধ্যে ধন সম্পত্তির অংশ লইয়া পরস্পর অনেক বিবাদ হয়। কিন্তু পরিণামে তাহাদিগকে পিতৃকৃত বিনিয়োগ পত্রানুসারেই কার্য করিতে হইল। বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই তাহাদের "চৌধুরী" বলিয়া খ্যাতি হয়। ইহার তিন পুত্র। বাবু উমাকান্ত, বাবু কাশীকান্ত ও বাবু কালীকান্ত ইহার কেহই এখন জীবিত নন। কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই জমিদারবৃন্দ বিদ্যাবিষয়ে অনেক উৎসাহ দান করিতেছেন। অত্রত্য ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয়টি তাহার উদাহরণস্থল। এখানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। জমিদার মহোদয়দিগের অন্তঃকরণে বিদ্যানুরাগিতা যতদূর দৃষ্ট হয়, যদি অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উৎসাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহা অসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, কালীপাড়া অপর গ্রামসমূহের অনুকরণস্থল হইয়া উঠিত। সম্প্রতি কালীপাড়ায় অনেকাংশ ভয়ঙ্করী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

এখানে জয়কালিকার মৃন্ময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন ইহার অর্চনা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অমাবস্যা নিশিতে কালীর সম্মুখে এক একটি অজচ্ছেদ হয়। পূর্বে এই কালীর বড়ই প্রতাপ ছিল। কিন্তু সংপ্রতি উহার তাদৃশ উচ্চ নাম নাই।

রাঢ়ীখাল

রাঢ়ীখাল ভূতপূর্ব অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাময়ের বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য ঢাকা নগরীর তুমুল চেষ্টা ও উদ্যোগ হয়, ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু (ইনি সম্প্রতি চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক) তাহার অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সহধর্মিনী, শুনা যায়, তাহাতে (বিবাহে) স্ত্রী আচার সম্পাদনার্থ সমাহূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এখানে বেশ ভদ্রলোকের বাস আছে।

মাইজপাড়া

বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের অলঙ্কার। ইনি অধুনা রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রতি জেলাস্থ বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। এই মহাত্মা ঢাকা জেলার বিদ্যালয় সকলের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন। তখন ইনি যেরূপ বিপুল প্রতিষ্ঠা সহকারে দেশের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী ছিলেন, এখন তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া পরকীয় জেলাসমূহের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বস্তুত তাহারই যত্নাতিশয়ে বিক্রমপুর যে কিছু সৌষ্ঠব সম্পন্ন দৃষ্ট হয়। কাশীবাবুর সময়েই বিক্রমপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। মাইজপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়টি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও প্রধান।

মাইজপাড়ার হরিকিশোর রায়, তারাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ বেশ প্রতিপন্ন লোক। দেশ মধ্যে ইহাদের কম প্রতাপ নহে। এখানে অনেক সুশিক্ষিত দৃষ্ট হন।

ভাগ্যকুল

অত্রত্য প্রসিদ্ধ ধনী কুণ্ডদিগের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যকুলে শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। এখন বিক্রমপুরে ইহাদের ন্যায় ধনশালী লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা দানশীলতার নিমিত্ত সাধারণ্যে বিশেষ বিখ্যাত। বিগত দুর্ভিক্ষে কুণ্ড মহোদয়গণ দারিদ্র্যপীড়িত অনাথদিগের নিরতিশয় উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভোজের আনুষঙ্গিক অর্থ দানও করেন। ফলত ইহাদিগের হৃদয়মুকুরে দয়ার প্রতিবিম্ব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহারা সাধারণের উপকারার্থে নিজ গ্রামে একটি ডিস্পেন্সারি স্থাপন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের বিদ্যালয়ের প্রতি কুণ্ডুবাবুদিগের বেশ যুত্ন আছে সন্দেহ নাই। ইহাদের যত্ন ও উদ্যোগে এখানে একটি ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। কুণ্ডদিগের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণির্জ্যের বিলক্ষণ প্রচার আছে।

বাগড়া

বাগড়া এককালে বিরল বসতি নহে। অতি অল্পকাল হইল, এই স্থান শুদ্ধ কাশবনে আবৃতও বালুকাময় ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় প্রবল সমীরণ সহযোগে যখন কাশকুসুমগুচ্ছ ও বালুকাকণা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিত, তখন পথিকদিগের যারপরনাই কষ্ট উপস্থিত হইয়া সমাগমন অসাধ্য হইয়া উঠিত। দূর হইতে দৃষ্টিপাত কেবল ধু ধু করিতেছে দেখা যাইত। কিন্তু তাদের কি বিচিত্র গতি। কি চমৎকার

পরিবর্তন। এখন বাগড়া, কামারগাঁ, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি স্থানসমূহের চতুর্দিকস্থ গ্রামাবলী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি রূপে প্রতীত হয়।

এই গ্রামে শ্রীনাথ ও বাসুদেবের প্রতি মূর্তি সংস্থাপিত আছে। সাধারণ্যে পুত্র কন্যাদিগের অন্নপ্রাশন সময় ইঁহাদিগের (শ্রীনাথ ও বাসুদেবের) প্রসাদ গৃহীত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে বাসুদেব ও শ্রীনাথ দর্শনার্থ অনেক বিদেশীয় লোক সমাগত হয়। তখন হট্টাদির ন্যায় অনেক স্থল লোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এস্থানে সংপ্রতি শিক্ষিত লোকও বেশ দৃষ্ট হইতেছে।

কুকুটিয়া

এই পল্লী দ্বিজবংশ সম্ভূত চৌধুরী ও সরকারসমূহে পরিপূরিতা; ইহাদের পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধি নাই। এখানে বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী একটি সভা আছে বটে, কিন্তু বড় উন্নতিশালিনী বোধ হয় না। এমন কি, এখন উহা জীবিত আছে কি-না সন্দেহ স্থল। একদা অত্রত্য বিদ্যালয়ে পূর্ব পণ্ডিত বাবু জগন্নাথ সরকার ও কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে "সংসার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। কালে পরিবর্তনশীল ধর্মের সঙ্গে কিছুদিন পরে আর তাহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় লক্ষিত হইল না সুতরাং পত্রিকার জীবনান্ত হইল। পল্লীগ্রামে অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধনই এইরূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াও অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধনীদিগের তাহার প্রতি তত মনোযোগ দেখা যায় না।

এই গ্রাম নিবাসী মৃত কালীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জজ আদালতের একজন প্রধান উকিল ছিলেন। ইনি বিস্তর বদান্যতার কার্য করিয়া "দাতা কালীকুমার" বলিয়া সর্বত্র প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল ইহার পরোপকারিতা গুণদর্শনে কাতর হইয়াই যেন দুরন্ত শমন বিকটমূর্তি পরিগ্রহণপূর্বক ইহাকে নিজ নিকেতনে লইয়া গিয়াছে। ইহার অকাল লোকলীলা সংবরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হৃদয় হইয়াছেন।

কোলা

যদিও কোলার অনেক স্থান অরণ্যাকীর্ণ হউক, কিন্তু যতটুকু পরিস্কৃত ও বাসযোগ্য আছে তৎসমুদয় স্থানই মনুষ্য বাসের পরিপুরিত বলা যাইতে পারে। এখানে অনেক ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। বোধ হয় ঘটকদিগের সংখ্যাধিক্য বশত ইহাকে "ঘটকের কোলা" বলিয়া থাকে। এখানকার সার্কেল বিদ্যালয়টির কার্য উৎকৃষ্টরূপে চলিতেছে। অন্যান্য বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অপেক্ষা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অনেক অধিক। কোলা ও ইহার নিকটবর্তী অনেক পল্লী প্রায়ই অরণ্যময়।

সানসিদ্ধি

এখানকার গুহ ও মিত্রমণ্ডলী একপ্রকার বেশ সম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও এককালে মন্দ নহে। অত্রত্য মৃত শম্ভুচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক মঠ প্রতিষ্ঠা

করেন। উক্ত মঠ বিক্রমপুরের আধুনিক অপরাপর স্থানের মঠ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ফলত উহাকে আজি বিক্রমপুরের এককীর্তি স্বরূপ বলিতে হইবে।

পূর্ব বিক্রমপুরে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ গণ্ডগ্রাম বলিয়া উক্ত হইতে পারে। নওপাড়া, তেলিরবাগ, ভরাকৈর, পাইকপাড়া, রামপাল, বজ্রযোগিনী, নগরকস্‌বা, সোনারঙ, আইরল, বিদগাঁ, বানরী।

তেলিরবাগ

এই গ্রাম বিজ্ঞবর বাবু কালীমোহন দাশ ও বাবু দুর্গা দাশ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জন্মস্থান। ইহাদের পিতা কাশীশ্বর দাশ মহোদয় বরিশালে প্রধান ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তিনি উক্ত কর্মে বিলক্ষণ কার্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া অনেক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে একপ্রকার বিদেশবাসী বলা যাইতে পারে। কালীমোহনবাবু বঙ্গদেশীয় উচ্চতম আদালতের একজন বিখ্যাত উকিল। দুর্গামোহন বাবু বরিশালের গভর্নমেন্ট নিয়োজিত প্রধান উকিল। ইহারা উভয়েই শিক্ষিত ও উন্নত স্বভাব। ধর্ম ও দেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে ইহারা বিধবা বিমাতার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন, অনেকে এই জন্য ইহাদের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহারা অত্যন্ত পরোপকারী ব্রাহ্মণ। বরিশালের যে'কিছু উন্নতি দেখা যায় দুর্গামোহন বাবুকেই তাহার মূল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগকে গৃহে আসিতে বড় একটা যত্নশীল দেখা যায় না। ইহারা ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির নিমিত্ত নানা স্থানে দান করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ দান পক্ষে ইহারা বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক কতকদিন জীবিত থাকিলে ইহাদের দ্বারা দেশের বিশেষত বিক্রমপুরে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইহারা স্বদেশে আসিয়া শীঘ্র তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবেন, আমাদের এরূপ মনে হইতেছে না।

ভরাকৈর

এই স্থানে কাঁঠালিয়ার দত্ত বংশজগণ একপ্রকার প্রাধান্য সহকারেই বাস করিতেছেন। ইহারাই অর্ধকুলীন বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। এই দত্তজ নিচয়ের প্রতি দুরপনেয় কলঙ্ককর কৌলীন্যদেবের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ না জন্মিবার এক কৌতুকাবহ কিংবদন্তী আছে। তাহা এই :—

আদিশূরের রাজত্বসময়ে রাজ্য মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এতন্নিবন্ধন প্রজামণ্ডলীর বহুবিধ কষ্ট উপস্থিত হয়। প্রজা হিতৈষী মহানুভব আদিশূর প্রকৃতির ক্লেশ দর্শন করিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের করুণা লাভাশয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে স্থির সঙ্কল্প হন। তখন এতদ্দেশীয় দ্বিজগণ বেদশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং স্থানান্তর হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা হইল। নৃপবর কান্যকুব্জরাজ বীর-সিংহকে তাঁহার রাজ্য হইতে বেদকুশল পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজা বীরসিংহ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ বেদগর্ভ, ছান্দড় এবং শ্রীহর্ষ এই প্রধান বেদজ্ঞ ৫ জন ব্রাহ্মণকে আদিশূর সমীপে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কবিবর

ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য মুনির বংশসম্ভূত বলিয়া শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন। বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা সকলেই ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইঁহার সঙ্গে ভৃত্য হইয়া আগমন করেন। ঘোষ বংশীয় সকলেই এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান। কশ্যপ মুনি দক্ষের আদি পুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত।

আদিশূর প্রোক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মহা সমারোহে যাইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তদবধি দ্বিজ নিচয় বঙ্গদেশেই বসতি করেন। কালক্রমে তাহাদের ৫৬ জন সন্তান হয়। নৃপমণি বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে ৫৩ খানি গ্রাম ব্রহ্মত্র দিয়া সংস্থাপন করে। ইহা হইতেই ৫৩ গাঁই হয়। তিনি সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্ম ও আচারগত প্রভেদ গৌণ, দ্বাবিংশতি ব্যক্তিকে কুলীন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে শোত্রীয় শ্রেণীতে পরিগণিত করিলেন, অনন্তর কন্যার দানাদান প্রভৃতি দোষে শেষোক্ত শ্রেণীস্থ দ্বিজ ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানবৃন্দের কেহ কেহ কুল ভ্রষ্ট হইয়া বংশজ ক্ষান্ত রহিলেন এমন নহে। তিনি এদেশে পূর্বে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাদিগের সহিত উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানাদির বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপিত, না হয়, এই জন্য ঐ দ্বিজগণকে সাত শত গৃহে গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক শ্রেণী করিয়া দেন, তাহারা "সপ্তসতী" শব্দে অভিহিত হন। এইরূপে রাজা বল্লাল সেন কানোজ হইতে সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের ও দেশস্থ সপ্তসতী দ্বিজবৃন্দের বিভাগ বিধান করেন।

অনন্তর বল্লালতনয় লক্ষ্মণ সে যখন রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রোক্ত রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানসমূহের সমীকরণ করেন। তাহাতে উক্ত সন্তানগণ তাহাদিগের আদিপুরুষ পঞ্চদ্বিজ হইতে যত শ্রেণী (পুরুষ) অন্তর হইয়াছেন তাহা নির্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পর আদান-প্রদান্ হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপন করেন। কিয়ৎকাল বিগত হইলে দেবীবর নামক এক ঘটক ব্রাহ্মণ বহুদিন স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে যাহাদিগকে কুলীন করিয়া লিখিলেন, তাহারাই কুলীন এবং যাহাদিগকে কুলীন পদের অযোগ্য বলিলেন, তাহারই কুলহীন হইলেন। দেবীবর বলিলেন, তাহারাই কুলহীন হইলেন। দেবীবর প্রণীত নিয়ম আজও অব্যাহত রহিয়াছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে আগত কায়স্থ পঞ্চ জনের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এই চারিজনের সন্তান কুলীন এবং দত্ত ভ্রাতৃত্ব স্বীকারে অসম্মত হন বলিয়া তাহার বংশীয়গণ কুলীন না হইয়া মৌলিক হইলেন। উক্ত পাঁচজন কায়স্থের আগমণের পূর্বে এদেশে যে সকল কায়স্থ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে আটঘর সিদ্ধ মৌলিক ও বায়াত্তর ঘর সামান্য মৌলিক হয়। শেষোক্তদিগকে সাধারণে "বাহত্তরিয়া" শব্দে কহিয়া থাকে। এই রূপে মহাত্মা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন, কায়স্থবৃন্দের শ্রেণী স্থাপন করেন। অনন্তর হোসেন সাহ যখন গৌড় দেশের সম্রাট হন, তখন তাঁহার উজীর পুরন্দর বসু পুনরায় একশ্রেণী নির্মাণ করেন।

নরনাথ বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে "কুলীন" উপাধি প্রদান করিয়া তাহাদের ভৃত্যগণকেও কৌলীন্যভূষণে বিভূষিত করিতে সমুৎসুক ও অভিলাষী হন। তাহারা আহূত হইয়া তাহার

সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? প্রথমোক্ত চারি ব্যক্তি (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র) "আমরা ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগের ভৃত্য। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিয়াছি" বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিলেন। নৃপবর তখন "তুমি ও কি দ্বিজ দাস?" বলিয়া দত্তর পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। দত্ত স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার মানসে উত্তর করিলেন মহাশয়! "ন দত্তঃ কস্যচিদ্দাসঃ সহৈতৈস্তু সমাগতঃ দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছেন। 'রাজা তচ্ছ্রবে তাহাকে নিতান্ত গর্বিত মনে করিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিতে নৃপতির স্তব স্তুতিত প্রবৃত্ত হইলেন। উদার চিত্ত নৃপকুঞ্জর বল্লাল বহুবিলম্বে তাহাকে 'অর্ধকুলীন' উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন কিছু করিতে পারেন না। এককালে না থাকা অপেক্ষা কিছু থাকাও ভাল। সুতরাং তাহাতেই আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় কুলীন বিক্রমপুরের নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। দত্তগণ কাঠালিয়ায় চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে নির্ধারণ করা সহজ নহে।

বজ্রযোগিনী

এই গ্রামে সাতাইশ উপপল্লীতে বিভক্ত। শঙ্করবন্ধ, সোমপাড়া, পুকুরপার, আটপাড়া প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেনকৃত অট্টালিকাসমূহের অনেক ভগ্ন অবশেষ লক্ষিত হয়। অধুনা তৎসমস্ত দ্বারা অনেকানেক ভদ্রমহোদয় বেশ প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন। এরূপও জনরব যে অনেকে তাঁহার সাময়িক বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অত্রত্য গুহবংশজগণ বিলক্ষণ পরিচিত সন্দেহ নাই। মৃত মহোদয় জয়চন্দ্র গুহের খ্যাতি বিষয় অনেকে অবগত আছেন।

এখানকার ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়টির ক্রমশ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। স্থানীয় সাহায্য দাতৃগণও মন্দ উৎসাহ সম্পন্ন নন। এই বিদ্যালয়ে জ্ঞান প্রদায়িনী নাম্নী একটি সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার মন্দ উন্নতি নয়।

নগর কস্‌বা

এই স্থানটি সুন্দর নগরের মতই দৃষ্ট হয়। এখানে নানা ব্যবসায়ী লোকের বাস আছে। অত্রত্য সাহাগণ বিশেষ সম্পন্ন। এখানকার সার্কেল পণ্ডিতবাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় লোকের উৎপীড়নে নিত্যানন্দ বাবুকে কাতর করিতে পারিয়াছিল না। বহুদিন পর্যন্ত ইনি সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়াও ক্রমাগত অবিচলিত উৎসাহ সহকারে সভার কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সমাজটি গতজীবিত হইয়াছে।

বজ্রযোগিনী, বেতকা, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে চৌর্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। বেতকাই চোর বলিয়াই বহুকাল প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে।

সোনারঙ

এই স্থানে বৈদ্য বংশজগণের সংখ্যাই অনেক অধিক। অন্যান্য শ্রেণীস্থ লোকেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিক্রমপুরের অধুনাতন ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় এই সোনারঙ নিবাসী। সমধিক অধ্যবসায় লক্ষিত না হইলেও ইহার অন্তঃকরণে স্বদেশানুরাগিতা ও হিতচিকীর্ষা মন্দ বলবতী নয়। অতি অল্পদিন হইল ইহারই যত্নাতিশয়ে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য অন্যান্য বৈদ্য মণ্ডলীও সাতিশয় ক্ষমতাশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের হিতসাধনে অত্যল্প মাত্র যত্নবান দৃষ্ট হন। এই গ্রামে মুন্সেফ, সদর আমীন, প্রধান সদর আমীন, কোর্ট আমীন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ইনস্পেক্টর, হেডমাস্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অনেক আছেন।

আইরল

এই স্থান অনল্প পরিসর। এখানে মুসলমানদিগের সংখ্যাই অনেক অধিক। অনেকে বলেন আইরলে সাতশত ঘর কাগজী আছে। বাস্তবিক একথা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বহুদূর হইতে "কাগজ কোটার" শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কাগজও লিখিতে মন্দ নয়। আইরলে চুনকার ও কাপলিক অল্প নহে। চুনকারগণ বেশ পরিস্কৃত চুন প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে শ্রোত্রীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। কিন্তু কায়স্থ নিতান্ত বিরল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু উমাচরণ উপাধ্যায় মহাশয় এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অল্পদিন হইল ইনি এক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রামের স্থানে স্থানে ভ্রমণ সময়ে পাদতল ইষ্টকবর্ণে প্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। ইহাতে বোধহয় পূর্বকালে এখানে অতি সমৃদ্ধিশালী কোন ব্যক্তি বাস করিতেন।

তথ্য নির্দেশ

১. "আচারে বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদান; নবধা কুললক্ষণং ॥"
২. ইহাদিগের আমূল বৃত্তান্ত স্থানান্তর উল্লিখিত হইবে।
৩. পাটাভোগ নিবাসী কালীকুমার ঠাকুর ইহার ধুরন্ধর। ইহাতে ভানকারিতা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়।
৪. ভাণ্ডারের দীনদয়াল চক্রবর্তী ইহার ধুরন্ধর। ইহাতে ভানকারিতা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়।
৫. একটি শূদ্র জাতীয়া বিধবা কামিনী কালীর অর্চনাক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।
৬. এখানে কার্তিক বারুণী নামে একটি প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।
৭. সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ব্যতীত সার্কেলগুলি (মণ্ডল বিদ্যালয়) এক একটি প্রায়ই তিন তিন পাঠশালায় বিভক্ত। সার্কেলের সংখ্যা মন্দ নহে।
৮. এই স্থান কীর্তিনাশা তরঙ্গিণীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

৯. "উদ্ভিজ্জ ও শস্য" মধ্যে যে সকল শস্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহাই এখানকার কৃষিজাত শস্য বলিয়া এখানে আর তাহাদের নাম নির্দেশ করা গেল না। কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের মুখ্যোদ্দেশ্য।

১০ অনেক বলেন, ধীসেন বল্লালেব পিতা ছিলেন। তিনি দিল্লীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

১১. বল্লালের কার্য প্রণালী দর্শন করিলে এ কথা অমূলক ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি সহৃদয়তা ও দয়ার অনল্প পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

১২. ইহাতে বোধ হয় একমাত্র বাওআদমই বল্লালের অরি ছিল। অন্য মুসলমানেরা তাহার সহিত যোগ দেয় নাই।

১২. ইহার জন্ম বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ কথা আছে। রাজবল্লভের জননী যখন গর্ভবতী ছিলেন, তখন একদা তিনি নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া স্বামীর নিকট বললেন যে হে স্বামিন! আমি দেখিলাম যেন আমার গর্ভবনে একটি চন্দ্র প্রবেশ করিল। কৃষ্ণজীবন পত্নীর এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাকে এক চপেটাঘাত কবিলেন তাহার প্রণয়িনী পতিকেঈদৃশ ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিতও একান্ত চমৎকৃত হইলেন। এবং প্রোক্ত আঘাতে মহতী যতনা অনুভব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনী প্রভাত হইলে তিনি স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কৃষ্ণজীবন বলিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে ক্লেশ প্রদান উদ্দেশ্যে চপেটাঘাত করিযাছি এরূপ মনে করিও না। শাস্ত্রে উক্ত আছে তাদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়া আর নিদ্রা যাইবে না, প্রভাত পর্যন্ত জাগরিত থাকিবে। তুমি রোদন করিয়া রজনীযাপন করিবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে ঐরূপ আঘাত দিয়াছি। তাহার স্ত্রী ইহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে নিরতিশয় শ্লাঘনীয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই গর্ভেই বিখ্যাতনামা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

১৩. কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে অনেকদিন পর্যন্ত তাহাতে পানি উঠে না। পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে "এক পুত্রবতী মাতা তদীয় পুত্র কাটিয়া রক্তদান করিলে দীঘিতে পানি উঠিবে।" কেশা তাহার মার একমাত্র পুত্র ও কৈবর্ত জাতীয় ছিল রাজাদেশে দীর্ঘিকা তটে কেশার শিরচ্ছিন্ন হয়। পুত্রবিয়োগ শোকে মাতা অধীরা হইলে তাহার শোকোপনয়নার্থ প্রভু দীর্ঘিকার নাম "কেশার মার দীঘি" রাখেন। উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

১৪ রামদাসের সাহসিকতা ও চতুরতার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রবাদ আছে তিনি নবাব ভিন্ন সম্ভ্রান্তই হউক অথবা নীচ জাতীয়ই হউক অপর সকলকে বাম হস্তে সেলাম দিতেন ও তাহাদিগ হইতে সেলাম গ্রহণ করিতেন। রামদাসের ঈদৃশ দুর্ব্যবহারে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিয়া কতিপয় প্রবাস ব্যক্তি নবাব সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করেন। রাজবল্লভ তখন দেওয়ান ছিলেন। তিনি পুত্রের তাদৃশ আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নবাব তাঁহার পুত্রকে আনয়ন জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে রাজবল্লভ রামদাসের নিকট তাহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখেন। তিনি "তাহার প্রাণবধ হইবে। এবার আর রক্ষা নাই" মনে করিয়া এককালে অস্থির ও ব্যাকুল হইলেন। এদিকে পিতার পত্র পাইয়া রামদাস অকুতোভয়ে তাহার নিকট উপনীত হইলেন। রাজা রাজবল্লভ তাহাকে দেখিয়া প্রাণনাশ হইবে বলিয়া অনেক ভয় দেখান। রামদাস বলিলেন পিতঃ! আমি তো কৃষ্ণজীবনের পুত্র নই যে, আপনার মত ভীত হইব। আমি রাজা রাজবল্লভের পুত্র। আমি কেন শঙ্কিত হইব?" পরে তিনি নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে সমস্ত ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। রামদাস নির্ভয় চিত্তে কহিলেন 'মহাশয়, আমি দক্ষিণ হস্তে আপনাকে সেলাম দি। এবং অপর হস্তে অন্যান্যকে সেলাম প্রদান

করিয়া থাকি। যদি দক্ষিণ হস্তও সাধারণের নমস্কার সময়ে ব্যবহার করি তাহা হইলে আপনাতে ও সামান্য লোক প্রভেদ কি থাকে?' নবাব হইতে শাস্তি দিবেন দূরে থাকুক প্রত্যুত বহুমূল্য এখন পরিচ্ছদ পুরস্কার দান করিলেন।

১৫. অনেকের বিশ্বাস জমিদারগণ পণ্ডিতদিগকে ধনোপচারে পূজা দিয়া বশীভূত করেন।

১৬. অনেকে বলে, সংগ্রামে রাজবল্লভ বিজয়ী হন। কেহ কেহ এই সংস্করাপন্ন দৃষ্ট হন যে জয়লক্ষ্মী চৌধুরীদিগের অঙ্কশায়িণী হন। আবার অনেকের বিশ্বাস প্রথমে একবার রাজবল্লভ ও বারান্তরে চৌধুরীগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। "নানা মুনির নানা মত।" আমরা অধিকাংশের সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্তিকপুরের চৌধুরীদিগকে রণজিৎ বলিয়া লিখিলাম।

১৭. ইহার সময়েই রাইযবর "শ্রীনগর" নামে খ্যাত হয়।

১৮. রাজনগরের প্রাচীন নাম বিল দাওনিয়া।

১৯. কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
বগলাসিদ্ধি বিদ্যাচ মাতঙ্গীকমলাত্মিকা।
ভৈরবী ছিন্নমুস্তাচ বিদ্যাধুমাবতী তথা॥
একাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধি বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

২০. চাঁচেরপাশা এখন পদ্মার গর্ভস্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাস

[প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্যন্ত]

চিত্র ও মানচিত্র সংবলিত

প্রথম খণ্ড

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ-যুগ-ধাবিত-যাত্রী,
তুমি চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত দিবারাত্রি।
—রবীন্দ্রনাথ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উৎসর্গ

যাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র সংসার আমার
নিকট ভীষণ অন্ধকারময় বোধ
হইতেছে,
যিনি আমার একটি নগণ্য ক্ষুদ্র কবিতা পাঠেও
কত না আনন্দ প্রকাশ করিতেন
এবং
যাঁহার আদেশেই মাতৃভূমির এ-প্রাচীন
ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হই
আমার সেই সরল হৃদয়, উদার ও পরোপকারী
স্বর্গত পিতৃদেব

মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুণ্য নামে

মাতৃভূমির এ-পুণ্য ইতিহাস
উৎসৃষ্ট করিয়া
কৃতার্থ হইলাম

৩০শে আশ্বিন ১৩১৬

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থকারের নিবেদন

সোনার শৈশবে মা ও দিদিমার মুখে যখন রামপালের কাহিনী শুনিতাম, সে গজারি বৃক্ষের কথা, রামপাল দীঘির কথা, বল্লাল রাজার যুদ্ধ, রানীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন, কেদার রায়ের জীবনোৎসর্গ সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম আরও শুনিতে সাধ যাইত, কিন্তু তাঁহারা আমার সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না; সেই শৈশবেই বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের পুণ্য ইতিহাস আমার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সুপ্ত বাসনা জাগরিত হইয়া আমাকে দেশের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহারি ফলে সাত-আট বৎসরের পরিশ্রমের পর নানা বাধা-বিঘ্ন ও শোক-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া এতদিনে বিক্রমপুরের ইতিহাস জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিক্রমপুরের ন্যায় প্রাচীন ও ইতিহাস-বিখ্যাত প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা, তাহা বুঝিয়াও যে কেন আমি এমন গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ছেলে মাকে ভালবাসে, মায়ের কথা শুনিতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশব-সুলভ সরলতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাসে সে মায়ের কতই না গুণ বর্ণনা করে এবং তাহাতেই তাহার তৃপ্তি হয়; তেমনি আমার মাতৃভূমির প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি মস্‌জিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মৃত্তিকাকণার মধ্য হইতে বিশ্বজননীর যে চেতনাময় আহ্বান আমাকে তাঁহারি গুণ-গানে হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল,– ইহা কেবল তাহারি বিকাশ।

এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আমার নাই এবং তাহা থাকিতেও পারে না। যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সে দেশের ইতিহাসালোচনা করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ-মধ্যে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে তাহা আমি বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি, তবে এ আশা করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, উদার হৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি সে দিকে ধাবিত হইবে না।

প্রথমে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' নামক মাসিক পত্রিকাতে 'বিক্রমপুরেব. ইতিবৃত্ত' নামে বিক্রমপুরের কতকাংশ প্রকাশিত হয়, তৎপরে 'প্রবাসী', 'জাহ্নবী', 'নব্যভারত', 'সুপ্রভাত', 'মানসী', 'ঐতিহাসিক চিত্র' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাদিতেও এতদ্‌সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে সকল প্রবন্ধাদি সংশোধিত, পরিবর্তিত ও বহু নূতন নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিক্রমপুরের সমগ্র ইতিহাস যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি, প্রাচীন কিম্বদন্তীসমূহও উপেক্ষা করি নাই। নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপ্লব হেতু ও সময়ের পরিবর্তনে বিক্রমপুরের এতদূর পরিবর্তন হইয়াছে যে, প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস অনেকস্থলে যথার্থরূপে জ্ঞাত

হওয়া অসম্ভব; দিন দিন ইতিহাসানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও নবীন সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায় ইতিহাসের প্রকৃত সত্য এখন পর্যন্তও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আর ইতিহাসের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কাজেই আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? বঙ্গগৌরব প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহই যখন দিন দিন ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কোন কথা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিক্রমপুরের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাঁহাবা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলেও বোধ হয় বিশেষ ক্রটী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। কেবল নামের তালিকাই দিতে গেলে, দুই-তিন পৃষ্ঠা হইয়া পড়িবে। তাহা পাঠে তাঁহাদেব প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা, পাঠকের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। কাজেই আমাব তাহাতে নিরস্ত হইতে হইল, এবং আমার স্বদেশী বন্ধুবর্গও সেজন্য আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন তাহাও আমার মনে হয় না।

এতদ্‌তিরিক্ত যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন' রিভিউ-র' সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. মহোদয় ও ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদাব এম. আব. এ. এস. মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধাভাজন রামানন্দ বাবু আমাকে কয়েকখানা হাফটোন ব্লক প্রদান করিয়া এবং কেদার বাবু ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দেব এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে প্রকাশিত রাজাবাড়ীর মঠের একখানা লিথো-চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। আর একজন মহাত্মার কথাও এখানে উল্লেখ না করিলে আমাব পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়. তিনি ময়মনসিংহের কালীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সাহিত্যসেবী বিখ্যাত পর্যটক শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়, ইঁহার স্নেহ-ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়। যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমাব ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত, তিনি আমার সাহায্যার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সে সকল গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এ দয়া ও স্নেহ আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

আজ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমাব হৃদয় শোকভারে নত হইয়া আসিতেছে। দু'জনেব শোক-স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে, একজন আমাব পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব, অপর আমাদের গ্রামবাসী আমাব পরম স্নেহভাজন স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমার দুর্ভাগ্য– পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহার আদেশে রচিত এই পুণ্য-ইতিহাস তাঁহার চরণকমলে অর্পণ করিতে পারিলাম না। আর প্রভাত, সে আমার ছাত্র ও সুহৃদ উভয়ই ছিল। এই বিক্রমপুরেব ইতিহাসের জন্য তাহার কতই না আগ্রহ ছিল। যেদিন বিক্রমপুরেব ইতিহাস প্রেসে দিই, সেদিন তাহার নয়নে যে উজ্জ্বল প্রফুল্লতার বিকাশ দেখিয়াছিলাম, মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আর সে

আনন্দ লাভ কবিতে পারিলাম না। প্রভাত, প্রভাতী-তারার মত তাহার অপাপ-বিদ্ধ সরল সুন্দর হৃদয় লইয়া যৌবনের বসন্ত প্রভাতে সেফালীর ন্যায় ঝরিয়া গিয়াছে। আজ দু'বিন্দু অশ্রুব তীব্র-তাড়নায় আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত ব্যথিত হইতেছে!

বহু ভাষা এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এই সামান্য পুস্তকেব ভূমিকা লিখিবার ভার লইয়া আমায় যে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-পাশে আবদ্ধ কবিয়াছেন, তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

যদি গ্রন্থ-মধ্যে কেহ কোনও ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করেন, তাহা আমাকে জানাইলে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। দেশের লোকের নিকট আশা ও উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই বিক্রমপুরকাহিনী ও বিক্রমপুরের পল্লীবিবরণ লইয়া উপস্থিত হইবার বাসনা আছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল। ইতি

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

ত্রিশ বৎসর পরে 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে ইহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়, আর এই দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইল ঠিক ত্রিশ বৎসর পরে ১৩৪৬ সনের ৩০ শে আশ্বিন তারিখে। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, আমার অনেক সময় এইরূপ একটা কথা মনে হইয়াছে বুঝিবা আমার জীবিতকালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিব না, কেন না ত্রিশ বৎসর কাল মানুষের জীবনে বড় অল্প সময় নহে।

সেই যৌবনের প্রারম্ভে ২৪/২৫ বৎসর মাত্র বয়সে যে দুঃসাহসিক কার্যে হাত দিয়াছিলাম, আবার প্রৌঢ় বয়সে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, তাই সর্বাগ্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মাথা নত করিতেছি।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' যে সময়ে প্রকাশিত হয় সেই সময়ে ঐতিহাসিক বলিয়া যাঁহারা জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আমার পিতা ও মাতা দুই জনেই "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রকাশ সম্পর্কে একান্ত উৎসাহী ছিলেন। পিতৃদেব প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমার মাতাও আজ দশ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার সাহিত্যানুরাগ, আমার জনক-জননীর স্নেহে ও উৎসাহেই পরিবর্ধিত হইয়াছিল। আজ 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে যাইয়া তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহারা পরপার হইতে আমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন বলিয়াই এই কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলাম।

১৩১৭ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার" ২য় সংখ্যায় ১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থসমূহের মধ্যে "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" নাম সর্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছিল।

সে সময়ে ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে বিবরণী লেখক অমূল্যবাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন:– "বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রচিত ইতিহাস ছিল না। পুরাণই ইতিহাসের কার্য করিত। বৌদ্ধযুগ হইতেই ইতিহাস-রচনা প্রথার প্রবর্তন হইল। কিন্তু তখনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই; তাম্রফলক বা শিলাস্তম্ভই কথঞ্চিৎ সে উদ্দেশ্য সাধন করিত। তাহার পর যখন রীতিমত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইল, তখনও বৈদেশিকদের অনুকরণেই অনুবাদ গ্রন্থ হইল, তাহার মৌলিকতা রহিল না।** কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল অনেক মহাত্মাই মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাস নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক বাঙলার কলঙ্কমোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, বস্তুতঃই তাঁহারা দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।"

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গবেষণার যে সূত্রপাত করেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব প্রেরণা বলে সঞ্জীবিত হইয়া বহু কৃতী ঐতিহাসিকের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সকল মহামনস্বী ব্যক্তিগণের নাম সর্বজনবিদিত।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস, শাখার সভাপতিরূপে "বাংলাদেশে ইতিহাস-চর্চা" নামে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাঁহারা বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধেও যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের পরিচয় দিয়া বিশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় সেই প্রবন্ধে "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উল্লেখ করিয়া আমার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

আমি কিভাবে প্রথম 'বিক্রপুরের ইতিহাস' রচনায় অগ্রসর হই সেকথা পাঠকগণ প্রথম সংস্করণের নিবেদন হইতেই জানিতে পারিবেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি" গঠিত হয়। দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় উহার প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই আমি বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঐতিহাসিক তথ্যনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তখন সময়ে সময়ে কলিকাতা আসিলে "সাহিত্য-পরিষদের" অধিবেশনে দুই-একটি প্রবন্ধ পড়িতাম এবং বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের যে কত মালমসলা পড়িয়া আছে সে বিষয়ে পরিষদ-গৃহে আলোচনা করিতাম। সে সময়ে মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর, সারদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্যোমকেশ মুস্তোফী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং অন্যান্য সুধী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ আমাকে পরম স্নেহের সহিত গ্রহণ করিতেন। আজ সে দিনের কথা মনে পড়িয়া নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে। "সাহিত্য-পরিষদের" পরম পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেন এবং মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' সেকালের সমুদয় সংবাদপত্র ও মনীষী ব্যক্তিগণ সকলের কাছেই প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

সে সময়ে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বাংলাদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করেন। স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া উৎসাহিত করায় আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হই এবং 'অর্ধ-নারীশ্বর' মূর্তি, 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করি। আমার সংগৃহীত মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় সযত্নে সংরক্ষিত আছে। মূর্তির পরিচয় কিন্তু আমার নাম তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই! তবে 'গৌড়রাজমালা'র উপক্রমণিকায় সহৃদয় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন– "বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভূমির সকল স্থানে, বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, এখনও তাহার বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই।** কিন্তু তাঁহার পুত্রপৌত্রের শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত; জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, [মুসলমান অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া]

মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তজ্জন্য, বিক্রমপুর অঞ্চলেও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথায় [অনুসন্ধান সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে] শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, অশেষ অধ্যবসায় বলে, অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন। বিবরণ মালায়, শিল্পকলায় এবং গ্রন্থমালায় তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" দুঃখের বিষয় ঐ সমুদয় গ্রন্থমালার অধিকাংশই প্রকাশিত হয় নাই।

আমি সে সময়ে এবং তাহার পূর্ব হইতেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের বহু গ্রাম পর্যটন করিয়া 'বিক্রমপুরের বিবরণ' নাম দিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে যে যে গ্রামে ঘুরিয়াছি, সেই সেই গ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ, শ্রীমূর্তি-পরিচয়, মঠ, মন্দির প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়েব অনুরোধে তাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থেব পাণ্ডুলিপি প্রেবণ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় সেই বিবরণমালা মুদ্রিত হয় নাই আর আমি সেই পাণ্ডুলিপিও ফিরিয়া পাই নাই। সে সময়ে উহাতে এমন অনেক গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, যে সমুদয় গ্রাম চিরদিনের জন্য পদ্মা-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমার আজ এই বলিয়া দুঃখ হইতেছে, যদি তাহার একটা নকল রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাকে আর অনুতপ্ত হইতে হইত না। সে সময়ে আমি নিজের ক্যামেরা দ্বারা দুই-তিন শত মূর্তি, মঠ, মন্দিরের, মসজিদের ও দৃশ্যাবলীর চিত্র তুলিয়াছিলাম, অনেকদিন পর্যন্ত সেই Negativc- গুলিও যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু একবার প্রবাস হইতে বাড়ি আসিয়া দেখিলাম সেই Negative-এর কাচগুলি পুরমহিলারা ধুইয়া-মুছিয়া পবিষ্কার করিয়া দেশীয় লণ্ঠন প্রস্তুতকারীদের নিকট ডজন হিসাবে বিক্রয় করিয়াছেন! আর এলবামের চিত্রগুলি আমার শিশু-পুত্রকে ছবি দেখাইবার অছিলায় তাহাব দ্বারা বিনষ্ট করা হইয়াছে। আজ আমার পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর একথা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য বোধ করিবে। কিন্তু ইহাই হইতেছে এ দেশের রীতি। কি আর করা!

বন্ধুবর যতীন্দ্রমোহন রায়কে আমার গৃহীত ফোটোগ্রাফ ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। সেই ব্লক কযখানি 'ঢাকার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রেসের গোলমালে আমি সেই ব্লকগুলি আর ফিরিয়া না পাওয়ায় আবার নূতন করিয়া অনেক ব্লক প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। "ঢাকার ইতিহাসে" প্রকাশিত কোরহাটির মনসা ও নৃসিংহ মূর্তিখানি দক্ষিণ বিক্রমপুরের কোনও গ্রামে এখন স্থানান্ত রিত হইয়াছে।

সোনারঙ্গ নিবাসী স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় বিক্রমপুরের একজন প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে নানা গ্রাম পর্যটন করিতেন, পর্যটনকালে তিনি বিক্রমপুর হইতে বহু মূর্তি সংগ্রহ করিয়া ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল মূর্তির চিত্র ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তৎপ্রণীত Iconography of Budhist and Brahmanical Sculptors in the Dacca Muscum নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নগরে ডালবাজারের মন্দিরে সংরক্ষিত চণ্ডী মূর্তিও বৈকুণ্ঠবাবুই রামপালের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় বলেন:

-"The unique four armed image of Chandi** was found in the ruins of Rampal in the Dacca district. It was obtained by the late Babu Baikunthanath Sena along with a number of other images, and presented to the late Babu Jivana Chandra Raya who erected a temple for this fine image and installed it there. The temple is situated on the Farasganj road of this town, a little to the east of the Northbroke Hall." এইভাবে বিক্রমপুরের নানা মূর্তি, নানা স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মহকুমা হাকিমদের মধ্যেও অনেকে ড্রইংরুম সাজাইবার জন্য অল্পবিস্তর মূর্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন কিংবা উপহারও পাইয়াছেন।

এই জন্য কাহাকেও কোন অনুযোগ দিবার কিংবা অপরাধী করিবার কারণ নাই। কেন না তৎকালে ঢাকা সহরে কিংবা বিক্রমপুরের কোথাও কোনও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। আর লোকে সে সময়ে মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাহারা 'নাক কাটা বাসুদেব' নাম দিয়া সর্বশ্রেণীর মূর্তিকেই সমতুল্য জ্ঞান করিত এবং কোন কোন স্থলে নানারূপ অকল্যাণ কল্পনা করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া অনেক মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং পানিতে বিসর্জন দিয়াছে। তারপর দেউলগুলি ও রামপাল অঞ্চল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কখনও খনন করা হয় নাই, কাজেই কত রত্ন, কত মূর্তি, কত কীর্তি, যে বিক্রমপুরের মৃত্তিকা-গর্ভে কিংবা পদ্মা-নদীর অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সন্ধান করিবে?

এখানে একটা কথা অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, বিক্রমপুরের কোনও মূর্তির চিত্রসহ প্রবন্ধ কেহই আমার পূর্বে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজ আমার হৃদয় এই বলিয়া আনন্দে ও গর্বে স্ফীত হইতেছে যে, আজ আমাদের বিক্রমপুরবাসী যে সব যশস্বী ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা নানাদিক দিয়া দেশের ইতিহাসকে জগদ্বাসীর নিকট গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছেন। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, স্বর্গত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং বহু তরুণ ঐতিহাসিক দেশের অতীত ইতিহাসকে নানাভাবে নানারূপে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

'গিরিশ-প্রতিভা' ও 'Indian Stage', ও "দেশবন্ধুর জীবনী", প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে যাইয়া 'বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী' হইতে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ফাইল দেখিতে অনুরোধ করি, হেমেন্দ্রবাবু তথায় যাইয়া যেমন নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার জন্যও তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ দেখিয়াছেন। আমি তদনুযায়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ৩১শে ভাদ্র রবিবার, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে গমন করি এবং 'সোমপ্রকাশের' ফাইল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ১২৭৩ সালের ৩০শে মাঘ, ২১শে ফাল্গুন ১২৭৩, ১২ই চৈত্র ১২৭৩, ১৯শে চৈত্র ১২৭৩, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭, তারিখে "বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক

সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নীচে লেখকের নাম নাই। আমার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া কেমন সন্দেহ হইল, মনে হইল যে, এ সমুদয় প্রবন্ধ পূর্বে কোথাও পড়িয়াছি! তাই বাড়ি আসিয়া ১২৭৩-১২৭৫ সনে জৈনসার হইতে প্রকাশিত 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাখানি খুলিয়া দেখিলাম পল্লী-বিজ্ঞানে [প্রথম ভাগ, ৮ম সংখ্যা। ১২৭৪। ভাদ্র। ইংরেজী ১৮৬৭, সেপ্টেম্বর।]" ঢাকা নর্মাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ বিরচিত 'বিক্রমপুরের বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সোমপ্রকাশের' প্রবন্ধের সহিত "পল্লীবিজ্ঞানের" প্রবন্ধের কোনও পার্থক্য নাই। যেমন "পল্লীবিজ্ঞানে", তেমনি "সোমপ্রকাশে"ও কোরহাটির অনেক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই 'সোমপ্রকাশের' ও পল্লীবিজ্ঞানের লেখক যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম। 'পল্লী-বিজ্ঞান' অতি অল্পসংখ্যক মুদ্রিত হইত, আর সেকালে "সোমপ্রকাশের" প্রচার বেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয় অম্বিকাবাবু তাঁহার প্রবন্ধ ও সংবাদ "সোমপ্রকাশে" প্রকাশ করিতেন। অম্বিকাবাবু পরে তাঁহার লিখিত এই সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "বিক্রমপুরের ইতিহাস" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পুস্তকাখানি আমার নিকট আছে।

অম্বিকাবাবুর জীবিত কালে, তিনি যখন ঢাকা গ্যাণ্ডারিয়াতে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তিনি সেকালে যে সমুদয় জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। অম্বিকাবাবুর ইতিহাস নামধেয় 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার কথার তাৎপর্য অনুভব করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে বিক্রমপুরের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা সর্বপ্রথম আমার দ্বারাই হইয়াছিল, অপর কেহই ঐদিকে তাহার পূর্বে আর অগ্রসর হন নাই। এই বিষয়টি সাধারণের জানা আবশ্যক বোধেই লিখিলাম।

"সোমপ্রকাশ" ও "পল্লীবিজ্ঞানে" প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কিংবদন্তীমূলক, কাজেই উহার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু আছে তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন।

টেলার, কানিংহাম, ডক্টর ওয়াইজ, হাণ্টার, ব্র্যাডলিবার্ট ব্লকম্যান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও অনেকটা কিংবদন্তীর উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন।

পরমপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের "Indo Aryan" নামক গ্রন্থে সেনরাজগণের বংশমালা ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তিনি লিখিয়াছিলেন-"The Chief seat of their power was at Vikrampur near Dhaka where the ruins of Bullal place are still shown to travellers." যে বল্লালসেনের কিংবদন্তী লইয়া অম্বিকাবাবু ও প্রসন্নবাবু বায়াদমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন- সেই বল্লালের সহিত যে বিজয়সেনের পুত্র "প্রত্যক্ষ নারায়ণ স্বরূপ" বল্লালসেনের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না তাহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। বর্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে বিজয়সেনের শূর বংশীয়া রানী বিলাসবতীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেনের রাজ্যকাল আনুমানিক ১১৫৯-৮৫ সাল। কাজেই ১৪৮৩ বা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত বা মৃত বাবা আদমের সহিত সেনবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বল্লালের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। স্বর্গত

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ঢাকা জেলায়, বাবা আদমের সমাধির শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি অনুসারে, উহা ৯১৩ হিজরায়, জমাদি-উস্-সানী মাসের সপ্তম দিবসে (১৫ই অক্টোবর, ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপি স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক (Dr. Theodor Bloch) কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল, ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"বিক্রমপুরের ইতিহাসের" এই প্রথম খণ্ডে মুসলমান-বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সাধারণ বিবরণ, প্রকৃতি-পরিচয়, এবং জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ অধ্যায় হইতে ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে যতদূর সম্ভব প্রাচীন পুথিপত্র, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতামত ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। খড়্গ-চন্দ্র-বর্ম ও সেনরাজবংশের সময় হইতে যে ইতিহাসের ধারা প্রাচীন বিক্রমপুরের [গৌড়-বঙ্গের] স্বাধীনতার ইতিহাসকে গৌরবব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা শুধু বিক্রমপুরবাসীর নহে, সমগ্র বাঙালী মাত্রেরই গৌরব করিবার মত বটে। বিক্রমপুরের ইতিহাস সুধু একটি পরগনার ইতিহাস নহে, ইহা বঙ্গেরই ইতিহাস। যে 'বঙ্গ' শব্দ সমস্ত দেশকে বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করিয়াছে এবং সমস্ত দেশের অধিবাসীকে বাঙালী নামের অধিকারী করিয়াছে, সে দেশের ইতিহাসই বিক্রমপুরের ইতিহাস।

দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের জীবন-বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই মহামনীষী পণ্ডিত সম্পর্কে যেখানে যাহা গ্রহণযোগ্য পাইয়াছি তাহাই উপযুক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস" এতদিন পরে প্রকাশ করিবার প্রধান কারণ, প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ভট্টাচার্য এণ্ড সন্সের দোকানখানি দৈব-দুর্বিপাকে উঠিয়া যাওয়ায় আমাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইয়াছিল। তারপর ভাবিয়াছিলাম যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করাও প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, আমাকেও নানা অবস্থান্তরের ভিতর পড়িয়া স্থান পরিবর্তন করিয়া কলিকাতা আসিতে হইল। তারপর কলিকাতায়ও স্থায়ী ভাবে বাস করিতে পারিলাম না। বাঙলা ভাষায় ছেলেদের বিশ্বকোষ 'শিশু-ভারতী' সম্পাদনের জন্য কয়েক বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুরানো দপ্তর খুলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। "বিক্রমপুরের ইতিহাস" পুনরায় প্রকাশ করিতেছি এই মর্মে সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম, কিন্তু তাহার ফলে তেমন ভাবে কোনও সাড়া পাই নাই। তাহাতেও নিরাশ না হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই সময়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং দেশহিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরম দানশীল ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত এবং কলিকাতা লাহা পরিবারের গৌরবস্বরূপ ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম, এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি, ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দানশীল এবং এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অবিনাশচন্দ্র সেন, বিক্রমপুর

সম্মিলনী সভার প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মিঃ বি, বি, চ্যাটার্জি), রেঙ্গুণপ্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি একাউন্টেণ্ট জেনারেল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, এলাহাবাদ প্রবাসী অবসর-প্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট-জজ, (চব্বিশপরগনা নিবাসী) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটি-প্রবাসী রাজা রাজবল্লভের বংশধর স্বনামধন্য রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর, স্বর্গত রায় শশাঙ্কমোহন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পালচৌধুরী, ডক্টর অমরপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত এস, দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মিঃ এস, এন, চ্যাটার্জি ব্যারিস্টার), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার কালীপাড়া), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন তালুকদার, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রমোহন পাল-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র পালচৌধুরী, বিক্রমপুর হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠাতা– শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলি, রায়বাহাদুর ভুবনমোহন গাঙ্গুলি, মিঃ কে, ডি, ঘোষ, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেন, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন, ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামেন্দ্রলাল পালচৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরহরি ভট্টাচার্য, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, বি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু গুপ্ত, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহরায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন (অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট), শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুর ভুবনমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীমান আবদুল বারি, শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল হাসিম বিক্রমপুরী, এম, এল, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ (অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট) ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামখ্যাচরণ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী, ডক্টর এন, আর, ঘোষ, পণ্ডিত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার গুহ, রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, মিঃ এস, আর, দাশ (ব্যারিস্টার), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী এম, এন, হোসেন, শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় (জমিদার ভাগ্যকূল), শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ, কুমার প্রমথনাথ রায় (ভাগ্যকূল), ডক্টর স্নেহময় দত্ত, ডক্টর আর, আমেদ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি পালচৌধুরী, ডক্টর এন, সি বারড়ী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ বল ও দক্ষিণ বিক্রমপুর নিবাসী আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাইন প্রভৃতির নাম

উল্লেখযোগ্য। এই সব দেশ-প্রাণ ব্যক্তিগণ আমার পুস্তকের অগ্রিম গ্রাহক হইয়া ও কেহ কেহ এককালীন অর্থসাহায্য-দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইঁহাদের বদান্যতা ও সদাশয়তা আমার নিকট চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিক্রমপুরের গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা তেলিরবাগ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (মিঃ পি, আর, দাশ) ব্যারিস্টার এবং স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ আমাকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিক্রমপুরের কলমা গ্রাম-নিবাসী স্নেহাস্পদ চিত্রকর ও ফোটোআর্টিস্ট শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দাস, হলদিয়া-নিবাসী শ্রীমান গোপীবল্লভ সাহা, ইছাপুরা-নিবাসী শ্রীমান ভুবনমোহন পাল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ আমার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিক্রমপুরের মঠ, মন্দির, শ্রীমূর্তি, হাট, বন্দর, লোকজন, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির প্রায় পাঁচশতেরও অধিক আলোকচিত্র তুলিয়া দিয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা চিত্রগ্রহণ করিতে যাইয়া কোথাও সযত্নে অভ্যর্থিত হইয়াছেন আবার কোন কোন গ্রামে রাত্রিতে থাকিবার স্থানটুকু পর্যন্ত পান নাই! ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া প্রান্তরে, খালে ও বিলে ভ্রমণ করিয়া ইঁহারা আমার উপদেশে নানারূপ কঠিন কার্য করিয়াছেন। এইভাবে আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এইসব আলোক-চিত্র-শিল্পীগণ দেশহিতৈষণার বশবর্তী হইয়াই চিত্রগ্রহণের কার্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আজ ইঁহাদিগকে আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি, ইঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ করুন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার এবং মাতৃভাষার উন্নতিকামী প্রখ্যাতনামা মহাপ্রাণ মনস্বী ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ শাস্ত্রী এম, এ, আমাকে সর্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ রায়, তরুণ ঐতিহাসিক শ্রীমান্ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, আমার ছাত্র শ্রীমান্ জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আড়িয়ল চিত্রশালার কর্তৃপক্ষগণ, শ্রীযুক্ত বিনোদিনীকান্ত সেন, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার সেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত, শ্রীমান্ অমূল্যপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গুহ ও মৌঃ সৈয়দ এম্‌দাদ আলী ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি দেশহিতৈষী উৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও বিবিধ তথ্য পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

আমি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহা কত বড় কঠিন কাজ! তারপর এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে কত বড় অর্থের প্রয়োজন! এইজন্য ধারাবাহিকভাবে অতি দ্রুত মুদ্রণকার্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। সময় সময় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। সেই সময়ে দেবদূতের ন্যায় আসিয়া আমার প্রীতিভাজন বন্ধু বিক্রমপুর কান্দাপাড়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, বি, মহোদয় আমাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়াছেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং কিছুতেই যেন আমি হাল ছাড়িয়া না দেই সেইজন্য কতই না উৎসাহ

প্রদান করিয়াছেন। আমরা কোথাও নিরাশ হইয়াছি, কোথাও বা সাফল্য লাভ করিয়াছি। সেজন্য আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই ইতিহাস প্রকাশের সহিত তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ ও উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। নিজের কার্যের ক্ষতি করিয়াও তিনি আমার জন্য অক্লান্তভাবে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও ছুটাছুটি করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া যশস্বী ও সুখী হউন।

আমার শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "শুভকার্যের সহায় স্বয়ং ঈশ্বর–কাজেই আপনি নিরাশ হইবেন না।" বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সাহিত্য–সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন দেখিয়া আমার প্রাণেও উৎসাহ-দীপ্তি প্রভাম্বিত হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, ঢাকা চিত্রশালা, বিক্রমপুর চিত্রশালা এবং সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত আশুতোষ–মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ায় ঐতিহাসিক গবেষণার ও অনুশীলনের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের যৌবনে এত সুযোগ ছিল না। তখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, ঢাকা মিউজিয়াম ও কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা– রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মাত্র চলিতেছিল। আমার সংগৃহীত দ্বাদশ– ভুজ– শোভিত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আজিও রমেশ-ভবনে শোভা পাইতেছে। ঢাকা মিউজিয়াম, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা, সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা এবং আশুতোষ মিউজিয়মেও আমার প্রদত্ত মূর্তি ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "গ্রীনল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই!" সৌভাগ্যক্রমে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙলার ইতিহাস লিখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রজনীকান্তের 'গৌড়ের ইতিহাস' দুই খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর রাখালবাবুর বাঙলার ইতিহাস দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ হাশয়ের 'গৌড়রাজমালা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনও 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে দুই খণ্ডে বাঙলার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদের দেশের মনস্বী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বাঙলাদেশের একখানি বৃহত্তম ইতিহাস প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়া বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প জয়যুক্ত হউক। ডক্টর রমেশচন্দ্রের দ্বারা বাঙলার গৌরব পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হউক ইহাই কামনা করি।

"বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণের ভূমিকা-লেখক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সৌভাগ্যক্রমে এই সংস্করণেও আমাকে নানাবিষয়ে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রথম সংস্করণের সহিত প্রত্যেক বিষয়েই বর্তমান সংস্করণের পার্থক্য অনুভূত

হইবে। তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বিক্রমপুর কোলাপাড়া-নিবাসী বিলাতপ্রত্যাগত চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ পশুপতি ঘোষ বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য কয়েকখানা ব্লক বিনামূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী হইতেও আমি সময় সময় গ্রন্থ ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য পাইয়াছি। শ্যামপুকুরের "সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি" আমাকে সর্বদাই প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য ১৯৩৬ সালে আরম্ভ হইয়া ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে শেষ হইল। ইহার কারণও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। রঙপুর বারের অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায়-চৌধুরী মহাশয় স্বর্গত মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। এলাহাবাদ ও কলিকাতার ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ আমাকে বিশেষ উদারতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন বলিয়াই এত বড় বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

বিক্রমপুরের ন্যায় জনবহুল প্রাচীন স্থানের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, কথা–প্রবচন, উপকথা, খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ও কৃতী ব্যক্তিগণের জীবনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সহজ নহে। এজন্য আমরা ইতিহাসের দ্বিতীয়-খণ্ডে পাল-চন্দ্র-খড়্গ-বর্ম সেনরাজদের সময়ের শাসনতন্ত্র, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য, উপাসক-সম্প্রদায়ের কথা, পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ রাজত্বে দেশের অবস্থা, সামাজিক পরিবর্তন, ধর্মসংস্কার, সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি, শিল্পের ক্রম-পরিবর্তন, সেকালের ও একালের কথা আলোচনা করিব।

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে যাইয়া যাহাতে সেখানকার লাইব্রেরী হইতে আবশ্যকীয় গ্রন্থাদি দেখিতে পারি ও আলোচনা করিতে পারি, তদ্বিষয়ে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে পত্র দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় সুধী এবং দানশীল মাহাত্মারই যোগ্য হইয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বলাইবাবু আমাকে সর্বদা পুস্তকাদি দিতে তৎপর হইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় ভোজবর্ম দেবের তাম্রশাসনের ব্লক দুইখানি ও মুদ্রার প্রতিলিপি হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেয়া কৃতজ্ঞাভাজন হইয়াছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা আমাদের বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, তিনি আমার এই ইতিহাস-প্রণয়ণে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

যাঁহারা আমার এই ইতিহাস প্রণয়নে একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ্র মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত স্মরণীয়। নগেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩১৭ সালে। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর তিনি আমার সহিত পরিচিত হন। তারপর আমি যখন 'বিক্রমপুর' পত্র সম্পাদন করি, আড়িয়লের ও হলদিয়ার কাগজীদের হস্তনির্মিত কাগজ দ্বারা "বিক্রমপুরের" মলাট মুদ্রিত করিতে থাকি তখন

তিনি সর্বদা ঐ কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন।

তিনি আমার সঙ্গে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কখনও নৌকায়, কখনও পদব্রজে ঘুরিয়াছেন, কতদিন দারুণ বর্ষা– নিশীথে আকাশ হইতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আমরা নৌকার ছইয়ের নীচে বসিয়া আছি। অন্ধকার রাত্রিতে মাঝি দিশেহারা হইয়া বন্যার প্লাবনের মুখে অজানা পথে অগ্রসর হইয়াছে, নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক পথপ্রদর্শক নগেন্দ্রলাল আমাদিগকে লক্ষ্য পথে লইয়া গিয়াছেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রলাল "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কথা জানিতে পারিয়া, আবার প্রৌঢ় বয়সে যুবজনোচিত আগ্রহের সহিত আমাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসানুরাগ একান্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত হলদিয়া 'দুর্গা পুস্তকাগার' হইতেও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। নীরব কর্মী নগেন্দ্রলালের সহায়তা না পাইলে আমি অনেক স্থানীয় সংবাদই অবগত হইতে পারিতাম না। আমি বন্ধুবরকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। "বিক্রমপুর" পত্রিকা ছয় বৎসর কাল বাঁচিয়াছিল, সেই ছয় বৎসর কাল বিক্রমপুরের গ্রাম্যবিবরণ নিয়মিতভাবে উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই ফলে বিক্রমপুরের বহু গ্রামের বিবরণ সম্বলিত বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২৬ ও ১৩২৮ সালে প্রকাশ করি উহাতে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের বহু গ্রামের বিবিধ পরিচয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ও পণ্ডিতদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথম খণ্ড আমার নিকট মাত্র দুই কপি আছে, দ্বিতীয় খণ্ড একখানিও নাই। উহার একখানি যদি কাহারও নিকট থাকে তাহা পাইলে আমি উপকৃত হইব।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'গৌড়রাজমালার' উপক্রমণিকায় একটি অতি সত্য কথা লিখিয়াছেন– "রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়, ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল সেই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান কথা– বাঙালী জনসাধারণের কথা। ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমাত্র কথা বলিলেও, অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্মবিশ্বাসই অধিকাংশ কার্যের গতি নির্দেশ করিয়াছে; ধর্মের জন্য দেব মূর্তি গঠিত হইয়াছে, দেবমূর্তির জন্য বিচিত্র দেবালয় নির্মিত হইয়াছে, দেবালয়ের প্রচলিত অর্চনাপ্রণালীর জন্য উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, দেবলোকের প্রীতিসম্পাদন আশায় জলাশয় খনিত হইয়াছে, পান্থশালা, চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রালোচনা প্রচলিত হইয়াছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে উপার্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া, দেব-কার্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার-ব্যবহার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাহায্য বাঙালীর জাতিগত পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। কোন্ পুরাকাল হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, এদেশের অধিবাসীবর্গ তাহাদিগের শিক্ষা-দীক্ষার এবং আচার-ব্যবহারের প্রভাবে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা।"

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে তথা বাঙলার ইতিহাসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে এই দিকে লক্ষ্য করা একান্ত কর্তব্য। চন্দ্র-বর্ম ও সেন রাজাদের অধিকৃত

বিক্রমপুর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মও যেমন আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তেমনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতও এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেজন্যই এত বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্তি আমরা বিক্রমপুরের সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সেই ইতিহাস সযত্নে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ বিষয়ে চিত্রাদি সহ আলোচনা করিব। এইখানে শুধু প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন দেবমূর্তির চিত্র মুদ্রিত করিয়াছি ও প্রয়োজনানুরূপ পরিচয় দিয়াছি।

আমি এই বহু ব্যয়-সাপেক্ষ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমার সহধর্মিণী ও পুত্রকন্যাগণ নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং আমার পুত্রবধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী বি, এ, পাণ্ডুলিপি লেখনে ও কন্যা কল্যাণীয়া প্রতিভা সেন এম, এ, ও জামাতা শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্র সেন এম, এ, সময় সময় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। লোনসিং নিবাসী স্বর্গত রাজবিহারী দাস মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে পত্রাদি লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তবে একথা সত্য যে, নানাকার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও আমাকেই একা সমুদয় কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা-সচিব স্বর্গত ডক্টর সত্যানন্দ রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম, এ, স্নেহভাজন সুহৃদ্ ডক্টব শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ও শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আমাকে এই ইতিহাস প্রকাশ সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের নাম স্মরণ করিতে যাইয়া আজ প্রাণের মধ্যে গভীর শোক-বেদনা অনুভব করিতেছি। কি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচনা সম্পর্কে, কি "শিশু-ভারতী"র কোনও চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে যখনই তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছি, তখনই প্রীতিভাজন বন্ধুবর স্বভাবসিদ্ধ হাস্য-শ্রীমণ্ডিত মুখে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কার্য-সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি রূপে পাটনার অধিবেশনে বলিয়াছিলেন ঃ–

"দেশাত্ম-বোধের উন্মেষের সহিত সমগ্র ভারতে আজ প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙালীও তাহার অতীত জানিতে চায়। জানিতে চায় বাঙলা দেশ কত প্রাচীন, বাঙালী জাতি কত প্রাচীন, বাঙলার সভ্যতা কত প্রাচীন-এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়।* * কিন্তু বাঙালীর ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে নাই, কয়েকটি তাম্রশাসন, ভগ্নমূর্তি বা মুদ্রার সাহায্যে যথাযথ ইতিহাস রচনা হয় না। তজ্জন্য প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান, ধ্বংসস্তূপ খনন ও পরীক্ষার প্রয়োজন।"

সমস্ত বাঙলাদেশের পক্ষে যেমন একথা-কয়টি প্রযোজ্য, তেমনি আমাদের বিক্রমপুরের পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। কিন্তু এ কার্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে? কে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী রামপালের সন্নিহিত দেউল ও পুষ্করিণী খনন করিবে? এই কার্যে

আজ যদি ভাগ্যকূলের ধনকুবের জমিদারবর্গ অগ্রসর হন, তাহা হইলে রামপালের দীঘি খনিত হইয়া, দেউলবাড়ি খনিত হইয়া আবার এক বৃহৎ ও সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশের এই মহৎ কার্যে, ইতিহাস উদ্ধারের জন্য তাঁহারা এ কার্যে অগ্রসর হইবেন কি? সে শুভদিন কি আসিবে না?

Director of Land Records-এর Personal Assistant সোনারঙ্গ-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে F. D Ascoli সঙ্কলিত "Final report on the survey and settlement operations in the District of Dacca 1910 to 1917." এবং সংস্কৃত কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় Census Report ইত্যাদি গ্রন্থ-দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। বিখ্যাত মানচিত্র প্রস্তুতকারক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীবিক্রমপুর রামপালের মানচিত্রখানি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রীতিভাজন বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কৃতী সন্তান। তাঁহার ছাত্রজীবন হইতেই আমার সহিত তাঁহার পরিচয়। বিক্রমপুরের ইতিহাস সংগ্রহে, মূর্তি পরিচয়ে এবং নব নব তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ ও "Iconography of Budhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকটই সুপরিচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে যেমন সাহায্য পাইয়াছি, তেমনি চিত্র ইত্যাদি দ্বারাও তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। বিক্রমপুরের এই সুসন্তানকে আমি অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। ১৩৩৮ সালের ৩রা শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় "বিক্রমপুর" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ভূতত্ত্ববিদ্ মনস্বী পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয়। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার লিখিত ভূমিকায় আমার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কতকগুলি বিষয়ে আমি হিমাংশুবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে ১৩৪১ সালের ২৯শে ভাদ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে :–

আপনি "বিক্রমপুরের ইতিহাস" লিখিয়া আমাদের বিক্রমপুরের যুগ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। বিক্রমপুরবাসী স্বয়ং আপনার নিকট ঋণী। আমার বইখানা প্রণীত নয়-ইহা সঙ্কলিত। ইহা আপনার নাম সর্বত্র আদর্শ রাখিয়া লিখনী সঞ্চালন করিয়াছি– বোধ হয় লিখিত উপক্রমণিকার তিন পৃষ্ঠায় দেখিয়া থাকিবেন। আপনার আদেশ ও অনুমতি পত্র পাইয়াই আপনার পুস্তকসমূহ হইতে উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছি।* * ইত্যাদি।"

বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে, বিক্রমপুর পত্রিকা ১৩২০ সাল হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। কেদার রায় (বার–ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠবীর) বিক্রমপুরের বিবরণ দুই খণ্ড প্রকাশের তারিখও ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি। আমার পুস্তকাদি ও বিক্রমপুর বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে হিমাংশুবাবু 'বিক্রমপুর' প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। জানি না ইহার প্রয়োজনীয়তা কি ছিল!

আমি যে সকল বিদেশী ও স্বদেশবাসী গ্রন্থকারের রচনা হইতে সাহায্য পাইয়াছি, এই সুযোগে আন্তরিকভাবে তাঁহাদের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার একান্ত অনুরোধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপির অনুবাদ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। উহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। ঐ লিপি ও তাঁহার বঙ্গানুবাদ ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে করি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমার লিখিত যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাকে সে সকল ব্লক প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। আশা করি সুধীবর্গ এবং আমার দেশবাসী গ্রন্থখানির প্রতি সহানুভূতির সহিত দৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণে যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হইবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিক্রমপুর সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি রূপে ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে ডোমসার গ্রামে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার মনে হয় দেশবন্ধুর এই বাণী প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী স্মরণ করিয়া ধন্য হইবেন ও গর্ব অনুভব করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন :-

"যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখনি মনে করি, আমি বিক্রমপুরবাসী, তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায়– আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব, যাহা সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়; এই যে স্মৃতি, যাহা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে; এই ভাবও এই স্মৃতিকে সর্বদা জাগ্রত দেবতার মত আমাদের হৃদয়-মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।** যেমন সমস্ত বাঙালা দেশের একটা চিরন্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরেরও সেইরূপ একটা বিশিষ্ট বাণী আছে। আমরা কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতে চাই। যে বাণী শুধু আমাদের জন্যে। কর্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সে বাণী বুঝা চাই– শুনা চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই।"

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে বাঙলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, এখনও এদেশের ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। একথা আমরা শিরোধার্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি; বাঙালার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্বের খনি আছে– তাহার মূল্য কে না স্বীকার করিবে? সেই লুপ্ত রত্নোদ্ধার করা বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। আমরা একথাও মানিয়া লইতেছি যে, এই মূল্যবান উপকরণ-রাশি সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এদেশের কোন ইতিহাসই পূর্ণাঙ্গ হইবে না। অন্যদেশে সাধারণত গভর্নমেন্টের সাহায্যে এইরূপ সংগ্রহকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, এদেশের সরকার যে সেরূপ কিছু করেন নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ব্যাপার লইয়া তাঁহারা এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে,

অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমরা গভর্নমেন্টের নিকট সেরূপ কোন উদ্যমের সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

আমাদের জাতীয় উদ্দীপনা অনেক সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলন্ত ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়া অকালে নির্বাপিত হইয়া যায়। দেশের কোন গঠনমূলক কার্যে জাতীয় সাহায্য দুর্লভ। এদেশে এমন কোন সহানুভূতিপরায়ণ শিক্ষিত বড় লোক নাই, যাঁহারা লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। কিছুদিন হইল লালগোলার মহারাজা ও দীঘাপাতিয়ার মধ্যম কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় বঙ্গদেশের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ধ্বংস-স্তূপ ইত্যাদি খনন করিয়া এইরূপ কার্য বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিচালনা ও সম্পাদন করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা কে দিবেন?

সুতরাং ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ নিঃশেষ করিয়া বাঙলার ইতিহাস লেখা শুরু করিতে হইলে সেরূপ ইতিবৃত্ত আর লিখিত হইবে না, আমাদের মিউজিয়ামগুলির দ্বারদেশে তীর্থকাকের মত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এদিকে শত শত কাগজপত্র ও প্রাচীন দলিল এবং পুঁথি বৎসর বৎসর অগ্নিদাহে, শিশু ও কীটদিগের অত্যাচারে, জলপ্লাবনে ও কুসংস্কারের কবলে পড়িয়া ধ্বংস পাইতেছে। একদিকে বৃথা আশার কুহকে প্রতীক্ষায় সময় খোয়াইয়া আমরা নিঃস্ব হইব, অপর দিকে যাহা হাতে আছে তাহা উপেক্ষা করিয়া হারাইব। ইতিহাস-লক্ষ্মীর কে পূজা করিবে? সংস্কৃত শ্লোকে আছে, মধুর অভাবে গুড় ও বিল্বপত্রের অভাবে দুর্বাদল দিয়া পূজা সারিতে হয়। এক্ষেত্রে পূজারীরও তাহাই করিতে হইবে। তিনি কুশাসনে বৃথা বসিয়া থাকিতে পারেন না।

আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সূক্ষ্মদর্শীর কাছে তাহাও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে; প্রতি বৎসরই নূতন তথ্য আবিস্কৃত হইয়া প্রাচীন সিদ্ধান্তের স্বল্পতা ও ক্রটী-বিচ্যুতি প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া বনমার্জারেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই, সেতুবন্ধনের সময় তাহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তির সম্যক প্রয়োগ করিয়া সেই মহাকার্যের সহায়তা করিয়াছে। আমার এই ইতিহাসের সমগ্র অভাব ও ক্রটি আপনারা সেই চক্ষেই দেখিবেন। আমি এই ক্ষেত্রে ঐরাবত হস্তী নহি, সামান্য কাঠ-বিড়ালী মাত্র,- আপনারা এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিবার সময় সেই কথাটি ভুলিবেন না। বরং ইহার পরে যদি কোন ঐতিহাসিক মৎ সংগৃহীত উপাদান হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সৌধ নির্মাণ করেন, তবেই আমার সমগ্র শ্রম সার্থক মনে করিব।

দ্বিতীয় খণ্ড 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' শীঘ্র প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। বিস্তারিত নির্ঘণ্টও দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত মুদ্রিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মুন্সীবাড়ি-মহেন্দ্র কুটির, পোঃ মূলচর- ঢাকা

পি ৬৫১এ, মহানির্বাণ রোড, পোঃ কালীঘাট,

৩০ শে আশ্বিন ১৩৪৬, ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৯

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি-পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য– রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিক্রমপুরে স্বাধীন বর্মরাজগণ– রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীন সেনরাজবংশ– বিজয়সেন– বিক্রমপুর

অষ্টম অধ্যায়

সেনরাজত্বের শেষযুগ– মুসলমান-বিজয়

নবম অধ্যায়

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর– রামপাল

চিত্রসূচি

মানচিত্র

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য**– রঘুরামপুর খননে প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির চিত্র অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্রের Negatives হইতে পরিগৃহীত। শ্রীমান পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণে) প্রুফ দেখিতে সময় সময় সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।]

বিক্রমপুরের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর

বৈদিক যুগ ও বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব

বৈদিক যুগে যখন আর্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্বে পবিত্র-লিলা গঙ্গা-যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে তুষার মণ্ডিত শুভ্র হিমালয় পর্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে সিন্ধু-সঙ্গম পযন্ত প্রকৃতির এই লীলানিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্যাবর্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্বে এই সকল স্থান অনার্য-অধিবাসীদের কর্তৃক অধিকৃত ছিল। আর্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বৈদিক যুগে আর্যগণ আর্যাবর্তে বাস করিতেন বলিয়া যে ইহার বহির্ভূত, অন্য কোন প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহা নহে, কারণ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২/১/৩) সর্বপ্রথমে বঙ্গ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।

বঙ্গা– বগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি ॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, মগধবাসিগণ এবং চের জনপদবাসীগণ, এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্বলতা, কি দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবত সদৃশ।

বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ্য

ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐতরেয় অরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চের– এই তিন জাতিকে আর্যগণ দৌর্বল্য, দুরাহার ও বহু অপত্যতার জন্য কাক, চটক ও পারাবতের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম। মগধ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। বগধ হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা বগধ ও চের অর্থে বগধ নামক জাতি এবং চের জাতি, অথবা দেশ-বিশেষের নাম কিনা সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই তিনটি শব্দের অর্থ 'বঙ্গ' জাতি, 'বগধ' জাতি ও 'চের' জাতি। বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকেই প্রথম পাওয়া যায়।

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বৈদিকসাহিত্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব– এই চারি বেদের প্রত্যেক বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুইটি প্রধান ভাগ।

বেদের **মন্ত্র** ভাগ **সংহিতা** নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র এবং অন্ধ্রগণকে শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত দস্যুজাতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। যথা:

এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিরা ইত্যু দন্ত্যা বহবো ভবন্তি বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা।৭/১৮

অথর্ব-বেদ-সংহিতা

অথর্ব-বেদ-সংহিতার পঞ্চম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে। তাহাতে এইরূপ আছে, যে জ্বর আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে, সেই জ্বর মগধ ও বঙ্গদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করুক। অথর্ব-বেদ-সংহিতা অনেকটা পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া কিথ্ (Keith) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্বতবাসী বর্বর জাতিনিচয়কে শবর, পুলিন্দ, প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানকালে এই সকল জাতি সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে পরিচিত। শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত একত্র দস্যুর সামিল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে পুণ্ড্রগণ অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ শবর, পুলিন্দদের মত বর্বর ছিলেন এইরূপ মনে করিতে পারা যায় না।

কল্পসূত্র ও বাংলাদেশ, আর্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বঙ্গ-বিদ্বেষ

বয়স হিসাবে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের পরে সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বেদাঙ্গের অন্তর্গত **কল্পসূত্র**। বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ **পুণ্ড্র, বঙ্গ** এবং **কলিঙ্গগণের** দেশে গমন করে, তবে তাহাকে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলা এবং পুরীর দক্ষিণে অবস্থিত গঞ্জম জেলা প্রাচীনকালে **কলিঙ্গ** নামে পরিচিত ছিল। কলিঙ্গ দেশ উড্র, কোলিঙ্গ (আধুনিক গঞ্জাম) মুখ্য কলিঙ্গ ইত্যাদি ভাগে সম্মিলিত ছিল। একটি মহানদী ও দমোদর নদের মধ্যবর্তী অংশ ও অপরটি মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভাগ। পুণ্ড্র-বঙ্গ-যাত্রীর জন্য বৌধায়নের এই প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও আছে। সুতরাং শ্রুতির বা বেদের এবং স্মৃতির বা ধর্মশাস্ত্রের বচন-বিচার করিলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক সময় আর্যবর্তের অন্যান্য ভাগের লোকেরা **বাঙলার অধিবাসিগণকে বর্বর** মনে করিত এবং বাঙলায় যাওয়া-আসা পাপজনক মনে করিত।

শ্রুতি-স্মৃতি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের শাস্ত্র। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ, যাহারা ধর্মবিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতির অনুসরণ করে না তাহাদের) শাস্ত্রও দেখা যায়, প্রাচীনকালে একদিকে বিহার (মিথিলা, মগধ, অঙ্গ) এবং অন্যদিকে বাঙ্লা (পুণ্ড্র, সুহ্মা, বঙ্গ) এই দুই দেশের লোকের মধ্যেও বিশেষ পরিচয় বা যাওয়া-আসা ছিল না।

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকির রামায়ণের বয়স আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ এবং মহাভারতের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। এই দুই গ্রন্থেও বঙ্গের নাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে

বঙ্গদেশের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বঙ্গকে ছোটজাতি বলিয়া মনে হয় না, কেননা সেখানে বিদেহ, মলয়, কাশী, কোশল, প্রভৃতি বড় বড় জাতির সহিত উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা:-

সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলয়ান্ কাশিকোশলান।

মগধান্ দণ্ড-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ ॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ৪০ অঃ । ২৫ শ্লোক।

মহাভারতের আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রায় প্রতি পর্বেই বঙ্গের উল্লেখ আছে। এবং কেন এদেশের নাম বঙ্গ হইল সে উপাখ্যানও রহিয়াছে।

বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে লিখিত আছে, যিনি আরট, কারস্কর,পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণূন দেশে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়।

মনুসংহিতায়ও বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনুর মতে–

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র–মগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছণ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গে আছে– আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে, সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন এবং ঐ সকল জনপদে অজাবিক, ধন ও ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে। তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব।

বলিরাজার পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মা। অঙ্গের নামে **অঙ্গদেশ**, বঙ্গের নামে **বঙ্গদেশ**, কলিঙ্গের নামে **কলিঙ্গদেশ**, পুণ্ড্রের নামে **পুণ্ড্রদেশ** ও সুহ্মের নামে **সুহ্মদেশ**।[১]

মহাকবি ভাসের কাব্যে, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে, পাণিনির বৃত্তি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতিতে, গৌড়–বঙ্গের নামের উল্লেখ আছে। এই ভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে **বাঙলা দেশের প্রাচীনত্বের কথা জানিতে পারি**। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবতেও বঙ্গের নামোল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ এবং পৌরাণিক যুগ– এই তিন যুগ হইতেই বঙ্গের নাম সুপরিচিত। কিন্তু সে কালে বঙ্গের সীমা কিরূপ নির্দিষ্ট ছিল, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন।

১. মহাভাবতে লিখিত আছে– মহারাজা বলি দীর্ঘতমা নামক মহর্ষির ঔরসে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাব গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মা। ইহাদের নামে পাঁচটি দেশের নাম হইয়াছে। দীর্ঘতমা বেদোক্ত বিখ্যাত ঋষি। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা দেবীকে বলিতেছেন :–

"অঙ্গ বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতাঃ

তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।

মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪/৫০

এই আখ্যানটি পরবর্তী কালে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়!

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙলার অধিবাসী তাম্রলিপ্ত,পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতির লোকেরা সে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা অনার্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙলা সে সময়ে অনার্য ভূমি। এবিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

৩২৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর (Alexander) যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে 'প্রাসিই' এবং 'গণ্ডরিডয়' নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ পৌছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্ত লেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে 'গণ্ডরিডয়' সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা সুকঠিন।[১]

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রিক্‌দূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র নগরে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগরে যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিস্ তাহাকে 'প্রাসিই' (প্রাচ্য) বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্ব দিকে 'গঙ্গরিডি' নামক আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রিক্ লেখকগণের উল্লিখিত "গঙ্গরিডয়" এবং "গঙ্গরিডি" অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন।[২] ডিওডোরস্ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,– গঙ্গা নদী– "গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব-সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডইনিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণ-হস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গরিডইগণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তি-নিচয়কে ভয় করে।[৩] বাঙ্গলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা এখন "রাঢ়া" নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ "সুহ্ম" নামে পরিচিত ছিল। 'রাঢ়া' নামটিও প্রাচীন "আচারাঙ্গ-সূত্র" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১/৮/৩) "লাঢ়া" বা রাঢ়াদেশ উল্লিখিত আছে। "গঙ্গরিডই" রাজ্য যে রাঢ়াদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়াদেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙলার অপর দুইটি বিভাগ,– পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ,– নিশ্চয়ই, "গঙ্গরিডই-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও এই মতের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।[৪]

আমরা এ সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যে 'বঙ্গ' দেশের নাম পাই– সে সময়ে বঙ্গ পূর্ববঙ্গকেই বলিত। পূর্ববঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব বা প্রাচীন বঙ্গ অথবা পূর্বদিকে অবস্থিত দেশকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে যে বঙ্গ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশের নাম হইয়াছে, তাহা বঙ্গ সমতট বা পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইতেছে।

মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গরাজ্য এবং ইহার রাজা সীহবাহুর উল্লেখ আছে। সীহবাহুর পুত্র বিজয়, লঙ্কায় একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মিলিন্দপ্রশ্ন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নাবিকেরা নৌযানে বঙ্গদেশে গমন করিত। "অঙ্গুত্তর নিকায়" গ্রন্থে

১. McCrindle's Invasion of Alexander the Great (Westminister, 1893).
২. McCrindle's Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (Calcutta, 1877).
৩. McCrindle's Megasthenes P. P. 33-34.
৪. গৌড়রাজমালা–১-২ পৃষ্ঠা– রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত।

বঙ্গজাতির উল্লেখ আছে। 'দীপবংশ' গ্রন্থেও এই বঙ্গজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ এবং আধুনিক পূর্ববঙ্গ অভিন্ন। পূর্বে ইহা সমস্ত দেশকে বুঝাইত না, যেমন বর্তমানে বুঝায়।[১]

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত (সমতট-ডবাক্-কামরূপ-নেপাল কর্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত নৃপতিভিঃ) প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ কর্তৃক ("সর্বকর দানাজ্ঞা-করণ প্রণামাগমন-পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য") সর্বকরদান-আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এতদিন পর্যন্ত 'ডবাক্' বলিতে ঢাকাকে বুঝাইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ডবাক্ বলিতে কামরূপের অধিকাংশ প্রদেশকে বুঝাইত। সমতট (বঙ্গ) এবং ডবাক্ ব্যতীত বাঙলার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র (বরেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ এবং রাঢ়) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।

সমতট বিক্রমপুর

বিক্রমপুর সমতটের অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধযুগে পূর্ববঙ্গকেই সমতট বলা হইত। এখন কথা হইতেছে সমতট বলিতে পূর্ববঙ্গের কতটা ভূ-ভাগকে বুঝাইত। নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্‌চায়ঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখন বিক্রমপুর সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থানসমূহের অন্তর্ভূত ছিল। সে সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত ছিল :

১. চম্পা– ভাগলপুর জেলা।

২. কাজঙ্গলা– সাঁওতাল পরগনার উত্তর-পূর্ব সীমা, রাজমহলের চারি দিকের অংশ লইয়া অবস্থিত ছিল।

৩. পুণ্ড্রবর্ধন– মালদহের কতকাংশ, এবং রাজশাহী ও বগুড়া জেলা।

৪. সমতট– যশোহরের কতকাংশ, ফরিদপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলা। 'সমতট' সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

৫. তাম্রলিপ্ত– চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।

৬. কর্ণ-সুবর্ণ– বর্ধমান জেলার উত্তরাংশ এবং মধ্যভাগ ও সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা। ইউয়ান্‌চায়ঙ্গ তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে সে সময়ে ঐ সব রাজ্যে কে কে রাজত্ব করিতেন, সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।[২] মিঃ বিভারেজ

---

১. বৌদ্ধযুগের ভূগোল–৪২ পৃষ্ঠা। ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম, -এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি.
We learn from the Classical writers that the country of Gangaridae, i. e., Bengal, formed a part of the dominions of the king of the Prasi, i. e., Magadha, as early as the time of Agrammes, i. e., the last Nanda king. A passage of Pliny clearly suggests that the "Palibothri" dominated the whole tract along the Ganges. That the Magadhan kings retained their hold on Bengal as late as the time of Asoka is proved by the testimony of the Divyavadana and of Hiuentsang who saw stupas of that monarch near Tamralipti and Karnasuvarna (in West Bengal), in Samatata (East Bengal) as well as Pundravardhana (North Bengal) Kamrupa (Assam) seems to have lain outside empire. The Chinese pilgrim saw to monument of Asoka in that country. Political History of Ancient India by Dr. H. C. Roy Chowdhury, M. A. Ph. D. Page 210-11.

২. Imperial Gazetteer of India P. 360.
'বান্ধব'–ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮৯

তৎপ্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, সমতটাখ্যার পূর্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল দুই-একটি দ্বীপের ন্যায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রণীত "তবকাৎ-ই-নাসিরি" নামক পুস্তকে সমতটকে কোন স্থানে সনকট, কোথাওবা সাকাট বা সকাট এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সমতট সম্বন্ধে বিভিন্ন যত প্রকারের মতই হউক না কেন, বিক্রমপুর যে সমতটের অন্তর্ভূত ভূ-ভাগ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, সোনারগাঁ, ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানসমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহারও অতিপূর্বে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্বজন পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহু পরে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুর নাম কতদিনের প্রাচীন

এখন দেখিতে হইবে বিক্রমপুর নাম কত দিনের প্রাচীন? বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। কিংবদন্তীর সহিত ইতিহাসের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই! আমরা তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম যে সময় হইতে পাইতেছি সে সময় হইতেই বিক্রমপুরের নামের প্রাচীনত্ব নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি। তথাপি আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য কিংবদন্তীমূলক 'বিক্রমপুর' নামোৎপত্তির কাহিনীও এখানে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম। এগুলি যে একেবারেই প্রমাণসহ নহে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে "বিক্রম-ভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ" ইহাও অন্যতর।

বিক্রমপুরের সর্বত্র এইরূপ একটি জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভ্রাতা ভর্তৃ-হরির সহিত কোন কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হয়, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের উপর রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্তী সমতট প্রদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ 'বিক্রমাদিত্য' বলিতে আমরা কাহাকে বুঝিব? ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত আর এক জন বিক্রমাদিত্য ছিলেন না![১]

১. Hunter's statistical account of Bengal P. 118.

"বিপ্রকুলকল্পলতিকা" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ নিভুজসেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বঙ্গপ্রদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগর স্থাপয়িতা।[১] 'বিপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তির মধ্যে যে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা মনে হয় না। কেননা সেনবংশীয় নৃপতিদের যে বংশতালিকা আমরা তাম্রশাসন ইত্যাদির অনুসরণ করিয়া পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, 'বিপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তি প্রমাণসহ নহে।

কেহ কেহ বিক্রমাঙ্ক চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সংস্রবে টানিয়া আনিতেছেন। এই বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করিয়া বিক্রমপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই তাঁহাদের মত। বিহ্লন, চালুক্য বিক্রমাদিত্যের যে জীবনচরিত প্রণয়ন করেন, তাহার নাম বিক্রমাঙ্কচরিত। গৌড় ও কামরূপ অভিযান ব্যতীত তাঁহার সেনাপতি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জর, চের ও চোলপতিকে, চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্তৃক 'বিক্রমপুর' নামক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই হইতেছে ইঁহাদের মত। বিক্রমাদিত্য বিক্রমাঙ্ক (১০৭৬-১১২৬) পর্যন্ত রাজত্ব করেন, কাজেই ইঁহার সহিত বিক্রমপুর নামোৎপত্তির যোগ থাকিতে পারে বলিয়াও অনেকের অনুমান। এই অনুমানের মূলে কোন সত্যই নাই, কেন নাই তাহাও আমরা বলিতেছি।

বিক্রমণীপুর বিক্রমপুর

সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা **'বিক্রমণীপুর'** নাম দেখিতে পাই, বিক্রমণী হইতে বিক্রমপুর নামও হইতে পারে। এইগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। আবার কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, **বিক্রমপুরী-বিহার** হইতে বিক্রমপুরের নাম হইতেছে। তেঙ্গুরের মতে বিক্রমপুরী-বিহার বঙ্গদেশে (মগধের পশ্চিমে) অবস্থিত ছিল। নামের মিল দেখিয়া মনে হয় যে, উহা পূর্ববঙ্গের (ঢাকা বিভাগ) বিক্রমপুর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এবং জায়গাটির নাম, বিহারটির নাম দুই-ই ধর্মপালের বিক্রমশীলার অপর নাম হইতে হইয়াছিল। এই ধর্মপালই বাঙলাদেশের একমাত্র রাজা, যাঁহার বিক্রমশীলদের নাম ছিল এবং তিনি যে পূর্ববঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এই বিষয়ে কোন ও সন্দেহ নাই।[২]

১. পল্লীবিজ্ঞান- প্রথমভাগ পঞ্চম সংখ্যা। ১২৭৪। জ্যৈষ্ঠ। ইংরাজী ১৮৬৭, জুন। ঢাকা কলেজের ছাত্র বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ বিরচিত রামপালের বিবরণ ৯ পৃষ্ঠা।

২. The vihara of vikrampuri, which according to the *Tangyur* was situated in Bengal which is to the west of Magadha *(Vihara de Vikrampuri du Bengale, dans le Magadha oriental)*, appears from the coincidence of names to have been located in Vikrampura of East Bengal (Dacca District). It also appears plausible that both the tract and the Viahara received their names from that of Dharmapala. Alias Vikramsila, the only known king of Bengal with the appellation of "Vikrama" who again had for certain exercised his imperial sway over East Bengal (Indian Culture-Buddhist Viharas of Bengal-Vol I No 2. Nalininath Das Gupta Page 230)

এখন কথা হইতেছে যে, বিক্রমপুরী-বিহারের চিহ্ন কোথায়? বিক্রমপুরের নানা স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা যদি এখন বিক্রমপুরের স্তূপগুলি এবং দেউলবাড়িসমূহ খুঁড়িতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে সন্ধান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। ধর্মপাল বাঙালী রাজা ছিলেন, তিনি বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন; এই বাঙালী বীর-সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমান্ত প্রদেশ গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মবলম্বী ছিলেন– তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরী-বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই বিক্রমপুরী-বিহারেই কুমারচন্দ্র, যিনি আচার্যঅবধূত নামে পরিচিত, যিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক টিকা করিয়াছিলেন, তিনি ঐখানে বাস করেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের স্তূপ, মাহেঞ্জোদোরের অপূর্ব আবিষ্কারের মত যে ঐতিহাসিক কীর্তি ও গৌরব প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি বিক্রমপুরের স্তূপগুলির খনন-কার্য পরিসমাপ্ত হইলে বাঙলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন, শ্যামলবর্মার তাম্রশাসন ও সেনরাজাদের যে সকল তাম্রশাসন আমরা পাইয়াছি তাহাতে বিক্রমপুরকে, **'শ্রীবিক্রমপুর'** নামে অভিহিত দেখিতে পাই। শ্রীবিক্রমপুরের নাম একজন বাঙালী রাজাই দিয়াছিলেন এই বিশ্বাস আমাদিগকে আনন্দ দেয় এবং তাহার প্রমাণও উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই নবম শতাব্দী হইতেই আমরা বিক্রমপুরের নাম পাইতেছি। বিক্রমাঙ্কচালুক্য কিংবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির নাম হইতে শ্রীবিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে– এইরূপ সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা সন-তারিখের বিচারের দিক দিয়াও বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাঙ্কচালুক্যের রাজত্বকালের পূর্ব হইতেই **'বিক্রমপুর'** নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন আমাদিগকে বিক্রমপুরী বিহারের অনুসন্ধান করিতে হইবে। সে অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হওয়ার আশা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কাজেই নদী-মেখলা-বন-রাজিনীলা রম্যাভূমি আমাদের জন্মভূমি **শ্রীবিক্রমপুর**, –এই গৌরবময় নামে কবে কোন্ যুগ হইতে আখ্যাত হইতে থাকে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন।

গৌড়দেশ ও বিক্রমপুর

এখানে গৌড় দেশের কথা বলিতেছি। কেননা গৌড়দেশ বলিতে সেকালে এক বিস্তৃত দেশকে বুঝাইত। বিক্রমপুর গৌড়দেশের অন্তর্ভূত ছিল কিনা এখানে প্রসঙ্গত সে বিষয়ের আলোচনা করিব। বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগকে প্রাচীন কালে **'গৌড়'** বলা হইত। আবার 'গৌড়' শব্দ জনপদ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে যথা,

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, ৯৬২– ৯৭০ । Phayre's History of Burma p. 138 and J.A.S.B.1868 P. 107 Patikera-ka is alone responsible for at once reminding one acquianted with the old Bengali ballads, celebrating the doings of king Gopichandra or Govichandra of the city of Patikara in Bengal. *** Sir Arthur phayre identifies in with "Vikrampura" which was near Dacca.

"দেবকুল" শব্দ হইতে "দেউল" শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। 'দেবকুলিকা' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিলহর্ন 'দেবকুলিকাকে' ক্ষুদ্র দেবমন্দির (Small temple) বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। –গৌড়লেখমালা–ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন – ২৫ পৃষ্ঠা।

মৎস্য, লিঙ্গ, কূর্ম, বায়ু, আদিপুরাণে ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' গৌড় নামটি পাওয়া গিয়াছে। গৌড়দের আদিম নিবাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'গৌড়' নামের দ্বারা ভাগলপুরের পূর্বস্থিত রাজমহল পর্বতমালার অপর পারের দেশকে বুঝাইত। এই দেশটি অনেকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল– যথা, পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা) সমতট (আধুনিক ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা) তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক)। মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার হরাহা লিপিতে গৌড়দিগকে 'সমুদ্রাশ্রয়' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সমুদ্র তাহাদের আশ্রয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা সামুদ্রিক জাতি ছিল। কালিদাসও বাঙালীদিগকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ রণতরী ছিল তাহাদের যুদ্ধের সাধন। তাহারা জলপথে রণপোতের সাহায্যে যুদ্ধ করিত। সেকালে বাঙালীরা জাহাজে করিয়া জলপথে অনেক দূর দেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত যাওয়া-আসা করিত। আবার তাহারা সমুদ্রপারে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল। সিংহল, যবদ্বীপ, ব্রহ্ম, শ্যাম, প্রভৃতি দেশে এখনও তাহাদের সে সমুদয় প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। তাহা ফরিদপুরে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে তিনজন স্বাধীন রাজার কথা জানিতে পারা যায়। ইহাদের নাম ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। এই তিনজন রাজার রাজ্য-সীমার বিষয় কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না– সম্ভবত তাঁহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তর ও মধ্যবঙ্গেও শাসন করিতেন। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্যের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই যে, সমাচারদেব ধর্মাদিত্যের পূর্বে অথবা গোপচন্দ্রের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এই তিনজন রাজা ছাড়া জয়নাগ নামক আর একজন গৌড়াধিপের বিষয় লিপি-প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। জয়নাগ মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল। আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে একজন জয়নাগ নামক রাজার উল্লেখ আছে। মনে হয় লিপির জয়নাগ ও গ্রন্থোক্ত জয়নাগ অভিন্ন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙলা দেশ অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। এবং এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশটি প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছিল।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের যে তিনজন স্বাধীন রাজার নাম পাই তাঁহারা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহাদের রাজ্য উত্তর ও মধ্য বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহাতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিক্রমপুর সেই সময়ে গৌড়দেশের অন্তর্গত থাকিলেও স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন ছিল। – বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ও তন্ত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন এই বিক্রমসেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন বিক্রমপুর। এই বিক্রমসেন বিপ্রকুলকল্পলতিকা গ্রন্থে উল্লিখিত বিক্রমসেন কিনা বলা

কঠিন। বিক্রমপুর নাম কথাসরিৎসাগরেও পাওয়া যায়। বিক্রমসেনের সহিত বিক্রমপুর নামের ইতিহাস যদি আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ নাও করি, তথাপি বাঙলা দেশ বা বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা পূর্ববঙ্গের স্বাধীন রাজ্য যে সুবিস্তৃত গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এ সত্য আমরা সহজ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারি। পরবর্তীকালে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত।

বিক্রমপুরের চারিদিক বেড়িয়াই নদী। নদ-নদী বেষ্টিত এই উচ্চ ভূমিতে যে সকল রাজবংশীয়েরা রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডাক্তার শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন,- হরিকেলামণ্ডলের ভাবী ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া সর্বপ্রথম যিনি এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, রাজধানীর নাম তিনি বর্ধমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হরিকেল রাজলক্ষ্মীর আধার ছিলেন যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্রের অদ্যাবধি চারিখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনগুলির আবিষ্কার স্থান এবং ঐগুলিতে উল্লিখিত গ্রামের অবস্থান পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলা লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। তাঁহারই তাম্রশাসনে রাজধানীর নাম প্রথম **বিক্রমপুর** বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।"-আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে রাজধানীর যে উল্লেখ পাই, সেই বিক্রমপুর নাম হইতে সমগ্র ভূ-ভাগের নাম বিক্রমপুর হইয়াছে বলিয়া আমরা নির্বিবাদে প্রামাণিক সত্য রূপে গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীচন্দ্রদেবের পরে বর্মরাজগণ প্রায় এক শতাব্দীকাল এবং সেন বংশীয় নৃপতিরাও প্রায় এক শতাব্দীকাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্মরাজগণের এবং সেনরাজগণের তাম্রশাসনেও বিক্রমপুর রাজধানীর উল্লেখ রহিয়াছে- সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমর্জ্জেয়স্কন্ধাবারাত ইত্যাদি। অতএব, বিক্রমপুর নাম যে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন তাহা আমরা তাম্রশাসনের সাহায্যেই প্রমাণ করিতে পারিতেছি। এখন আমরা সুদৃঢ় ভাবে এই কথা বলিতে পারি যে, বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকারের কিংবদন্তীই প্রচলিত থাকুক না কেন, সে সকল আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাম্রশাসনের দ্বারা বিক্রমপুর নামের যে পরিচয় পাইতেছি তাহাই হইতেছে প্রকৃত প্রমাণ, এবং সে হিসাবে **'বিক্রমপুর'** নাম প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্য। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

১. বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিত সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

২. পালবংশীয় নৃপতি ধর্মপালের নির্মিত 'বিক্রমপুরী-বিহার' হইতেও বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি হইতে পারে। এবিষয়ে লামা তারনাথ রচিত তিব্বতের ইতিহাস বা তেঙ্গুর আমাদের প্রমাণ। তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণীতে যদি আমরা আস্থা স্থাপন নাও করি, তথাপি শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে যে বিক্রমপুর নাম পাই, সেই বিক্রমপুর

রাজধানীর নামানুযায়ী সমগ্র বিক্রমপুরের নাম হইয়াছে এবং তাহাই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

বিক্রমপুরের সীমা

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনগুলি যে যে স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সমুদয় গ্রামের নাম রহিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীচন্দ্রদেবের রাজ্য ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা লইয়া বিস্তৃত ছিল। বর্মরাজগণ, সেন রাজগণ প্রভৃতির রাজত্বকালে এবং বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর কেদাররায়ের রাজত্বকালে বিক্রমপুর রাজ্যের সীমা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিংশতী শতাব্দী অর্থাৎ বর্তমান কাল পর্যন্ত নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের সহিত বিক্রমপুর একান্ত বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য দিন-দিনই ইহার সীমার পরিবর্তন হইতেছে,– হয়ত ভবিষ্যতে আরও হইবে। বিক্রমপুরের সীমা– পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীর আক্রমণে প্রতিবৎসর যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে বিক্রমপুরের ক্ষুদ্র ভূখণ্ড একেবারে বিলুপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

বর্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হতশ্রী এবং পূর্ব-গৌরব–বিভব শূন্য হইয়াছে, পূর্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্য হেতু বিক্রমপুর দুইভাগে বিভক্ত হয় নাই।

থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত একটা ম্যাপ বা মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন কীর্তিনাশার (পদ্মা) কোন উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্বে অল্প পরিসরা কালীগঙ্গা নদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এবং খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রাচুর্য-বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করিত। উহার তীরবর্তী পল্লীসমূহের শ্যামল সৌন্দর্য ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্যটকের নিকট স্বর্ণ-কীরিট-মণ্ডিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে শোভা-সম্পদ, সর্বধ্বংসকারিণী পদ্মার তরঙ্গ-প্রহারে কবি-কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণ দিকে আড়িয়ল নদী ও কৃষ্ণসলিল মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ– এই চতুঃসীমাবর্তী স্থানই বিক্রমপুর নামে সর্বজন পরিচিত ছিল।

জপ্সা নিবাসী কবি লালা রামগতি রায় তাঁহার রচিত 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা', নামক পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর ॥

তাঁহার গ্রন্থেও কীর্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়েও 'কীর্তিনাশা' নামক কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না।– কিংবদন্তী এইরূপ

যে, চাঁদরায়-কেদাররায়ের কীর্তি ধ্বংস করিয়াই যে পদ্মা এই অপমান লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্বে পদ্মা একটি শীর্ণকলেবরা স্রোতোধারা ছিল এবং তখন উহা উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহদীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। বর্তমান সময়ে উহা দুইটি স্বতন্ত্র শাখায় প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইতেছে। ইহার একটি শাখার নাম **কীর্তিনাশা** এবং অপরটির নাম **নয়াভাঙ্গনি**। .

১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার উল্লেখ আছে। সে সময়ে কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ইদ্রাকপুর, (মুন্সীগঞ্জ), ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুল্লাপুর, মীরগঞ্জ, মাঝহাটি, সেরাজদি, সেকেরনগর, হাসারা, ষোলঘর, বারইখালি, নুরপুর, ঠাওঁদিয়া, বালিগাঁ, নুনকিশর, রাজাবাড়ি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান **আরিয়ল বিল**, তৎসময়ে **চুরাইন বিল** নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণতটবর্তী স্থানে মুলফৎগঞ্জ, করাতীকল, জপসা, কান্দাপাড়া, শ্যামসুন্দর ও খিল গাঁ, সারেঙ্গা, চিকন্দী, গঙ্গানগর, রাধানগর, ঘাগরিয়া, সমকোট, রাজনগর লড়িকুল ইত্যাদি গ্রাম বিরাজ করিত।

মেঘনা-তটে– কালীগঙ্গার দক্ষিণ-বুহার, স্নানঘাটা, কার্তিকপুর, ডলুই, বামগাঁও, ভয়ারা, সাদকপুর, শ্রীরামপুর, পাতলাডাঙ্গা, সিরান্দী, দুদুলিয়া, সননদীয়া (মিলন্দীয়া), নাদারদিয়া, ঢেউখালি, ছোটবাখরগঞ্জ, গাঙ্গরা ইত্যাদি।

পদ্মা-তটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে– দীঘারিপাড়া, রাজাখালি, ভাঙ্গাবাড়ি, কলার গাঁ, বালীসার, বুদারশাশ, (বদরাসন) মাছুয়াখালি, গজারিয়া, সোনাপাড়া, সনয়পুর, সলুয়ার হাট, বগাও, কুশারিয়া, ইসলাচর, মেন্দিগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, সুলতানী, কন্দর্পপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পল্লী বর্তমান ছিল। কন্দর্পপুরের নিকটই মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হইয়াছিল। কালের আশ্চর্য পরিবর্তনে প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্থলভাগ পানিতে এবং পানিভাগ স্থলে পরিবর্তিত এবং এক নদীর স্থানে অন্য নদীর আবির্ভাব হইয়া একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রদেশ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইতে পারা অসম্ভব। কালীগঙ্গার বর্তমান নাম পড়া বা পোড়া গঙ্গা। অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার সঙ্কীর্ণখাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া এখনও উহা ক্ষুদ্রদেহে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষার সময় ভিন্ন উহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ পানিও থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন উহার নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া পোড়াগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুরে তদ্রুপ হয় নাই, এখনও সেখানে কালীগঙ্গার ক্ষুদ্র খণ্ডকে কালীগঙ্গাই বলিয়া থাকে।

কীর্তিনাশা নামের উৎপত্তির ইতিহাস

অনেকের বিশ্বাস যে, পদ্মার প্রবল তরঙ্গে মহারাজা রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস হওয়ার পর হইতেই পদ্মার নাম কীর্তিনাশা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল, চাঁদ–কেদাররায়ের কীর্তিনাশ হেতুই ইহার নাম প্রথমে কীর্তিনাশা হয়, পরে রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস করায়ে উহা আরও দৃঢ়ীভূত হয়।[১]

বিক্রমপুরের বর্তমান সীমা

নদী-প্রবাহের দিন দিন গতি পরিবর্তন হেতু বিক্রমপুরের সীমারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তারপর চন্দ্র, বর্ম, সেন, প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনকালে, পাঠান ও মোগল প্রভাবকালে চাঁদরায়, কেদাররায় প্রভৃতি বারভূঁইয়ার প্রাধান্য সময়েও বিক্রমপুরের সীমা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে, তারপর ইংরাজ-রাজত্বকালে বিক্রমপুরের সীমা পদ্মা নদীর গতি পরিবর্তনে ও ভীষণ আক্রমণে দিন-দিনই পরিবর্তিত হইতেছে। বিভিন্ন রাজবংশের প্রভুত্বকালে বিক্রমপুরের সীমা কিরূপ ছিল তাহা যথাস্থানে বলিব। বর্তমান সময়ে আমরা বিক্রমপুরের সীমা এইরূপ নির্দেশ করিতে পারি– উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব-সীমা মেঘনাদ বা মেঘনা, পশ্চিম-সীমা পদ্মা ও চন্দ্রপ্রতাপ কতকটা এবং আরিয়ল বিলের অপর পারের দোহার, গাঞ্জিমপুর (উহা চন্দ্রপ্রতাপ ও বিক্রমপুরের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থান; দক্ষিণ-সীমা ইদিলপুর। রেনেলের মানচিত্র দেখিলে (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস্ রেনেল এফ, আর, এস, অঙ্কিত) বুঝিতে পারা যায় বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরের কত পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ছিল– কিন্তু পদ্মা নদী (কীর্তিনাশা) বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমে আনুমানিক প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণ প্রায় আট-দশ মাইল প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড ছিল, তাহা রাক্ষসী পদ্মা নিজ কুক্ষিগত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিতেছে। এই প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী, কত দেব মন্দির, কত মঠ-মসজিদ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তি যে পদ্মার বুকে অদৃশ্য হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তনের জন্য বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুনের গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপন অনুসারে

১. ১২৭৬ (১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ) সনে রাজগনগর কীর্তিনাশায় প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সার্ভে-ম্যাপেও পদ্মার নামের পরিবর্তে কীর্তিনাশা লেখা আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত "A sketch of the Topography and statistics of Dacc" নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে– "The first of these channels, which is represented as the" calligunga in Rennel's Maps, is now Called Kirtinessa, or Seripur river. অতএব বিক্রমপুরের সন্নিকটস্থ পদ্মার নাম 'কীর্তিনাশা' যে রাজবল্লভের রাজনগরের ধ্বংসের পূর্বে চাঁদরায়-কেদাররায়ের কীর্তিনাশা করা হইয়াছে তাহাই ঐতিহাসিক সত্য।

ঐ সনের ১লা আগষ্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, লোনসিংহ, কার্তিকপুর, ফতেজঙ্গপুর, নগর, বিঝারী, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, মুলফৎগঞ্জ পালং পোড়াগাছা, কুড়াশী, পাড়গাও প্রভৃতি ৪৫৮ খ্যানা গ্রাম সহ **দক্ষিণ বিক্রমপুর** বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভূত হয়। এই গ্রামগুলি মুলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্বেই মুলফৎগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জ সহ মাদারীপুর মহকুমা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়।[১]

উত্তর বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়া পদ্মার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত উহা দিঘলী (পূর্ব লৌহজঙ্গের নিকটে) বন্দরের পশ্চিম সীমা দিয়া ঘোড়দৌড় (গ্রাম) কনকসার, কোরহাটি, খরিয়া, হলদিয়া, গয়ালীমান্দ্রা, দক্ষিণ পাইকসা, ফৈনপুর, শ্রীনগর, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইয়া পুটিমারার নিকট হইতে একটি শাখা-পথে আলমপুর, শেখরনগর এবং রাজনগর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অপর একটি শাখা হাসাড়া, মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এই সলিলপ্রবাহ উত্তর বিক্রমপুরকে প্রধানত পূর্ব ও **পশ্চিম বিক্রমপুর** এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এইটিই উত্তর বিক্রমপুরের সর্ববৃহৎ হলদিয়ার খাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পদ্মার গতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ খালটির স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া স্থানে স্থানে ভরিয়া যাইতেছে।

শেখরনগরের প্রবাহটিই অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও গভীর। জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে হাসাড়ার খালে যখন পানি কম থাকে, তখন শেখরনগরের খাল দিয়াই গহেনার নৌকা ও লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত কবে। এই পানিপথের দুই ধারে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত।

নদ ও নদী

বিক্রমপুরের সীমান্তবর্তী নদ-নদী গুলির বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে খাল ও বিল ইত্যাদির কথা বলিব। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী নদী যমুনার একটি শাখা-নদী। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট হইতে যমুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই নদীর গতিপথ এইরূপ :–প্রথমতঃ– দক্ষিণবাহিনী হইয়া পরে আবার পূর্ববাহিনী হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া পুনরায় দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত আসিয়া ক্রমে সাভার পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাভার হইতে ফুলবেড়িয়ার কতকটা দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ক্রমে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদির পথে পাইনার দক্ষিণ দিকে সিংদহ নামক একটি শাখা-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে পশ্চিমদী, সরাইল, কোণ্ডা, প্রভৃতি স্থান দিয়া পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া শীতললক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনা একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীর সঙ্গম-স্থান অত্যন্ত বিশাল। এই সঙ্গম-স্থান কলাগাছিয়া নামে পরিচিত। মুন্সীগঞ্জ, কমলাঘাট

১. ঢাকার ইতিহাস– প্রথম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা– শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুরসাইল, বয়রাগাদী প্রভৃতি স্থানে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী বা ধবলেশ্বরী নদী এই ভাবে বিক্রমপুরের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহমানা।

মেঘনাদ বা মেঘনা নদ–বিক্রমপুরের পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত। মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পূর্ব ও উত্তর সীমানায় ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে মেঘনাদের সলিলরাশি দক্ষিণ দিকে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদ ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার সীমা বিভাগ করিয়াছে। মেঘনাদ নদ ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মেঘনাদ নদীর পূর্ব তীর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভূত। পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। মেঘনার পশ্চিমাংশে বিস্তৃত চরাভূমি, সেই চরাভূমির পশ্চিমে একটি নদী বা জলপ্রণালী প্রবাহমানা। এই জল-প্রণালীটি রেভিনিউ সার্ভে-ম্যাপ এবং বর্তমান সেটেলমেন্টের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত (Old bed of Brahmaputra) নামে উল্লিখিত। এই নদীটি মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পূর্বদিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ক্রমশ আঁকিয়া-বাঁকিয়া কাটাখালির মুখ হইতে দক্ষিণ দিকে, পূর্বে রাজাবাড়ির নিকট, বর্তমান সময়ে পুরান দীঘিরপাড়ের কাছে আপনার প্রবাহধারা পদ্মার সহিত মিলিত করিয়াছে। এই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জের দিক্ হইতে কেওয়ার, মহাকালী, মাকুহাটী (মাকুহাটীর খাল এখানে ব্রহ্মপুত্রের এই প্রাচীন খাতের সহিত মিলিত হইয়াছে), ঘাসীরপুকুরপাড়, সেরাজাবাদ, পুরুয়া, কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) মূলচর, দীঘিরপাড়, বাহেরক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি এই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই নদীতে বর্তমান সময়ে কেহই ব্রহ্মপুত্র বলে না। সাধারণত দীঘিরপাড়ের গাঙ্গ, মূলচরের গাঙ্গ, সেরাজাবাদের গাঙ্গ, (নদী) বলিয়া থাকে।

এই নদী যে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে– রেভিনিউ সার্ভেম্যাপে, ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলিয়াই লিখিত রহিয়াছে, বর্তমান সেটেলমেন্টের মানচিত্রেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত– এই নদীতীরে একটি তীর্থ স্থান আছে, এই ঘাটটি **যোগিনীঘাট** নামে পরিচিত। লাঙ্গল-বন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে স্নান হয়, এখানেও ঠিক সেই তারিখে লোকে তীর্থস্নান করিয়া থাকে।

কখন কোন সময়ে কি ভাবে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্তনের জন্য এই প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,– **"ব্রহ্মপুত্রের এই দিকস্থ প্রবাহ কোন্ সময়ে কলাগাছিয়ার উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সহজ-সাধ্য নহে। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্ববাহিনী হইয়া আরিয়ল খাঁ বা আড়িয়ল খাঁ নদীর মধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমত– নরসিংদীর নিকটে, পরে ভৈরববাজারের নিম্নে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পর্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ থাকায়, উহার প্রাচীন শুষ্ক খাত কর্তনের সুবিধা হইয়াছিল।"**

পদ্মা বা কীর্তিনাশা– বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরের যে অংশ ভেদ করিয়া পদ্মা মেঘনাদের

সহিত মিলিত হইয়াছে, অনেকের মতে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া মরা-পদ্মা নামে এক প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ-সাধন করিয়াছে, উহা **কীর্তিনাশা** নামে পরিচিত।

মেজর রেনেলের অঙ্কিত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে দেখা যায়, পূর্বে পদ্মা-নদী বিক্রমপুরের অনেকটা পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সে সময়ে **'কীর্তিনাশা'** বা **'নয়া ভাঙ্গনী'** নামে কোন নদী ছিল না। বিক্রমপুরের রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মানদীর প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। রেনেল কালীগঙ্গার নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন। গঙ্গানগর হইতে লড়িকুল এবং মুলফৎগঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম **কালীগঙ্গা**। তিনি উহার উত্তরের নদীটিকে কালীগঙ্গা বলিয়াছেন। যাহা হউক, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মার প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমন কি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত পদ্মা দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক্ দিয়াই প্রবাহিত হইত। এই নদী তখনও পদ্মা নামে এবং নতুন নদীটি কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হইত। এই নূতন নদীটি বাস্তবিক পক্ষে রেনেলের তথাকথিত কালীগঙ্গার বিস্তৃতি মাত্র। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দুইটি নদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুত্র, কীর্তিনাশার সাহায্যে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। ফলে সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী প্রবাহিত হইল। রেনেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম ছিল নয়া-নদী রথখোলা। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। কোন নদী অকস্মাৎ জল ভরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে সাধারণত যেরূপ জনশ্রুতি থাকে এ বিষয়ে তদ্রূপ কোন জনশ্রুতি নাই, এমনকি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত বহু পরিমাণে জল দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিকস্থ গঙ্গানগরের নিকটবর্তী পুরাতন খাতেই প্রবাহিত হইত। রেনেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম **নয়ানদী রথখোলা** ছিল। উহার অন্তত দুইশত বৎসর পূর্বেও কোন নদী এই যোজকের সহিত মিলিত হয় নাই। কীর্তিনাশার স্রোত খুব প্রবল ছিল, এই জন্যই সেকালে লোকে ইহার নাম দিয়াছিল **'কীর্তিনাশা সর্বনাশা'**। (কেন না কীর্তিনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রমপুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত কীর্তি-কলাপ উদরসাৎ করিয়াছে কি বলিব!)[১]

গঙ্গা ও মেঘনা নদীর তলের (লেভেল) পার্থক্য বোধ হয় ইহার কারণ। ইহাতে মেঘনা নদীর আপাতত কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে রেনেল কর্তৃক পোম্মানারা নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হইয়া যাওয়ায় মেঘনা নদীর দ্বারা উত্তর দিকস্থ দ্বীপগুলি ভরাট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড একটি যোজক উৎপন্ন হইল। এদিকে কীর্তিনাশা নদী মেঘনার পশ্চিম তীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন নদীর গতি স্থির ছিল না। স্রোতের প্রবলতা বশত ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলের মুলফৎগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মেঘনা প্রবল রূপ

১. পল্লীবিজ্ঞান ৫ সংখ্যা ১২৭৪ জ্যৈষ্ঠ। ইংরাজী ১৮৬৭, জুন।

ধারণ করিতে আরম্ভ করে; এবং নূতন নদী উত্তরে সরিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় যে, গঙ্গার স্রোত উত্তর-পূর্বদিকে প্রবল ছিল। এই নূতন নদী হইতে মেঘনার পশ্চিম পার পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড চর পড়িয়া দ্বীপের চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশী চর পড়িয়াছিল যে, কীর্তিনাশার মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ইহা অন্য দিক দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নুরপুর হইতে পাঁচচরের ধার দিয়া প্রায় ভদ্রাসন পর্যন্ত কীর্তিনাশা পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর-দক্ষিণ-প্রবণতা পুনরায় প্রকাশ পায় এবং গতি-চাঞ্চল্য বশত ইহাও **খাগুটিয়া** গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ইহাতে **রাজনগর** হইতে **মুলফৎগঞ্জ** পর্যন্ত আর একটি নদীর সৃষ্টি হয়। এই সময় (১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে) মেঘনা নদীর সহিত নূতন নদীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিম তীরে নূতন নদীতে যে চর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পদ্মা নূতন পথে বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। নূতন নদী খুব ভরাট হইতে আরম্ভ করিল এবং কীর্তিনাশার মূল স্রোত ইহার পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মেঘনার স্রোত-প্রাবল্যে কীর্তিনাশা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিনাশা রাজনগরের পূর্বদিকস্থ নূতন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। বেগ এত অধিক হইয়াছিল যে, কীর্তিনাশা আর একবার পূর্ব মূর্তি ধারণ করিয়া মেঘনার পশ্চিম তীরস্থ নূতন চর বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে **রাজনগরের সমস্ত কীর্তি** নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণদিক্‌গামী ভাঙ্গন বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল না। ১৮৮৬–৮৭ খ্রীষ্টাব্দে **লুরিকুল** এবং **জপসা** দেবমন্দিরাদি সহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হইয়া যায়। উহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে তারপাশা, বাঘিয়া, কাঁচাদিয়া, কালীপাড়া, লৌহজঙ্গ, পোড়াগাছা, বিলাসপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়। বর্তমানে তারপাশ নামীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর-তীর-ব্যাপী-চর পদ্মার ও মেঘনার সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, দক্ষিণ পারের রাজনগর (চর) পুনরায় নদীগর্ভস্থ হওয়ার সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১]

আর একটি নদী যেন কৃষ্ণনগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, পালঙ্গ, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া কীর্তিনাশা ও আড়িয়ল খাঁর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজনগর পদ্মার কুক্ষিগত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কীর্তিনাশার বুকে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটিত। ১২৭৩। চৈত্র। ইংরাজী ১৮৬৭। মার্চ মাসের 'পল্লীবিজ্ঞানের' স্থানীয় সংবাদাবলীতে দেখিতে পাই– "বহর হইতে কয়েক ব্যক্তি রাজনগর যাইতেছিল, কীর্তিনাশা নদীতে নৌকা ডুবিয়া ৫ জন প্রাণ হারাইয়াছে। নদীর প্রকৃত বেগের সময় আসিতে না আসিতেই কীর্তিনাশার এত পরাক্রম। পদ্ম কীর্তিনাশায় সচারচরই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।"

সে দিন হইতে পদ্মা নদীর ভীষণ আক্রমণের হাত হইতে আজ পর্যন্তও বিক্রমপুরবাসী নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। এই নদী প্রথমে 'রথখোলা,' পরে 'ব্রহ্মবধিয়া' পরে কাথারিয়া এবং সর্বশেষ কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই কীর্তিনাশার প্রভাবেই এখন **উত্তর বিক্রমপুর** ও **দক্ষিণ বিক্রমপুর** দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

১. পূর্ববঙ্গের নদী পরিবর্তন– আনন্দনাথ রায়, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা।
Canalisation in Munshiganj by Mr. F. D. Ascoli, I.C.S.

এইখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে 'রথখোলার' কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। কেহ বলেন, বিক্রমপুরের জমিদার নয়পাড়ার চৌধুরীগণের রথের ভারে রাস্তার উপর চাকার দাগ পড়িয়া গঙ্গা হইতে মেঘনা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হওয়ায় ঐ দাগ খালরূপে পরিণত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, চাঁদরায়-কেদাররায়ের রথচক্রের দাগেই যে খালের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই রথখোলার খাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পদ্মার প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ

এখানে পদ্মার প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে বলিব। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহের পরিবর্তন হয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনেল ঢাকার উত্তরাংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ নদের সম্মেলন দর্শন করিয়াছিলেন। আইন-ই আকবরি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে উহাই ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত ছিল। রেনেলের জরীপের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ রেনেলের উল্লিখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাচ্চরের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজাবাড়ি মঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল রাজাবাড়ির মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। রেনেলের জরীপ সময়ে এই সম্মেলন-স্থান পদ্মা- মেঘনাদের সম্মেলন স্থান হইতে সোজাসুজি উত্তরে অবস্থিত ছিল। পূর্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ নামক স্থান পর্যন্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ হইবে। উহা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে ঠিক দক্ষিণ দিকে পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত চণ্ডিপুরের দিকে গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল); রেনেলের ম্যাপের (২৩° নিরক্ষ) শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনী নামে একটি নূতন নদীর উদ্ভব হইয়া মেঘনাদকে পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ-মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রাচীন প্রবাহের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই জলপ্লাবন হেতুই যে ঢাকার উত্তর হইতে বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ পর্যন্ত ভূ-ভাগের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ভীষণ জলপ্লাবনের ফলেই নয়াভাঙ্গনী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, এতৎ-সাপক্ষে প্রমাণাবলি অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিস্তানদীই যে ভয়ানক পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ, এইরূপ অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে।

রাজনগর পরগনা সাধারণত পদ্মা ও কালীগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গা নদী খুলিয়া যাওয়ায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পদ্মা নদী মেঘনাদ নদে প্রবেশ-লাভ করিবার অভিনব পথ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অভিনব পথটিই স্বনামধন্য **কীর্তিনাশা**। যে সময়ে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ সলিলরাশি যমুনাব মধ্য দিয়া জাফবগঞ্জের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইতেছিল,

তৎসময়ে হইতে এইরূপ পরিবর্তন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ

পূর্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন **ময়নাকাঁটা** ও **আড়িয়ল খাঁ** নামে পরিচিত। পদ্মার গতি-পরিবর্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোন স্টিমার সপ্তাহকাল পূর্বে যে স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহার পরের সপ্তাহেই আবার সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে যে স্থান ক্ষীণ-তোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবীভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে।[১]

বিক্রমপুরের সীমার কথা বলিয়াছি, এইবার খালের কথা বলিব। তালতলার খাল বিক্রমপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধ।

খাল বিল ইত্যাদি ও তালতলার খাল

এই খাল বহরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া বালিগাঁও, সিলিমপুর, কোরাল, বাকাইচাল ফেগুনাসার, মালখানগর ও তালতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীতে যাইয়া মিশিয়াছে। এই বিখ্যাত খালটি বা পয়ঃপ্রণালীটির জন্যই ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। এই খালটি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় খাল। ইহা বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। হলদিয়ার ও তালতলার এই প্রসিদ্ধ খাল দুইটি প্রধানত উত্তর বিক্রমপুরকে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব বিক্রমপুর এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিম বিক্রমপুর হইতে পূর্ব ও মধ্য বিক্রমপুরের আয়তন অনেকটা বেশী হইবে। তালতলার খালের জন্য ধলেশ্বরী হইতে পদ্মার চলাচলের পথ সুগম হইয়াছে। কীর্তিনাশা ও মেঘনাদ নদ ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পথ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল সোজা। বরিশাল প্রভৃতি ভাটী অঞ্চলের মহাজনগণের নৌকা এই পথে সহজেই ঢাকা যাইতে পারে। কে এই খালটিকে খনন করাইয়াছিলেন, সে কথা বলা কঠিন। জন-প্রবাদ এইরূপ যে, সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস দেওয়ান কর্তৃক এই খাল প্রথমত খনন করা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ঐ খাল দিয়া স্বীয় আবাস-ভূমি রাজনগর হইতে ঢাকা আসিতে এবং ঢাকা হইতে রাজনগর যাইতে পারিতেন। যে সকল লোক নৌকাযোগে কীর্তিনাশা নদী দিয়া ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আইসে, তাহাদিগকে বাহির নদী দিয়া প্রায় দুই-তিন দিনের পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। কাজেই এই খালটি বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ খাল। আমাদের মনে হয়, রামদাস দেওয়ান কিংবা মহারাজা রাজবল্লভ এই খালের সংস্কার করিয়াছিলেন মাত্র। কারণ, এই খালের উপরকার ইষ্টক-নির্মিত পুলটি অনেকদিনের পুরানো এবং বল্লালী আমলের বলিয়া পরিচিত। পুলটি ভগ্ন। এই

১. বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড ৩১ অধ্যায়ে পদ্মা-গঙ্গা সঙ্গম তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

জন্যই মনে হয় যে, তালতলার খালটির সংস্কার মহারাজ রাজবল্লভ কিংবা দেওয়ান রামদাস করিয়া থাকিবেন।[১]

মীরকাদিমের খাল

এইবার মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে বলিতেছি। বিক্রমপুরের বিশেষত উত্তর বিক্রমপুরবাসী সকলেই এই খালটির নাম জানেন। মীরকাদিমের খাল বর্তমান রেকাবী-বাজারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটীর খালের সহিত মিশিয়াছে। প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণে ইছামতী নদী প্রবাহিত ছিল, এবং ইছামতী নদী হইতেই খাল বাহির হইয়াছিল। এখন ইছামতী ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তালতলার খালের সম্বন্ধে রাজবল্লভ ও রামদাস দেওয়ানের সহিত খনন সম্পর্কে যেরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে সেইরূপ কোন কিংবদন্তী প্রচলিত নাই।

খালের উপরের প্রধান কীর্তি একটি হিন্দু আমলের তিন খিলানযুক্ত প্রকাণ্ড ইটের পুল। জনপ্রবাদ বলে, পুলটি বল্লালসেনের নির্মিত। পাইকপাড়া ও আবদুল্লাপুর গ্রামের উভয় সীমায় পুলটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ খালকে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া অতিক্রম করিয়াছে। পুলটি যে রাস্তাকে স্বীয় দেহের উপর দিয়া এই ভাবে খাল অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা মীরকাদিমের খালের তিন মাইল দূরে সমান্তরালে অবস্থিত তালতলার খাল অতিক্রম করিয়াছে এবং তথায়ও ঠিক এইরূপ আরেকটি ইটের পুল আছে। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই পুল দুইটি কে কবে নির্মাণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। পুল দুইটি যে অতি প্রাচীন, দেখিবা মাত্রই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গাঁথুনী আগাগোড়া ইটের কোথাও পাথর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইটের গাঁথুনীই বজ্রের মত দৃঢ়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই খালটি সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বৎসর মীরকাদিমের খাল খনিত হইয়াছিল। কাজেই এই খালের বয়স প্রায় নয়শত বৎসর হইতে চলিল, সেই হিসাবে তালতলা খালের বয়সও এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। এই খালটি ধলেশ্বরী নদী হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতে বা সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া যে খালটি চূড়াইনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া আড়িয়ল বিলে যাইয়া মিশিয়াছে, তাহা 'চূড়াইনের খাল' নামে খ্যাত। উহার অপর

১. Tradition states that the Taltola khal was excavated by Raja Raj Ballava in the middle of the 18th century. This is not a fact as the bridge upon it is many years older If it was excavated by the Raja, it was clearly impossible to keep it open as it was already bolted up by the British Government to allow the passage of large boats in the river. Canalisation in Munshigunj by Mr F. D. Ascoli, তালতলার পুল সম্বন্ধে জানিতে পারি যে– It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammadans. List of Ancient Manuments in the Dacca. Division Page 26. Published by authority.

একটি শাখা সেরাজদিঘার পূর্ব-প্রান্তে লুপ্ত অবস্থায় আছে।

এই সমস্ত স্বাভাবিক ও খনিত পয়ঃপ্রণালীগুলি হইতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের উদ্ভব হইয়াছে। সে সমুদায় খালের নাম যে যে গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে সে গ্রামের নাম অনুযায়ী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে; যেমন বেতকার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল, কামারখাড়ার খাল, বাঘিয়ার খাল, হাসাডার খাল। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামের মধ্যভাগ ও সীমা ধৌত করিয়া ও সমুদয় খাল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। খালের সংখ্যা বেশী বলিয়া বিক্রমপুরের ভূমির উর্বরা-শক্তি অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত ছোট ছোট খালগুলিকে চল্‌তি ভাষায় 'ঝোরাখাল' বলে।

হলদিয়া, তালতলা, মীরকাদিম এই তিনটি প্রসিদ্ধ খাল হইতে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোরাখাল বাহির হইয়া বিক্রমপুরের অভ্যন্তরস্থ্ গ্রামগুলিকে ও হাটে-বন্দরে চলাচল ও বাণিজ্য-পণ্য বহনের সুবিধা করিয়াছে। এই সমস্ত খালে জোয়ার-ভাটায় পানি কমে ও বাড়ে। জোয়ারের সময় মালবোঝাই বড় বড় নৌকাও যাতায়াত করিতে পারে। এই প্রকার যে খালগুলি দ্বারা লোকের যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি খালের বিবরণ দেওয়া গেল।

হলদিয়ার খাল—এই খাল হইতে যে সকল খাল বাহির হইয়াছে তাহার পরিচয় দিলাম।

ক. লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহার যে শাখা পূর্বগামিনী হইয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে মিশিয়াছিল, তাহা পদ্মার ভাঙ্গনে পদ্মার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

খ. দিঘলী হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি শাখা পূর্ববাহিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ঘোড়দৌড় হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া বেজগাঁ, ভোগদিয়া, মসদাগাঁও, আর্টিগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া দক্ষিণ-চারিগাঁয়ের নিকট অন্য "ঝোরা খালে" পতিত হইয়াছে। ইহার পারে বেজগাঁ, ভোলদিয়া, আটিগাঁও ও দক্ষিণ-চারিগাঁও-এর হাট-বাজার অবস্থিত।

গ. ঘোড়দৌড় গ্রামের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বগামিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসরের পর উত্তরবাহিনী হইয়া এক শাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া বিলে পড়িয়াছে, অপর শাখা মসদাগাঁও ভেদ করিয়া উত্তর দিকে যাইয়া গ্রামের সহিত মিশিয়াছে।

ঘ. কনকসারের পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া এক শাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া কনকসারের বন্দরের পশ্চিম প্রান্ত ধৌত করিয়া নাগেরহাটের মধ্য দিয়া, অপর শাখা নাগেরহাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র খালে যাইয়া মিশিয়াছে। **নাগেরহাট বন্দর** ইহার পারে অবস্থিত। নাগেরহাটে বহু কুম্ভকারের বাস; এ খাল দ্বারা তাহাদের ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

ঙ. এই খাল হইতে উৎপন্ন দু'টি অপ্রশস্ত জলধারাকে লোকে **"কালীগঙ্গা"** ও **"পোড়াগঙ্গা"** বলে। প্রথমোক্তটি কোরহাটী ও খরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া

ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে। এটিকে "কালীগঙ্গা" বলে, পুরাতন থাক-নক্সায়ও এই জলধারাটি "কালীগঙ্গা" বলিয়া বর্ণিত ও চিহ্নিত হইয়াছে।

চ. হলদিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া একটি অপ্রশস্ত জলধারা পূর্বগামিনী হইয়া নাগেরহাট, দক্ষিণ-চারিগাঁও, ভবানীপুর, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া মধ্যপাড়ার নিকট একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতোধারাটিই "পোড়াগঙ্গা" নামে পরিচিত। ইহার পারে নাগেরহাট, দক্ষিণ–চারিগাঁও, ভবানীপুর প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত; হলদিয়া হইতে নৌকাযোগে মাল বহনে সুবিধাজনক খাল।

ছ. হলদিয়ার খালের পশ্চিম-পার হইতে শিমুলিয়া বন্দরের পূর্ব সীমা ভেদ করিয়া খরিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া কোরহাটী ও খরিয়া হইতে আগত "কালীগঙ্গার" সহিত মিলিত হইয়া ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে।

জ. সাতঘরিয়ার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মৌছার ভিতর দিয়া কাজিরপাগলায় মিশিয়াছে।

ঝ. কারপাশার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া হারিয়ামুন্সির ভিতর দিয়া বিলে পতিত হইয়াছে।

ঞ. গয়ালী-মান্দ্রার দক্ষিণ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বগামিনী হইয়া কুকুটীয়ার মধ্য দিয়া বিলে মিশিয়াছে।

ট. গয়লী-মান্দ্রার পশ্চিম হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়া কাজিরপাগলার খালে যাইয়া মিশিয়াছে।

ঠ. দক্ষিণ-পাইকসার উত্তরসীমানা ভেদ করিয়া এক শাখা কাজিরপাগলা, দোগাছি, কোলাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া বিলে পতিত হইয়াছে। অপর শাখা দক্ষিণ-পাইকসার দক্ষিণসীমানা স্পর্শ করিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া বিলে যাইয়া মিশিয়াছে। প্রথমোক্ত ধারাটির তীরে কাজিরপাগলা, দোগাছি এবং কোলাপাড়া বন্দর অবস্থিত।

ড. শ্রীনগরের দক্ষিণ প্রান্ত ধৌত করিয়া শ্যামসিদ্ধির মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বক্রাকৃতি ভাবে রাড়ীখালের উত্তর দিয়া আরিয়ল বিলে মিশিয়াছে।

ঢ. পদ্মানদীর ভাঙ্গনীর জন্য অনেক সময় চর পড়িয়া নূতন নূতন পয়ঃপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্তমানে এইরূপ একটি জলপ্রণালীর নাম করা যাইতে পারে, উহা কলমার নিকট হইতে বাহির হইয়া পুরান দীঘিরপাড়ের নিকট যাইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সব পয়ঃপ্রণালী পদ্মার প্রকোপে পুনরায় নূতন চর ভাঙ্গিয়া গেলে আবার মূল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এই ভাবে তালতলার খাল ও মীরকাদিমের খাল হইতেও অনেক 'ঝোরাখালের' উৎপত্তি হইয়াছে। বিক্রমপুরের নিম্নভূমিকে উচ্চ করিয়া না লইলে বাড়ি-ঘর ইত্যাদির নির্মাণ-কার্য চলিতে পারে না। তারপর যাতায়াতের জন্যও খালের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। কি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য, কি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্যও খালের

আবশ্যক। এইজন্য বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্ত দিয়া কিংবা মধ্য দিয়া খাল আছে, ঐ সব খালের নাম গ্রামের নাম অনুসারেই হয়। যেমন আউটসাহীর খাল, বাঘিয়ার খাল, বেতকার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল এইরূপ। সে সমুদয়ের নাম করা অনাবশ্যক-বোধে আর নাম লিখিলাম না। প্রধান কয়েকটি খালের কথাই বলিলাম।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের গহেনার নৌকা ও ছোট ছোট লঞ্চগুলি প্রধান প্রধান খালগুলির মধ্য দিয়াই মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যাতায়াত করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাস কাল খালের ভিতর দিয়াই গহেনা, লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করিতে পারে। কার্তিকের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ পর্যন্ত অবশিষ্ট সাত মাস সময় ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ-গামী গহেনাগুলি পদ্মা, মেঘনা, শীতললক্ষ্যা ঘুরিয়া ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার পথে ঢাকা পৌঁছে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের খালগুলির মধ্যে ভোজেশ্বর, ঘড়িসার, নড়িয়ার, মহিষখোলার, নওপাড়ার, গোয়ালমারীর, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুর গোয়াখালী, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের খাল ও বিলরুট প্রসিদ্ধ।

বিল

বিক্রমপুরের বিলের মধ্যে **আড়িয়ল বিল** বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজপাড়া, কোলাপাড়া, উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারুইখালি এবং সেকেরনগর বা শেখরনগর। পশ্চিমে নারিশা গ্রাম, পূর্বপ্রান্তে দয়হাটা, হাসাড়া গাঁদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল বা পরাণীমণ্ডল প্রভৃতি গ্রাম। এই বিলটির দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ১২ মাইল এবং দক্ষিণে প্রস্থ প্রায় ৭/৮ মাইল হইবে। অতি প্রাচীনকালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূখণ্ড যে এই আড়িয়ল বিলের গর্ভে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এখন অনেক স্থান গ্রামরূপে পরিণত হইলেও আড়িয়ল বিল বিক্রমপুরের এক তৃতীয়াংশ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষার সময়ে কুমীরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, এবং ঝড় উঠিয়া বিলের পানিতে এমন ঢেউ উঠে যে, বিলের মধ্যে নৌকা থাকিলে জীবনের আশা বড় কম থাকে। এই বিলটিকে ছোট-খাটো হ্রদ বলা যাইতে পারে।

ঢাকা জেলার বিলগুলির মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আড়িয়ল বিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেকে অনুমান করেন যে, সম্ভবত রাজশাহীর চলন বিল এবং ঢাকার আড়িয়ল বিলেই অতি প্রাচীন কালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে।

আড়িয়ল বিল বা চূড়াইন বিল ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ও বড় এবং মাঝারি রকমের বিল আছে। এখানে তাহাদের নাম করিলাম:

ক. কদম বিল– হলদিয়া ও নাগেরহাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে এই বিলে বহুলোকে মৎস্য ধরে।

খ. জিয়াস বিল।

গ. হাসাড়ার বিল– এই বিলকে চূড়াইন বিলের একটি অংশ বলিলেই হয়। এইরূপ আরও অনেক ছোট ছোট বিল আছে। সে সমুদয় সাধারণত যে যে গ্রামের

কাছাকাছি অবস্থিত, ঠিক সেই সেই গ্রামের নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ বিক্রমপুরে ঢোলসমুদ্র বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। বর্তমান সময়ে গ্রীষ্মকালে এই বিল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিল হাতিমোহনা আড়াই মাইল দীর্ঘ ও দু'মাইল প্রশস্ত ছিল। কাজলারবিল, বাঘিয়াবিল, কোটালিপাড়ার উত্তর। রামশীলা দীঘি, বড়য়া ইত্যাদি। এই সমুদয় বিল ক্রমশই শুকাইয়া আসিতেছে।

ভূমির আকৃতি ও প্রকৃতি

বাঙালা দেশ পলিমাটির দেশ। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহার বয়স অনেক কম। কম বলিয়াও একেবারে নেহাৎ কম নহে। কেননা বাঙলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অনেক প্রাচীন ভূমি রহিয়াছে। এমনকি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে, যে সমুদয় প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের শিলা নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, দক্ষিণাবাসী আদিমমানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মাদ্রাজে ও বাঙলায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময়ে উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়।[১] এ সকল হইতে সপ্রমাণ হয় যে, আমাদের জননী বঙ্গভূমি নবীনা হইলেও একেবারে নবীন নহেন, তিনি বেশ প্রবীণা।

বিক্রমপুর বলিয়া নহে, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্থান এবং বিক্রমপুর ত একেবারেই নদীমেখলা। একজন ইংরাজ লেখক বিক্রমপুরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে সত্য: Encircled in a network of rivers where Ganges and Buriganga, Megna, Ishamutti and Brahmaputra meet, lies ancient Kingdom of Vikrampur......Every where the influence of the great rivers has made itself felt in the story of Vikrampur. Silted up by them in days gone by, when the world was young, it is practically an island set in their midst. Having brought in into being, they made of it their Special Care.[২] নদ-নদী পরিবেষ্টিত বিক্রমপুরের উপর নদ-নদী তাহার ইতিহাস প্রতিদিন লিখিয়া যাইতেছে। সেই কবে কোন্ যুগে কোথাও নদী শুকাইয়া গিয়াছে, কোথাও নদীর স্রোতোধারা বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিক্রমপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ। এজন্যই বিক্রমপুর ও বাঙলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় পলিমাটির দেশ। নদী তটরেখা হইতে সাধারণত ইহার উচ্চতা অল্প। বর্ষার প্লাবনে সারা বিক্রমপুর সাত সাগরের এক সাগরে পরিণত হয়, শুধু জল-জল-জল। মাঝে মাঝে শ্যামল-তরু-গুল্ম-পরিশোভিত বনরাজি পরিবেষ্টিত পল্লীগ্রামগুলির, সবুজ

১. V Ball-Stone implements found in Bengal, proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865, p.p. 127-28. স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,– বাঙ্গালার ইতিহাস– প্রথম খণ্ড।– ৬ – ৭ পৃষ্ঠা।

২. DaccaThe Romance of an Eastern Capital, by I B. Bradley Birt, Page 16.

ধান্য-ক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূ-ভাগ জলমগ্ন থাকে।

ভূ-ভাগের বৈচিত্র

বিক্রমপুরের ভূমি সমতল নহে। কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ। এমন কোন কোন স্থান আছে যে স্থানে বর্ষার জলপ্লাবন ও পৌছাইতে পারে না। যেমন রামপাল, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। পূর্ব-বিক্রমপুরের ভূ-ভাগ পশ্চিম-বিক্রমপুর হইতে উচ্চ। পশ্চিম-বিক্রমপুরের মধ্যে পদ্মার তটভূমির নিকটবর্তী স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। আড়িয়ল-বিল পশ্চিম-বিক্রমপুরে অবস্থিত, এজন্য ইহার চারিদিকে যে সমুদয় স্থান আছে, সেগুলি নিম্নভূমি।

মৃত্তিকার গুণাগুণ ও কৃষি

পূর্ব বিক্রমপুরের মৃত্তিকা খুব উর্বরা। রামপাল ও মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে ভূমি উচ্চ এবং মৃত্তিকা পীতবর্ণ। এজন্য ঐ স্থান কদলী উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। সেখানকার দুধসাগর, অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, সবরী, চিনিচম্পা, কবরী, আট্যা, কানাইবাঁশী প্রভৃতি কদলী খুবই বিখ্যাত এবং দেশ-বিদেশে ইহার চালান হইয়া থাকে। রামপালের মুলাও বিশেষ বিখ্যাত। পূর্বে বিক্রমপুরের কপির চাষ হইত না। বর্তমান সময়ে রামপাল, মুন্সীগঞ্জ ও তাহার চারিপাশের গ্রামে গ্রামে বহু ফুলকপি, বাঁধাকপি ও গোল আলুর চাষ হইতেছে। এখানকার কচুও উৎকৃষ্ট। আখের (ইক্ষু) চাষও বেশ ভাল হয় এবং এখানে যে উৎকৃষ্ট আখিগুড় হয় উহা 'রামপালের আখিগুড়' নামে প্রসিদ্ধ। মুন্সীগঞ্জে এজন্য বহু আখমাড়াই কল মজুত থাকে। এক সময়ে রামপালের চৌগাড়ার (নালা ডোবা) অন্ত ছিল না, সেখানকার সুগভীর চৌগাড়া দেখিয়ে ভয় হইত। এখন তাহা ভরাট হইয়াছে। সে সমুদয় উচ্চ স্থানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হয়। বিশেষত রামপালের কলা, মুলা, বাইগণ (বেগুন) সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইক্ষু ও খর্জুরের রসে তথায় অধিক পরিমাণে অতি উপাদেয় গুড় উৎপন্ন হয়। এমন মিষ্ট ও পরিস্কৃত গুড় কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। এখানে তেঁতুল ও শিমুল-তুলা অনেক জন্মিয়া থাকে।

মধ্য বিক্রমপুরের পানিয়া, খিলগাঁও, তন্তর, দক্ষিণ-চারিগাঁও প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। পানের 'বোরো' বা বরোজ এ অঞ্চলেই বেশী। পানের বরোজ– পটল, মরিচ, প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম-বিক্রমপুরের মৃত্তিকা উর্বরা বটে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। ধান, পাট, কায়ন, তিল প্রধান ফসল।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ

বিক্রমপুরের সমগ্র ভূ-ভাগের মৃত্তিকাই আটালে বা (১) আটালিয়া, (২) দোয়াসা (বিল ও ঝিল প্রভৃতির নিকটবর্তী মৃত্তিকাই এই শ্রেণীভুক্ত), এই মৃত্তিকা সাধারণত কৃষ্ণবর্ণের হয়। সম্ভবত উদ্ভিজ্জ-পদার্থ মিশ্রিত থাকার দরুনই এইরূপ হইয়া থাকে। (৩) বালুকাময় যেমন চরভূমি এবং নদীর তটদেশের ভূ-ভাগ। পশ্চিম-বিক্রমপুরের কোন

কোন স্থানে বিশেষ হলদিয়ার মৃত্তিকা অত্যন্ত বালুকাময়। অথচ পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের মাটিই আটালিয়া ও দোয়াসা। হলদিয়া গ্রামে এক ফুট মাটি খুঁড়িলেই গভীর বালুকাময় স্তর পাওয়া যায়, এ জন্য এখানে উৎকৃষ্ট জলাশয় যেমন দীঘি, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করা অসুবিধাজনক।

আড়িয়ল-বিলের পাড়ে স্থানে স্থানে এবং রাড়িখালের গ্রামের মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহার মৃত্তিকা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। এখানে অনেক সময় মৃত্তিকা খননে মহিষের সিং ইত্যাদি পাওয়া যায়।

চরাভূমি

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীতে বহু চর আছে। কোন চরই বড়-একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পুরাতন চর ভাঙ্গিয়া নূতন চরের সৃষ্টি হয়। এই সমুদয় নূতন চর দখল করিতে ভূম্যধিকারীদের মধ্যে অনেক সময়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে। উহাতে খুন জখম পর্যন্ত হয়। বহরের চৌধুরী জমিদারদের সহিত ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের চর-দখলি খুন-জখমের কথা আজও লোকের মুখে মুখে প্রবাদের মত শোনা যায়। প্রত্যেক চরেরই এক-একটি নাম থাকে। সাধারণত জমিদারদের নামানুযায়ী চরের নাম হয়, যেমন মিত্রের চর, কুণ্ডুর চর, চরজজিরা এইরূপ। এ সমুদয় চরে মুসলমানদের বসতি বেশী। অনেক নমঃশূদ্রও আছে। বর্তমান সময়ে ভাগ্যকুল হইতে দুয়াল্লী পযন্ত একটি বিস্তৃত চর পড়িয়াছে তাহাতেই 'পদ্মার ভাঙ্গনি' অনেক কমিয়াছে, নতুবা এত দিনে আরও বহু গ্রাম পদ্মার অতলতলে নিমজ্জিত হইত। এই সমুদয় চরে ধান, পাট, মুগ, আখ জন্মে এবং আখের গুড়ও চরেই জন্মে। দুধ ত প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়। পদ্মার তীরবর্তী বন্দরগুলিতে যথা, – ভাওয়ার, খরিয়া, দিঘলী, কলমা, দীঘিরপাড় প্রভৃতি স্থানে চরের দুধ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর আমদানি হয়। চরের লটা বা লঠা-ঘাস-গরুর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। চরে একজাতীয় ছোট ছোট ঝাউগাছ জন্মে, ঐগুলি সাধারণত 'বুনো বা বউনা ঝাউ' নামে পরিচিত। ইহা জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

বন-জঙ্গল

বিক্রমপুরের কোন স্থানেই বর্তমান সময়ে গভীর বন-জঙ্গল নাই। কিন্তু একদিন ছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বিক্রমপুরের অবস্থা কিন্তু এইরূপ ছিল না, তখন বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ ছিল। – যেরূপ উত্তর পারে, তেমনি দক্ষিণ পারের গ্রাম সমূহও ঐ প্রকার বনাকীর্ণ ছিল। সেকালের 'পল্লীবিজ্ঞান, পত্রে লিখিত আছে– **"সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত, ব্যবহার জন্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশের একাংশ নাই। একে নানা প্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে উত্তম পানীয়জল একেবারে অভাব বলিলেই হয়। কোন মাঠ কি ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইলে চারিদিকে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যেন লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্বাংশে রামপাল, মহাকালী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর, শিয়ালদি, বয়রাগাদি প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্তিনাশার পারে জপসা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান**

এমন কি সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের এ লেখা অবস্থা-সম্মত কি না প্রতীত হইবেক। রামপালের ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম ও পথ ঘাটগুলির অবস্থা শতবর্ষ পূর্বে কিরূপ ছিল, তাহাও এখানে বলিতেছিঃ– আহা কি আক্ষেপ! পূর্বে যেখানে রাজা ও রাজপরিবারদের অধিবাস ছিল, যে স্থানে সর্বদা শান্তিজনিত চতুরঙ্গক জয়ধ্বনিতে কর্ণকুহরকে আমোদিত করিত, সেখানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পশ্বাদিতে বসতি করিতেছে, আর সেই চতুরঙ্গক জয়ধ্বনি কর্কশ অসুখকর শৃগালধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে, পূর্বে যে সমস্ত বর্ত্ম দিয়া নানাদেশ-বিদেশীর লোক অহর্নিশি গমনাগমন করিত, এইক্ষণে তাহা দিয়া নানাজাতীয় পশুচয় বিচরণ করিতেছে।... . রামপালের দীঘির পশ্চিম পার দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী খাড়ি (রিকাবীবাজারের খাড়ির সম্মুখস্থ গুদারাঘাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ি থানা পর্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম রামপালের দরজা। উক্ত দরজার পরিসর অন্যূন ৩০ হাত হইবে। কথিত আছে, বল্লাল সেন ঐ দরজা নির্মাণ করাইয়া লোকের গমনা-গমনের অসুবিধা নিবারণ করিয়াছিলেন। উহার আধুনিক অবস্থার বিষয় স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হয়। সম্প্রতি উল্লিখিত রাজবর্ত্মের দুইপাশে প্রঘোর জঙ্গল-সমূহ বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, শিমূল, খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, মধ্যস্থলে এক হাত পরিসরবিশিষ্ট যে একটু পথ আছে, তাহাও আবার ইষ্টক, কন্টক ও বৃক্ষের মোটা মোটা শিকড়াদিতে আবৃত রহিয়াছে। ঐ স্থান দিয়াই লোকেরা গতায়াত করিয়া থাকে। আর প্রোক্ত জঙ্গল-মধ্যে অনেক হিংস্র-প্রাণী বাস করিয়া থাকে। এতদ্বারা জনগণের যে কি পর্যন্ত অনুরোধের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যিনি একবার রামপালের পথ দিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রামপালের পথ কীদৃশ দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। তিনি আর নির্ভাবনায় এ স্থান দিয়া চলাচল করিতে পারে না। ... পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই গাঢ় জঙ্গলাকীর্ণ, তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়ুর সঞ্চালন দূরে থাকুক, শারদীয় শুক্লপক্ষের রজনী ও কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার ন্যায় বোধ হয়।"

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায়ও বিক্রমপুর বনাকীর্ণ ছিল। এমনকি দস্যু-তস্করের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। সেই সময়ে গভীর বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সেই সময় রামপাল দিয়া কেহ একাকী গমন করিতে পারিত না। এমনকি অনেক লোক একত্র হইয়া না যাইতে বিনষ্ট হইত। এখানে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি।– প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এক দিবস কোন ব্রাহ্মণ আপন একজন আত্মীয়াকে ডুলিতে আরোহণ করাইয়া রামপাল দিয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে পথ-গমনহেতু পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামলাভার্থ তথায় কোন ছায়াময় স্থানে বসিয়াছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কয়েকজন দস্যু শান্তমূর্তি পরিধান করিয়া ভদ্রবেশে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হয়। এবং প্রথমে ডুলি মহারত (ডুলিবাহক) দিগকে বিবিধ অনুনয়-বিনয় করিয়া নৌকা উত্তোলনের ছলে কোন গুপ্তদেশে লইয়া যাইয়া বধ করিল, পরে ব্রাহ্মণকেও কোন কার্যের ভান করিয়া কোন গোপনীয় স্থানে আনয়ন করিয়া বিনাশ করে। ব্রাহ্মণ-কন্যা ইহা টের পাইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ দৌড়িতে দৌড়িতে কোন ইক্ষুবনস্থ এক বৃদ্ধ মুসলমানের পা ধরিয়া পড়ে এবং তথ্যবিষয়ক যাবতীয় বিবরণ অবগত করায়। ইহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়। এই প্রকার অনেকানেক নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিক্রমপুরের পরগণা বিভাগ

আমরা বর্তমান সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পারের যে ভূ-ভাগকে বিক্রমপুর নির্দেশ করিতেছি পূর্বে বহু বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার নানা স্থান নানা বিভিন্ন পরগনায় পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বে কার্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার, ঢাকার উত্তরাংশও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। তিন চারিশত বৎসর পূর্বে এ পরগনাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে– **"বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত... লতা... ঘোড়াঘটক পূর্বে... স... একা... ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর বসাগোবিন্দ বলান্ত ভূসীমা পশ্চিমে... ইত্যাদি।"** এই তাম্রশাসনে 'লতা' ও 'ধীগ্রাম' বলিয়া যে দুটি স্থানের পরিচয় আছে, উহা যে বর্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামলবর্মার তাম্রশাসনে নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্তিকপুরের নামোল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া তাম্রশাসনে রহিয়াছে, বর্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগনার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট-নয়শত বৎসরের পূর্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্তিকপুর এই দুইটি পরগনা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময় সরকার সোনারগাঁর অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগনার ন্যায় এই সময়ে কার্তিকপুর, সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগনা নির্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগনার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দুরাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

রাজ পরিবর্তনের সহিত দেশের বিভাগেরও পরিবর্তন হয়। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপরে নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর-মধ্যেই আবার **আরঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর** প্রভৃতি তিন-চারিটি পরগনার সন্নিবেশ হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ পর্যন্ত গেস্ট্রেল ও ডেলী-কর্তৃক যে সার্ভে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৮/৯ নং **মকিমাবাদ**। ১০ নং **বিক্রমপুর**। ১৩/১৪ নং **রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর**। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগনার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮/৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরে দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা,

ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হল্‌দিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালীপাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান-সমুদয় ১৩/১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত থাকায় সর্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় 'দক্ষিণ' বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে+ কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদান কালে মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের নাম করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ি রাজনগর, পরগনা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজ-পত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগনার বহু খর্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগনায় বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন তাঁহারাও সগর্বে বাক্‌লার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ-বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদর স্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সনকট কেহ কেহ সকাট বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। এ বিষয় পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চারণের বৈষম্যবশত বিক্রমপুর-বাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন। (১) সমগ্র বেহার প্রদেশ-মধ্যে যেমন একটি খণ্ড-স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড-স্থানেরও ঐরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদর-স্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর জেমস্ রেনেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ভে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ-বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগুটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদী-প্রবাহে ভগ্ন হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে যে সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের পরিচয় আছে তাহাতে খাগুটিয়ার একটি মঠ, রাজনগরের দুইটি মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র এবং জপ্‌সার একটি মঠের চিত্র আছে। জপ্‌সার মঠটির পাশে লেখা রহিয়াছে, Japsa pagoda seen in both rivers. এই মঠ পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্তিনাশা-দ্বারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপ্‌সা, তারপাসা' রূপটা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, ফানারগাঁ, আকসাইল, সোনারদেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খিলগাঁ, খারচাকা, বক্‌সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ-সিমলিয়া, পারগাঁ, গাগেরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতার- ভোগ, গোপালপুর,

মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, মাইজপাড়া, বাসগাঁ, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী, আকিয়াধল, কাউলিপাড়া, বহর, কোমরপুর, দীঘিরপার, বাহেরক, বেহেরপাড়া প্রভৃতি বহু গ্রাম পদ্মার বা কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই এখনও যথার্থভাবে প্রত্যেক গ্রামের নাম বলা সুকঠিন।

বিক্রমপুরের গ্রামের নাম-রহস্য ও নাম-পরিবর্তন– আমাদের দেশের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস অনেক স্থলেই অজ্ঞাত; এবিষয়ে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন কোন স্থলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেত মাত্র হয়। এমন গ্রামও আছে, যাহার জন্ম অবজ্ঞায়, নামও ঘৃণায় বিকৃত, কিন্তু পরে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছে। (২) বিক্রমপুরের গ্রামের নাম এইভাবে নির্দেশ করায় অনেকেরই গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিবে। সেই ভাবেই কতগুলি গ্রামের নাম লিখিলাম। যথা:

গ্রাম হইতে গাঁ বা গাঁও– বালিগাঁ, মাইজগাঁও, শাসনগাঁও, দওগাঁও, কুড়িগাঁও, বেজগাঁও, পানগাঁও, কামারগাঁও, ব্রাহ্মণগাঁও, খিলগাঁও, গারুড়গাঁও, বিদগাঁও, বান্দেগাঁও, বড়সাতগাঁও, খৈরগাঁও, চাঁদগাঁও, দিয়াগাঁও, ছয়গাঁও, আটিগাঁও, পাঁচগাঁও, তিনগাঁও, হাজিগাঁও, ক্ষয়গাঁও, ও পাড়াগাঁও।

নগর– রাজনগর, রাজানগর, নগর, শ্রীনগর, সেকেরনগর, বা (শেখরনগর) মালখাঁনগর, গিরিনগর, বলাইনগর, কানাইনগর, নয়ানগর।

সং দ্বীপ– মূল অর্থ দুইদিকে পানি- বেষ্টিত ভূমি। চারিদিকে পানি-বেষ্টিত হইলেও দ্বীপ।– পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ, এই প্রকার দ্বীপকে হিন্দীতে টিবা, বা টিলা বলে। বিক্রমপুরে 'দী' ও 'দীয়া' শব্দান্তক গ্রাম সমূহ ঐ সকল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছে। যথা:

হলদিয়া, রাজদীয়া, গড়িদীয়া, কাঠাদিয়া, মালপদীয়া, কাঁচাদিয়া পাউলদিয়া, রাণাদিয়া, ভোগদিয়া, বাইদিয়া, গোবরদী, শিয়ালদী, চামারদি, বিবনদি, আলদি, বয়রাগাদী, চিকনদী, কাকদী, অজদী', পরাশরদি, মরিচাদি, রাউদিয়া, তিলরদি, দুশলদিয়া, শ্যামসিদদি, ভোজদিয়া, সিন্দুরদি, পাচলদিয়া, রামকৃষ্ণদি, লতপদী, রাজাদিয়া, কাকালদিয়া, থরিয়া, ভোগদিয়া ইত্যাদি।

পুর (সং) যথা– ভবাগীপুর, শ্রীপুর, ধীতপুর কাদিরপুর, সমসপুর, চৈতপুর, ইছাপুর, বাপুর, কুসুমপুর, কমলাপুর, মামুদপুর, মজিদপুর, সিলিমপুর, ষোলপুর, তস্তিপুর, গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, খিজিরপুর, ধীপুর, সৈদপুর, কুমুদপুর, মধুপুর, সুয়াসপুর, গোবিন্দপুর, শিবরামপুর, তাজপুর, শিকারপুর, সোন্দলপুর, গোপালপুর, মোহনপুর, ঘনশ্যামপুর, আলমপুর, শ্রীধরপুর, লস্করপুর, মামুদপুর, বিনোদপুর, উত্তররায়পুর,

(১) বিক্রমপুর ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। (২) অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়বাহাদুব, এম্-এ, গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহাবি প্রদর্শিত পন্থানুসাবে বিক্রমপুরের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলাম। (৩) 'প্রবাসী' ১৩১৭, আশ্বিন। ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (৪) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ও 'বিক্রমপুর' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণরায়পুর, দেবীপুর, রাজপুর, কামারপুর, কাজলপুর, মসিমপুর, মহিষপুর, ক্ষুদিদাদপুর।

সার– সাগর, সায়র, বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই দীঘির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ বিক্রমপুরের ন্যায় নিম্নস্থানে লোকালয় গঠনোপযোগী উচ্চভূমির অভাব- মোচনার্থ এককালে বহুসংখ্যক জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়গুলি এতদঞ্চলে 'সার' নামে খ্যাত। সার নামে বিক্রমপুরে বহু গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে। যথা– কনকসার, মহীসার (মাঐসার), জৈনসার, দেওসার, পঞ্চসার, নন্দনসার, সামন্তসার, বেজনীসার, কাকইসার, কান্দনীসার, গণাইসার, ঘড়িসার, পণ্ডিতসার, অনন্তসার, মিঠুসার, ফেগুণাসার, পৌসার, কৈবর্তসার, মামাসার,[১] ইত্যাদি।

পাড়া– (সং পাটক) গ্রামের অর্ধভাগের নাম পাটক (হেমচন্দ্র) পাট হইতে ওড়িয়া, মরাঠি, দ্রাবিড়ি, পেট-প্রায়ই বাণিজ্যস্থান। পল্লী হইতে পাড়া নহে। পাড়াগাঁ পাটক ও গ্রাম। পল্লী-ক্ষুদ্রগ্রাম-(মেদিনী) পল্লী-গ্রাম-পল্লী ও গ্রাম।

পাইকপাড়া, পুরাপাড়া, কাজিপাড়া, সাপাড়া, তেলিপাড়া, মধ্যপাড়া, নাহাপাড়া, সুরপাড়া, বড়ওপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দ্বীপাড়া, কর্কটপাড়া, কুশারিপাড়া, বেহেরপাড়া, আটপাড়া, আরধিপাড়া, গাউপাড়া, হাটেরপাড়া, চারিপাড়া, দামপাড়া, ভাটপাড়া, করপাড়া, নপাড়া, পুরাপাড়া, চৈতপাড়া, হরপাড়া, রসিতপাড়া, পোটাপাড়া, সুয়াপাড়া, মাইজপাড়া, রাড়িপাড়া, কান্দাপাড়া, খালপাড়া, কালিঙ্গিপাড়া, গণকপাড়া, কোলাপাড়া, খিদিরপাড়া, আবিরপাড়া।

তলা– (সংতল অধোভাগ-তলি) তালতলা, চাচইরতলা, বেলতলি, কাঁঠালতলি, ঘোলতলি, চাপাতলি, বৌলতলি, ছাইতানতলি, নিমতলি, আমতলি ইত্যাদি।

চর– (চড়াভূমি-নদীর মধ্যে কিংবা পরে উত্থিত ভূমি) মূল-চর, চরডুমরখোলা, তিপিরচর, ইমামচর, চরবিশ্বনাথ, সাতুরচর, চরমর্দন ইত্যাদি।

খাল– (সং খল্ল-গর্ত, কিংবা সংখাত-খাই খাল ও খালা ব্যুৎপত্তিতে এক। খালবিশিষ্ট স্থান-খালি)– কেউটখালি, গোয়ালখালি, বারৈখালি, রাড়িখাল, খালপাড়, তুলসিখালি, কুমারখালি, মহেশখালি ইত্যাদি।

গঞ্জ– (সংগঞ্জ আকর, মদিরাগৃহ- হেমচন্দ্র) (ফার্সী গঞ্জ অর্থে বাণিজ্য স্থান) মুন্সীগঞ্জ, ধর্মগঞ্জ।

কান্দ-কান্দি– (স্কন্ধ শাখা হইতে) ভূমিখণ্ডের শাখা কান্দি।–বিক্রমপুরের কতক গ্রামের নাম কান্দা বা কান্দি নাম সংযুক্ত উহার অপর অর্থ নদী তীরস্থ উচ্চভূমিকেও বুঝায়। যথাঃ বীরকান্দি, বেহারকান্দি, গোরকান্দা, ষোলকান্দা ইত্যাদি।

হাট বা হাটি– (সং-হট্ট) যথা– নাগেরহাট, গদীহাট, মুন্সীরহাট, মাকুহাটি, সেনহাটি, সিংহেরহাটি, রানীহাটি, বেজেরহাটি, জগন্নাথহাটি, কোরহাটি ইত্যাদি।

---

২০. কতকগুলি সার বা জলাশয় অদ্যাপি নিজ নামে পরিচিত রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের নামের পশ্চাতে একটি দীঘি শব্দ যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দশলজের নাসিমসার দীঘি, শিমুলিয়া-নন্দাইসার দীঘি, রিয়মীয়ার চান্দাসার দীঘি, রানিহাটির কণাসার দীঘি, সোনারঙের জয়ব্রহ্মসার দীঘি, মাঐসারের মহীসার দীঘি ইত্যাদি।

বাটী-বাড়ি– (সং আবৃতস্থান, ঘেরা বা যায়গা বাট-প্রাচীর। প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ও বাট ও বাটি, বাটী হইতে বাড়ি যথা– রাজাবাড়ি, বল্লালবাড়ি, কেদারবাড়ি, দেউলবাড়ি, টঙ্গীবাড়ি, এতদ্ব্যতীত, গড়, চক, বেড়, ঘর, বাজার, খাড়া, কুর, বতী, ঘাট, বন্দ, ভোগ, আ, ইয়া, উয়া, মণ্ডল, বিল, দহ, অল্, আলি ইত্যাদি শব্দ নামের শেষে যুক্ত হইয়া গ্রামের নাম হইয়াছে।

আবার বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম হইতে উহার মুসলমান প্রাধান্য বুঝা যায়। তাহারও কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম।যথা– সেরাজাবাদ, সেরাজদিখা, নবীর পুকুর পাড় (নৈরপুকুর পাড়) ইসাপুর, ইছাপুর, কাজিরপাগলা, কাজিরকস্‌বা, কাজীবাড়ি, বান্দেগাঁও, মালখানগর, রাড়িখাল, আলমপুর, তাজপুর, রসুনিয়া, ইদ্রাকপুর (মুন্সীগঞ্জ), মোল্লাবাড়ি, নুরপুর, কাজিকস্‌বা, মীরকাদিম, নগরকস্‌বা, আবদুল্লাপুর, মামুদপুর ইত্যাদি। আবার কয়েকটি গ্রামের নামের মধ্যে বিশেষত্বও দেখিতে পাওয়া যায়– যেমন, কলিকাল, পয়সা, কলিকাতা ইত্যাদি।

বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের পুরাতন নামও পরিবর্তিত হইয়াছে। উহা দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হইয়াছে। ফলে প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া ঐ সকল গ্রাম নূতন নাম ধারণ করিয়া একরূপ অপরিচিত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কতিপয় গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম। যথা– কামারখাড়া– স্বর্ণগ্রাম, ফুরসাইল– ফুল্লমালী, চামারদী– চম্পকদী, সোনারটং– সোনারঙ্গ, মাঐসার– মহীসার, সেকেরনগর– শেখরনগর।

আমদানি ও রপ্তানি– উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, কলিকাতা, আসাম, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, ডিব্রুগা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বদা বিস্তর পণ্যবাহী বাণিজ্য-তরণীসমূহ বিবিধ নদ-নদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী প্রভৃতি নদ-নদীতে পতিত হইয়া তথা হইতে বহরের খাল ধানকুনিয়ার খাল, হল্‌দিয়ার খাল এবং মীরকাদিম প্রভৃতি বহু খাল অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আমদানি – কলিকাতা হইতে সোনা, রুপা, লোহা, কাপড়, ছাতা, জামা, জুতা ও মনোহারী দ্রব্য; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ডাইল, গুড় ও ভূষিমাল; গয়া হইতে গুড়; রেঙ্গুন ও চাটগাঁও হইতে ফারাই-কাষ্ঠ ও আতপ তণ্ডুল; আসাম-আলিপুরদুয়ার, ভাতখাওয়া, গৌরীপুর, বিলাসপাড়া, জুগীখোপা, বগরীবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শাল-কাষ্ঠ ও এণ্ডি, তসর, মুগা প্রভৃতি; বরিশাল ও রাখরগঞ্জ হইতে চাউল, ডাইল নারিকেল, গুড়; শ্রীহট্ট হইতে মূলিবাঁশ, কমলা খলপা; ত্রিপুরা হইতে মূলি ও কাঠ; রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; নোয়াখালি হইতে নারিকেল, সুপারী, চিকনাই; যশোহর, তারপুর, গাজিপুর ও কেশবপুর হইতে চিনি, গুড়; গোয়ালন্দ ও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা; ডিব্রুগড়, শিবসাগর হইতে বেত প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলিতে আমদানি হইয়া থাকে।

রপ্তানি– বিক্রমপুর হইতে পিতলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট ও লুঙ্গি, পাট, চামড়া, ঘৃত, মৎস্য ও মৃন্ময় বাসন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়; লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, দিয়াগাঁ প্রভৃতি গ্রামে পিতলের উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়,

প্রতিদিন লৌহজঙ্গ ষ্টেশন হইতে এই সমস্ত বাসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমানে রপ্তানি হইয়া থাকে। নাগেরহাট ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারগণের প্রস্তুত পুতুল জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত মুন্সীগঞ্জের (রামপালের) কলা ও মুলা; সেরেজদিঘার পাতক্ষীর ও ঘৃত প্রভৃতি মীরকাদিম ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের পান, ষোলঘর, হাসাড়া, শ্রীনগরের ডেঙ্গার কই-মৎস্য পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে রপ্তানি হয়। পূর্বে রামপালের পাতিল গুড় নানা স্থানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হইত; কিন্তু ইক্ষুর চাষ হ্রাস-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন উক্ত গুড় দ্বারা স্থানীয় অভাব পূরণ হইতেছে না। দেশীয় কুলুর ঘানিতে অল্পাধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশান্তর হইতে গমনাগমন– বিক্রমপুরের বিদেশাগত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; ইহারা বিক্রমপুরের বাণিজ্য-প্রধান স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে দোকান করিয়া ব্যবসার কার্য করিয়া থাকে।

ফরিদপুর জেলার সাহাগণ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দর সমূহে স্থায়ী দোকান করিয়া বাতাসা ও কদমা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

'বাইদা' বা বেদে নামক একশ্রেণীর পার্বত্য অসভ্যজাতীয় লোক বিক্রমপুরের বাণিজ্য বন্দর সমূহের নিকট নৌকাযোগে বসবাস করিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ; ইহারা হাটে-বাজারে দোকান পাতিয়া এবং 'গাওয়ালে' বহির্গত হইয়া, মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা নদী, খাল, বিল হইতে অপর্যাপ্ত পরিমাণ ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে, ধোপাগণ এই ঝিনুক-দ্বারা চূণ প্রস্তুত করে এবং শিল্পীগণ ইহার দ্বারা বোতাম, চেইন ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

প্রতি বৎসর শীতের প্রাক্কালে বিক্রমপুরের বন্দর সমূহে পশ্চিম-দেশীয় ধুনকর, চামার, ক্ষৌরকার, মাটিয়াল (যাহারা মাটি কাটার কাজ করে) ও বেহারা আসিয়া থাকে; ইহারা শীতের কয়েক মাস নিজ নিজ ব্যবসার কার্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পশ্চিমা ক্ষৌরকারগণও সর্বদাই থাকে; পশ্চিম-দেশীয় কুলিগণও সর্বদা বাণিজ্য-প্রধান স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চালায়। বেহারাগণ বর্ষার সময় দেশে চলিয়া যায়। ২৫/৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টের নমঃশূদ্রগণ এখানে বেহারার কার্য করিত; এখন আর নমঃশূদ্রগণ আসে না; পশ্চিম-দেশীয় বেহারা এখন এদেশে কার্য করে।

প্রতিবৎসর বর্ষার সময় কুমিল্লা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু সংখ্যক ধীবর, শিং মৎস্য ধরিবার জন্য বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে আসিয়া থাকে। ইহাদের শিং মৎস্য ধরিবার প্রণালী এক অভিনব প্রকারের। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চাই' পাতিয়া যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মৎস্য ধরে সেরূপ কৌশল বিক্রমপুরের ধীবরগণ পরিজ্ঞাত নহে। ইহারা ৩/৪ মাস এই ব্যবসায় করিয়া আশ্বিন মাসে দেশে ফিরিয়া যায়। বিক্রমপুরে ইহারা 'চাইয়া' বলিয়া পরিচিত।

পারজোয়ার অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণ বিক্রমপুরের বন্দর-সমূহ হইতে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ

প্রভৃতি স্থানে গহনার বা গহেনার নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে। কুলিরা সাধারণত সমস্তই পশ্চিম দেশীয়।

ফসল কাটার সময় বহু সংখ্যক মুসলমান মজুর এই স্থান হইতে পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে ধান কাটিয়া যায়।

বিক্রমপুরের কুম্ভকারগণ মৃন্ময় তৈজসপত্রাদি বোঝাই করিয়া পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে "গাওয়ালে" বা গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতে বহির্গত হয়; ইহারা হাঁড়ি পাতিলের বিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; এখন অন্য জাতীয় লোকেও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

পথ-ঘাট ও যাতায়াত– বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ যাতায়াতের গহেনার নৌকা আছে। প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই সর্বদার জন্য 'কেরাইয়া' বা 'ভাড়াটিয়া' নৌকা থাকে। নদী তীরবর্তী স্থান সমূহে স্টিমার স্টেশন বা জাহাজ ঘাট আছে; কলিকাতা অঞ্চল হইতে সাধারণত মহাজনগণের মালপত্র, জাহাজ ও নৌকা-যোগেই আইসে। সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই ডাকঘর আছে; তার ঘরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। মোট বহিবার জন্য পশ্চিমা কুলি পাওয়া যায়। মহাজনগণের মাল সরবরাহের জন্য "খরার" দিনে ঘোড়া পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী– বণিক, তিলি, কুণ্ডু ও সাহাগণই বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসায়ী। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া ক্রোড়পতি হইয়াছেন, ইঁহাদের নিজেদের কয়েকখানা জাহাজ কলিকাতা হইতে মাল বোঝাই করিয়া পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য-প্রধান স্থানে যাতায়াত করে।

বিক্রমপুরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে, কোন হাটে বাজারে বা বাণিজ্য-বন্দরে তাহাদের স্থায়ী দোকান নাই। ইহারা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাউল, ডাইল, মরিচ, হলুদ, গুড়ও তরিতরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া কোন মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহাকে 'ভাসানি' কাজ বলে । আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী পরিদৃষ্ট হয়, ইহারা গাওয়ালে বহির্গত হইয়া লবণের বিনিময়ে মৌচাক সংগ্রহ করে; পানিয়া, তন্তর ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহে উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের ধীবরগণের মৎস্যের ব্যবসায় বহু দূরদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহারা পদ্মানদীতে, ধলেশ্বরী ও মেঘনাতে বিবিধ প্রকারের জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত ইহারা পদ্মসার নানাস্থানে 'জগৎবেড়' জাল ফেলিয়া যেরূপভাবে মৎস্য ধরে তাহা দর্শনযোগ্য; এই জাল ৩/৪ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ফেলা হয় এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া উহার মৎস্য ধরা চলিতে থাকে; সময় সময় প্রতি বেড়ে ৩/৪ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের মৎস্য ধরা পড়ে। এই সমস্ত মৎস্য সাধারণত কলিকাতাতেই অধিক পরিমাণে প্রেরিত হয়। বর্ষার সময়ে ধীবরগণ ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও যেরূপ সুকৌশলে ও অবলীলাক্রমে নৌকা পরিচালনা করিয়া ইলিস মৎস্য ধরে, তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য। পদ্মার ইলিস-মৎস্য খুব সুস্বাদু।

হাট ও বাজারের বিবরণ– বিক্রমপুরের হাট ও বাজারগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিশেষ বিশেষ জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ হাট, বাজার

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ধানকুনিয়ার হাট, ভাওয়ারের হাট, শ্রীনগরের হাট, সেরেজদিঘার হাট, হাসারার বাজার কচ্ছপ (বা কাউটা) ও ছাগ বিক্রয়ের জন্য; মুন্সীগঞ্জ, ভীলাকাণ্ডি, করিমগঞ্জ, ভিরুজখাঁ, দেউলভোগ, ইমামগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি হাট গরু বিক্রয়ের জন্য; ভরাকৈর, কলমা ও আরিয়লের হাট নৌকা বিক্রয়ের জন্য; ধানকুনিয়া, ভাওয়ার ও শ্রীনগরের হাট ঘাস ও বাঁশ বিক্রয়ের জন্য; খরিয়া ও শিমুলিয়ার হাট কারিকরের কাপড় বিক্রয়ের জন্য; হলদিয়া, কনকসার, দীঘিরপাড় ও তালতলা প্রভৃতি বন্দরগুলি কাঠ বিক্রয়ের জন্য; শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, শেখেরনগর, দেউলভোগ, ভাওয়ার প্রভৃতি বন্দর, আবগারী জিনিস বিক্রয়ের জন্য এবং হলদিয়ার বন্দর লৌহব্যবসায়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, রাজানগর, সেরেজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পাট, পাথুরিয়া-কয়লা, লবণ ও কেরোসিন তেলের বিস্তৃত কারবার আছে; ধানকুনিয়া বিশেষ করিয়া বাঁশ ও ধানের জন্য বিখ্যাত, আবদুল্লাপুর, মীরকাদিম বন্দরে আড়তদারী ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তৃত দোকান আছে। পূর্বে রাজানগর, সেরেজাবাদ, ইছাপুরা ও হাঁসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল কিন্তু এখন সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, বহর, হলদিয়া, আবদুল্লাপুর, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকিববাজার বা রেকাবীবাজার, মীরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, দীঘিরপাড়, তালতলা ও সেরাজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলি বিক্রমপুরের মধ্যে প্রধান আমদানি ও রপ্তানির স্থান।

লৌহজঙ্গের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান, নারায়ণগঞ্জের পর পূর্ববঙ্গে আর নাই; কিন্তু এই প্রাচীন বন্দরটি বিগত ১৩২৬ সনের মধ্যে বর্ষার জলপ্লাবনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মানদীর কুক্ষিগত হওয়াতে সম্প্রতি স্থানান্তরে নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোমরপুর কাঠের কারবারের একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, এই বন্দরটিও পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন কোমরপুর গ্রামের অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। কোমরপুরের সন্নিকটবর্তী উয়ারী গ্রামে অল্পদিন যাবত একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্বে বহর একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, এস্থানের চৌধুরীদের দোর্দণ্ড-প্রতাপ ছিল এবং বহর একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। এই স্থানটি দশ-বারো বৎসর হয় রাক্ষসী 'কীর্তিনাশা' নিজ কুক্ষিগত করিয়াছে। তালতলার বন্দরটি ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত, কতিপয় বৎসর যাবৎ ধলেশ্বরীও পদ্মার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ইহার আয়তন অনেক খর্ব করিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিই নদী অথবা খালের পাড়ে অবস্থিত।

পদ্মাতীরে– ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ বা তারপাশা, দীঘিলপাড় ও বহর।

ধলেশ্বরী তীরে– তালতলা, মীরকাদিম, আবদুল্লাপুর ও মুন্সীগঞ্জ।

ইছামতী তীরে– সেরেজদিঘা বা সেরাজেদিঘা, বাহিরঘাটা ও বাড়েখালি প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খালগুলির তীরেও বহু বন্দর রহিয়াছে।

বিক্রমপুর নগরী– রামপাল এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহার সমৃদ্ধির সময় এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল, অদ্যাপিও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন শাঁখারীবাজার, পানহাটা প্রভৃতি।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর-

নগরী ষোড়শ শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর ছিল; বিদেশী পর্যটকগণও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; শ্রীপুর নৌ-শিল্পের কেন্দ্রস্থান ছিল, এস্থানে একটি পোতাশ্রয় ছিল; শ্রীপুরে আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্তও নির্মিত হইত। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় গভর্নমেন্টের বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের আফিস ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরে 'রাজসাগর' নামক একটা হ্রদের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল; সে কালের সভ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই বন্দরটি সর্বদাই জনকোলাহল-মুখরিত থাকিত। এ সম্বন্ধে পরেও আলোচনা করা যাইবে।

কালীপাড়া (বা কাওলীপাড়া), নপাড়া প্রভৃতি স্থান এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল; উহা এখন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, উক্ত উভয় স্থানই তৎকালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।

ওজন– বিক্রমপুরের সর্বত্র জিনিসের ওজন প্রায় সমান; স্থানে স্থানে অন্যরূপও দেখা যায়, কিন্তু ৮০ তোলার ন্যূন কোথাও সের ধরা যায় না, তবে পাইকারি ও খুচরা ভেদে ওজন সাধারণত ৮০, ৮২ এই দ্বিবিধ প্রকারের; কিন্তু তাহাও সর্বত্র সমান নহে, স্থানে স্থানে ৮$\frac{১}{২}$ আনা, ৮৪$\frac{১}{২}$ আনা এবং ৯০ তোলায়ও সের ধরা হয়, সেরেজদিঘা ও মীরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয়ের কালীন ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় কালীনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ওজনে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত জিনিসের ওজন সর্বত্র ৮২ তোলায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে আমদানি সর্বপ্রকার দ্রব্যই ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় কালীন কোন কোন জিনিসের মণ প্রতি এক পোয়া হইতে আধ সের পর্যন্ত বেশী দেওয়া হয়; ইহাকে 'চলক' বা 'লাভান' বলে; এবং প্রতি ৫ মণ জিনিসের উপর এক পোয়া বেশী দেওয়া হয়, ইহাকে 'চাইলা' বলে। শুঁটকি 'সোরা' মাছ বিক্রমপুরের সর্বত্রই ওজন দরে বিক্রীত হয়।

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর

পদ্মানদীর তীরে যে সমস্ত হাট ও বন্দর অবস্থিত, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান কয়েকটি প্রধান।

ভাগ্যকুল– এস্থানে পাট ও কাঠের আমদানি হয় এবং রপ্তানিও হইয়া থাকে।

যশাইলদা– জোলাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রচুর বিক্রয় হয় এবং কাঠের ব্যবসায়ের জন্যও প্রসিদ্ধি আছে।

মাওয়া– কাঠ ও মূলিবাঁশ বিক্রয় হয়। বাজার ও হাট হিসাবেও প্রসিদ্ধি আছে।

লৌহজঙ্গ– বর্তমান সময়ে ইহা তারপাশা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। লৌহজঙ্গের প্রাচীন বন্দর কয়েক বৎসর হইল পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। এখানে পাটের আড়ত, বেত, খলফা, তৈল, বাঁশ প্রভৃতি বিক্রয় খুব বেশী

পরিমাণে হইয়া থাকে। তা-ছাড়া এখানে মনোহারী দোকান, মিঠাই ও কাপড়ের দোকান, মোজা, গেঞ্জি, সোডাওয়াটারের কল, ঔষধালয়ও পুস্তকবিক্রয়ের দোকান আছে। যুগীদের নির্মিত বস্ত্রাদি, করগেট টিন ও কাঠ এখানে প্রচুর-পরিমাণে রপ্তানি হয়।

দীঘিরপাড়– প্রসিদ্ধ হাট। পদ্মানদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রসিদ্ধ বন্দরটি উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া কান্দারবাড়ি ও মূলচর গ্রামের নিকটবর্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে অবস্থিত। এই হাটে সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া কাঠ ও মাছ। এখান হইতে প্রচুর-পরিমাণে মৎস্য কলিকাতা অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে। অধুনা ইহার নিকটবর্তী স্থানেই বহর নামক স্টিমার- স্টেশন অবস্থিত।

ধলেশ্বরী নদী-তীরে– অবস্থিত নিম্নলিখিত হাট, বাজার ও বন্দরগুলি প্রসিদ্ধ:

তালতলা– প্রসিদ্ধ বন্দর। এখন উহার অধিকাংশ ধলেশ্বরী নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। পাট, কাঠ ও অন্যান্য সমুদয় প্রয়োজনীয় জিনিসই এখানে পাওয়া যায়।

মীরকাদিম– বর্তমান সময়ে উত্তর-বিক্রমপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। সরিষার-তেলের আড়তদারী দোকান এখানে অনেক। কলিকাতার প্রায় সমুদয় তেলের কলের এজেন্সি এখানে রহিয়াছে। তেলের কারবারে শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে রবি-শস্যের আড়তদারী অনেক দোকান আছে। মীরকাদিমের এই প্রসিদ্ধ বন্দরে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানি হয়, এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আছেন। তাহারা নানাস্থানে কারবার করেন।

ফিরিঙ্গিবাজার– প্রাচীনকালে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের একটি প্রসিদ্ধ বসতিস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

মুন্সীগঞ্জ– মহকুমা সহর। প্রাচীন নাম ইদ্রাকপুর। এখানে রামপালের বিবিধ শাকসব্জী ও ফল-মূল, কলা ইত্যাদি প্রচুর-পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মুন্সীরহাট– এখানে নানা প্রকার শস্যেরও আমদানি হয়। চর অঞ্চলের মুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী হইয়া থাকে।

ইছামতী নদীর তীরে– সেরাজদিঘা প্রসিদ্ধ বন্দর। পাটের আড়ত। পাথুরিয়া-কয়লা, লবণ প্রবৃতির প্রচুর-পরিমাণে আমদানি হয়।

বাড়েখালি– এখানে কই মাছ এবং প্রচুর শাক, আলু বিক্রয় হয়।

খালেরপাড়ের হাট-বাজার– হলদিয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। পূর্বে বন্দরটি কালিপাড়ার জমিদারদের অধীনে ছিল। অধুনা ইহা গভর্নমেন্টের অধিকৃত। লৌহ ব্যবসায়, কাঠের থল, জোলাদের কাপড় ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

গয়ালী-মান্দ্রা– হলদিয়ার এক মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্লভসেন গয়া যাইয়া গয়ালীদিগকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। এজন্য মান্দ্রার সহিত গয়ালী শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। রাজবল্লভের তাম্রলিপিখানা এখনও গয়ালীদের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানে বহু-সংখ্যক 'রিষি' জাতির বাস। ইহাদের সংগৃহীত প্রচুর-পরিমাণে অসংস্কৃত চামড়া প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এস্থানে আসাম হইতে আনীত শাল কাঠের প্রধান বাণিজ্য স্থান।

শ্রীনগর– শ্রীনগর-জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালা কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগর গ্রামের পত্তন করেন এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন করতঃ সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা তাঁহার অক্ষয়-কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের হাট প্রসিদ্ধ। এখানে রবি ও বুধবার হাট হয় এবং বহু সংখ্যক স্থায়ী দোকান আছে। এখানে থানা, ডাক ও তারঘর, রেজেস্টারী আফিস ও ফৌজদারী বিচারালয় আছে, একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বিচারালয়ের কার্য সম্পন্ন করেন। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা- নৌকা চলাচল করে। পূর্বে এই বন্দরে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার পাট খরিদ-বিক্রয় হইত। এখন তাহা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। এস্থান বর্ষায় সর্বদা পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ তরণী-সমাকীর্ণ থাকে। শ্রীনগরের "রথের মেলা" প্রসিদ্ধ। শ্রীনগর হইতে একটি রাস্তা মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। শ্রীনগর পত্তন করিয়া কীর্তিনারায়ণ স্বীয় বাসভবনের চতুর্দিকে বিপৎকালে আত্মরক্ষার্থ যে চারিটি বুরুজ নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান থাকিয়া লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই বুরুজে দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কতিপয় বিগ্রহ স্থাপনও তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

দেউলভোগ– মঙ্গলবার ও শনিবার হাট মিলে, গরু বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে আবগারী দোকানও আছে। শ্রীনগর হইতে এ স্থানের ব্যবধান অতি অল্প মাত্র। এখানে একটি খোঁয়াড় আছে।

ষোলঘর– প্রত্যহ বাজার মিলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এ স্থান তত উন্নত নয়, স্থায়ী দোকান অনেকগুলি আছে। ষোলঘর বাজারে অনেক কাঁশারীর দোকান আছে। এ স্থান হইতে অনেক কাঁশার বাসন অন্যত্র রপ্তানি হয়। এখানে পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। রথ ও মনসা পূজার দশমী উপলক্ষে খুব বড় মেলা হয়। এখানে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য অনেক সুনিপুণ শিল্পী আছে। এ স্থানে কালীবাড়ি আছে। জস্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ষোলঘর বিক্রমপুরের একটি দীঘিকাবহুল গ্রাম। এই স্থানে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয় ও ডাকঘর আছে। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা-নৌকা চলে। ষোলঘরের 'ডাঙ্গার' কই-মৎস্য ও 'কাজীবাড়ির' আম বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

হাঁসাড়া– হাঁসাড়ার বাজার খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান অনেক আছে। নিকটবর্তী বহু গ্রামের লোক হাঁসাড়ার বাজার করেন। মহাত্মা পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় তদীয় মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে একটি দাতব্যচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অক্ষয়-কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। এখানে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। হাঁসাড়ার আলমগাজীর দরগা ও দীঘি খুব প্রসিদ্ধ। চৌধুরিগণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ ও পঞ্চরত্নমঠ এতদঞ্চলে বিশেষ খ্যাত।

মোহনগঞ্জ– পাটের গুদাম আছে; হাটও খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান-ঘরও কম নয়। ঢাকার গহেনা নৌকা এই বন্দরের নিকট দিয়া যায়, এজন্য এখানে স্বতন্ত্র গহেনা-নৌকা নাই।

রাজানগর– এখানে দুইটি হাট। পাটের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হইত। এখানে ডাকঘর আছে। রাজানগর একটি প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী।

হল্‌দিয়ার খালের শাখাপ্রশাখা অনেকগুলি; উক্ত শাখা-খালের তীরে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার অবস্থিত আছে; দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান করিলাম।

ধানকুনিয়ার খালের তীরে অবস্থিত– (একটি শাখা ধানকুনিয়া বন্দরের ঠিক দক্ষিণ দিক ঘেঁষিয়া পূর্বদিক চলিয়া গিয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।)

গাউদিয়া– হাট প্রসিদ্ধ; রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানটি 'ধাউদিয়া' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে ডাকঘর আছে।

কলমা– এই হাটটি নৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ; এই গ্রামের একটি বটবৃক্ষ 'কালাপাহাড় বৃক্ষ' বলিয়া সুপরিচিত; জনপ্রবাদ এই যে, হিন্দুবিদ্বেষী মোশ্লেম সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উক্ত বৃক্ষ মূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন, তদবধি উহা 'কালাপাহাড় বৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

বেজগাঁয়ের খাল– এই খালটি ঘোড়দৌড়ের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একশাখা বেজগাঁ ও অপর শাখা ভোগদিয়া গ্রামে গিয়াছে।

বেজগাঁ– বাজার প্রসিদ্ধ; কতকগুলি স্থায়ী দোকানও আছে। এই বন্দরে সহমরণের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, উহা **'সতী ঠাক্‌রুণের মঠ'** বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুন্সীবাড়িতে বহু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ ও অর্ধভগ্ন মন্দির ইত্যাদি দেখা যায়। এখানে ডাকঘর আছে। এখানে একটি ব্রাহ্মমন্দির আছে, ব্রাহ্মগণ সেখানে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। রথ উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়। মেলায় বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

ভোগ্‌দিয়ার খাল– পয়সা, মাইজগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া খিদিরপাড়ার মধ্যস্থিত বিলের মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছে; উহার পাড়ে : নিম্নলিখিত হাটগুলি প্রসিদ্ধ।

ভোগদিয়া– সোম ও শুক্রবার হাট মিলে; ধান বিক্রয়ের প্রধান হাট; কতকগুলি স্থায়ী দোকানও আছে। এখানে একটি খোঁয়াড় আছে।

খিদিরপাড়া– সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গলবার ও শনিবার হাট হয়; এখানে প্রচুর পাট জন্মে। ডাকঘর আছে; এই গ্রামের বাসুদেব জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ারের খালের তীরে– (এই খালটি হলদিয়া বন্দরের পশ্চিম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া শিমুলিয়া, ভাওয়ার প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া পদ্মার নিকট কোমরপুরের খালের সহিত মিলিত হইয়াছে।)

পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে:

শিমুলিয়া– হাট খুব প্রসিদ্ধ; সপ্তাহে একদিন,– মঙ্গলবার হাট বসে; জোলার কাপড় বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র-স্থান। প্রতি হাটবারে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রয়

হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা-সমূহের পাইকারগণ এই হাট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া স্ব-স্ব জেলায় প্রেরণ করিয়া থাকে। এই হাট ভাগ্যকুলের কুণ্ড ও হলদিয়ার পোদ্দারদের অধিকারভুক্ত। শিমুলিয়ার কৃষ্ণকিশোর পোদ্দার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া এতদঞ্চলে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন; দাতব্য চিকিৎসালয় ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। ইনি এক সময়ে খুব প্রতাপশালী ছিলেন। এই হাটের পশ্চিম দিক হইতে একটি ক্ষুদ্র খাল কুমারভোগ ও কাজিরপাগলা গ্রামের মধ্য দিয়া কোলাপাড়া গ্রামে পড়িয়াছে। খালের পাড়ে ছোট-বড় গ্রাম আছে।

ভাওয়ার–রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট হয়; এই হাট বাঁশ, লটাঘাস, ছাগ ও কচ্ছপ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ; আবগারী দোকানও আছে। এখানে বহু-সংখ্যক স্থায়ী দোকান-ঘর আছে, গোয়ালা ও সাহাগণ এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী। পদ্মার সন্নিকটে বলিয়া এই হাটে প্রচুর ইলিশ-মৎস্য পাওয়া যায়।

পোড়াগঙ্গার তীরে অবস্থিত– (হলদিয়া বন্দরের উত্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া এই খাল নাগেরহাট, জৈনসার, শিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তালতলার খালের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নৌ-বাহনযোগ্য পানি থাকে না।)

পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকাভিমুখে:– (নাগেরহাট, দক্ষিণ-চারিগাঁও, নওপাড়া, ভবানীপুর, জৈনসার, মধ্যপাড়া, আউটসাহী, শিলিমপুর, শুবচনী।)

নাগেরহাট– একটি প্রসিদ্ধ বাজার; স্থায়ী দোকান অনেক আছে, এখানে জোলাগণ তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উক্ত কাপড় রপ্তানি হয়। রথ উপলক্ষ্যে একটি মেলার অধিবেশন হয়। মাঘীসপ্তমী দিবসে একটি মেলা হয়। এই বাজারের পূর্বদিক ঘেঁষিয়া একটি খাল কনকসারের খালের সহিত মিশিয়াছে। এই গ্রামের কুম্ভকারগণ মৃৎ-শিল্প গঠনে সিদ্ধহস্ত; তিলক পালের শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় যথা-তথায় শ্রুত হওয়া যায়। আধুনিক যুগে তাঁহার অধস্তন পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ শিল্পের যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা দেশের গৌরবের বিষয়। প্রসন্ন পালের নামও প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-চারিগাঁও– হাট প্রসিদ্ধ, মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট মিলে; ধান্যের প্রধান বাণিজ্য-স্থান। রেনেল তাঁহার দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানকে 'দক্ষিণ-চারগাঁও' বলিয়া লিখিয়াছেন। এখানকার লেবু ও তরিতরকারী দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নওপাড়া– সপ্তাহে দুই দিন বুধ ও শনিবার হাট হয়। এই গ্রাম দক্ষিণ-চারিগাঁও হইতে পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যবধান মাত্র। নওপাড়ার পাট উৎকৃষ্ট; খুব খ্যাতি আছে। এখানে খুব ভাল ফসল উৎপন্ন হয়।

ভবানীপুর– সোম ও শুক্রবার হাট হয়। মধ্যপাড়া– রবি ও বুধবার হাট মিলে।

আউটসাহী– দৈনিক বাজার হয়। **শিলিমপুর**– হাট প্রসিদ্ধ; নিকটবর্তী বহু গ্রামের লোক এই হাটে আসে। এখানে কতকগুলি স্থায়ী দোকান আছে।

শুবচনী- হাট প্রসিদ্ধ। এইখানে প্রতি বৎসর একটি মেলাও হইয়া থাকে। কুকুটিয়ার খালের ধারে অবস্থিত। গয়ালী-মান্দ্রার পূর্বদিক হইতে উৎপন্ন হইয়া কুকুটিয়া গ্রামের

মধ্যে যাইয়া মিশিয়াছে।

কুকুটিয়া– দুইটি হাট; একটি পুরান হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাকঘর ও উচ্চ -ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। কুকুটিয়ার বুড়াশিবের বাড়ি প্রসিদ্ধ। অনেক লোক দর্শনার্থ আসে।

কাজিরপাগলার খালের পারে অবস্থিত। গয়ালী-মান্দ্রার পশ্চিম হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রামের মধ্যে গিয়াছে।

কাজিরপাগলা– বাজার প্রসিদ্ধ; স্থায়ী অনেক দোকান আছে। সাহাগণই প্রধান ব্যবসায়ী। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এখানে হইতে ঢাকা মুন্সীগঞ্জে গহনা-নৌকা যায়। এখানকার বাজারে স্থায়ী দোকানও আছে।

কোলাপাড়া বা ঘোষের কোলাপাড়া– গ্রামে দুইটি হাট মিলে। গ্রামের উত্তর ভাগকে কোলাপাড়া এবং দক্ষিণ অংশকে ঘোষের কোলাপাড়া বলা হয়।

সমাসপুর– কয়েক বৎসর যাবত একটি নূতন হাট জমিয়াছে; এখানে কেবল মুসলমানের বসতি। মুসলমানেরা বেশ উৎসাহের সহিত ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান্।

নাগরভাগের খালের পারে অবস্থিত– গয়াল-মান্দ্রার মাইল দেড়েক উত্তরে যাইয়া একটি শাখা নাগরভাগ গ্রামের মধ্যে মিশিয়াছে। নিম্নলিখিত হাট ও বাজার প্রসিদ্ধ।

নাগরভাগ– সোম ও শুক্রবার হাট মিলে, দুধ, মাছ, তরিতরকারী প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বসতি। শিক্ষিত পল্লী।

শেখেরনগরের খালের তীরে অবস্থিত– পুটিমারার নিকট হইতে এক শাখা শেখেরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

শেখেরনগর– হাট প্রসিদ্ধ। দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে; ডাকঘর আছে। রেনেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে এস্থানের উল্লেখ আছে, তিনি এই স্থানকে 'সেখীনগর' বলিয়া লিখিয়াছেন। এ গ্রাম বিক্রমপুরের একটি উন্নত পল্লী।

তালতলার খালের তীরস্থ বন্দর– এই খাল ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মালখাঁনগর, বালিগাঁও প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বহরের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিশিয়াছে। একটি প্রকাণ্ড ইটের পুল, খালের উপরের প্রধান কীর্তি।

রায়পুরা– এই বন্দরটি খাস গভর্নমেন্টের পত্তনে; পাট ক্রয়-বিক্রয়ের বাণিজ্য-স্থান; এই বন্দরটি তালতলার খুব নিকটে। এ গ্রামে প্রাচীন কীর্তি আছে।

বালিগাঁও– হাট প্রসিদ্ধ; রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ডাকঘর আছে। হাটটিরও বেশ খ্যাতি আছে।

গৌরগঞ্জ বা দহরি– মীরকাদিমের খালের তীরস্থ বন্দর। এই খাল রিকাবীবাজারের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালটিও বোধ হয় সেন বংশের কোন রাজা খনন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

টঙ্গিবাড়ি– হাট প্রসিদ্ধ, পান ও তরকারী প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এখানে থানা ও ডাকঘর আছে। এই গ্রামটিতে অনেক প্রাচীন কীর্তি আছে।

মীরকাদিমের খালের শাখা-প্রশাখা অনেকগুলি, উক্ত শাখা-খালের পারে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার আছে তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাকুহাটীর খালের তীরবর্তী বন্দর– এই খালটি টঙ্গিবাড়ির মাইল খানেক দক্ষিণে মীরকাদিমের খাল হইতে উৎপন্ন হইয়া মাকুহাটি গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে।

কাটাখালি– এখানে অনেকগুলি পাটের গুদাম আছে। পূর্বে প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ টাকার পাট বিক্রয় হইত। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও কাটাখালি খালের সঙ্গম-স্থানে অবস্থিত।

মাকুহাটী– সেরেজাবাদ

মাকুহাটী– এখানকার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ; বন্দরে অনেক স্থায়ী দোকান আছে। রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। উহাতে বানান করা হইয়াছে Maquady। এক সময়ে এখানে প্রচুর-পরিমাণে তাঁতের 'মাকু' বিক্রয় হইত। 'মাকু' বিক্রয়ের হাট বলিয়া ইহা মাকুহাটী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই হাটটির অবস্থান বড় সুন্দর। মাকুহাটির খাল ও ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই সংযোগ-স্থলে এই হাটটি অবস্থিত। নদীর অপর পার, চর অঞ্চল হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেরেজাবাদ– রেনেলের মানচিত্রে Sarajabad এইরূপ লিখিত আছে। সাধারণত এই স্থানের নাম স্থানীয় জনসাধারণ সেরেজাবাদ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। হাটটি প্রসিদ্ধ; এক সময়ে এখানে নীলের কুঠী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সুধারাম বাউলের আখ্ড়া উল্লেখযোগ্য। পুরা বা পুরুয়া গ্রামে একটি নূতন হাট বসিয়াছে। সেরেজাবাদ ও পুরুয়া এই দুইটি গ্রামই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

আরিয়লের খালের পারে অবস্থিত বন্দর (মীরকাদীম ও মাকুহাটি খালের সঙ্গম-স্থল হইতে উৎপন্ন)।

আরিয়ল– নৌকা বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট; এখানে পূর্বে প্রচুর-পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখনও কাগজ তৈয়ারী হয়। আরিয়লে পাঁচ-ছয় শত মোসলমানের বসতি। কাগজ প্রস্তুতকারক বলিয়া ইহারা 'কাগজ' নামে সুপরিচিত; এখন ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে দপ্তরীর কার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে। এখানে ডাকঘর আছে।

সোনারঙ্গের খালের পারে অবস্থিত : (মীরকাদিমের খালের শাখা)

সোনারঙ্গ– একটি বাজার; ডাকঘর ও তার আফিস আছে। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, এবং দুইটি প্রাচীন দেউলবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সোনারঙ্গের যুগ্মমঠ দর্শনযোগ্য। পূর্বে এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। এখানে চৌদ্দহাজারি নামক একটি পল্লী আছে।

দইধার মার বাজার– শাখা-খালের পারে এই বাজারটি অবস্থিত। এখানে নিয়মিতভাবে বাজার মিলে।

ভীরুজখাঁর খালের তীরস্থ হাট

সানিহাটী গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ভাওয়ারের হাটের দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষিয়া কোমরপুরের খালে মিশিয়াছে।

ভীরুজখাঁ– গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট; এখানে খোঁয়াড় আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের তীরস্থ বন্দর বা হাট-বাজারঃ

হাঁসাইল– হাট প্রসিদ্ধ; এক সময়ে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল; ডাকঘর আছে।

ভরাকৈর– স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত। ডিঙ্গী নৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। ভদ্রপল্লী। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস।

কামারখাড়া– বাজার আছে। গৃহীর নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

বজ্রযোগিনী– মীরকাদিমের একটি শাখা-খালের তীরে অবস্থিত; বাজার প্রসিদ্ধ। একটি প্রাচীন স্থান। এই গ্রামে বহু প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানেই বৌদ্ধতান্ত্রিক অদ্বিতীয় জ্ঞানী দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে তার ও ডাকঘর আছে। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ও রহিয়াছে। ইহা প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের (রামপালের) অন্তর্ভূত।

সানিহাটী– পদ্মা হইতে উৎপন্ন শাখা-খালের তীরে অবস্থিত ছিল; এখানে তিনটি বাজার মিলিত। দরজী, লোহা, কাপড়, ডাইল ও চাউলের স্থায়ী দোকান ছিল। এখানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বড় রাস্তা কিংবা গ্রামের ভিতর যে সমস্ত বন্দর বা হাট-বাজার

ব্রাহ্মণগাঁও– লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্তী; এইখানে পিতলের বাসন প্রস্তুত হইত। অনেক কাঁশারীর বাস ছিল। প্রত্যহ বাজার মিলিত। কয়েকখানা স্থায়ী দোকানও ছিল। ব্রাহ্মণগাঁয়ের ঘোষবাবুরা একসময়ে খুব প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইঁহাদের নির্মিত 'ঠাকুরদালান' বা 'দুর্গামণ্ডপ' একটি দেখিবার জিনিস ছিল। এখানে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডাকঘর ছিল। কয়েক বৎসর হইল ইহা পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুমারভোগ– চন্দ ভূমধ্যধিকারীগণ এই বাজারের স্থাপয়িতা, হল্‌দিয়ার মাইল-খানেক পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে চাউল, ডাল, কাপড় প্রভৃতির স্থায়ী দোকান আছে।

মাইজপাড়া– শ্রীনগর থানার অন্তর্গত, সোম ও শুক্রবার হাট হয়, হাট প্রসিদ্ধ; মাইজপাড়ার কালীবাড়ি প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রথ উপলক্ষে এখানে একটি মেলার অধিবেশন হয়।

রাড়ীখাল– বাজার হয়। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও ডাকঘর আছে।

বাসাইল– খালের ধারে গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। অনেক টোল আছে, এজন্য এ স্থানকে টোলবাসাইলও বলে। ডাকঘরের মোহরের শেষোক্ত নামই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজার প্রসিদ্ধ। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে বাসাইলের উল্লেখ

আছে।

বীরতারা– শ্রীনগরের সন্নিকটে। রবি ও বৃহস্পতিবার হাট মিলে। চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি বড় মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর আছে। প্রতিদিন বাজারও বসে।

সিংপাড়া– বাজার প্রসিদ্ধ, অনেক স্থায়ী দোকান আছে। শ্রীনগর হইতে যে সড়ক মুন্সীগঞ্জ গিয়াছে তাহার পার্শ্বে অবস্থিত।

ইছাপুরা– তালতলা হইতে যে রাস্তা শ্রীনগর গিয়াছে তাহার পার্শ্বে কয়েকখানা স্থায়ী দোকান আছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই মিলে। এখানে ডাক ও তার আফিস, উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এক সময়ে এখানে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল।

তন্তর– শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। বাজার প্রসিদ্ধ। অনেক স্থায়ী দোকান আছে। এখানে ঘানিতে উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়।

বিবন্দী– পূর্বে এখানে হাট মিলিত; এখন বাজার হয়। এ-গ্রামের বাসুদেব প্রসিদ্ধ। পুরোহিত-বাড়িতে রজত-নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হইয়া থাকে। এখানে অল্প-দিন-যাবৎ ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের একটি পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে।

ইমামগঞ্জ– শ্রীনগর থানায়; গরু বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বেজেরহাটী– রসুনিয়ার সন্নিকটবর্তী গ্রাম। হাট প্রসিদ্ধ।

তারাটিয়া– লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্তী; বাজার প্রসিদ্ধ।

ভীলাকান্দি– রাজাবাড়ির থানার অন্তর্গত; গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট।

করিমগঞ্জ– রাজাবাড়ি থানায়, (বর্তমান দীঘিরপাড়) গরু বিক্রয়ের হাট।

পঞ্চসার– মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরে; বাজার মিলে; গুড় প্রস্তুত হয়; প্রচুর পান উৎপন্ন হয়।

খালিপাশা– মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটে; হাট হয়। পান, তরিতরকারী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য।

গারুরগাঁও– হাট হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের হাট, বাজার ও বন্দর

চিকন্দী– এখানে গব্য-ঘৃত এবং ক্ষীরের আমদানি প্রচুর-পরিমাণে হইয়া থাকে। গঙ্গানগরের-ক্ষীর ও ঘৃতের খ্যাতি আছে।

পণ্ডিতসার– বাজারের পুস্তকের দোকান। প্রেস এবং কাঠের 'থল' রহিয়াছে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস।

পালং– প্রসিদ্ধ হাট ও বাজার। এখানে অনেক দোকান-পশারী, কাঁশারীদের দোকান, মনোহারী দোকান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে।

কাঞ্চনপাড়া– এখানে ধান, চাউল, খেজুর-গুড়ের প্রচুর আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে।

মাঐসার বা মহীসার– শ্রীশ্রী দিগম্বরীতলা তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। এখানে সপ্তদিবসব্যাপী একটি মেলা হয়।

সেনের বাজার– খেজুরীগুড় বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত।

বুড়ীরহাট– বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই হাটে গরু, নৌকা, উলুখড়, ঘাস ইত্যাদি খুব বেশী বিক্রয় হয়।

নরিয়া– প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দর। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু ধনী-ব্যবসায়ীর বাস।– প্রাচীন, নরিয়ার সীমা, দৈর্ঘ্যে– উত্তরে আরাফুলবাড়িয়া হইতে দক্ষিণে খৈয়ারবিল পর্যন্ত অনুমান পাঁচ-ছয় মাইল ও পশ্চিমে মূলপাড়া হইতে পূর্বে কেদারপুর চণ্ডিপুরের পশ্চিম অর্থাৎ, বর্তমান মুলফৎগঞ্জের খালের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত অনুমান সাড়ে তিন মাইল। রেনেলের মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে–বর্তমান সময়ে প্রাচীন নরিয়ার আট ভাগের একভাগ মাত্র ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকী সকলই পদ্মার চরের অন্তর্ভূত হইয়াছে। নরিয়ার ঘটকবংশীয়দের প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। উহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।– উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর প্রাকৃতিক বিপ্লবে, নানাভাবে দিন-দিনই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলে হাট-বাজার ও বন্দরের, নানারূপ রূপান্তর ও স্থানান্তর ঘটিতেছে। কাজেই স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের প্রসিদ্ধিরও হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রকৃতি-পরিচয়

বিক্রমপুরের জলবায়ু

বিক্রমপুর নদী-মাতৃক দেশ হইলেও ইহার ভূ-ভাগ সর্বত্র সমতল নহে একথা পূর্বেও বলিয়াছি। এজন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও ইহার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কোন কোন স্থান-বিশেষ স্বাস্থ্যকর, আবার কোন কোন স্থান একান্ত অস্বাস্থ্যকর। জল-বায়ু জমির উর্বরতা ও নিম্নতার জন্যও ঐরূপ হয়। শতবর্ষ পূর্বে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল, দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। সেকালের সংবাদপত্র ও সরকারি রিপোর্ট হইতে তাহা বিশদভাবে জানিতে পারা যায়।– তদানিন্তন একজন লেখক বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলেন– তথায় ক্রমাগত কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে মাতঙ্গকল্প সুস্থকায় বীর-পুরুষকেও পীড়াগ্রস্ত এবং দিন দিন ক্ষীণদেহ ও হতবীর্য হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইতে হয়। আইরল, মালদা, ধীপুর, রাউতভোগ, যশোলঙ্গ, কাঠাদিয়া, কেয়ার, নয়না, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রাম-সমূহ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। এই নিমিত্ত উল্লিখিত স্থানগুলি অত্যন্ত বিরলবসতি হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ অল্প জনাকীর্ণ স্থানেও বিকটমূর্তি পীড়াদেবীর মন্দ প্রভাব লক্ষিত হয় না, এমন গৃহ অতি অল্প, যাহাতে দুই-একজন রুগ্‌ণ, সুতরাং শয্যাগত ও শান্তি-সুখ-বঞ্চিত দৃষ্ট না হয়।– পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই গাঢ় জঙ্গলাকীর্ণ, তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়ুর সঞ্চালন দূরে থাকুক, শারদীয় শুক্লপক্ষের রজনীও কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার ন্যায় বোধ হয়। জঙ্গলের মধ্যবর্তী পল্লীসমূহের মধ্য দিয়া অতিশয় সংকীর্ণ পয়ঃ-প্রণালী-সকল বহিয়া গিয়া গ্রাম্য পুষ্করিণীর সহিত মিশিয়াছে, ঐ সকল পয়ঃ-প্রণালী ও পুষ্করিণীগুলি সর্বদাই 'সেওলায়' (শৈবাল) আবৃত আছে। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বৃক্ষাদির গলিতপত্র মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, বর্ষাকালের ঐ সকল পত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার আবর্জনা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া পুষ্করিণী ও পয়োনালে তাহারই স্রোত বহিতে থাকে, জল ঈষৎ লালের সহিত কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত চমৎকার! একপ্রকার রঙ্গে রঙ্গিন হয়। তাহা এইরূপ সমল যে সংস্কার করিয়া লইলে একসের জলের মধ্যে তিন পোয়া জল পাওয়া কঠিন হয়।– স্বাস্থ্যের নিদান যে জল-বায়ু তাহা বৎসরের অধিককাল যে স্থানে দূষিত থাকে, তথায় যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যায় তাহা আশ্চর্য! বাস্তবিক অনেককে নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়, অকাল মৃত্যুর সংখ্যাও কম নহে, অনেকে 'গুল' ধারণ করিয়া হস্তে বা পায়ে একটি নরদামা খুলিয়া দিয়া শরীরকে দশদ্বার বিশিষ্ট করিয়া রাখেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ ঢাকার তদানিন্তন সিবিলসার্জন ডাঃ টেইলার বিক্রমপুরকে ঢাকা জেলার একটি প্রধানতম অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১] ইহা শতবর্ষ পূর্বের

১. 'পল্লীবিজ্ঞান' ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। মি এস্‌কলি সাহেব বলেন– In 1840 the civil surgeon of Dacca described Bikrampur as one of the most unhealthy parts of the District.

কথা। বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরের কোন গ্রামেই বড় একটা বনজঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ, ঘাট, খাল, পুষ্করিণীর উন্নতি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নলকূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ অনেক হ্রাস পাইয়াছে।– কিন্তু শ্রীনগর থানার অন্তর্ভূত গ্রামের লোকের যেরূপ জলকষ্ট মুন্সীগঞ্জ বিভাগের তদ্রূপ নহে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীনগর বিভাগে ওলাউঠা রোগে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এবং প্রতিবৎসরই হইয়া থাকে। দূষিত জলপান করাই যে তাহার মুখ্য কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিক্রমপুরের এতদঞ্চলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পুকুর, ডোবা, খাল ইত্যাদি শুকাইয়া যাইয়া জলের এইরূপ দুর্দশা ঘটে। সময় সময় দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে বহু লোকের প্রাণনাশ হইয়া থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গ্রাম বনাকীর্ণ ও লোকজন-সমাগম-হীন ছিল, এখন তাহা জন-মুখরিত ঘন বসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের জল-বায়ুর ঋতুবিশেষে পরিবর্তন হইয়া থাকে। বর্ষার সময় দেশের চরম দুরবস্থা হয়। নদ, নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী, মাঠ, ঘাট সমুদয় জলে পূর্ণ হইয়া বিক্রমপুরকে দ্বীপের ন্যায় করিয়া তোলে। তখন সর্বত্র পানিতে জলময় হয়। বাড়িতে, উঠানে এমন কি কোন কোন স্থলে গৃহের মেজেতে পর্যন্ত জল উঠে। তখন উপরেও জলেও-ধারা, নিম্নের জলের প্লাবন, কাজেই বিক্রমপুরবাসীকে দারুণ ক্লেশের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতে হয়। এমনকি, অনেকের গৃহের মধ্যে জল উঠিয়া বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বংশ ও কাষ্ঠাদি নির্মিত মঞ্চের উপর বাস করিতে হয়। অতি বর্ষা-নিবন্ধন সময় সময় শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

উদ্ভিজ্জ ও শস্য

উদ্ভিজ্জ ও শস্য সম্বন্ধে আমরা প্রথম অধ্যায়েও সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি। ধলেশ্বরী, ইছামতী, মেঘনা ও পদ্মা-নদীর জন্য বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিনী-শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এজন্য এখানে প্রচুর-পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। আশুধান বিক্রমপুরের সাধারণ লোকের অতি প্রিয়। এবং প্রধান উপজীবিকা বলা যাইতে পারে। আশুবর্ষা, আশুধান্যের পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত হৈমন্তিক ধান্য (আমন ধান্য) হেমন্তকালে ইহা কাটা হয় বলিয়া ইহার নাম হৈমন্তিক। সর্ষপ, কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, পাট, কার্পাস, কালিজিরা, ধনিয়া, তামাক, সুপারি, মেথি, শণ, চিনাই, করলা, প্রভৃতি নানা জাতীয় ফসল জন্মিয়া থাকে।

বিক্রমপুরের লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। ময়দা, আটা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। বিক্রমপুরে সাধারণত নানা প্রকার ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। তবে প্রধানত চারি প্রকারের ধান্যের চাষই প্রচলিত। যথা– আউস, আমন, দিঘা, রোয়া। এই বিভিন্ন জাতীয় ধান যথাক্রমে বিঘা প্রতি ১০, ২৫, ১৫, ৩০, ১২, ২৫, এবং ১৫, ২৫, মণ পর্যন্ত জন্মে। পৌষের শেষ ভাগ হইতে চৈত্রের প্রথমভাগ পর্যন্ত তিনমাস ব্যতীত আর সকল মাসেই বিক্রমপুরের কৃষকেরা ধান কাটিয়া ঘরে আনে।

ধানের নানা প্রকার সুন্দর নাম ও জাতিভেদ আছে। যেমন উড়িজাল, কালমাণিক, চিনিশঙ্কর, জমির ফুল প্রভৃতি চল্লিশ প্রকার। আউস ধান্য এবং অঘুনিয়া, ইদা, কালাসোনা, পাইনকাইজ, প্রভৃতি আশী প্রকারের আমন ধান্য। ধলদিঘা, আশ্বিনী, কার্তিকাইল প্রভৃতি প্রায় বিশ রকমের দীঘাধান এবং কালাবোরা, গইলারি, জামালভোগ প্রভৃতি কয়েক প্রকারের রোয়া ধান উৎপন্ন হয়। এখানে ধান সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা বলিতেছি।– সমগ্র ভারতবর্ষে দশ হাজার রকম আমন জাতীয় ধানের চাষ হয়। বাঙলা দেশে আমন ধানের সংখ্যাও চারি হাজারের কম নহে।– এখানে বাঙলার কোথায় কোন্ জেলায় কত রকমের ধানের চাষ হয় তাহার একটু উল্লেখ করিলাম।– সুন্দরবন জঙ্গলমহলে ২৫/৩০ রকম, মেদিনীপুর ৩০/৩২ রকম, যশোহরে ৬২ রকম, ঢাকা ও বরিশালে শতাধিক রকম, ২৪ পরগনা, নদীয়ায় ৬০/৬২ রকম, হুগলী, বর্ধমান, পূর্ণিয়ায় ৭০/৭২ রকম, রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে ২৫/৩০ রকম। আসামেও বহু রকম ধানের আবাদ হয়। বাঙলার আমন ধানের মধ্যে, কার্তিক শাল, ঝিঙ্গাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশাল, কামিনীশাল, বাগতুলসী, নাগড়া, দাউদখানী বা দাদখানী, কাটারিভোগ, বাদশাভোগ, সমুদ্রবালি, বাঁশমতী কালিজিরা প্রভৃতি প্রধান। বাঙলাদেশে যে কত প্রকার আউসধান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুরে বহু প্রকার আউসের আবাদ হয়। আউস ধানের মধ্যে দুর্গাভোগ, কেলেরোয়ে, কেলেবোগরা, লক্ষ্মী-পারিজাত, লক্ষ্মীপূরা, রাজশাই, শালাই, সীতাহার, সূর্যমণি, সূর্যমুখী প্রভৃতি প্রধান।

বোরো ও জলিধান– বোরো ধানকে আমন বা আউশ কিছুই বলা যায় না। ইহা উহাদের মাঝামাঝি এক প্রকার মোটা ধান। জলি ধানকে আউসের শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। কাজেই আমরা দেখিতে পাইলাম, বাঙলা দেশে বিভিন্ন জেলায় যে ধান জন্মে, তাহার অনেকটা বিক্রমপুরেও জন্মিয়া থাকে। ইহার দ্বারা, বিক্রমপুরের চাষীদের কৃষির প্রতি অনুরাগও তাহাদের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে।

বিক্রমপুরে ধান উৎপন্ন হইলেও অধিবাসীর পক্ষে উহা পর্যাপ্ত নহে। বরিশাল ও বাগেরহাট অঞ্চলে এক প্রকার সরু পাতলা ধান জন্মে উহা হইতে সেখানকার লোকেরা এক জাতীয় সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করে। এই সিদ্ধ চাউল "বালাম" নামক একপ্রকার সে দেশীয় নৌকায় বোঝাই হইয়া দেশে দেশে বিক্রয়ার্থ যায়, উহা 'বালাম চাউল' নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের প্রত্যেক হাটে ও বন্দরে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ বালাম চাউলের আমদানি হয়। এবং বিক্রমপুরের মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন এবং ধনী ব্যক্তিরা বেশীর ভাগই বালাম চাউলের ব্যবহার করেন। খুলনা অঞ্চলের এক প্রকার সাদা, মোটা আতপ চাউল প্রস্তুত হয়, উহাকে লোকে 'ভাটিয়াল চাউল' বলে। এই সিদ্ধ বালাম ও ভাটিয়াল আতপের বিক্রমপুরে খুবই প্রচলন আছে। বিক্রমপুরে এক সময়ে অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাষ হইত।

বিবিধ উদ্ভিদ

তরকারীর মধ্যে শিম, বেগুন, কলা, মূলা, আলু, কচু, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, কাকরোল, পানিকচু বা জলকচু, ঘেচু, শাকআলু, নানা জাতীয়

ডাটা, পালংশাক, গিমিকুমড়া, হেলেঞ্চা, হিঞ্চি, রসুন, খেসারী শাক, পেঁয়াজ, পুঁই প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। আজকাল গোল-আলু, পটল, টমেটো, এবং নানাবিধ কপি, শালগম প্রভৃতিরও চাষ বিক্রমপুরে হইয়া থাকে।

ফলবান্ বৃক্ষ– ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারিকেল (খুব বেশী নহে) তাল, খেজুর, ফুটি, ক্ষিরাই, শশা, কাউ, জম্বুরা, (বাতাবী লেবু), আম, জাম, কালজাম, তেঁতুল, আমলকী, কলা, নানা জাতীয় আনারস, লেবু-জামির, পেয়ারা (গয়া বা গইয়া) লট্‌কা, লিচু, জামরুল (আমরুল), চালতে, জলপাই, করঞ্জা (করজা), বেল, খদির, গাব, ডহুয়া, (ডেউয়া), ডেফল, কুচই, ময়না, বখই, নানাজাতীয় লেবু, কামরাঙ্গা, বিলাতি-আমড়া, লকেট, ডালিম, সপেটা, বিলাতি-গাব, বিলেতি-বেগুন (টোমেটো), পেঁপে উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি বিদেশী ফল এ দেশের হইয়া গিয়াছে, যেমন– মর্তমান বা মর্তবান কলা (মার্তাবানদ্বীপ), বাতাবি লেবু (ব্যাটাভিয়া সহর), পেঁপে (পাপুয়া দ্বীপ), আতা, নোনা প্রভৃতি প্রধান।

ফুল– নানা জাতীয় জন্মে। যথা– গাঁদা (গেন্ধা), যুঁই, বেলী, মালতী, অপরাজিতা, চাঁপা, সুবর্ণকলিকা, গন্ধরাজ, দোপাটি, কামিনী, শেফালী, টগর, বক, সাদাজবা, লালজবা, বকুল, চাঁপা, কনকচাঁপা, কাঁটালে-চাঁপা, আকন্দ, করবী রক্ত ও শ্বেত, ঝুমকো জবা (পঞ্চমুখী), শাপলা, কুমুদ, পদ্ম ইত্যাদি। রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গোলাপ, কাঠগোলাপ, শ্বেতগোলাপ, বিলেতি-মেহেদি, হলদে করবি, ভেরাণ্ডা, লালভেরেণ্ডা, মুকুট ফুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি অনেকগুলি ফুল বিদেশ হইতে ভারতে ও বাঙলা দেশে আসিয়াছে। লালভেরেণ্ডা রাস্তার পাশে জন্মিয়া থাকে। Sir Joseph Hooker ইহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। কাজেই ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইহা এই দেশে আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করা যায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহা বাঙলা দেশে দেখা যাইত না।

বন-ফুল– এখানে বিক্রমপুরের কয়েকটি বন-ফুল সম্বন্ধে বলিতেছি।

পিঠক্ষীরা, পিঠানি (গম্ভীরা)– সমস্ত সরু সরু ডালের অগ্রভাগে ফুলের ছড়া ঝুলিয়া পড়ে। ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দেখিতে সুন্দর নয়, গন্ধ নাই। ফুলের পাপড়ী ও সবুজ পুষ্পাভরণ এক বলিয়া বোধ হয় ও একটি ফুলে তিনটি করিয়া থাকে। পুং-কেশর অনেকগুলি। ফুলের বিশেষত্ব এই যে, পুষ্প-রেণু প্রচুর-পরিমাণে হয় ও চেষ্টা করিলে অনেকগুলি একত্র করা যায়।

পলাশ– বিক্রমপুরে এই গাছ খুব বেশী হয় না। কারণ ইহা জলপ্লাবিত স্থানে জন্মে না। পলাশ-ফুল যখন ফোটে তখন তাহার লোহিত শোভা সকলের মনোরঞ্জন করে। ফোটা অবস্থায় গাছ, পাতা-শূন্য অবস্থায় থাকে। এই গাছ Leguminosae বা সীম্বিক জাতীয়।

শাল্মলী বা শিমূল– পলাশ-গাছের ন্যায় শিমূল গাছেও ফুল ফুটিলে গাছগুলি বাস্তবিকই শোভন ও সুন্দর হয়। বিক্রমপুরে শিমূল গাছ খুব বেশী দেখা যায়। এই সমুদয় গাছে সচরাচর মাঘ মাসেই ফুল ফোটে। তখন চারিদিকে লালে লাল হইয়া যায়, এবং সত্য-সত্যই মনে হয়– "আগুন লেগেছে বনে বনে।"

চূত-মুকুল– মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সৌরভে বিক্রমপুরের বনস্থলী প্রমোদিত হইয়া

থাকে।

উড়িআম– ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নূতন পাতা ও ফুল একত্র হয়, গন্ধ পাওয়া যায় না।

গোলাপ-জাম– ফুলগুলি বড় হয় ও দেখিতে সুন্দর হইয়া থাকে। পুং-কেশরগুলি লম্বমান হইয়া ফুলের শোভা বৃদ্ধি করে।

কাউগাছ– চৈত্র মাসে ফুল হয়। এই জাতীয় গাছ পশ্চিমবঙ্গে বেশী দেখা যায় না। বিক্রমপুরে খুব বেশী জন্মে। এই গাছের ফুল গোলাপী রঙের হয় এবং বেশ দৃঢ় ও চতুষ্কোণ। ইহার ফল বর্ষাকালে পাকে এবং খাইতে অম্লমধুর।

লটকা– ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পুং-স্ত্রী দুই-জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে। ফল জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে জন্মে, স্বাদ অম্লমধুর।

বরুণ (বনুয়া-বউনা)– বরুণ গাছগুলি নূতন পাতার উপর শাদা শাদা ফুলের গুচ্ছ দ্বারা আবৃত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করে। গাছ তীক্ষ্ণ ত্বকবিশিষ্ট, ছাল, পাতা, ফল সকলই তীক্ষ্ণ। এ গাছের ছাল আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ফুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে। ফুলের চারিটি পাপড়ী ও চৌদ্দটি পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর। বর্ষাকালে বিস্তর ফল হয়, এই ফল কোন কাজে লাগে না। এইগুলি পচিয়া শুধু পুকুর ও খালের পানি নষ্ট করে। এই ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক।

ভাঁইট– (ভাণ্ডিল) সুন্দর শুভ্র ফুলগুলি; পাঁচটি পুষ্পাবরণ, পাঁচটি পাপড়ী নিম্নভাগ-যুক্ত হইয়া চুঙ্গির আকারে গঠিত। পুং-কেশর চারিটি এবং গর্ভ-কেশর দু'টি। গন্ধ বেশ মিষ্টি। এই গাছ আয়ুর্বেদীয় অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আস্বাদ তিক্ত। পথে-ঘাটে প্রচুর জন্মে।

চৌক-উদানী– গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বোটার রস চক্ষের পাতার উপর দিলে চোখ উঠা রোগ হয় না। ফুলগুলি ক্ষুদ্র গোলাপী রঙ্গের, দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই, গাছগুলি সুপারি বাগানে ও অন্য উচ্চ ভূমিতে জন্মে।– অনেকগুলি করিয়া ফুল এক এক গুচ্ছে হয়।

গাব– ফুলগুলি ঘটীর আকৃতি, দেখিতে বেশ সুন্দর, ছোট ছোট। গাছগুলি ঘনপত্রাবৃত বলিয়া ইহার চারিদিকটা একেবারে অন্ধকারময় হয় বলিয়া লোকে এই গাছ বড় ভালবাসে না। বিক্রমপুরের অজ্ঞ লোকের যতকিছু ভূতের ভয়, তাহা এই গাছকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। এই গাছ, দক্ষিণ ভারত হইতে বাঙলা দেশে আসিয়াছে।

সোনাল– (কবিরাজদের সোনামুখী) সাধারণ ভাষায় ইহা 'কানাইলড়ি' নামে পরিচিত। সমস্ত বৃক্ষটি ফুলের একটি ঝাড়ের মত দেখায়। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের সময় ইহার সৌন্দর্য অতুলনীয় হয়। এই ফুলের গন্ধ নাই, কিন্তু তার বর্ণের ও পরিচয়ের সৌন্দর্য অতি চমৎকার। এই গাছ সচরাচর জন্মে না। মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফুলগুলি লম্বা ছড়া। এইগুলিকে চলতি ভাষায় কানাইলড়ি বলে।

জারুল– এই বৃক্ষ বিক্রমপুরে যেখানে–সেখানে জন্মে। তক্তার জন্য এই গাছের ব্যবহার খুব বেশী। যত রকম বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে জারুলই তক্তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গাছ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড়েও জন্মে এবং সেখানেও কাঠের দিক দিয়া ইহা প্রসিদ্ধ।

এই গাছে যখন ফুল ফোটে তখন গাছগুলি দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। ফুলগুলি সাধারণত গোলাপী রঙ্গের ও তদ্দারা প্রায় সমস্ত বৃক্ষটি আবৃত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ইহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

হিজল– এই গাছ বাঙলার অন্যান্য অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ষার জলপ্রবাহে ইহার বীজ সঞ্চালিত হইয়া আপনা হইতে এই গাছ জন্মে। অতএব স্থানীয় অবস্থামতে এই গাছ বিক্রমপুরের সর্বত্রই দেখা যায়। ইহারা খালের পাড়ে, গড় ও মাঠে মাঠে জন্মিয়া থাকে। লম্বমান ছড়াতে ফুল হয়। সাধারণত গোলাপী রঙ্গের ফুল। কোন গাছের ফুল কম গোলাপী রঙ্গের ও কোনটাতে প্রায় সাদা মত হয়। ফুলগুলি আপনা-আপনি বা মক্ষিকার বা বাতাসের স্পর্শ-মাত্রে ঝরিয়া পড়ে। বৃক্ষেরতল কি স্থলে কি পানিতে এই ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ফুলের শয্যা পাতিয়া দেয় এবং মৃদু সৌরভে চারিদিক প্রমোদিত হইতে থাকে।

মোত্রা– এই 'গাছড়ার' বেতি দিয়া পাটী তৈয়ারী হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহাকে "পাটীপাতা" বলে। গড়ের পাড়ে ও 'কোলা' প্রভৃতি স্থানে বিস্তর জন্মে। ইহার ফুলগুলি খুব সাদা, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর-পরিমাণে ফুটিয়া মোত্রাবনকে সুন্দর সুদৃশ্য করিয়া তোলে। উদ্ভিদ্‌বিদগণের এই ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কচুরী– পানাজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিজ্জ। কয়েক বৎসর যাবৎ বিক্রমপুরে আসিয়া ছাইয়া পড়িয়াছে এবং তথাকার জলপথসকল প্রায় বন্ধ করিয়াছিল। এইগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িয়া জলপথ বন্ধ করিয়া দেয়, পুকুর ইত্যাদি আবৃত করিয়া ফেলে ও বর্ষা বেশী হইলে ধানক্ষেত ইত্যাদি আবৃত ও নষ্ট করে। বাস্তবিক ইহা বিক্রমপুরের এক নূতন প্রবল শত্রু। যদিও নবাগত কচুরী-পানা এমন শত্রু (পূর্বে এক রকম কচুরী এদেশে ছিল, এখনও আছে, তাহা এত বৃদ্ধি হইত না বা অনিষ্টকর ছিল না) কিন্তু যখন এই কচুরী 'বন'-ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয় তখন দেখিতে খুব সুন্দর হইয়া থাকে। গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলগুলি সবুজপত্র-মধ্যে দাঁড়াইয়া দর্শকের আনন্দদায়ক হয় ও কচুরীর অনিষ্টকারিতা ভুলাইয়া দেয়। কচুরীপানা ব্রেজিল হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিভাবে আসিল সে সম্বন্ধে নানারূপ জন-প্রবাদ প্রচলিত। সম্প্রতি কচুরীপানা বিক্রমপুর হইতে দূর করিবার জন্য একজন বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় এইবার কচুরী দেশছাড়া হইবে।

কাঠ জলকী– এই গাছ আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে। ফুল ফোটে অসংখ্য। সাধারণ চক্ষে দেখিতে সৌন্দর্য বেশী নাই, কারণ বর্ণ সুন্দর নয়; গন্ধ ভাল। কিন্তু ফুলগুলি উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদের পরীক্ষার যোগ্য। চারিটি পুষ্পাবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র বা বৃত্তির (sepals) সমষ্টিমাত্র। উহার মধ্যে নয়টি দন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনেক সংখ্যক পুং-কেশর (stamens) বহন করিতেছে। ফুলের পাপড়ী, গর্ভ-কেশর সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায় না।

লজ্জাবতী– "লতা লজ্জাবতী" উদ্ভিদ রাজ্যে চমৎকার সৃষ্টি। তাহার ফুলগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর। গোলাপীর রঙ্গের গোলাকার ফুলগুলি গন্ধশূন্য; এক-একটি 'ফুল' কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি, কতকটা কদম্ব ফুলের ন্যায়।

লজ্জাবতীর ক্ষুদ্র নিবিড়-বন বহু পুষ্প-কুটীরে বড় সুন্দর দেখায় ও নিকটে বসিলে মক্ষিকাগণ কেমন সুন্দরভাবে আত্মকার্যচ্ছলে প্রকৃতির কার্য করিতেছে দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। লজ্জাবতীর পত্র ও পত্রদণ্ডগুলি স্পর্শে বা সমীরণ স্পর্শে জড়সড় হইয়া পড়ে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহা সকৌতুকে দেখিয়া থাকে। কিন্তু ঐ লতার অন্য-ভাগ ও ফুল এবং ফুলের দণ্ড সেরূপ জড়সড় হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার উপযুক্ত বিষয়।

কদম্ব– বর্ষার সময়ে বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে কদম্ব। কদম্ব বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন স্থলেই অপরিচিত নয়! যাহা হউক বিক্রমপুরে কদম্ব গাছ বহুল-পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি সুবিধামত স্থানে হইলে সুদীর্ঘ ও সরলভাবে বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং যখন গাছ ভরিয়া ফুল ফোটে, তখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। ফুলগুলি সাধারণের চক্ষে বড়ই সুন্দর এবং উদ্ভিদ্‌বিদের নিকটও তাহা খুবই আদরের হওয়ারই কথা। এক-একটি কদম্ব-গোলক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি। তাহার উপরের একস্তর শুভ্র, অসংখ্য গদা-সদৃশ সুন্দর পুষ্পভাগ, দ্বিতীয়স্তর পীতবর্ণ অংশ, তৃতীয় স্তর হরিৎ পুষ্পভাগ ও চতুর্থস্তর কেন্দ্রভাগ দৃঢ়, একটি গোলক। কিন্তু তাহা ফুল বা বীজ নহে। ফুলের গন্ধ মৃদু, রৌদ্রের দিনে গাছের নিকটবর্তী স্থান গন্ধে আমোদিত হয়। ছেলেমেয়েদের খেলার ফুলের মধ্যে কদম্বই প্রধান। অতি বৃষ্টিতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, রৌদ্র হইলে এবং দিন বেশ পরিষ্কার থাকিলে ফুল বেশী হয়।

কেলীকদম্ব– কদম্ব জাতীয় বৃক্ষের ফুল, এটা সাধারণ জাতীয় কদম্বের মত হইলেও আকারে অনেক ক্ষুদ্র হয়। ফুলের আকারে-প্রকারে গঠন একই প্রকারের।[১]

এইভাবে আমরা বিক্রমপুরের নানাস্থানে নানা জাতীয় ফুল ও ফল দেখিতে পাই। সে সমুদয়ের বিস্তৃত-পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ বিষয়ে বিক্রমপুরের উৎসাহী তরুণ উদ্ভিদ্‌বিদগণের আলোচনা করা কর্তব্য।

বৃক্ষাদির মধ্যে– ফলবান্ বৃক্ষের নাম পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন এখানে সাধারণভাবে পুনরায় বলিলাম, ইহাতে দ্বিরুক্তি হইলেও বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। আম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শিমূল, জারুল, উড়িয়াম, পলাশ, হিজল, বরুণ (বউনা), ছায়াতন (সপ্ততাল–সপ্তপর্ণী) পারুল, পিঠক্ষীরা, রয়না (রণা) করই, পাকুরকানী, যজ্ঞ-ডুমুর, গাম্ভারী, গণিয়ারী, পিপুল, নাওসোনা, কদম্ব, শিরীষ, পয়াই, মান্দার দুই রকমের হয়। কাঁটা-মান্দার এবং পালা-মান্দার। কাইপলা (জিকা) ইহা হইতে আঠা হয়। গোলাপজাম, কালজাম প্রভৃতি গাছের নাম করা যাইতে পারে। বাঁশ ও বেত এক সময়ে বিক্রমপুরের সর্বত্র খুব অধিক-পরিমাণে দেখা যাইত, এখনও আছে। সাধারণত বিক্রমপুরে চার-পাঁচ রকমের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন– বড়া, তল্লা, মূলি ইত্যাদি। খাল ও ঝোরাখালের মধ্য দিয়ে নৌকাপথে চলিতে গেলে কবির কথা মনে পড়ে,– 'কোথাও বাঁশের ঝাড় এলিয়ে পড়েছে।'

বাঁশের ঝোপ একেবারে খালের উপর ঝাঁকিয়া পড়িয়া নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। বেতসকুঞ্জের ত কথাই নাই। বেতের করাতের মত অগ্রভাগ নৌকার ছই

১. আমরা বিক্রমপুরের বন-ফুল সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি আমার অনুরোধক্রমে মৎ সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় ১৩২২, ১৩২৩ সালে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ইত্যাদি আটকাইয়া ফেলে। এই অভিজ্ঞতা বিক্রমপুরবাসীমাত্রেরই আছে।

বিক্রমপুরের পূর্বাঞ্চল– বেতকা, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া, কসবা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু, আদ্রক (আদা) ও হরিদ্রার বেশ চাষ হয়।

পশু-পক্ষী

পূর্বে বিক্রমপুর যখন বনজঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন বিবিধ বন্যজন্তুর বাস ছিল এবং তাহারা রীতিমতভাবে গৃহস্থ ও পল্লীবাসীর প্রতি উৎপীড়ন করিত। ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের 'পল্লীবিজ্ঞান' (১৮৬৮ ফেব্রুয়ারী) পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদাবলীতে লিখিত আছে– "ইছাপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাঘ্র-ভয় হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বেই বাঘ ডাকে। দুইটি গরু নষ্ট করিয়াছে।"– সেকালের প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রেই এইরূপ সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের সংবাদপত্রে বিক্রমপুরের বন্য-জন্তুর উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। সে সময়ে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারও (Royal-Bengal-Tiger) মাঝে মাঝে দেখা যাইত। বন্য মহিষ, বন্য শূকর প্রভৃতির খুবই অত্যাচার ছিল। এমন গ্রাম ছিল না, যে গ্রামে বন্য শূকরের কথা শুনা যাইত না। সেজন্য গ্রামবাসিগণ নানারূপ অস্ত্রেরও ব্যবহার করিতেন এবং বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে বাহির হইবার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতেন এবং সঙ্গে শূল, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি থাকিত। হিংস্র-জন্তু ব্যতীত গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, মহিষ, প্রভৃতি প্রধান। বন্য-জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, খেঁকশিয়াল, ভোঁদর, বানর, (হনুমান দেখা যায় না) ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ছুঁচো, খাটাশ, উদ, (বন্য-শূকর বেশী দেখা যায় না।) বেজি, বাঘডাসা, ভাম খরগোশ উল্লেখযোগ্য। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ভিতর– কেঠো বা কাউঠা, কচ্ছপ বা কাছিম (নিরামিষাহারীরা ব্যতীত বিক্রমপুর অঞ্চলের হিন্দুগণ প্রায় সকলেই পরম পরিতোষের সহিত ইহা খাইয়া থাকে)। শৃগালের দংশন ও শৃগাল কর্তৃক শিশুহরণ-ব্যাপার বিক্রমপুরে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আমরা এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম:

"গত বুধবার বেলা অনুমান ৯ ঘটিকার সময় বিক্রমপুর সিরাজদীঘা থানার অন্তর্গত তাজপুর গ্রামের পোদ্দারপাড়ার রাজেশ্বর পোদ্দারের পত্নী পানির ভয়ে তাহাদের ১৪ মাস-বয়স্কা কন্যার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বারান্দায় তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া ঘর-কন্নার কাজ করিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে একটি শিয়াল আসিয়া শিশু-কন্যার কোমরের বাঁধন ছিঁড়িয়া তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া পানিপূর্ণ একটা নালা পার হইয়া যায়, অপর বাড়ির একটি মেয়ে উহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করায় শিয়াল তাজপুরের খাল পার হইয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করে। বলাই নামক একটি ছেলে খাল সাঁতরাইয়া পার হইয়া একটা ঝোপের মধ্য হইতে অর্ধমৃত অবস্থায় ঐ শিশুটিকে উদ্ধার করে। শিয়াল শিশুটির ঘাড়ে, গলায়, পিঠে ও হাতে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে। সিরাজদীঘা হাসপাতালে শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু সেখানে শৃগাল বা কুকুরের দংশনের চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকাতে শিশুকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে

পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গত ২ বৎসর পূর্বেও একটি শিশু-কন্যাকে শিয়ালে ঘর হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। (আনন্দবাজার- ১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৪)"

শিয়ালের এইরূপ উৎপাত প্রায় প্রতি গ্রামে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে।

গোধিকা– গোসাপ বা গুই সাপ। এই গুই সাপ এক সময়ে বিক্রমপুরে খুব বেশী-পরিমাণে ছিল, কিন্তু চামড়ার ব্যবসায়ীগণ গোসাপের চামড়া খুব বেশী মূল্যে ক্রয় করার দরুন, উহার বংশ প্রায় নির্মূল হইয়া আসিয়াছে। গোসাপ– সাপদের পরম শত্রু ছিল, ইহাদের দ্বারা অনেকটা সর্প-ভয় নিবারিত হইত, ইহাদের বংশ প্রায় নির্মূল হওয়ায় এই দিক্ দিয়া যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। টিকটিকি, গিরগিটি, প্রভৃতি নানাজাতীয় সরীসৃপও বিক্রমপুরে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যে গোধিকার বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

সর্প– বিক্রমপুরে নানা জাতীয় সর্পের বাস। সর্পদংশনে প্রতি বৎসর বহুলোকের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবৎসর কুড়ি-বাইশ হাজার লোকের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বাঙলাদেশেই সব চেয়ে বেশী লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। আমাদের দেশে গড় প্রতি, প্রতি বৎসরে প্রায় ১০৫৫৭ লোকের সর্প-দংশনে মৃত্যু হয়। বর্ধমান জেলায় সর্প-দংশনে সব চেয়ে বেশী লোক মারা পড়ে। প্রতি লক্ষে প্রায় ১৭৫ জন, তার পরে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে মৃত্যুসংখ্যা অনুপাতে কম নহে।

বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালীতে বাঙলাদেশের প্রচলিত অনেক সাপের নাম পাওয়া যায়। যথা:

ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজগর সাপে ॥
আড়রিয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন ॥
খইয়াজাতি নাগে পদ্মার হাতের বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা মাথায় বাঁধে খোঁপা ॥
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতিসর্প দিয়া বাঁধে মাথার পুটলী ॥
শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দুর।
বিঘতিয়া বোড়ানাগে চরণে নূপুর ॥
সূর্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলী।
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী ॥

এই সমুদয়-জাতীয় নাগ এবং প্রায় সমুদয় বিষধর সর্পই বিক্রমপুরে দেখা যায়। গোখুরা ও কেউটে-জাতীয় সর্প– (Proteroglypha), শঙ্খচূড় (King cobra, Niabungarus

Hamadryad), সাধারণ গোখুরা (Niatropudiaus), সাধারণ করেতা (Bungarus caeruleus), কুরসা (Echis carinata) এবং রাসেলস্ ভাইপার (Viper Russell's) প্রধান। এই-জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষধর। ইহাদের বিষ এত ভয়ঙ্কর যে, ইহারা দংশন করিলে অতি অল্প সময়েই প্রাণান্ত হয়। গোখুরা– এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষাক্ত। গোখুরা সাপ লইয়া বেদেরা বা সাপুড়েরা সর্বত্র সাপের খেলা দেখাইতে আসে। এই সাপ বিক্রমপুরে খুব বেশী দেখা যায়। গোখুরা সাপ নানা প্রকারের হয় এবং নানা নামে পরিচিত। যথা– নাগ, কেউটে, বা কেউটিয়া, কালসাপ, জাতিসাপ, কেউসাপ, খইয়ে-গোখুরা ইত্যাদি। বাঙলাদেশে কাল-গোখুরা সাপকেই কেউটে সাপ বলে। এই সাপের স্বভাব অতি ভীষণ। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী যেমন গোরু, ছাগল ইত্যাদি কাছে গেলেই এমন ফোঁস ফোঁস করে ও তাড়া করে যে, পলাইয়া তবে প্রাণ রক্ষা হয়। কেউটে সাপ, ভিজে ও স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতেই বেশী পছন্দ করে, ইহারা জলার ধারে ও ধানের ক্ষেতেই বেশীর-ভাগ থাকে। সাধারণত দাঁড়াইস বা ডারাস, দুধরাজ, জিঙ্গলাপোড়া (গাছে গাছে বাঁশের ঝোপে তীরের মত বেগে ছুটিয়া যায়) খইনা (খনিয়া), ডোরা বা ধোরা সাপ প্রভৃতি সচরাচর মাঠে, খালে দেখা যায়।

পক্ষী

বিক্রমপুরে নানা জাতীয় পক্ষী দেখা যায়। কাক, দাঁড়কাক, ঘুঘু, চড়ুই, টুনি, বউকথাকও, কোকিল, চিল, বাজ, শকুনি, গৃধিনী, কোড়াল, টিয়া, হরিকেল, ঘুঘু, ঝুটকলি, বক, হাড়গিলা, ডাহুক, পেঁচক, রামশালিক, মাছরাঙ্গা, বন-মোরগ, ঢুলি, বাবুই, বুলবুল, পিপি, তিতির, খঞ্জন, কুক্কুট, বেলেহাঁস, পানকাওর, দয়েল, চন্দনা, শালিক, সময় সময় নানা বিদেশী পক্ষীও আসিয়া থাকে, যেমন– সারস, সিদ্ধিগুরু, পাণিভোলা। সিদ্ধিগুরু পক্ষী যখন যে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় সেই গ্রামে মারীভয় দেখা দেয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সোনাগঙ্গা পাখী এখন দেখা যায় না।

মৎস্য

বিক্রমপুরের সর্বত্র দীঘি, পুষ্করিণী, খাল, বিল, নদ ও নদী থাকার দরুন মৎস্যের কোন অভাব নাই। মেঘনা ও পদ্মা এবং ধলেশ্বরী নদীতে প্রচুর-পরিমাণে ইলিশ মাছ জন্মে। নদ-নদী ও বিল-পুষ্করিণীতে রোহিত বা রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, চিতল, আইড়, ভাঙ্গনা, ভেটকী বা কোরাল, ভাঙ্গনা, এলাঙ্গি, চেলা, মৌরলা, পুটি, ফেসা, চাপিলা, কৈ, খলিসা, সিং, মাগুর, টেংরা, গোলসা, পাবদা, চাঁদা, শৌল, গজার, তপ্সী, পোয়া, বেলে বা বাইলা, বাইম-কাচকী, শিলন, বাঁচা, পাঙ্গাস, বোয়াল, চিংড়ী, মুগুড়ে বা চিংড়ী (ইচা) পুটি, সরপুটি, বৃহদাকার খড়গ মাছ প্রভৃতি মিলে। এত বিভিন্ন-জাতীয় ছোট-বড় মাছ আছে যে, তাহাদের নাম করা কঠিন। বিক্রমপুর হইতে প্রতিবৎর বহু হাজার টাকার মৎস্য বাঙলার নানা স্থানে বিশেষত কলিকাতাতে রপ্তানি হয়।

জল-জন্তুদের মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীতে,–কুমীর খুবই দেখা যায়, কিন্তু হাঙ্গর বড়-একটা নাই। শিশুক বা চলতি কথায় শুশুক খুব বেশী আছে এবং উহা সচরাচর দেখা

যায়। শিশুক মাছ হইতে প্রচুর-পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। এক-একটি শিশুকে আধ মণ হইতে দেড় মণ পরিমাণ তেল হয়। শিশুকের তেল, বাতরোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন।

বিদেশগত উদ্ভিদ

বিক্রমপুরের যে সকল উদ্ভিদ, ফুল ও ফল এবং ফলবান বৃক্ষের নাম করিলাম, তাহার অনেকগুলিই বিদেশ হইতে আসিয়াছে। কোন্ উদ্ভিদটি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য লিখিয়া দিয়াছেন।

পৈত্রিক বাসস্থান		বাঙলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন
আফ্রিকা	:	তেঁতুল, তাল, গিনিঘাস, অড়হর, তরমুজ, ভেরেণ্ডা।
আমেরিকা	:	ভুট্টা, টোমাটো, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পেঁপে, লঙ্কা, টেপারি, তামাক, পেয়ারা, আনারস, আতা, নোনা, বকুল, মিঠাকুমড়া, চিনাবাদাম, হিজলী বাদাম, কচুরীপানা।
গ্রিস ও ইতালি	:	মসূর, মটর।
চীন	:	চা, লিচু, কামরাঙ্গা, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, জবা, আক।
পারস্য ও আফগানিস্তান	:	পালংশাক, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, খেজুর।
মালয় দ্বীপপুঞ্জ	:	নারিকেল, পান, সুপারি, ঝিঙ্গা।
মেসোপোটেমিয়া	:	যব, গম।
যাভা (যবদ্বীপ) সিংহল	:	তিল, চালকুমড়া, আম।
ইউরোপ– বেলুচিস্থান	:	পোস্ত, গোলাপ, বাঁধাকপি, মেঁদি, ডালিম।

এই তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ বৃক্ষ ও লতার মধ্যে বেশীর ভাগই বিদেশাগত উদ্ভিদ।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের জনসংখ্যা

মোট-জনসংখ্যা– ১,৫২,১৩১ জন।

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৩৮,১৭৬	৩৯,৫৭২	৭৭,৭৪৮
মুসলমান	৩৪,৪৭৭	৩৭,৪৪৭	৭১,৯২৪
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী	১,৩৭৪	১,০৮৫	২,৪৫৯

সেন্সাস্ রিপোর্ট বা আদমসুমারির বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মাদারীপুর মহকুমার জনসংখ্যা গোঁসাইরহাট ও শিবচর থানায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ, (১) নদীর ভাঙ্গনী (২) এ থানার কোন কোন অংশ ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। পালং ও রাজৈর প্রভৃতি থানায় জনসংখ্যা ৩.৮ হইতে ৬.৩ শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি, সংক্রামক ব্যাধির অভাব এবং পাটের ব্যবসায়ের জন্য নানা স্থানের লোক আসিয়া এখানে বাস করিতেছে।[১]

ঢাকা জেলার প্রতি বর্গমাইলে সাধারণত ৯৩৫ জন লোকের বাস। টঙ্গিবাড়ি থানায় প্রতি বর্গ মাইলে ৩,০৪৪, লৌহজঙ্গ ৩,২২৮, মুন্সিগঞ্জ ২,৪১৩, শ্রীনগর ১,৮৯৫ হইতে ২০০০ জন লোকের বাস। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সার রিপোর্ট বা আদমসুমারির বিবরণীতে দেখিতে পাই, সে সময়ে মুন্সীগঞ্জে প্রতি বর্গ মাইলে ১,৫২৬ জন এবং শ্রীনগর থানার ১,৭৮৭ জন অধিবাসী ছিল। এ সম্বন্ধে সেন্সাস রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছিল– Munshiganj-Thana which showed an advance of 20.2 percent in 1891 has now grown by only 10.2 percent, but even this rate of expansion is extraordinary, having regard to the fact that the thana has a density of 1,526 persons to the mile Srinagar, reached the extraodinary average 1,787 per sq. mile. Census of India 1901. Volme VI. by E A Gait.

মুন্সীগঞ্জ ও টঙ্গিবাড়ি থানার জনসংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আদমসুমাবির ১৯৩১ সনের বিবরণীতে তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিত হইয়াছে তাহা সুসঙ্গত:

The decrease in the comblined popuation of Munshiganj and Tangibari police stations in the Munshiganj subdivision is mainly due to the transfer of Char areas from this police station to Madaripur and Chandpur subdivisions whilst Tangibari has also suffered from erosion both on the north by the Dhaleswari river and on the south by the Padma.

টঙ্গিবাড়ি এবং মুন্সীগঞ্জ থানার জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শ্রীনগর এবং লৌহজঙ্গ থানার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অধিক। তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া আদমসুমারির বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে– Srinagar and Lohajang police sta-

1. In the rest of the Subdivision (Madaripur) increases ranging from 3.8 in Rajair police station to 6.3 per cent, in Naria are due to the general healthiness of the locality, its freedom from epidemic diseases and the general prosperity of the Jute trade during the last decade which has attracted settlers far employment.– Census of India, 1931 Volume V. part pages 53.

তৃতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম

ঢাকা জেলা বাঙলাদেশের সকল জেলা হইতে জন-বহুল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদমসুমারির একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া গেল, ইহাতে এই জেলার জনসংখ্যা কিরূপ-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার একটা ধারণা জন্মিবে।

ঢাকা জেলার থানার সংখ্যা

১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
১২	১২	১৩	১৩	১৩	৩৫	৩৪

জনসংখ্যা

প্রতি থানায় :	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
	১৫৪,৪১৬	১৭৬,৩৬৩	১৮৬,২০৪	২০৩,৮০৯	২২৭,৭২৩

১৯২১	১৯৩১
৮৯,৩১৩	১০০,৯৫৮

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বিক্রমপুরের জন্মসংখ্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত নিম্নলিখিতরূপ ছিল:

থানা	লোকসংখ্যা	জন্ম	প্রতি সহস্রে বার্ষিক গড়
শ্রীনগর	৩১৩২৫৮	৪৩৫	১৬.৫৬
মুন্সীগঞ্জ	২৯২৮৪৭	৫৪৮	২২.৪৪
পালং	২৭৯৮৪	৩৪৬	১৪.৭৩
শিবচর	১৩১৮৫২	২০২	১৮৩৬
মোট	৭,৬৫,৯৪১	১৫৩১	

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে বিক্রমপুরের জনসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:

উত্তর বিক্রমপুর

মোট-জনসংখ্যা– ৭,৬১,৭০৬ জন।

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	১,৫৯,৪০৩	১,৭৪,৭৭৫	৩৩৪১৭৮
মুসলমান	২,০৮,৭১০	২,১৪,০৩৫	৪,২২,৭৪৫
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী	২,৭০৫	২,০৭৫	৪,৭৮৩

tions have also suffered from erosions but the population shows an increase and apparently those persons affected by the erosions have migrated merely to the interior of the police-station altogether.

লৌহজঙ্গ থানার অন্তর্গত অনেক সমৃদ্ধপল্লী নদী গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে সে সমুদয় গ্রামবাসিগণ নিরাপদ স্থানে বাস করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের মধ্যবর্তী ভাগ-লৌহজঙ্গ থানার এবং শ্রীনগর থানার নানা গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করাতেই লৌহজঙ্গ এবং শ্রীনগর থানার জনসংখ্যার তারতম্য বড় একটা হয় নাই। একদিকে ভাঙ্গিতেছে আর একদিকে গড়িতেছে কতকটা ঐরূপ। এই আদমসুমারির বিবরণী হইতে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা হইতেছে– বিক্রমপুরে এবং সাধারণ ভাবে পূর্ববঙ্গে মুসলমানাধিক্য। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় আপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিক্রমপুর ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানাধিক্য

আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই হিসাবে উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙলা দেশের জনবিবরণী আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনুপাতে বাঙলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী। আদমসুমারিতে দেখা যায়, নদীয়া, চব্বিশপরগনা প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক সংখ্যক। মুসলমান অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে মুসলমানেরা বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারপর কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমান নৃপতিদের অধিকারভুক্ত হইতে যে অনেকদিন লাগিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যেমন বাঙলাদেশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল, তেমনি তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রৌদ্রতপ্ত অনুর্বর ভূখণ্ড অপেক্ষা বাঙলাদেশের উর্বর প্রদেশকেই অধিকতর বাসোপযোগী স্থান বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এই জন্যই ক্রমশ বগুড়া, মালদহ, (রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী স্থানসমূহ) স্থানে তাহাদের বসতি বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। একদিকে উপনিবেশ স্থাপন, অন্যদিকে ধর্মপরায়ণ মহাপুরুষগণের উদার মত এবং ধর্মপ্রচারও মুসলমানাধিক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীহট্টের মহাপুরুষ শাহ জালাল ৩৬০ জন আউলিয়া লইয়া আসিয়া শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেবল শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই যে ইঁহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; সমগ্র পূর্ববঙ্গে ক্রমশ ইঁহাদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে পূর্ববঙ্গে যে সমুদয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছেন, তন্মধ্যে এই আউলিয়াগণের বংশীয়দের কোন না কোন ভাবে সম্পর্ক নাই, এমন অতি অল্পই দেখা যায়।

বিজয়ী মুসলমানের ধর্মে তখন বহু লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুজাতি অতিশয় ধর্মপরায়ণ হইলেও, তৎকালে, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে, ধর্মবন্ধন যে

শিথিল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।.....বিশেষত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে নিম্নস্তরের হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত সাধন-ভজনের বিশেষ কোন পথ ছিল, এমনও বোধ হয় না। তান্ত্রিক-দীক্ষা সমস্ত বর্ণের জন্য বিহিত হইলেও, জলচল-জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য জাতীয়েরা যে ঐ দীক্ষালাভ করিত এরূপ বিবেচনা হয় না।

এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে যাহাদের অবস্থা হীন ছিল, তাহারাই দলে দলে নব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া বাদশাহী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং নিম্ন শ্রেণীর জন্য পবিত্র হরিনামের কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক লোকেরই ধর্ম-সাধনের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ববঙ্গে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, নতুবা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের ন্যায় মুসলমানের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচার সম্বন্ধে বাধা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

সামাজিক সাম্য

শ্রীহট্টের শাহজালালের ন্যায়, বিক্রমপুরের বায়াআদম বা বাবা আদম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রভাবে সহজেই পূর্ববঙ্গে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে। নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম-ধর্মে নানা প্রকার সাম্য ভাব দেখিয়াও এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সামাজিক নীতি বড়ই অনুকুল, বহু-বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেকেই সাগ্রহে এই ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে বংশ-বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তারপর কেবল অধিক পরিমাণে সন্তানোৎপাদন হইলেই যে বংশ বিস্তার হয়, এমন নহে, পুষ্টির নিমিত্ত খাদ্যাদিরও প্রাচুর্য চাই এবং তৎকল্পে নূতন উপনিবেশের স্থানও আবশ্যক। পূর্ববঙ্গে তাহার অপ্রতুল ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে নূতন আবাদের নিমিত্তে ভূমি অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে জঙ্গল ও চরভূমি, অধিত্যকা তখন অধিক পরিমাণে অনধিকৃত ছিল। মুসলমানগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া লইতে লাগিল।

উপনিবেশ স্থাপন বিষয়েও মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ পদ্ধতি অনুকূল। প্রথমতঃ– বিবাহাদিতে হিন্দু সমাজে যেরূপ বহুবিচার, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। দুইটি মাত্র ভাই সপরিবারে লোকসমাজ হইতে দূরান্তরিত স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেও, একের কন্যা অপরের পুত্রে বিবাহ করিতে পারায় বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি বিষয়ে কোন বাধা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ– জাতি বিচার না থাকাতে উপনিবিষ্ট মুসলমানগণের মধ্যেও পার্বত্যজাতীয় লোকদিগের সঙ্গেও বিবাহাদি-সম্বন্ধ স্থাপনের কোন রূপ আপত্তি হইবার কথাই নাই। তৃতীয়তঃ– সাহসিকতা না থাকিলে সুদূর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবর্তনা জন্মে না।

মুসলমানদের তখন দেশে প্রবল প্রতাপ, এবং ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে অল্প-সংখ্যকের অবস্থানহেতু পরস্পর সহানুভূতি খুব প্রবল ছিল। তারপর মুসলমানেরা স্বভাবতঃই হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। পুষ্টিকর বিবিধ খাদ্য ইত্যাদির জন্যও মুসলমানদের সন্তানোৎপাদনেও হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রদান করিয়াছে। যে জাতির এইরূপ বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছিল, তাহাদের জনসংখ্যা যে অতিমাত্রায় বর্ধিত হইবে, ইহাতে

আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। আবার মুসলমান সমাজে মৃত্যু ব্যতীত ক্ষয়েরও কোন কারণ ছিল না। কোন নৈতিক বা সামাজিক অপরাধেও তাহাকে মুসলমান আখ্যা পরিত্যাগ করিতে হয় না।

এদিকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে নানা ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান ছিল। কথায় কথায় সামাজিক নির্যাতন চলিত। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে একটা মহাসুবিধা বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। পশ্চিমবঙ্গে মাতা ভাগীরথী অনেক অনাচার কদাচার শুধিয়া লইতেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের এই মহাসুবিধাকর উপায়টি বর্তমান না থাকায় অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণে অর্থাৎ মুসলমান হইতে বাধ্য হইত।

মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পূর্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কেহ পতিত হইলে চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়া যাইত এবং নিম্নতম শ্রেনীতে কাহারও কোন অপরাধের কারণ ঘটিলে একঘরিয়া হইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হইত। তৎপর দণ্ড দিয়া আপন সমাজে উঠিত। মুসলমানেরা এ দেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পতিত ব্যক্তিরা অনায়াসে সেই সমাজে স্থান লাভ করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গে সুপ্রচারিত হইলে পর, পতিত উদ্ধারের পথ অনেকটা পরিস্কৃত হইল। তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপস্থিত হইলে যখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হইত, তখন অনেকস্থলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিত। এবং সপরিবারে মুসলমান হইয়া সেই সমাজের পুষ্টি সাধন করিত। পূর্ববঙ্গে এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহার অনেক গল্প আছে।

এখানে আর একটি কারণেরও উল্লেখ করিতেছি। তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিক্রমপুর ও পূর্ববঙ্গে যখন এইরূপ ধর্মবিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছিল, সে সময়ে অনেকে বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সব কারণেও জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল।[১]

বর্তমান সময়ে বাঙলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক বেশী। সে অনুপাতে বিক্রমপুরেও মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। আদমসুমারির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বাঙলা দেশে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক।[২] বিক্রমপুরে লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ ও শ্রীনগর, মুসলমান-প্রধান, টঙ্গিবাড়ি ও সেরাজদিঘা থানায় হিন্দুর সংখ্যা অধিক। দক্ষিণ বিক্রমপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

জাতি

বিক্রমপুর পরগনা-আকারে বৃহৎ না হইলেও জনসংখ্যার দিক দিয়া ইহা বাঙলায় অদ্বিতীয়। বিক্রমপুরে বহুজাতীয় লোকের বাস। হিন্দুদের মধ্যেই বিভিন্ন জাতি ও তাহার

১. পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য– শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা– সাহিত্য, ১৯শ বর্ষ, ৬০৮ পৃষ্ঠা।

২. Within Bengal they (Muslims) predominate particularly in the Chittagong and Dacca Divisions where they form 73.68 and 70.93 percent of the population respectively and also in the Rajshahi Division where they contribute 62.24 percent, of the population. In the Presidency Division they do not contribute even half of the population, their percentage being 47.20, whilst in the Burdwan Division they amount to only 14.14 percent, of the Total.– Census of India, 1931.

শ্রেণী-বিভাগ আছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, জেলে, কৈবর্ত, বৈষ্ণব, বারুই, বেদিয়া (বাইদা), বেলদার, ভূঁইমালী, ধোপা, গোপ (গোয়াল), ঝাল-মাল, যুগী, তেলি (কলু) তিলি, কর্মকার, (কামার) কপালি, রাজবংশী, কুমার (কুম্ভকার), মাহিষ্য, মালাকর, মাঝি, মুচি, নমঃশূদ্র, নাপিত, পাটনি, শঙ্খবণিক, সাহা, সূত্রধর, স্বর্ণকার, তাঁতি, কাঁসারী, পাটিকার, শিকারী, নর (রিষি)।

মুসলমানও ধর্ম্ম

বিক্রমপুরে মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, সেখ, পাঠান, প্রধান। জোলাদের সংখ্যাই খুব বেশী, তাহারা বর্তমান সময়ে আপনাদিগকে কারিকর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন জাতির শ্রেণীবিভাগ ও তাহার ইতিহাস আলোচনা নানা কারণে অপ্রাসাঙ্গিক বোধে পরিত্যাগ করা হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে Census of India, 1931, Volume V. Bengel & Sikkim part I: Report by A.E. Porter, M.A (oxon) I. C.S. গ্রন্থের Chapter XII. Caste, Tribe and Race পাঠ করিতে পারেন। বিক্রমপুরে প্রচলিত ধর্মের মধ্যে হিন্দু, ইসলাম, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা রহিয়াছে। তবে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীন কথা

বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিবার উপায় নাই; বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান চলিতেছে। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'বাঙলার ইতিহাস' দুইখণ্ড ও রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা এবং গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে। বাঙলাদেশ নদী-মাতৃক দেশ। এখানকার জল-বায়ুর প্রভাবে এবং নদীর গতি পরিবর্তন হেতু এবং ধ্বংসলীলার জন্য প্রাচীন কীর্তি অধিকাংশ স্থানেই বিলুপ্ত-প্রায়। যাহা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকিবার সম্ভাবনা রহিযাছে, তাহাও বেশীর ভাগ মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত। পাহাড়পুরের স্তূপ খনন করিবার পূর্বে কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙলায় এইরূপ ঐতিহাসিক কীর্তি থাকা সম্ভবপর। পাহাড়পুর-স্তূপ ও মহাস্থানগড় খননের ফলে বাঙলার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বাঙলাদেশের বয়স খুব বেশী নহে। তবে কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশেই নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথম সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন বীচিং (Captain Beching) সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আট-ক্রোশ দূরবর্তী একটি নদীতীরে প্রস্তর নির্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভিসেন্ট্ বল্ এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণখণ্ডগুলি মানব কর্তৃক নির্মিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র।[১]

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্– ভারতে তাম্রযুগের কথার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন– In northern India the first metal to become known was Copper. Hundrdeds of curious implements made of pure Copper have been found in the Central provinces, in old beds of the Ganges near Cawnpore, and in other places from Eastern Bengal to Sind in the Kurram Valley.[1] They are supposed to date from 2000 B. c. more or less.

উত্তর ভারতে, মধ্যপ্রদেশে, কানপুরের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রাচীন খাতে, পূর্ববঙ্গে, সিন্ধুদেশে এবং কুরাম উপত্যকায় তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।[২] পূর্ববঙ্গের

১. ক. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙলার ইতিহাস।
খ. Procedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868 P. 177.

২. The oxford students History of India, Page, 24

কোন্‌স্থানে তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, ভিন্‌সেন্ট স্মিথ তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমা

বাঙলাদেশের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে একটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেছে মহাস্থানগড়ের আবিস্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালেখন। মহাস্থানগড় গ্রামটি বগুড়া সহর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। সেকালের পৌণ্ড্রবর্ধননগর বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। বগুড়া জেলার করতোয়ার শুষ্ক খাতের উপর অবস্থিত। যোগিনীতন্ত্রে করতোয়া নদী প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব-প্রতিপাদক অনেক প্রত্ন-চিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম ও হুগলী জেলার মহানাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তিন স্থানে যে খোদিত-লিপি, মন্দির ও অন্যান্য প্রত্ন-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খ্রীষ্টিয় পঞ্চম হইতে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সময় বাঙলাদেশ কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি

মহাস্থানগড়ের আবিস্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালেখখানি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বরু ফকির নামে এক ব্যক্তি পাইয়াছিল। সে সময়ে পূর্ব বিভাগের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জি. সি. চন্দ্র উহা পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন ঐ শিলালেখনখানি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালেখনের অক্ষরগুলি মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী। এই অনুশাসনটি যে মৌর্যযুগের তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রথমতঃ এই লেখন-খানির বিষয় "বঙ্গবাণী" নামক একখানা বাঙলা দৈনিক-পত্রে এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল তারিখের "Liberty" নামক ইংরাজী দৈনিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডি. আর ভাণ্ডারকর (D.R. Bhandarkar) এই শিলালেখটির নাম দিয়াছেন "মহাস্থানের মৌর্য্য ব্রাহ্মী লেখমালা"[১] (Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan)। এই অসম্পূর্ণ লিপিখানিতে লিখিত আছে,–

মহাস্থানের বা প্রাচীন বঙ্গের ব্রাহ্মীলিপি

১। নেন সংবংগীযান (গলদনস) দুমদিন– (মহা)

২। মাতে। সুলখিতে পুডনগলতে। এতম্।

৩। নিবহিপয়িসতি। সংবংগিয়ান্ (চ দি) নে (তথা)

১. Epigraphica Indica vol. XXI. Page 84-85 April 1931. Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan by D R. Bhandarkar

৪। ধানিয়ম্ (নিবহিসতি) দ (ং) গাতিয়ায়ি কে– দেবা।

৫। তিয়ায়িকসি। সুঅতিয়াইয়কসি পি গংড (কেহি)

৬। ধানি (য়ি) কেহি এস কোঠাগালে কোশম্ (ভর)

৭। (নীয়)

1. nena [Sa*] va [m*] giy [a] nam [Galadanasa] Dụmadina- [maha*]
2. mate । Sulakhite Pudangalate । e[ta] m
3. [ni*] vahipayisati । Samva [m*] giyanaam [cha di*] ne [tatha*]
4. [dha*] niyam । nivahisati । da [m*] g [a*] tiyay [i*] k [e] d [eva*]
5. [tiya*] [yi] kasi । su-atiyayika [si] pi gamda [kehi*]
6. [dhani*] [yi] kehi esa kothagale kosam [bhara*]
7. [niye].

অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, মহাস্থান-লিপি যে সময়ে প্রচারিত হয়, সে সময়ে সাধারণে উক্ত লিপি ব্যবহার করিতে জানিতেন। রাঢ়ী-বাঙলায় ব্রাহ্মীলিপি বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলায় শুষুনিয়া পাহাড়ের লিপি প্রায় উক্ত প্রকার। শুষুনিয়া শৈল-লিপি বাঁকুড়া জেলায় (বর্তমান) দামোদর তীরবর্তী পোখনার (পুষ্করণানগরী) রাজা চন্দ্রবর্মা কৃত লিপি। এই চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন শূরভূমরাজ। পুষ্করণা-প্রভু চন্দ্রবর্মার সময়ে শূরভূম ও মল্লভূম পুষ্করণা নামে খ্যাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন বাঁকুড়া (পুষ্করণা রাজ্যের) জেলার প্রধান রাজা। তাঁহার সহিত মাড়বারের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না তবে তিনি মহাসামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নাই।

ডাঃ ভাণ্ডারকর মহাস্থান লিপির এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন– "To Galadana (Galardana) of the samvamgiyas...(was granted) by order. The Mahamatra from the highly auspicious Pundranagara will cause it to be carried out. (And likewise) paddy has been granted to the Samvamgiyas. The outbreak (of distress) in the town during (this) outburst of superhuman agency shall be tided over. When there is an excess of plenty, this granary and the treasury (may be replenished) with paddy and the gamdaka coins."
এই শিলালেখখানি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মৌর্য যুগের কোন শাসনকর্তা, (তিনি মৌর্যবংশীয় নাও হইতে পারেন,) পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহমাত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন সংবংগীয়দের (people called Samvamgiyas) দুর্ভিক্ষ-জনিত ক্লেশ দূর করিবার জন্য। সম্ভবতঃ সংবংগীয়রা পুণ্ড্রবর্ধন নগরের মধ্যে কিংবা তাহার আশেপাশে বাস করিত। এই দৈব দুর্বিপাকের নিরাকরণার্থ দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ইহাতে আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার কোন উপায় নাই, কেন না প্রথমটির প্রথম পংক্তিটি বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে অনুমিত হয় যে, সংবংগীয়দের নেতা গলদন (Galadana)-কে গংডক মুদ্রা ঋণ দিয়া সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হইতেছে

ধানাগার বা গোলাঘর হইতে দুর্ভিক্ষ বা পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ধান্যদান করিবে। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য নির্দেশ ছিল। আরও লিখিত ছিল যে– যখন পুনরায় সুদিন আসিবে, তখন ঋণদানের মুদ্রা এবং ধান্য গোলাজাত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ টাকা এবং ধান প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

মৌর্যযুগে বাঙলাদেশের স্থান-বিশেষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও যে রাজারা গোলাঘর নির্মাণ করিতেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এখনও ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

মহাস্থান লিপির সাহায্যে আমরা বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের সন্ধান পাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই লিপিখানির প্রথম পংক্তিটি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ উহাতে যে রাজা বা শাসনকর্তা এই লিপির প্রচার করেন, তাহার নাম পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই লিপির অক্ষর ও ভাষা অশোকের অনুশাসনের অনুরূপ। সম্ভবতঃ এই আদেশলিপির প্রচার মৌর্যবংশীয় কোন নৃপতিই করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত ছিল।

এই লিপি হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধন সে সময়ে মৌর্যরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এ সময়ে বঙ্গ (বিক্রমপুর) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভূত ছিল না। দুইটি রাজ্যই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্তমান সময়ে বঙ্গ বলিতে আমরা সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝিয়া থাকি। এখন রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, কেহ বলে না; বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশই বলিয়া থাকে এবং তাহা সমগ্র বিভাগকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকেই বুঝাইত। হেমচন্দ্র তাঁহার "অভিধানচিন্তামণি" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গাস্তু হরিকেলিয় বঙ্গ বা হরিকেলিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (Itsing), ইউহিং (Wuhing) প্রভৃতি ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থিত 'হরিকেল' দেশে আসিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযের পুস্তকাগারে রক্ষিত সচিত্র 'অষ্টসহস্রপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামক হস্ত লিখিত গ্রন্থেও হরিকেলের নাম রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর চোল শিলালিপি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালই পাহাড়ের লিপি এবং চেদি কর্ণদেবের গোহারোয়া (Goharwa) লিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে,– যেমন বাঙ্গালা দেশম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ '**বাঙ্গলা**' নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গালা নামে আখ্যাত হয়।[১]

যে **বঙ্গ** এক সময়ে কেবল পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইত, সেই বঙ্গ নাম বর্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইতেছে। ইংরাজেরা যে Bengal বা বেঙ্গল বলেন তাহার উৎপত্তি হইতেছে **বাঙ্গালা** বা **বাঙ্গলা** শব্দ হইতে।[২] কাজেই বঙ্গদেশের বানান সম্পর্কে বাঙ্গালা, বাঙ্গলা যে কোন একটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১ The Vangas By B C Law Page 57 Indian culture July 1934

২ Vanga which at one time meant Eastern Bengal has thus now given its name to the entire province of modern Bengal, and the English rendering of the name is certainly to be derived from old Bangala or Bangla

এখন কথা হইতেছে যে, বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের আরম্ভ কিরূপে করা যাইতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সহিত গৌড় ও বঙ্গের ইতিহাস বিজড়িত। আবার বাঙলার ইতিহাস যে কেবল বঙ্গদেশ– এখানে বঙ্গদেশ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বঙ্গদেশের ইতিহাস কেবল বাঙলাদেশের সীমাতেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এবং ভারত সীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাঙলার ইতিহাসের নাম সম্বন্ধ বর্তমান ছিল।[১] বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। এক সময়ে বিক্রমপুর ছিল প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী, কাজেই বাঙলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা না করিলে বিক্রমপুরের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসও আলোচনা করিব। সে আলোচনা যেমন সঙ্গত, তেমনি বিক্রমপুরের সহিত তাহা একসূত্রে বদ্ধ। পাঠকগণের পক্ষেও ধারাবাহিকতার দিক দিয়া তাহা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে "তাম্রপট্টলিপি" ও "শিলালিপি" প্রভৃতি অনেক আবিস্কৃত হওয়ায় প্রাচীন ভারতেরও বাঙলার ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশে লিখিত ইতিহাস নাই, এজন্য জনশ্রুতি, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতেই ইতিহাসের মূল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্য সম্পদের উন্নতির যুগ। ভারতের বিবিধ বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, জাতি বিভাগ এবং প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের পার্থক্য ও প্রভেদ দূর করিয়া দিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে ঐক্য-সূত্রে বাঁধিবার মূলে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম যেরূপ মহৎ কার্য করিয়াছিল, সেইরূপ কার্য এ পর্যন্ত কোন ধর্ম পৃথিবীতে করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই বৌদ্ধ যুগের প্রভাবেই **বৃহত্তরবঙ্গ** ও **বৃহত্তরভারত** গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গৌতম সিদ্ধার্থ ও বৌদ্ধধর্ম : গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা গৌতম, বর্তমান বাস্তিজেলার উত্তরে নেপাল-তরাইয়ে অবস্থিত প্রাচীন কপিলবস্তু নগরের নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু এ সকলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। সাংসারিক বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন ছিলেন। সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদন পুত্রকে সংসারানুরাগী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এই

১. ক. In a Nalanda inscription recently edited by Mr N. G. Majumder (F P Ind vol XXI Pt P P. 91 foll, the name *Vangala desa* appers.

খ. For early references to Vanga, see Leir, Pre Dravidian dans-Inde.

গ. History of the Bengali Language by B.C Majumder P P 38-41.

ঘ. Glimpses of the ancient relation of Bengal with the Tamils are reflected in atleast one place name of ancient Bengal-Tamralipti which was also called Damalipti or Damilitti, i.e the city of the Damala people. The Damalas are the same as the Tamala people or the Tamila and Bengal must have once in ancient days been a home of those people. H P. Sastri, Manasi, Vaisakh 1321, Indian Culture July 1934 Page 58

উদ্দেশ্যে শাক্যদণ্ডপাণি নামে একজন ছোট রাজার যশোধারা [ইনি বিম্বা, গোপা, ভদ্দকসেনা প্রভৃতি নামেও আখ্যাত হইয়া থাকেন।] নামে এক সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। ক্রমে তাঁহার একটি পুত্রও হইল, তখন সিদ্ধার্থের মনে হইল যে, তিনি ক্রমশঃই সংসারের মায়াময় আকর্ষণের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেছেন। দুঃখময় সংসারের বিবিধ প্রকারের দুঃখ ও নির্যাতন হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে যখন সমুদয় জগৎ নিস্তব্ধ, প্রিয়তমা পত্নী শিশুটিকে কোলে লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছেন, তখন ধীরে-নীরবে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন। সেই তাঁহার 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'। অতঃপর তিনি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরীরকে যতদূর কষ্ট দিতে হয় দিলেন,– তাঁহার অস্থি-চর্ম সার হইল, তবু অভীপ্সিত ফল লাভ হইল না। এ সময়ে তাঁহার মনে হইল যে, শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। এইরূপ অসহায় অবস্থায় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে গয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বোধিদ্রুম মূলে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এইখানে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। গৌতম দুঃখময় মানবজীবনের মুক্তির প্রকৃত সমাধান নির্বাণ লাভের সন্ধান পাইলেন। সেইদিন হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ, 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হইলেন। যে বোধিদ্রুম বা অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্বলাভ করেন, পরবর্তীকালে সেখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেই মন্দির এখনও বর্তমান আছে, ঐ স্থান বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেব লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ধ্যান ও ধারণার ফলে বিশ্বমানব বিশুদ্ধ ধর্মের উপদেশ লাভ করিল। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, বাসনা ও মোহ দূর করিতে পারিলেই সকল কষ্ট দূর হইয়া যাইবে। বাসনা ও মোহ জয় করিবার যে পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তপস্যার বাড়াবাড়ি বা জ্ঞানের বাগজাল ছিল না; যোগের ঋদ্ধিরও কোন স্থান ছিল না। তিনি লক্ষ্যকে ভুলিয়া উপায়কে লইয়াই থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রধান কথা এই ছিল যে– মানুষ মাত্রেই নির্বাণ-মুক্তির অধিকারী। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোন ভেদ নাই। বুদ্ধদেব উপবাসাদি কঠোর ব্রতসাধন নিষেধ করিয়াছেন এবং আলস্য, আমোদ-প্রমোদ বা ভোগ-বিলাসেরও বিরোধী ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যবর্তী পথই তাঁহার মতে অবলম্বনীয় ছিল। 'অহিংসা পরম-ধর্ম' এই বাণীই তাঁহার ধর্মের মূল সূত্র।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধের দেহত্যাগ হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন– আমার উপদেশসমূহ দ্বারাই তোমরা পরিচালিত হইও। এই জন্য বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাঁহারা রাজগৃহে সমবেত হইয়া (রাজগির) বুদ্ধের যে সব বচন তাঁহাদের স্মৃতি-পথে বর্তমান ছিল, সে সমুদয় লিখিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। এই ধর্মগ্রন্থ (১) বিনয়পিটক, (২) সূত্রপিটক, (৩) অভিধর্মপিটক এই তিনভাগে বিভক্ত। একসঙ্গে এই তিন পিটক ত্রিপিটক নামে অভিহিত। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত, পালি, চীন প্রভৃতি ভাষায়ও ত্রিপিটক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পালি-ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকই প্রধান বলিয়া গণ্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ভ হইলেও সম্রাট অশোকের সময় হইতেই উহা দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্ব চাণক্য নামে তিনি তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধের নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি বিরল। এ সময়ে গ্রিকবীর আলেকজাণ্ডার পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পঞ্জাব হইতে গ্রিকদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের কতকাংশও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র (পাটনা) সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। গ্রিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন– অমিত্রখাদ (Amitrochadcs) বা শত্রুজয়ী। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ হওয়ায় বিন্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অশোক সহজেই সেই বিদ্রোহ দমন করেন। পরে তিনি উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৪ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়।

সম্রাট অশোক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মহানুভব সম্রাট অশোক, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে কলিঙ্গদেশ, মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অশোক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বর্তমান ব্রিটিশ-ভারত অপেক্ষাও বিস্তৃত ছিল। উত্তরে পারস্যের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের শ্রাবণ বেলগোলা (Sravana Belgola) পর্যন্ত। গ্রিসদেশীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মগধরাজ্যের পূর্ব দিকে 'গঙ্গারিডি' নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। গঙ্গারিডির কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোকের ধর্মমতের পরিবর্তন হয়। অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বে প্রথম জীবনে দেবদেবীর উপাসক (Deva-Worshipper) ছিলেন। কি মানুষ, কি জীবজন্তু হত্যা সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধের পর হাজার হাজার লোকের মৃত্যুতে তাঁহার মনের পরিবর্তন ঘটে, সে সময়ে উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে তিব্বত হইতে সিংহল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও সে সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক বাঙলাদেশের নানাস্থানে স্তূপ বা বৌদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের অনুশাসন (পর্বতগাত্রে খোদিত যে লিপি–Rock-Edicts) বা খোদিত লিপিসমূহ হইতে জানা যায় যে, তিনি কত বড় মহৎ এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন।

অশোকের সময়ে যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে এখন আর

সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মহাস্থানগড়ের মৌর্য-ব্রাহ্মী শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৌর্যরাজগণের প্রভাব বাঙলাদেশ (ব্যাপক অর্থে) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বৌদ্ধধর্ম বঙ্গ (পূর্ববঙ্গে) দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

এজন্যই পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের পরবর্তীকালেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য-সাম্রাজ্য আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১–১৭৪ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৬ হইতে ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে মৌর্য নৃপতিগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। মৌর্য বংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে বসিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত রাজবংশ শুঙ্গবংশ নামে পরিচিত।

মৌর্যরাজগণের পতনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। উত্তর ভারতে একে একে শুঙ্গ, কাণ্ব প্রভৃতি অনেকেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে মৌর্যরাজাদের রাজত্বকালে দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব এবং সভ্যতাও অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মৌর্য নৃপতিরা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোন অবিচার করেন নাই। কিন্তু রাজধর্ম বৌদ্ধ বা জৈন হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম খর্ব হইতে আরম্ভ করে।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও বোধ হয় মৌর্যরাজাদের পুরোহিতবংশীয় ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লোপ পাইয়াছিল। পুরোহিত-বংশ নামেমাত্র পুরোহিত ছিলেন। পুষ্যমিত্র রাজা হইলে-পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

•

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ

পুষ্যমিত্রেব বাজত্বকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল। গ্রিকেরা ভারত আক্রমণ করেন– পুষ্যমিত্র সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাহুবলের প্রভাবে পুষ্যমিত্র গ্রিকরাজকে ভারতে গ্রিক-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতে পাবিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধ, তীরভুক্তি, কোশল, অযোধ্যা ইত্যাদি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয়ত উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। মনে হয়, পঞ্জাব এবং সুরাষ্ট্র ছাড়া সমগ্র উত্তরাপথই তাঁহার আধিপত্য স্বীকাব কবিয়াছিল।

গ্রিকদেব সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন বিদর্ভকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র নিজেকে সমগ্র উত্তরাপথের রাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও নিজের এই প্রাধান্য বা সার্বভৌমত্বেব প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। অশোক মহারাজা যজ্ঞের পশু বিনাশ নিবাবণ কবিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাজ্ঞিক-ধর্মেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

পুষ্যমিত্রের যজ্ঞাশ্ব একদল গ্রিক্ অশ্বারোহী-সৈন্য বলপূর্বক ধরিয়াছিল। অশ্বের রক্ষক পুষ্যমিত্রের পৌত্র, বসুমিত্র তুমুল যুদ্ধ করিয়া, বুন্দেলখণ্ডের নিকট সিন্ধু-তীরে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।– পুষ্যমিত্র অনেক বৌদ্ধশ্রমণদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ও তাঁহাদের বিহারগুলিকে পোড়াইয়া দিতেন বলিয়া কথিত আছে। অতিরঞ্জিত হইলেও পুষ্যমিত্র যে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, সে বিষয়ে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতের হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছে।

পুষ্যমিত্র প্রায় ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ১৪৯ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর অগ্নিমিত্র রাজা হন। শুঙ্গ বংশের নবম রাজা ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাগবতের পরবর্তী নৃপতি দেবভূতি দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার আমাত্য বাসুদেব কাণ্বর হস্তে নিহত হন। এই ভাবে প্রায় ৭৫ খ্রীষ্টপূর্বে শুঙ্গ রাজ্যের পতন হয়।

শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাব **বঙ্গ** রাজ্য পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল।– তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। তবে সে সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারাই বিভিন্ন অংশে প্রভাবান্বিত ছিলেন।

শুঙ্গ রাজাদের প্রভাব

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাবে এক নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল।– সে সময়ে বৈদিক ধর্মের নব-অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল ও শিল্পকলার উৎকর্ষ-সাধন হইয়াছিল। পতঞ্জলি এই সময়ে তাঁহার মহাভাষ্য লিখেন ও ভারতের কারু-শিল্পীরা পাথরেতে কাঠের কাজের অনুকরণ করিয়া সাঁচী ও ভরহুত স্তূপের রেলিং ও তোরণ-দ্বার নির্মাণ করিয়া পৃথিবীতে শিল্পনৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গীতার ধর্ম, জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এমনকি গ্রিকেরাও ভারতের ভাগবতধর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

কাণ্ব ও **আন্ধ্রবংশীয়** রাজাদের বিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা করিবার নাই।– ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে শক, পহ্লব, কুষণ বা কুষাণ প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব নানা সময়ে ভারতের নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্যসম্রাট অশোকের পর কুষণ-নৃপতি কনিষ্ক ভারতবর্ষে অসাধারণ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। কনিষ্কের কাল লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বিতর্ক চলিতেছে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল আছে। প্রথম দলের মতে তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহন করিয়াছিলেন এবং তিনিই শক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় দলের মতে তাঁহার রাজ্যের আরম্ভ ১২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে, এমনকি ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছিও হইতে পারে।

কুষণ রাজা কনিষ্ক

কনিষ্ক রাজা হইবার কিছুকাল পরেই কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন। কনিষ্ক এখানে অনেক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন ও কনিষ্কপুর নামক একটি নূতন নগর স্থাপন

করিয়াছিলেন। এই নগর এক্ষণে সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ কনিষ্ক পাটলীপুত্রের তদানীন্তন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজসভার রত্নস্বরূপ বৌদ্ধ শ্রমণ **অশ্বঘোষকে** লইয়া গিয়াছিলেন।– এই অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে নানাদিক দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দার্শনিক, কবি এবং পরম বিদ্বান ও সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিলেন।

কনিষ্ক নানা দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁহার যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিমে সুংলিং পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে পাটলীপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। খাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান বা ফিরিস্তান, বাহলীক, কাবুল, পঞ্চনদ, সিন্ধু, মথুরা, কৌশাম্বী, বারাণসী, পাটলীপুত্র ইত্যাদিও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।

মহাযান ও হীনযান : গৌতমের মূর্তি-নির্মাণ ও মন্দিরে স্থাপন

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজা অশোকের পরেই কনিষ্কের নাম বৌদ্ধ-জগতে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার অদম্য উৎসাহেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য ও উত্তর এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের বিজয়-বাণী আবার চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল।– তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুইটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। মহাযান মতাবলম্বীরা প্রাচীনপন্থিদিগকে হীনযান নাম দিলেন। তাঁহারা নবীন পন্থাটিকে প্রাচীন পন্থা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন।– এই মহাযান মতাবলম্বীরাই সর্ব প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে দয়ার অবতার-রূপে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযান মতাবলম্বীরা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে **দেবতাবোধে পূজা করা, মূর্তি-পূজার প্রবর্তন**, বুদ্ধত্ব লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য মনে করেন।

ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের এইরূপ পরিবর্তনের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার ও গীতার ভাগবৎ-ধর্মের প্রভাব বৌদ্ধেরা শেষ পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অশ্বঘোষও পরে মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থাদিও রচনা করেন।

মহাযান ধর্মের প্রবর্তক বা শাস্ত্রকর্তা ছিলেন **নাগার্জুন**। ইনি অশ্বঘোষের কিছু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। **'মাধ্যমকারিকা'** নামক মহাযান ধর্মগ্রন্থ ইনিই প্রণয়ন করেন। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধদের চতুর্থ বৌদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কাশ্মীরে রাজধানীর নিকট কুন্দলবন নামক সঙ্ঘারামে এই সভার অধিবেশন হয়। পাঁচশত বৌদ্ধশ্রমণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে **ত্রিপিটক** নামক বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই সভার অধিবেশনের পর ঐ সকল গ্রন্থ বড় বড় তাম্রপাত্রে খোদিত হইয়া স্তূপ-সমূহের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

গান্ধার শিল্প

সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে গান্ধার-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান্ধার দেশে এই শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহা **গান্ধার-শিল্প** নামে পরিচিত।– ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, প্রায় তিনশত বৎসর কাল– গান্ধার দেশ গ্রিকদের অধীনে ছিল। তাহারই ফলে ঐ স্থানে একটি নূতন শিল্পের প্রভাব মূর্ত হইয়া উঠে। কনিষ্কের রাজত্বকালের কতকগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গান্ধার-শিল্পীরা অর্থাৎ ভাস্করেরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অনেক মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কনিষ্ক প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজসভা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতির দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। বসুমিত্র, পার্শ্ব, অশ্বঘোষ, চরক, সঙ্ঘরক্ষ, গ্রিক-পূর্তবিদ্যাবিশারদ অ্যাগিস্যাইলোস (Agesailos) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভার গৌরব বর্ধন করিতেন।

বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে, এত বড় একজন সম্রাটের সম্বন্ধে হিন্দুসাহিত্য ও ইতিহাস কোনরূপ উদারতা দেখান নাই। কেবল কহ্লনের "রাজতরঙ্গিনী" নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে কনিষ্কের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন– "খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে **বাঙলাদেশ সম্ভবতঃ কুষাণ রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল**। ঐ যুগের কয়েকটি মুদ্রা উত্তরবঙ্গে এবং হুগলি জেলায় মাহনাদ গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে।"

বিক্রমপুরে মহাযানপ্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। কি ভাবে কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্মে মূর্তি নির্মাণের ও মূর্তি-পূজার প্রথা প্রবর্তন হইল, সেকথা বলিবার জন্যই আমরা এখানে কনিষ্কের বিষয় আলোচনা করিলাম।

গুপ্তবংশ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর, গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়-কাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যবর্তী কালের ইতিহাসের সহিত, আমাদের কোন সংস্রব নাই, কাজেই উহার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অপ্রসাঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কালকে ভারতের সুবর্ণ যুগ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। গুপ্ত-রাজত্ব হইতে অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙলার ইতিহাসের কিছু কিছু মালমসলা পাওয়া যায়।

গুপ্ত রাজবংশ

খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত রাজবংশ নামে এক নূতন রাজবংশ মগধের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। (আনুমানিক ৩৫০–৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এ সময়ে অনেক শক্তিশালী নৃপতির আবির্ভাব হওয়ায় হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদার উপকূল পর্যন্ত সর্বত্র ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষ যেমন এক বিরাট ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয়শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, এই যুগেও তেমনি ভারত আর একবার বিরাট রাষ্ট্রীয়শক্তি-গঠনে অর্থাৎ, এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সংস্কৃত

সাহিত্যের উন্নতি, বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরায় অভ্যুত্থান, ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি ভারতের বাহিরে ভারতের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতার ও ধর্ম প্রচারিত হইয়া **বৃহত্তর ভারতের** সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইতিহাস লিখিবার উপকরণ

গুপ্ত রাজাদের রাজত্ব-কাল হইতে ইতিহাস লিখিবার কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উৎকীর্ণ শিলালেখ, তাম্রলিপি হইতে মুদ্রা এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ হইতে গুপ্ত রাজাদের কীর্তিকলাপ প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা যায়। এই গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম **গুপ্ত**। ইঁহাকে গুপ্তলেখমালায় 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। ইঁনি মগধের কাছাকাছি ২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তরাজ মহারাজ শ্রীগুপ্তের সময়ে মগধেশ্বর কে ছিলেন তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ মৌখরি, ভারশিব বা বাকাটক বংশের কেহ কেহ সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

মহারাজ গুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচগুপ্ত পিতার ন্যায় একজন সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। মগধ অঞ্চলে তাঁহার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। এই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই শ্রীবৃদ্ধির মূলে **লিচ্ছবি জাতির** নাম করা যাইতে পারে। লিচ্ছবি জাতি প্রাচীনকালে বৈশালী রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব-সময়ে লিচ্ছবি জাতি একটি প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই লিচ্ছবি বংশের এক রাজকন্যা মহাদেবী কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। পাটলীপুত্র লিচ্ছবি জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারদেবীর বিবাহোপলক্ষে তাঁহারা পাটলীপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে যৌতুক স্বরূপ সমর্পণ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্মরণীয় করিবাব জন্য কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী কুমারদেবীর মূর্তি ও অপর দিকে সিংহবাহিনী লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও 'লিচ্ছবয়ঃ' লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া মগধ হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তৃত প্রদেশই তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন– চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে একটি নূতন সংবতের প্রবর্তন হয়। ইতিহাসে উহা **গুপ্ত সংবৎ** নামে প্রসিদ্ধ। এই সংবৎ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। **'চন্দ্রগুপ্ত'** অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র **'সমুদ্রগুপ্ত'** গুপ্ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গণনা করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, তথাপি চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভজাত ছিলেন এই জন্যই আমরা তাঁহার খোদিত লিপিতে দেখিতে পাই,– তিনি আপনাকে 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে **সমুদ্রগুপ্ত** একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহাই নহে, তিনি রাজনীতিজ্ঞ, বিদ্বান ও সঙ্গীতানুরাগী নৃপতি ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল দিগ্বিজয়ী রাজার নাম দেখিতে পাই তিনি তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সমুদ্রগুপ্ত নানা দেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উত্তর-ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যকালের ইতিহাস এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে অবস্থিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়। এ লিপিটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃতভাষায় রচিত। এই প্রকার লিপিকে **প্রশস্তি** বলে। মহাকবি হরিষেণ এই প্রশস্তিটি রচনা করেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবন-চরিত সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ইহাতে আছে।

সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ বিজয়

উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তে আপনার বিজয়-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত জয় করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দক্ষিণ ভারত বিজয়ের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। আমরা উত্তর ভারতে তাঁহার বিজয়বার্তার কাহিনীই আলোচনা করিব। আমরা হরিষেণের প্রশস্তি হইতে জানিতে পারি, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বিজয়-যাত্রা করিয়া একে একে 'সমতট' (পূর্ববঙ্গ), কামরূপ, ডবাক, নেপাল, কর্তৃপুর (বর্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্তরাজ্যের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশ' নামক কাব্যের চতুর্থ সর্গে নৃপতি রঘুর যে দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক দিগ্বিজয়েরই রূপক বর্ণনা মাত্র। কালিদাস রঘুর বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই কথা একেবারে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। কবির বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'সুহ্ম' এবং 'উৎকলের' লোকেরা সহজেই রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গবীরেরা তাঁহার সহিত অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। আমরা রঘুবংশের ৪র্থ সর্গ ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক পর্যন্ত কালিদাস রঘুর যে দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহাদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ ॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।

ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামসাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
স তীর্ত্ত্বা কপিশাং সৈন্যের্ব দ্বিরদ-সেতুভিঃ ॥
উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮ ॥

বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্যদেশ সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্বমহোদধির বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন। ৩৪ ॥

বেগবতী প্রবাহিণীর খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছিত বৃক্ষকেই উন্মুলিক করে, কিন্তু আনতকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন। ৩৫ ॥

বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে তাঁহাদের পরাজয় সাধনপূর্বক গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। ৩৬ ॥

তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর, তাঁহারা শালি ধান্যের ন্যায় (রোয়াধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ৩৭ ॥

তদন্তর রঘু গজনির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩৮ ॥[১] [রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ–বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ ৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা]

কালিদাসের এই বর্ণনা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিলাম, রঘু যে দিগ্বিজয় করেন সেই বঙ্গদেশ, পূর্ববঙ্গ এবং বিশেষরূপে **বিক্রমপুরকেই** বুঝাইতেছে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদাজীর মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মানদীর মধ্যবর্তী ভুখণ্ডই **বঙ্গনামে** পরিচিত। এই বঙ্গ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তারপর আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রঘুর সহিত বাঙালিরা যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বীরত্বের পরিচায়ক। বঙ্গদেশের রাজারা রণতরীর সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙলাদেশ বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে যেরূপ নদী আছে সেরূপ নদী আর কোথাও নাই। স্বর্গত ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন– "বাংলার যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল। –দোলা, দুলি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী

১. Some scholars are of opinion that it is really the Guptas who under the poetic disguise of Raghus form the theme of Kalidasa's Raghuvansa, and the Canto IV of the poem is a disguised version of the conquering tour of *Samudra Gupta* a record of whose conquest is inscribed on the pillar now in Allahabad fort but originally at Kausambi, 30 miles westward on the Jumna. With regard to the eastern powers of the age, this inscription describes Samudragupta as *Samatata Davaka-Kamarup-Nepala-Karttrpuradi, pratyanata, nripatibhih..pranamagamana, paritosia-pracanda-sasanasya* (Fleet, P. 8). It may be noted incidentally that Karttipura is identified with present Kumaon (V. smith, J.R.A.S. 1897, P. 881). The Indian Historical Quarterly Vol. VII No 3 September 1931 page 440.

ইত্যাদি। এই সকল ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাঙলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।"

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন "বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এই কথা 'রামচরিতে' স্পষ্ট লেখা আছে। ইংরেজী ১২৭৬ সালে তাম্রলিপি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়ে পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এই কথাও কল্যাণ নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

"কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাঙলা দেশের নৌকা-যাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,– চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ একজন সওদাগর, একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন। সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৫/১৬ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বাণিজ্য করতেন।[১] কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। অনেক সময় দূর দূরান্তরেও যাইতেন।

পালবংশীয় নরপালগণের কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাটক" এবং কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাট" শব্দ উৎকীর্ণ আছে। বাঙালীর নৌবল চিরপরিচিত। মহাকবি কালিদাস এই জন্যই বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই রঘুর সহিত বাঙলার রাজারা রণতরীসমূহ লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন কিংবা পক্ষান্তরে দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের সহিত নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিক্রমপুর অঞ্চলে নানা শ্রেণীর নৌকা এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে আমরা সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। কেদাররায় ৫০০ কোষা লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে এবং মগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই জানা আছে। এরূপ স্থলে আমরা নানা অনুকূল প্রমাণের দ্বারা বলিতে পারিতেছি যে, সমুদ্রগুপ্ত যে বাঙলার রাজাদের নিকট বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ববঙ্গের প্রতাপশালী নরপতিদিগের কাছেই হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কোন কোন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের মতে ইউ-য়ান চুয়াঙ্গের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) রামপালের নিকটই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। এইরূপ স্থলে আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-যাত্রার ফলে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সেকালের সমুদ্রশাখা মেঘনাদের বক্ষে হওয়া অসম্ভব নহে এইরূপ অনুমান করিতে পারি। অপরপক্ষে শালিধান্য রোপণ বঙ্গদেশে, বিক্রমপুরে আড়িয়ল বিল অঞ্চলে এখনও রোপিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই আমরা অনুমান করিতে পারি শ্রীবিক্রমপুরের

১. য়ুয়ন্-চয়ঙের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। য়ুয়ন্-চয়ঙের অন্যূন এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের রাজবাটীতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না। বান্ধব, ষষ্ঠখণ্ড; পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৯।

অধিবাসী এবং সেকালের পূর্ববঙ্গের রাজাদের সহিতই নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এখানে আমরা একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া 'অশ্বমেধ-যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে নির্মিত সেই যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তরময় মূর্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে আবিস্কৃত হইয়াছিল। উহা এখন লক্ষ্মৌ-এর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞে দক্ষিণা দান করিবার জন্য এক নূতন সুবর্ণ মুদ্রা নির্মাণ করেন, ঐ সমুদয় মুদ্রার একদিকে যজ্ঞযূপে আবদ্ধ অশ্ব ও অন্যদিকে প্রধানা মহিষীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এই মুদ্রা অধুনা অতি দুস্প্রাপ্য। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম গৌড় ও রাঢ়া প্রদেশ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং 'বিক্রমপুর' যে সে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের সীমান্তভুক্ত ছিল এইরূপ অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, সমতট-বঙ্গের অধিবাসিগণ সহজে সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাহারা নিজদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার সুবর্ণ মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় ধনুর্বাণ হস্তে রাজার মূর্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশু হস্তে রাজার মূর্তি এবং তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় মূলহস্তে রাজার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় রাজা একটি আসনে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন। সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার মুদ্রায় বিক্রমাঙ্ক, শ্রীবিক্রম, বিক্রমাদিত্য, অজিতবিক্রম, সিংহবিক্রম এইরূপ নানা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল উপাধির মধ্যে বিক্রমাদিত্য উপাধিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপাধি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে উজ্জয়িনীর একজন নৃপতি শকদিগকে পরাজিত করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং বিক্রমাব্দ নামে একটি অব্দের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও এই 'শকারি বিক্রমাদিত্যের' অনুকরণে শকজাতীয় ক্ষত্রপবংশের রাজ্য নাশ করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' নাম ধারণ করিয়াছিলেন ও রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকট মেহরৌলি নামক যে গ্রাম আছে সেখানে লৌহস্তম্ভের গায়ে একটি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে 'চন্দ্র' নামক একজন রাজার বিজয়-কাহিনী সংক্ষেপে খোদিত আছে। এই চন্দ্র কে? ইনি প্রথম কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অন্য কোন রাজা সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন এই চন্দ্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। মেহরৌলি লিপির চন্দ্ররাজা বঙ্গদেশের বিদ্রোহী শত্রুদলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, 'চন্দ্র' সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী কোন রাজা হইবেন, কারণ সমুদ্রগুপ্তই প্রথম বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিলেন।[১] অতএব সমুদ্রগুপ্তের পরে বঙ্গবাসীগণ যে দেশের

স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইবেন তাহা সম্ভবপর। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। 'বিক্রমপুর' নামটি প্রাচীন তাম্রশাসনে 'শ্রীবিক্রমপুর' নামে লিখিত রহিয়াছে। অতএব বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ 'বিক্রমাদিত্য' রাজার নাম হইতে 'বিক্রমপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সম্বন্ধে আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গদেশ বিজয়ের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গবাসীগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহ দমন করেন ও নিজের উপাধি 'শ্রীবিক্রম' সংযুক্ত পুর বা নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যদিও এ বিষয়ে আমরা পূর্বে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি। এবং এখনও ইহাই সঠিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি কিনা তাহাও বিচার্য। তবে ইহা লৌকিক প্রবাদ ও কিংবদন্তীর সহিত মিলিয়া যায়। সেজন্যই বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিলাম।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতেও চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিতেছি। কাজেই আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত বঙ্গদেশের বা বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ অপ্রাকৃত নহে।

শাসনের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি ছোট-বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেই ভাগগুলিকে 'ভুক্তি' বলা হইত। এই ভুক্তি শব্দ পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল, যেমন পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, সৌরাষ্ট্র এবং মালবের শক রাজাদের যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই শকবিজয়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাতেই কবি কালিদাস, উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বিরাজমান ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণনা এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে যাহা করিয়াছেন এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় কালিদাস যেন রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার স্থলে সমুদ্রগুপ্তেরই দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভারতের সহিত রোমকসাম্রাজ্যের বাণিজ্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রোমের সুবর্ণমুদ্রা 'দিনেরিয়স্' এদেশে ব্যবহার হইত। গুপ্ত রাজারা রোমের মুদ্রার অনুকরণে সুবর্ণমুদ্রা

১. Eastern Bengal or at least grater part of it probably remained as an independent Kingdom or more properly a confederacy of independent Kingdoms till the middle of the fourth century A. D. About this time we hear of a great fight put up by a confederacy of states in Vanga against a hero called Chandra who conquered the whole of Northern India from Bengal in the east to Bahlika beyond the Indus to the west. There is much dispute among historians about the identity of this king Chandra. Some have identified him with Chandra Gupta I or Chandra Gupta II of the Imperial Gupta dynasty while others have identified him with Chandra varman of the susunia inscription. The Early History of Bengal by Dr. R. C. Majumder, M. A. ph. D. page 13. (1) Meherauly Pillar inscription of Chandra; Fleet. Gupta Inscriptions, p. 139 (2) E. G Mr. R.G. Basak in (3) Ind. Ant. 1919 p. 98 ff. Ep. Ind. Vol. XIII p. 133; vol. XII p. 318. (4) Dacca Review vol. X. 1920-21, Nos. 2, 3, 4, 5.

মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এ সকল মুদ্রাকে "দিনার" বলা হইত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রজতমুদ্রারও প্রচলন করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজাদের এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা নানা স্থানেই বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে প্রায় দুইশত গুপ্তমুদ্রা কালিঘাটে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় 'মহম্মদপুর' গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক রজতমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র 'কুমারগুপ্ত' আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। পিতার ন্যায় কুমারগুপ্তেরও অনেকগুলি উপাধি ছিল। তিনি তাঁহার মুদ্রাতে সেই সকল উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন,- যেমন, মহেন্দ্র, মহেন্দ্রাদিত্য, সিংহমহেন্দ্র; অজিতমহেন্দ্র, গুপ্তকুলব্যোমশশি, 'অশ্বমেধ মহেন্দ্র' ইত্যাদি। আমরা এই সমুদয় উপাধি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, কুমারগুপ্ত আপনাকে বীরত্ব ও প্রতাপের দিক দিয়া পিতার সমকক্ষ মনে করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার রাজ্যকালের শিলালিপি এবং মুদ্রার প্রাপ্তি-স্থান হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহার অধিকার বঙ্গদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার অমাত্য চিরাতত্ত্ব পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেন। কিন্তু বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ বা সমতটে কে শাসন করিতেন? তাহার কোন উল্লেখ নাই। অতএব 'শ্রীবিক্রমপুর' কোন অজ্ঞাতনামা রাজার অধীনে স্বাধীন ছিল, এইরূপ অনুমান ব্যতীত আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না। পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৪১৫ গৌপ্তাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সময়কার ছয়টি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রজতমুদ্রায় ১৩৬ গৌপাব্দ পর্যন্ত বর্ষ অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালের অবসান ঐ বর্ষ অর্থাৎ, ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্ত

কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্র ও হূনজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত অসাধারণ পরাক্রমের সহিত তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ভিটারি লিপিতে [গাজিপুর জেলায় ভিটারি নামক স্থানের স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি] হইতে জানা যায় যে, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিরচিত রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য এক রাত্রি ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। "অর্থাৎ, যুবরাজকে রণক্ষেত্রেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আনুমানিক ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারগুপ্ত পরলোক গমন করিলে - স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন।

স্কন্দগুপ্ত বীর রাজা ছিলেন। তিনি হূনদিগকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু হূনেরা পরাজিত হইয়াও উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজ্যের প্রান্তদেশ-সমূহ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের প্রভাব-তাঁহার জীবিতকাল সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ অবধি অক্ষুন্ন ছিল। তিনি কুমারগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় তিনি পরম ভাগবতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল অসাধারণ। রাজা

নিজে বৈষ্ণব হইলেও জৈন ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি অভাব ছিল না। তিনি কোন ধর্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না। আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা

অনেক ঐতিহাসিকের এইরূপ ধারণা যে, স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু একথা প্রমাণসহ নহে। শিলালেখন ও সাহিত্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে গুপ্তসাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরার্ধেও মালব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তরাজাদের অধিকার উত্তরবঙ্গ, বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী দেশ (বুন্দেলখণ্ড, বঘেলখণ্ড, জব্বলপুরের নিকটবর্তী প্রদেশ ইত্যাদি) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন পরমভট্টার মহারাজাধিরাজ ও গুপ্তসম্রাটের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গে শাসন করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পুরগুপ্ত; সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মহিষী বৎসদেবীর পুত্র নরসিংহগুপ্ত পিতার পর সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। আনুমানিক ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল মহালক্ষ্মী দেবী। মহালক্ষ্মী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৪৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে পুর, নরসিংহ ও দ্বিতীয় কুমারের রাজত্বকাল মাত্র দশ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের পর বুধগুপ্ত, গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। তিনি একে একে জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র নরসিংহগুপ্ত ও পৌত্র কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়কে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে পৌত্রের মৃত্যুর পর কেহই যখন সিংহাসনের দাবী করিবার রহিল না; তখন তিনি নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বুধগুপ্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশ হইতে মালব পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যে বিস্তৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হূনেরা ক্রমশঃ গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বিস্তৃত গুপ্তসাম্রাজ্য খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। হূনেরা একে একে মালব, রাজপুতনা এবং পঞ্জাব অধিকার করিল। এই ভাবে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

ভানুগুপ্ত নামক একজন গুপ্ত রাজার নাম অরিকিনের (Eran) লিপিতে পাওয়া যায়। এই ভানুগুপ্ত ও বালাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই মনে করেন। লিপিতে ভানুগুপ্তকে 'পৃথিবীর বীর ও পার্থের ন্যায় শক্তিশালী নরেশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভানুগুপ্ত সম্ভবতঃ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিহিরকুল পরাজিত হইবার পরেও নানরূপ নৃশংস অত্যাচারের দ্বারা ভারতবর্ষে এক ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করেন, সেই সময়ে মাণ্ডসোরের (Mandasor) রাজা যশোধর্মদেব ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে এই রক্তপিপাসু নররাক্ষসের হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার সাধন করেন।

. যশোধর্মদেবের রাজকবি বাসুলি বিরচিত কীর্তি-গাথা হইতে আমরা যশোধর্মের ইতিহাস জানিতে পারি। মান্ডাসোরের (Mandasor) লিপি উৎকীর্ণ হইবার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ, ৫৪৯-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত বংশের এক প্রতিনিধি যাঁহাকে একটি লিপিতে পরমবট্টারক, মহারাজরাধিরাজ পৃথিবীপতি বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশের পুণ্ড্রর্ধনভুক্তিতে (উত্তরবঙ্গ) শাসন করিতেছিলেন। কালবশে লিপি হইতে তাঁহার নামটি বিলুপ্ত হওয়ায় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা অন্ধকার রহিয়াছে। কোন গুপ্ত রাজার প্রতিনিধি বঙ্গদেশে শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার পরিচয় আমরা জানিতে পারিলাম না।

যশোধর্মদেবের মৃত্যুর পর আর্যাবর্তের শাসনভার মৌখরি নামক রাজবংশের নৃপতিদের হস্তে পতিত হয়। মৌখরিগণ প্রথমে মগধে বাস করিতেন। মৌখরিরা পরে কান্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মৌখরি রাজারা গুপ্তসম্রাটদের পদ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। মৌখরিদের প্রাচীন ইতিহাস বেশ ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই। মৌখরি নামে একটি প্রাচীন গোত্রের কথা জানা যায়। জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকাবৃত্তি নামক পাণিনিরচিত আষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ-সূত্রের টীকা-গ্রন্থে মৌখরি নাম পাওয়া গিয়াছে। কাশিকাবৃত্তি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

মৌখরি নামের উৎপত্তি যাহাই হউক, এই নামের দুইটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একটি গয়ার নিকট অবস্থিত বরাবর ও নাগার্জুনী নামক পর্বতমালায় অবস্থিত "গুম্ফামন্দিরের" (Cave-Temple) ভিত্তিগাত্রে খোদিতলিপি হইতে মৌখরি রাজ অনন্তবর্মা, তাঁহার পিতা শার্দুলবর্মা ও পিতামহ যজ্ঞবর্মার নাম পাওয়া গিয়াছে । এই তিন জনের শাসনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী নির্ধারিত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইহারা গুপ্তসম্রাটদের সামন্ত ছিলেন।

এই বংশের প্রধান শাখার তিনজন রাজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিবর্মা, আদিত্যবর্মা, এবং ঈশ্বরবর্মা। ঈশ্বরবর্মার সময়েই মৌখরিবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঈশ্বরবর্মার পিতা আদিত্যবর্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বরবর্মা উভয়েই গুপ্তরাজবংশের রাজকুমারীদের বিবাহ করেন। এই বিবাহের দ্বারা যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঈশ্বরবর্মার উত্তরাধিকারীর নাম ঈশানবর্মা। ঈশানবর্মা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।[১] আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানবর্মা সম্ভবতঃ গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত অসিতে অসিতে সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবং হূনাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি আন্ধ্র, শুলিক ও গৌড়দিগকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন।

---

১. ক. In or about the year A.D. 554, however, Isanvarman Maukhari ventured to measure swords with the Guptas, and probably also with the Huns, and assumed the Imperial title of Maharajadhiraja. For a period about a quarter of a century (A. D 554-cir, A. D 580) the Maukharis were beyond question the strongest politicial power in the upper Ganges valley. (Political History of Ancient India, Page 429 by Dr. H. C. Roy Chaudhury, M. A. Ph. d.)

খ. From an inscription of his son, Suryavarman we learn that Isanvarman was ruling in 661 (I. e. A. D. 554) and that he had conquered the land of the Andhras, defeated the sulikas, otherwise unknown, and caused the *Gaudas* to cease their raids and remain within their own territory. (Page 102, The Cambridge shorter History of India.)

এইরূপ বিজয়ের দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াই তিনি 'মহারাজাধিরাজ' পদবি ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মার বিজয়-কাহিনী তাঁহার 'হারাহা' নামক গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। গৌড়দের উল্লেখ সর্বপ্রথম হারারা লিপিতেই পাওয়া যায় এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

ঈশানবর্মার পরে সর্ববর্মা মৌখরি রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সে সময়ে গুপ্ত বংশের দামোদর গুপ্ত রাজত্ব করিতেন। সর্ববর্মার সহিত দামোদর গুপ্তের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে সম্ভবতঃ দামোদর গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সর্ববর্মার রাজত্বকালেই মগধ মৌখরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। আদিত্য সেনের অফসড় লিপি হইতে জানা যায় যে, দামোদর গুপ্ত সম্মুখ-সমরে প্রাণ-বিসর্জন করেন। দামোদর গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র মহাসেন গুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন। মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের রাজ্য মালবদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। মহাসেনগুপ্তের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা, আসামরাজ সুস্থিরবর্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহাসেনগুপ্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন। অফসড়ের লিপিতে এই বিজয়-কাহিনী লিখিত আছে। মহাসেনগুপ্ত স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করেন। এই বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধন শ্রীকণ্ঠে (স্থানেশ্বর) এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র হর্ষবর্ধন পরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উত্তর ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্তের পরে দেবগুপ্ত নামক একজন মালব নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে স্বাধীন গুপ্ত-রাজাদের কোন প্রভাব ছিল না।

আমরা পূর্বে সংক্ষেপে গৌড় দেশের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা গুপ্ত রাজাদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, সমুদ্র গুপ্ত এমন পাঁচটি রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন, যাঁহাদের রাজ্য কলিঙ্গ রাজ্যের সীমান্তভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে শৈলোদ্ভব নামক একটি রাজবংশ কলিঙ্গদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের বিষয় আলোচনা অনাবশ্যক।

হর্ষের রাজত্বকালে বাঙলা দেশে আমরা একজন অতি পরাক্রমশালী নৃপতির পরিচয় পাই। তিনি মহারাজা শশাঙ্ক। মহারাজা শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহার সহিত মহারাজ হর্ষের যে কলহ হইয়াছিল, তাহা আমরা বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিত এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান্ চুয়াং-এর ভ্রমণ-বিবরণী হইতে জানিতে পারি। কয়েক-খানি খোদিতলিপি হইতেও শশাঙ্কের বিষয় অবগত হওয়া যায়। বঙ্গদেশ ও মগধের নানাস্থান হইতে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইউ-য়ান্-চুয়াং লিখিয়াছেন– "বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু কর্ণসুবর্ণের নৃপতি শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন যে, বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই ভাবে চীনদেশীয় শ্রমণ শশাঙ্ককে একজন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধ-নির্যাতনকারী নৃপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষচরিতে এই রাজাকে "দুষ্ট-গৌড়-ভুজঙ্গ" নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শশাঙ্ক কে ছিলেন সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। হর্ষ-চরিতেরবর্ণনানুসারে ইঁহাকে গৌড়াধিপতি বলিয়া মনে হয়। সেকালে গৌড় বলিতে প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ বুঝাইত। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, শশাঙ্ক মগধ,

গৌড় ও রাঢ় দেশের অধিকারী ছিলেন। ইঁহার অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। হর্ষ-চরিতের একখানা পুঁথিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, গৌড়াধিপ শশাঙ্ক মগধ, গৌড় ও রাঢ়া দেশের অধিপতি ছিলেন-বঙ্গ রাজের সহিত কোন সম্পর্ক তাঁহার ছিল না। যদি ইনি বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তাহা হইলে সমতট বা বঙ্গের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। স্বর্গত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বাঙলার ইতিহাসে" শশাঙ্কের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন– "নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী অভিজাত কুলজ কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে কান্যকুজ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্বোক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাঙ্ক নামে মুদ্রাঙ্কিত, তৎসমুদায়ের এক পার্শ্বে হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্তি আছে। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রাসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই-একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্মিকা মূর্তি, দ্বিতীয়তর মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি, গুপ্ত-মুদ্রার সহিত শশাঙ্কের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দুইটি সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্তসম্রাটগণ ভাগবৎ মতাবলম্বী অর্থাৎ, বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুদ্রায় বৃষভবাহন মহাদেবের মূর্তি দেখা যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখন-কালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামেও অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত যে দুইটি মুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় আছে, তাহাদিগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যে খোদিতলিপি আছে, কোন পণ্ডিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ 'নরেন্দ্রাদিত্য'। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের "আদিত্য" নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য গুপ্ত রাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি। শশাঙ্কের রাজ্য ও তাহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে অনমুান হয় যে; তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ সম্ভবতঃ সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন।"[১] এ-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

---

১. ক. Like the Maukharis, the rulers of Bengal, too, seem to have thrown off the Gupta yoke in the second half of the sixth century A. D. In the fourth and the fifth centuries Bengal undoubtedly acknowledged the suzerainty of the Gupta Empire. The reference to Samatata in Eastern Bengal as a Pratyanta or border state in the Allahabad Pillar inscription of the emperor Samudra Gupta proves that the Imperial dominions must have embraced the whole of western Bengal, while the inclusion of Northern Bengal (Pundravardhana bhukti) within the empire from the days of Kumar Gupta I to A.D. 543-4 is sufficiently indicated by the Damodarpur plates, Samatata, through outside the limits of the Imperial provinces, had, neverthe-less, been forced to feel the irresistible might of the Gupta arms.

রায়চৌধুরী বলেন,– "মৌখরি নৃপতিদের ন্যায় সম্ভবতঃ বাঙলাদেশের শাসনকর্তারাও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত রাজাদের অধীনতা-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনাধিকারে যে ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাঙলাদেশের সীমা কতদূর– অর্থাৎ, গুপ্ত রাজারা যে বাঙলা দেশের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাত্রোৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের যে দিগ্বিজয় কাহিনীর বর্ণনা পাই, তাহা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, সমতট এবং ডবাক ব্যতীত বাঙলার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ এবং রাঢ় অর্থাৎ, সমুদয় পশ্চিম বঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তবে উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি) প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে আনুমানিক ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই বিবরণ আমরা দামোদরপুরের লেখন হইতে জানিতে পারি। সমতট বা বঙ্গরাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ছিল, তথাপি তাহাদের উপরে গুপ্ত রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল না এমন কথা বলা যায় না।"

আমরা উত্তর ভারতের সম্বন্ধে এবং বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলাম। আমরা একটি কথা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলাম যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালব ও গৌড়দেশের গুপ্তরাজা তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা পুনরায় ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার উচ্চাশা অন্তরমধ্যে পোষণ করিতেন। তাঁহাদের এই আশা-পূর্ণের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল থানেশ্বর ও কান্যকুব্জের মিত্রশক্তি। থানেশ্বরের বর্ধন নৃপতি ও কান্যকুব্জের মৌখরি রাজা উভয়েই গুপ্তদের বিশেষ শত্রু ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে গুপ্তেরা মৌখরী ও পুষ্যভূতিদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পূর্বে আমরা বাঙলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই জানিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ে এ-বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারিতেছি। একটি বিষয়ে বিশেষভাবে গৌরব বোধ করিতেছি এজন্য যে, পূর্বে অনেকেরই এইরূপ একটা মত ছিল যে, বাঙলাদেশ অতি আধুনিক; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ইহার দাবী চলিতে পারে না এবং পাল রাজাদের পূর্বে বাঙলাদেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সৌভাগ্যক্রমে বিবিধ ঐতিহাসিক আবিষ্কারের দ্বারা বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের সমৃদ্ধি দিন-দিনই আমাদের নিকট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি রাঁচি-প্রবাসী রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত

খ. From the fact that the plates found in west Varendra refer to Gupta emperors while found elsewhere in Bengal refer to kings of other lines, it appears that the Gupta sway in Bengal was confined to west Varendra or what was afterwards known may as the kingdom of Gauda, while the rest of Bengal and Kamarupa merely adopted the Gupta script and the Gupta system of administration but were not under their sway. From the fact none of there inscriptions go beyond Kumargupta's line of we may conclude that Bengal was included in the gupta empire when it reached its palmy days under the emperor, as the poet Vatsa-Bhatti puts it in the verse...Samudranta etc. (Fleet, P. 82).

শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের অসাধারণ চেষ্টা, যত্ন ও গবেষণায় বাঙলা দেশের প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের অনেক কিছু প্রত্নচিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে। মিঃ ই, এ, মরে (E. A. Morray) টাটানগরের কাছাকাছি রুয়ানগর (Ruanagar) নামক স্থানে অনেক কিছু প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে বৃহত্তর বঙ্গের বিস্তৃত ভূ-ভাগ ছোটনাগপুর এবং বিহারের সভ্যতার ইতিহাস কোনরূপে আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর নামক স্থানেও অনেক কিছু প্রাচীন প্রত্নচিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী জেলায়, চব্বিশ পরগনায় এবং মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খননের সহিত ৩য়, ৪র্থ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের এবং ২য় ও ৩য় শতাব্দীর যে সমুদয় রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় এক সময়ে বাঙলাদেশের উপর কুষাণ নৃপতিগণেরও প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আমরা এই অধ্যায়ে গুপ্ত রাজাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে যদিও আমরা এখন পর্যন্ত গুপ্তরাজাদের সমকালীন বাঙলা দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানিবার সুযোগ পাই নাই, তথাপি এই কথা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশের ইতিহাস বেশ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। আমরা এই অধ্যায়ে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যব্রাহ্মী-লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। মহাস্থানগড়ই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গুপ্তরাজাদের সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। যখন মহাস্থানগড়ের নানাস্থানের খনন-কার্য সম্পূর্ণ হইবে তখন আমরা আশা করিতে পারি, গুপ্তরাজাদের সমসাময়িক ইতিহাস আরও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিব এবং রাঢ়া, বারেন্দ্র, বঙ্গ এই বিরাট বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের বিশেষ গৌরবের কারণ হইবে।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বাঙলা দেশে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পৌণ্ড্রবর্ধন নগর গুপ্ত যুগ হইতেই বাঙলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার অবশেষ করতোয়া তীরে বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ের ধ্বংস-স্তূপগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপগুলি প্রায় চারি মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার কোন কোন স্থান খনিত হওয়ায় গুপ্তযুগ হইতে পালযুগ পর্যন্ত অর্থাৎ অনুমান পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত নানা প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, গুপ্তরাজাদের প্রভাব বারেন্দ্রভূমির পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বারেন্দ্র ভূমিই পরে গৌড়সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। বাঙলা দেশের অন্যান্য ভূখণ্ড এবং কামরূপ ইত্যাদি গুপ্তলিপি এবং গুপ্ত শাসনরীতি অনুসরণ করিলেও গুপ্তরাজাদের শাসনাধীনে ছিল এমন কথা বলা চলে না। এইরূপ স্থলে অনুমান করা যায় যে, কুমারগুপ্তের পূর্বে সমগ্র বাঙলাদেশ কখনই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

গুপ্তরাজাদের বিষয়ে আমাদের আর বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা অনাবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইলাম গুপ্তরাজাদের প্রভাব উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ বারেন্দ্রভূমে যেইরূপ বিস্তৃত ছিল বঙ্গদেশের অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত সাসারাম হইতে চব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রোটাসগড় অবস্থিত। অনেকদিন পূর্বে রোটাসগড় গিরিদুর্গস্থ প্রস্তর-গাত্রে খোদিত একটি লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে– "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য"– শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের। ঐতিহাসিকগণের মতে ইহাই মহারাজ শশাঙ্কের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ-লিপি অক্ষরতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা এই শিলালিপির কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই মহারাজ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই শশাঙ্ক সর্বপ্রথম করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু ইনি কোন্ রাজার অধীনে করদ রাজা ছিলেন তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌখরি ঈশানবর্মার রাজত্বকালের হারাহা লিপি ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশানবর্মার পরে একে একে সর্ববর্মা, অবন্তীবর্মা ও গ্রহবর্মা ক্রমান্বয়ে মৌখরি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রহবর্মা অকালে নিহত হন। ঐতিহাসিকগণের মতে শশাঙ্ক মহারাজা গ্রহবর্মা ও অবন্তীবর্মার সময়ে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মহারাজ শশাঙ্ক সাহাবাদ জেলার করদ রাজা ছিলেন। এবং তিনি সর্বপ্রথম অবন্তীবর্মা ও তাঁহার পুত্র গ্রহবর্মার অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন– "শশাঙ্ক সর্বপ্রথম কর্ণসুবর্ণে স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। তারপর তিনি ক্রমশঃ পুণ্ড্রবর্ধন, গয়া, রোহিতগিরি এবং চোঙ্গোদ-মণ্ডল করায়ত্ব করেন। শশাঙ্ক মৌখরিদের অধীনে মহাসামন্ত রূপে রাঢ়া, গৌড় ও মগধে শাসন করিতেন বলিয়া সমীচীন বোধ হয় না। মহাসামন্ত শশাঙ্ক উক্ত দেশত্রয়ে শাসক ছিলেন ধরিয়া লইলে তাঁহার রাজ্য অধিরাজের রাজ্য হইতে বৃহৎ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ মহাসামন্ত শশাঙ্কের আধিপত্য সাহাবাদ জিলা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশের উপর বিস্তৃত ছিল বলিয়া, কোন প্রমাণ নাই। রোহিতগিরি বর্তমানে রোটাসগড়, প্রাচীনকালে একটি বিখ্যাত স্থান ছিল ইহা পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশোদ্ভব নৃপতিগণের পূর্বপুরুষদের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক সর্বপ্রথমে রোটাসগড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং, মূলতঃ শশাঙ্ক রোটাসগড়েরই অধিবাসী ছিলেন। এমতাবস্থায় শশাঙ্ককে বাঙলার সর্বপ্রথম জাতীয় বীর বলিয়া উল্লেখ করা চলে। "শশাঙ্ক বাঙলার জাতীয় বীর বলিয়া গণ্য হইলে অন্যান্য যে সমস্ত বিদেশী বাঙলা জয় করিয়াছিল তাঁহাদিগকেও বাঙলার জাতীয় বীর বলা যাইতে পারে।"

শশাঙ্ক পশ্চিম দেশে যুদ্ধাভিযানের পূর্বে মগধ, গৌড় ও রাঢ়া জয় করিয়াছিলেন। রোটাসগড় হইতে কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটী। উহা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শশাঙ্কের জয়ের অব্যবহিত-পূর্বে গৌড় ও রাঢ়ার অধিপতি কে ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই। বপ্পকোষ তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে জয়নাগ

কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। নিধানপুর তাম্র-লিপির সংবাদ অনুযায়ী কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মণ· কিছুকালের জন্য কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্মা জয়নাগকে পরাজিত করিয়া কর্ণসুবর্ণ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শশাঙ্ক গৌড়দেশ তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। ইহার পরেই ভাস্করবর্মা কামরূপের সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মহারাজ শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাই হোক ৬১৫-৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতে শশাঙ্কের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। উক্ত বর্ষে দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার নিকট হইতে কলিঙ্গ অধিকার করেন। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-আন্-চাং মগধ পরিদর্শন করেন। তাঁহার মগধ ভ্রমণের কিছুকাল পূর্বেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়াতে বোধিবৃক্ষ ধ্বংস করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণবর্ম মগধের রাজা হইয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্য কাহার দ্বারা শাসিত হইতেছিল তাহার কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। কাজেই ঐ সমুদয় দেশ কাহার দ্বারা শাসিত হইত তাহা বলা কঠিন। সে সময়ে গৌড়দেশের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, দেশের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা আরম্ভ হয়। কোন রাজা এক সপ্তাহ, কোন রাজা দুই সপ্তাহ, কেহ বা এক মাস কাল রাজত্ব করেন।

ইউ-য়ান্-চাং বলেন শশাঙ্কের অত্যাচারেই বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর এবং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়। বিক্রমপুর-রামপালে আবিষ্কৃত· শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশ রোহিতগিরিতে রাজত্ব করিত। শ্রীচন্দ্রের প্রপিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। উক্ত চন্দ্রবংশের সহিত শশাঙ্কের কোন সংস্রব ছিল কি না তাহা বলা কঠিন।

এইরূপস্থলে পূর্ববঙ্গের বঙ্গরাজ্যে শশাঙ্কের কোন প্রভাব বিদ্যমান ছিল কি না বলা সম্ভবপর নহে। কেন-না সেই সময়ে বঙ্গদেশ খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবেই শাসিত হইত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুপ্ত রাজাদের সময় ভারতবর্ষে শিল্প ইত্যাদির দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং পাহাড়পুরে দুইটি বিখ্যাত ধর্মকেন্দ্র ছিল। পাহাড়পুরে জৈন প্রভাব যে বিদ্যমান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল চীন-শ্রমণ আসিয়াছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই গুপ্ত রাজাদের সময়ে নালন্দা-বিহারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং উহার সমৃদ্ধি দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়।

গুপ্ত রাজারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং কোন্ দেব-দেবীর উপাসক ছিলেন তাহা বলা কঠিন এবং তাঁহাদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল তাহাও সঠিকভাবে বলা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি খোদিত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইঁহারা বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। গয়ার খোদিত-লিপিতে গরুড় চিহ্ন মুদ্রিত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন। অনেকে বলেন তাঁহাদের রাজধানী

পাটলীপুত্র বা বর্তমান পাটনা নগরীতে ছিল। কালিদাসের মতে তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল পুষ্পপুর–

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।

প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্প-পুরাঙ্গনানাম্ ॥

রাজপুত্রি! এই বরণীয় মগধরাজ কর্তৃক পাণি-পীড়ন যদি তোমার অভিলাষিত হয়, তবে পরিণয়ের পর শোভাযাত্রা করিয়া যখন পাটলীপুত্র নগরে মহাসমারোহে প্রবেশ করিবে, তখন তত্রত্য প্রাসাদসমূহের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইয়া কত সুন্দরী ললনারা তোমার কমনীয়-কান্তি দর্শনে নয়ন সার্থক করিবে।"

(রঘুবংশ–ষষ্ঠ সর্গঃ ২৪ শ্লোক) বসুমতী সংস্করণ

পালরাজগণের অভ্যুদয়

মহারাজা শশাঙ্কের পর অনেকদিন পর্যন্ত গৌড় বা বঙ্গদেশের কোন প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায় না। সে-সময়ে বাঙলাদেশ বলিতে সমগ্র গৌড়দেশকে বুঝাইলেও উহা উত্তর ভাগকেই বিশেষরূপে বুঝাইত। এই সময়ে নানা বিদেশী রাজারা বাঙলা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তদানীন্তন গৌড়ের রাজাকে নিহত করেন এবং অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। এইভাবে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তির ভিতর দিয়া বাঙলা দেশের শাসনকার্য চলিতেছিল। দেশের নানাস্থানে অশান্তি, বিদ্রোহ, কু-শাসন প্রভৃতির জন্য দেশে কোনরূপ শান্তি ছিল না। অনেকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় গৌড়-বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে জয়াপীড়ের গৌড়দেশে আগমনের কথা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত উত্তর ভারতে এমন কোন ক্ষমতাশালী নৃপতির আবির্ভাব হয় নাই যিনি সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বাঙলা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারবার আক্রমণে গৌড়ের প্রজারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর গুপ্তবংশের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজাই গৌড়, মগধ ও বঙ্গে আপনাদের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজেদের শক্তির অপচয় করিতেন। মিলিতভাবে দেশের কল্যাণ করিবার মত আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চ আদর্শ তাহাদের কাহারও ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। দেশপ্রীতি বলিয়া কোনরূপ অনুভূতি তাহাদের মধ্যে ছিল না। সেই সময়ে বাঙলা দেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া সন্ধ্যাকর নন্দী উহা মাৎস্যন্যায়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মাৎস্যন্যায় বলিতে অরাজকতা বুঝায়। মাৎস্যন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক ন্যায়। তাহার অর্থ– দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার-জনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথ বর্ম বিরচিত "লৌকিক ন্যায়-সংগ্রহ" গ্রন্থে "মাৎস্যন্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা–

"প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্ব্বল-বাধাবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ।

অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাসিষ্টে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তুত্যোক্তিম্–

এতাবতাথ কালেন অদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভুবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায় কদর্থিতম্ ॥

যথা–প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিস্নেতি ন্যায়ার্থঃ।"

অধ্যাপক বোধিলিঙ্গ একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যথাঃ

"পরস্পরাভিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্মনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যোন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে ॥"

–Von Bohtlingk's-Inde Spruche.

বঙ্গদেশে একসময়ে এইরূপ মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হইলে, প্রজাপুঞ্জ তাহা দূরীভূত করিয়া গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনের এই বিবরণটি তারনাথের গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। ইহা বাঙলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'মাৎস্যন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম,-এ লিখিয়াছেন– "to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed like a fish.[১]

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল সে-সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন এক-একজন রাজা নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তারনাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইহা হইতে গৌড়বঙ্গের অরাজকতার বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতে পারা যায়।

আমরা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিতেছি, বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে পালরাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসাধারণ কর্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় আমরা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশি–
শশধর ইব ভাসো বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতি রবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া–
অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ ॥
আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ ॥
মাৎস্য-ন্যায়-মপোহিতুং প্রকৃতির্ভির্ল ক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ

১. গৌড়লেখমালা– ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন ১৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি-স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন- যশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

"মনোহারিণী লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তিস্থান [সম্ভব] যেমন শশধর, সেইরূপ অবনিপালকুলের সর্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজিপুরুষ [প্রকৃতি] সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" "যিনি বিপুলকীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী [সর্বকার্যে] কুশল, প্রশংসনীয়, সেই বপ্যট [দয়িতবিষ্ণু হইতে] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক] 'মাৎস্য ন্যায়" [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্বাচিত করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর [দিঙ্মণ্ডল-প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম এই তিনটি শ্লোকে দয়িতবিষ্ণু, বপ্যট এবং গোপাল এই তিনজনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দয়িতবিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে নৃপতিগণের উত্তমবংশের প্রকৃতি বা বীজপুরুষ সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে দয়িতবিষ্ণু বিদ্বান এবং রাজবংশের জনক ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের প্রশস্তিকার যখন তাঁহাকে সর্ব-বিদ্যাবিৎ ভিন্ন আর কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই, তখন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি বিশেষ প্রভাবশালী লোক ছিলেন না। পরের শ্লোকে দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি প্রশংসার যোগ্য, অরাতিনিধনকারী কুশলী এবং বহুকীর্তিকলাপ দ্বারা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা অরাতি-নিধনকারী এই বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বপ্যট একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং যে-সে যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় যোদ্ধা ছিলেন। যিনি পৃথিবীকে কীর্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, অনেক মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে- গোপালদেব এবং দেদ্দদেবী হইতে ধর্মপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপালদেব পালরাজবংশের প্রথম রাজা। গোপালদেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এবং সিংহাসনারোহণের সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। তারনাথের মতে গোপালদেব প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি ঐ মতাবলম্বী। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে- "গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০-৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।"[১]

১. ক. বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রথম খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ. Bengal suffered from prolonged anarchy which became so intolerable that the people (C.A.D. 750) elected as their king one Gopala, of the race of the sea, in order to introduce settled government. The oxford History of India -By Vincent A. Smith, C.I.E. page 185.

ধর্মপাল ৭৯৫-৮৩০ খ্রিস্টাব্দ

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালদেব পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও পালবংশের প্রকৃত কীর্তিকলাপ এবং বিস্তৃত রাজ্য-সমৃদ্ধি ধর্মপালের সময়েই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ধর্মপাল যেমন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি পালরাজাদের গৌরবও তাঁহার দ্বারাই প্রসারিত হয়। প্রায় সমুদয় উত্তর ভারত তিনি জয় করেন। কাজেই গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কেবল বাঙলা ও বিহারের রাজা ছিলেন তাহা নহে, তিনি বঙ্গ, বিহার ও উত্তর ভারতের নৃপতি ছিলেন।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক ধর্মপালের যে তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয় তাহা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক-পত্নীর নিকট হইতে পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ক্রয় করেন। সেদিন হইতেই ইতিহাসের এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। এই তাম্রশাসনখানিই হইতেছে পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্মপালদেবের ভূমিদানের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনখানি খালিমপুরে আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহা খালিমপুরের লিপি নামে পরিচিত। এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নৃপতি ধর্মপালদেব কিরূপ বীরপুরুষ ছিলেন, কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়।

তাম্রশাসনখানির সপ্তম শ্লোকে আছে– "সেই রাজা (ধর্মপাল) প্রকট-লীলাচলিত-সেনাবল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতে মস্তকস্থিত নম্রীকৃত মণি-দ্বারা মস্তকে বেদনা অনুভব করিয়া, সেই বেদনাক্রান্ত শিরঃ সমূহের সাহায্যার্থ হস্তোদগম করিয়া, অনন্তদেব অধোদেশে [সেই রাজার] অনতিদুরবর্তিরূপে ত্বরিত পদে অনুগমন করিয়া থাকেন।"

দ্বাদশ শ্লোকে রহিয়াছে– "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে [ইঙ্গিতমাত্র] ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [সামন্ত ?] নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে, করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ-কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কান্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।"– ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ধর্মপাল কত বড় বীরপুরুষ ছিলেন।

মহাবীর ধর্মপাল রাজা হইয়া প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খলা করেন। পরে তিনি এইরূপ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন।

এই সময়ে কান্যকুব্জে বা কনোজে ইন্দ্রায়ুধ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে রাজপুতনার ভিল্লমাল নামক নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া নাগভট নামক একজন রাজা রাজপুতনাও মালবদেশ শাসন করিতেছিলেন। এই সময় বিন্ধ্যপর্বত ও নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নৃপতিদের রাজধানী প্রথমে নাসিক নগরে ছিল, পরে উহা মান্যখেত নগরে স্থানান্তরিত হয়। ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের (শ্রীপরবাল) কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ

করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের শাসন সময়ে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র [মহেন্দ্র] নামক নরপতির ধর্মপালের হস্তে পরাভব, অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ধর্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,– ধর্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।[১]

চক্রায়ুধ বশ্যতা স্বীকার করিলে মহানুভব নৃপতি ধর্মপাল চক্রায়ুধের উপর প্রসন্ন হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক করাইলেন। ধর্মপালের মহত্ত্ব ও বীরত্ব দর্শনে রাজপুতনা ও পঞ্জাবের নৃপতিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

ভিল্লমালের তেজস্বী রাজা নাগভটের কাছে ধর্মপালের এই বীরত্ব-গৌরব সহ্য হইল না। বাঙলা দেশে যখন অরাজকতা ছিল, বাঙলার রাজারা যখন দুর্বল ছিলেন, তখন নাগভটের পিতা বৎসরাজ বাঙলা দেশ আক্রমণ করিয়া তথায় রক্তস্রোত বহাইয়াছিলেন, বাঙলার দুইটি রাজছত্র কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। সেই পদদলিত বাঙলার রাজা আজ সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট হইতে চলিলেন, ইহা নাগভটের সহ্য হইল না। নাগভট প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইবার নাগভটের সহিত ধর্মপালের যুদ্ধ হইল। ধর্মপালের শ্বশুর তৃতীয় গোবিন্দ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার জামাতা পূর্ব-ভারতপতি ধর্মপাল প্রতীহার-রাজ নাগভটের আক্রমণে বিপন্ন, তখন তিনি বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া উত্তরা-পথে অগ্রসর হইলেন। নাগভট তখন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে ধর্মপালের সৈন্য আর পশ্চিমদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট এইবার পরাজিত হইলেন এবং কোথায় যাইয়া যে লুকাইলেন তাহার আর সন্ধান মিলিল না। নাগভটের পরাজয়ের পর যুদ্ধের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল।

ধর্মপাল দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙলা ও বিহারের সর্বত্র অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।[২] মহারাজা ধর্মপাল ও পরবর্তী

১. গৌড়লেখমালা–২১ পৃষ্ঠা।

২. ধর্মপালের পিতা গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ধর্মপালের [খালিমপুরে আবিস্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারনাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তর লিপির (গরুড়স্তম্ভলিপির দ্বিতীয় শ্লোকে আছে– সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিলেন যে,– [শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটি মাত্র দিকেও [সদ্যঃ] দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম" [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।–এই শ্লোকোক্ত ধর্ম নামক রাজা ইতিহাস বিখ্যাত ধর্মপাল। তাঁহার [খালিমপুরে আবিস্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের [দ্বাত্রিংশদ্বর্ষীয় দ্বাদশ মার্গ দিনে] পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে আর কখনও' পালবংশীয় নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ আবিস্কৃত হয় নাই। গৌড়লেখমালা ৭৭ পৃষ্ঠা।

পালরাজগণ প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনে 'গৌড়াধিপ' ও 'গৌড়েশ্বর' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। প্রতিহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে ধর্মপালকে "বঙ্গপতি" বলিয়া এবং তাঁহার সৈন্যগণকে 'বঙ্গান্' অর্থাৎ বাঙালী বলা হইয়াছে। বঙ্গ পালরাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলে এইরূপ উক্তির কোন মূল্য থাকে না।[১] স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র গরুড়স্তম্ভ-লিপির আলোচনা করিতে যাইয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন-"পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারনাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, (তদধিপ) শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল নরপালগণ যে বাঙালী ছিলেন, এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।"

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছিল। 'ঢাকার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন- "এই সব কারণে মনে হয় ধর্মপাল হয়ত গোপালের জীবতাবস্থায় বঙ্গের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" বঙ্গ বলিতে যে সমুদয় পূর্ববঙ্গকে বুঝাইত সে বিষয়ে আমরা পূর্বেও অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।[২]

আমাদের মনে হয় যতীন্দ্রবাবুর এই অনুমান সত্য। এই প্রসঙ্গে আমরা বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিত ভাবে ইহা আলোচনা করিয়াছি।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় তাঁহার পিতা গোপালদেবের জীবিতকালে তিনি যখন

---

১. ঢাকার ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা,
গৌড়লেখমালা ৭৭ পৃষ্ঠা। পাদটীকা।

২. ক. Banga the country to the east of and beyond the delta J.A.S.B. 1873, No III and H. Blochman's History and Geography of Bengal.

খ. Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before and afterwards, having long be near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole. [Hamiltons' Hindusthan vol. 1]

গ. There can be little doubt that a portion, at any rate, of the district of Dacca was included in the ancient kingdom of Pragijyotisha or Kamrup- a passage in the Yogini Tantra distinctly stating that the southern boundary of that kingdom was the junction of the Brahmputra and Lakshya, which is situated near the modern town of Narayangaj. The early traditions that have come down to us indicated that Dacca and several of the neighbouring districts were originally under the sway of Buddhist kings. According to the Tibetan legends a Buddhist king named Vimala was master of Bangala and Kamrup, and therefore of Dacca. Hiuentsiang who visited Kamrup in the second half of the seventh century states that Samatata, which probably included the Pargana of Bikrampur, was a Buddhist kingdom although the king was a Brahman by caste. In the Raipura thana brass images of Buddhist origin have been discovered and two copper-plates with inscriptions of Buddhist kings. These have been assigned by experts to the end of the eighth and begining of the ninth century and a copper-plate found in the Faridpur district, which is ascribed to the same period, proves that the Bikrampur pargana was also under Buddhist rule, District Gazetteer of Dacca, Page 19.

বঙ্গে [বিক্রমপুরে] শাসনকার্যে ব্রতী, তখনই হয়ত 'বিক্রমপুরী-বিহার'-নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে যে সকল প্রত্ন-চিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, পাহাড়পুরের মন্দির ও বিহার এক সময়ে ধর্মপালদেবের সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃপতি ধর্মপাল জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন বঙ্গে [বিক্রমপুর] শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন তখন বিক্রমপুরী-বিহার নির্মাণ করিয়া থাকিবেন।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গদেশে আধিপত্য করেন এবং পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তারনাথের মতে ধর্মপাল চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ তারনাথের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য মনে করেন না। তাঁহারা অনুমান করেন ধর্মপাল দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন (৭৭০-৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।[১]

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গঙ্গাতীরে নির্মিত তাঁহার বিক্রমশীলার বিহারের খ্যাতি পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন– ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি মহাযানমতালম্বী বৌদ্ধ ছিলেন।

ধর্মপাল ও তাঁহার পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে প্রাচীন নালন্দা-মহাবিহার ও ধীমান্ ও তাঁহার ছেলে বীতপাল নামে দুইজন শিল্পী বিশেষ খ্যাতিমান্ হইয়া উঠে এবং তাহাদের নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি সেকালের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

ধর্মপাল বাঙালীজাতির গৌরব সেকালে যে-ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাস চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বীর সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর-পশ্চিমের সীমা গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ধর্মপালের কীর্তি-কথা সেকালের লোকের মুখে মুখে পরিকীর্তিত হইত। খালিমপুরের তাম্রশাসনের ১৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে– "সীমান্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ (?) কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্র ভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।[২]

১. Dharmapala was a Buddhist, and built a celebrated monastery at Vikramsila, on the bank of the Ganges. He seems to have enjoyed a very long reign, probably of forty five years. (A. D. 770-815). [The Cambridge shorter History of India. Page 143.]

Dharmapala, like all the members of his house, was a zealous Buddhist. He founded the famous monastery and college of Vikramsila, which probably stood at Patharghata in the Bhagalpur District. The Buddhism of the Pals was very different from the religion or philosophy taught by Gautama, and was a corrupt form of Mahayana doctrine. [The Oxford History of India By Vincent A. Smith, C.I.E. pp. 185.]

২. স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন– ধর্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্তীকালে বরেন্দ্র মণ্ডলের ঘরে ঘরে মহীপালের গীত প্রচলিত হইয়াছিল। হয়ত একসময়ে ধর্মপালের গীতও সেইভাবে সকল স্থানেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই শ্লোক ভিন্ন, তাহার ধন্য কোনরূপ উল্লেখ সাহিত্যে বা জনশ্রুতিতে বর্তমান নাই।– গৌড়লেখমালা ২২ পৃষ্ঠা

সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন– "এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোন প্রশাস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর-প্রকার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না, এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জনে সফলমনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি?"১

পালবংশীয় নৃপতিদের সহিত 'বঙ্গ' পূর্ববঙ্গের ও বিক্রমপুরের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। 'বঙ্গপতি' ধর্মপাল বঙ্গরাজ্যের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এজন্যই পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে পালবংশীয় নৃপতিদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলন আছে, এবং তাঁহারা ভূ-স্বামী বা ভূঁইয়া নামেও জনগণমধ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন।২

দেবপালদেবের "মুঙ্গেরলিপি" [১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের নগরে কর্ণেল ওয়াট্‌সন কর্তৃক এই তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রপট্টলিপির একটি লিথোগ্রাফ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চালর্স উইল্‌কিন্স এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।]– এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দেবপালদেব– "নির্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্মনিরত, বোধিসত্ত্ব যেমন নিরুপদ্রব বুদ্ধপদ লাভ করেন নির্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্ম-নিরত দেবপালদেবও সেইরূপ নিরুপদ্রব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ,– একদিকে বরুণ নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র] এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসন্তপ্তভাবে উপভোগ করিয়াছেন।"

আজ পর্যন্ত দেবপালদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, দেবপালের সেনাপতি লাউসেন বা লবসেন আসাম ও কলিঙ্গ রাজ্য পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপাল বিহার, বঙ্গ এবং আসামের উপর যে

১. রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়লেখমালা' দ্রষ্টব্য

২. ... The next ruler we hear of belonged to the Boonheas or Buddhist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, (Dacca) and in that protion of it lying to the north of the Boorganga and Dulleserry where the sites of the capitals are still to be seen. Justpal resided at Moodabpore in the Purgunnah of Toolipabad. Harischandra at Cotabary near Sabar and sesoopal at eopassia in Bhowul... (Taylors Topography of Dacca).

"The Bhuya or Buddist Rajas (founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this district, to the north of Booriganga and Dhaleswary, where the sites of their Capital are still to be seen." Hunters' statistical Account of Dacca, p. 118.

আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত।

"অরিনৃপতিমুকুটঘটিত চরণঃ সকল ভুবনবন্দিত শৌর্য্যঃ।

বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশেরর্চ্চিতোহতিশয় ধবলঃ ॥

রাষ্ট্রকূট নৃপতি প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলখণ্ডে আবিস্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ-বঙ্গ, মগধ ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন।[১]

কাজেই ইহা, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গ- পূর্ববঙ্গ বা বিক্রমপুরও দেবপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

দেবপালের মন্ত্রীর নাম ছিল দর্ভপাণি। দর্ভপানির নীতি-কৌশলেই দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমস্ত ভূমি দেবপালের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এইরূপ অনুমান করা যায় যে, মান্যখেট বা খেতের রাষ্ট্রকূটবংশ ভিল্লমালের গুর্জর-প্রতীহারবংশ এই দুই বংশের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবপাল আপনার পৈত্রিক-রাজ্য সগৌরবে সুরক্ষিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২]

দেবপাল প্রায় ঊনচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর ক্রমশ পালবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। গুর্জার-প্রতীহার নৃপতিরা প্রবল হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ মগধ, ত্রিহুত এমন কি বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাহাড়পুরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে গুর্জর-প্রতীহার রাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও এ-কথা সপ্রমাণ হয়।

দেবপালের পর বিগ্রহপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শূরপাল নামেও পরিচিত।

"নৃপতি প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে- তদীয় পুত্র- নারায়ণ পালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহন করেন।- সমুদ্র-পত্নী [জহ্নুকন্যা] জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয় [রাজ] বংশ ভূষণস্বরূপা লজ্জানাম্নী [কন্যা] তাঁহার [বিগ্রহপাল] পত্নী হইয়াছিলেন। [সেই লজ্জাদেবীর] বিশুদ্ধ চরিত্র পিতৃবংশের এবং পতিবংশে পরম "পাবন-বিধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।" বিগ্রহপাল- "আমার

১. The sırur inscription claims that worshıp was done to him by the kıngs of *Anga, Vanga, Magadha, Malava* and *Vangıs*. As regards *Anga, Vanga,* and *Magadha* places which lay very far to the East, in the directions of Bengal,- the assertion is doubtless hyperbolical. "Bombay Gazetteer. Vol I part II page 402 (1) Epigraphica Indica for V.P.211.(2) Epigraphica indica vol IX p, 5

২. গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, দর্ভপাণি দেবপালের প্রধান আমাত্য ছিলেন। দেবপাল, মন্ত্রী দর্ভপাণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। উহার ষষ্ঠ শ্লোকে লিখিত আছে- "নানা মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তবাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিকচক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। গৌড়লেখমালা। গরুড়স্তম্ভলিপি ৭৮ পৃষ্ঠা।

পক্ষে তপস্যা এবং তোমার পক্ষে রাজ্য"– এইরূপ বলিয়াই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক পুত্র বিগ্রপালকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।"

নারায়ণপালদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসন ভাগলপুরে আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহা "ভাগলপুরলিপি" নামে সুপরিচিত। এই তাম্রশাসন কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশবর্ষ রাজত্বকালে এই তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং উহা– **"সৎসমতট–জন্ম-শুভদাস-পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস** নামক শিল্পি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় সমতট নামে নগর যে বিদ্যমান ছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং সমতটনগর নাম হইতে এক বিস্তৃত ভূ-ভাগের নাম **সমতট** হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক লিখিত **"সমতটের রাজধানী"** শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। [সাহিত্য ২৫শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩২১।]

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপালের সময় হইতেই পালরাজবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপালদেব যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন উত্তরবঙ্গ পালরাজগণের হস্তে ছিল না। **দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জেলায়** তখন পালরাজগণের রাজত্ব মাত্র বিদ্যমান ছিল। এক কথায় কেবলমাত্র সমতটের আধিপত্যই লাভ করেন।

মহীপালদেব বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাণগড়-লিপি হইতে জানিতে পারি "বিগ্রহপাল তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ [প্রথমে] জল প্রচুর পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর [তদনু] মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল-শীকরোৎক্ষেপে তরু-সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিলেন।" তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।

মহীপালদেব আপনার পূর্বপুরুষগণের হস্তচ্যুত রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌড়, মগধ প্রভৃতি অধিকার করিয়া এমন কি কাশী পর্যন্তও আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পুনরধিকৃত এই রাজ্য বিদেশীয়েরাও সময় সময় আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে– "মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য হইতে 'চন্দ্র' রূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে "কলাময়'ত্বের, আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা-গজেন্দ্রগণের [আশ্রয়-স্থানাভাবে] নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংক্ষুব্ধ হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায়, এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে মহীপালদেবের "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য

পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্যবিপর্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।[১] স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন– "মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত।[২] তাঁহার মতে "প্রথম মহীপালদেব পালরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ কাম্বোজ-জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্মার সাহায্যে গুর্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষের পূর্বে বঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩]" আমরা এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, গৌড়বঙ্গাধিপ পাল নৃপতিরা ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই শাসনকর্তারূপে বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নিরাপদে বাস করিয়া শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য জল প্রচুর পূর্বাঞ্চলে [বিক্রমপুরে] রাজধানীতে বাস করিয়াও শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন।

মহীপালদেব প্রথম ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ

মহীপালদেব প্রথম আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। পালরাজাদের মধ্যে মহীপাল বেশ জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী আজও শ্রুত হওয়া যায়।[৪]

---

১. গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা–১০০।

২. বাঙলার ইতিহাস– রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা– ২১১।

৩. The Dacca Review, May, 1914, page 55.

৪. Of all the Pala kings he is the best remembered, and songs in his honour, which were both sung in many parts of Bengal until recent times, are still to be heard remote corners of Orissa and Kuchbihar" Dt. Gazetteer Rajshahi, page 26.

বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রধান কীর্তি-স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই দীঘি রঙ্গপুরের অতি সন্নিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের নানা গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তর-বঙ্গে গীত হইয়া থাকে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত" এই প্রবাদ বাক্য বাঙলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:

"যোগীপাল ভোগীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত।"

বৃহৎবঙ্গ– ডা. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ২৬২ পৃষ্ঠা।– তিরুমালয়-পর্বত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই লিপির মূল উদ্ধৃত করা অসম্ভব। তৎ-পরিবর্তে উদ্ধৃত অংশের ডা. হলৎ (Hultz scle) কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। .....In the 13th year *(of the reign)* of king.

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ আক্রমণ ১০২০-১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল তাঁহার রাজত্বে নবম ও ত্রয়োদশ বৎসর [১০২০ হইতে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দের] মধ্যে ওড্ড-বিষয়, কোশল-নাডু বঙ্গালদেশ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গৌড়াধিপ মহীপাল ১৮০৩ সম্বতে [১০২৬] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, প্রথম রাজেন্দ্রচোল "ওড্ড-বিষয়" বা উড়িষ্যা তক্কনলাড়স বা দক্কিনরাঢ় এবং "বঙ্গালদেশ" বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্য পালবংশীয় মহীপাল। তিরুমলয়ের লিপিতে যেভাবে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে' তাহা পাঠে মনে হয় তিনি গৌড়রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, – উড়িষ্যার রাজা মহীপালকে কর প্রদান করিতেন। চোলরাজ সম্ভবতঃ উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং রাঢ়ের সামন্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; এবং মহীপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্বেই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী চোলরাজ গৌড়রাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"পরকেশরী বর্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে– যিনি... তাঁহার মহান সমর-পটু সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন– দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশলনাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি ভীষণ যুদ্ধে ধর্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড়বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ চর্মপাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময়-তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা।

মহীপাল গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিবার কিছুকাল পরেই মুসলমানগণের উত্তরাপথ বিজয়ের সূত্রপাত হইতে থাকে।

Parakesarivarman *alias* the lord Srirajendra-Choladeva, who ......seized by (his) great, war-like army (the following) ....odda-vishaya which was difficult to approach, *(and which he subdued in)* close fights; the good Kosalainadu, where Brahmans assembled; Tandubutti, in whose gardens bees abounded *(and which he acquired)* after having destroyed Dharmapala (in) a hot battle; Takkanaladam whose fame reached (all) directions, *and which he occupied* after having forcibly attacked Ranasura; Vangala desha, where the rain-wind never stopped, *(and from which)* govindachandra fled, having descended from his male elephant; elephants of rare strengths and treasures of women *(which he seized)* after having been pleased to put to flight on a hot battle field Mahipala, decked *(as he was)* with ear rings, slippers and bracelets; Uttiralandam, as rich in pearls as the ocean; and the Ganga, whose waters dashed against bathing places covered with sand" Epigraphica Indica, vol. VII, Appendix, List of Ins of also see No 727-728 India No 729-গৌড়রাজমালা ৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য।

সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ-ফলে যখন উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ নৃপতি জয়পাল, আনন্দপাল প্রভৃতি অনেকেই রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যখন একে একে কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান বিজয়ী আক্রমণকারীর আক্রমনে বিধ্বস্ত হইতেছিল, সে সময়ে গৌড়ের নৃপতি মহীপাল যে কোনও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এইরূপ কিছুই জানা যায় না।

মহীপালকে সেই সময়ে পরের মঙ্গলমন্দিরে জীবনোৎসর্গ করিতে দেখা গিয়াছিল। সেই সমুদয় অতুলনীয় কীর্তি আজিও পুণ্যশ্লোক নৃপতি মহীপালের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় [রাঢ়দেশে] খনিত তাঁহার "সাগরদীঘি", এবং বরেন্দ্র (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপালদাঘি" আজিও মহীপালের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।[১] এতদ্ব্যতীত তিনটি বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ– বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহীপুর", দিনাজপুর জেলায় "মহীসন্তোষ" এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় "মহীপাল", মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। গৌড়াধিপ মহীপালের বারাণসীধামেও অনেক কীর্তি রহিয়াছে। সারনাথের প্রাপ্ত একখানা লিপি হইতে জানা যায় যে– "গৌড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের দ্বারা ঈশান (শিব) ও চিত্রঘণ্টার (দুর্গার) মন্দিরাদি [কীর্তিরত্নশতানি] প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন, মৃগদাবের (সারনাথের) "ধর্মরাজিকা" বা অশোকস্তূপ এবং অশোকের স্তম্ভোপরস্থিত "সাঙ্গ-ধর্মচক্রের" জীর্ণ-সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং অভিনব "শৈলগন্ধকুটী" নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথের লিপিতে মনে হয় যে– "বারাণসী তখন গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মহীপালের রাজত্বকালেই গৌড়রাষ্ট্রে বৌদ্ধশ্রমণদের একটি সম্মেলন হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে তিব্বত হইতেও অনেক বৌদ্ধশ্রমণ আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই মিলন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পালদেব গৌড়, মগধ, বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি– "সমস্ত নরপালগণের মস্তকে পদ-বিন্যাস করিয়া, সকলদিকেই প্রতাপ বিস্তৃত করিয়া অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী স্নিগ্ধ প্রকৃতি লোকানুরাগভাজন ছিলেন বলিয়া বর্ণিত

১. Mahipal-dighi, This is a large tank by the side of the Malda road about 18 miles south-west of Dinajpur in the Bansihari thana. It is thus described by Buchanan Hamilton:-

"In the north-east part of this division is a very large tank, supposed to have been dug by Mohipal Raja and called after his name. The sheet of water extends 3,800 feet from north to south and 1,100 feet from east to west. Its depth must be very considerable, as the banks are very large. On the banks are several small places of worship, both Hindu and Moslem, but none of any consequence; nothing remains to show that Mohipal ever resided either at the tank or at Mohipur, near it, but there is a vast number of bricks, and some stones, that probably belonged to religious buildings that have been erected by the person who constructed the tank. One of the stones is evidently the lintel of a door and of the same style as those at Bannagar and may have been brought from the ruins of that city. The people in the neighbourhood have an idea that there has been a building in the centre of the tank; but there is probably devoid of truth, as there is no end to the idle stories which they relate concerning the tank and Mohipal. Both are considered as venerable or rather awful and the Raja is frequently invoked in times danger." District Gazetteer, Dinajpur, page 138.

হইয়াছেন। নৃপতি নয়পাল পিতৃরাজ্য সুরক্ষিত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

নয়পাল, বিক্রমপুরবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে (অতীশ) বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানের জ্যোতিঃ বহন করিয়া গিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) :

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ, সে সময়ে গৌড়েশ্বর নয়পালের সহিত কর্ণ্যদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল।– "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে অর্থাৎ মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ-বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ্যরাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল, তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।"

এ প্রসঙ্গে "গৌড়রাজ-মালা" লেখক বলেন যে– নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলার-বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়-সেনা "কর্ণ্যরাজের সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শত্রুগণ রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার বুস্তন তাঁহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বুস্তনের প্রদত্ত মগধ– আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোন্ রাজ্যকে যে বুস্তন "কর্ণ্য" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। "কর্ণ্য" শব্দ যদি রাজ্যের নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া রাজার নাম মনে করা যায়, তবে এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে। চেদির কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র "কর্ণ্য" নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ] মধ্যে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণ্যের পৌত্রবধূ অহ্লনা দেবীর [ভেরঘাটে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণ্যের ভয়ে "কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।" অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [কর্ণ্য বলে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে সূচিত হইয়াছে– গৌড়াধিপ গর্ব ত্যাগ করিয়া কর্ণ্যের আজ্ঞা বহন করিতেন। কর্ণ্য চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধ-রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক্[১] নয়পালদেব সম্ভবতঃ কুড়ি বৎসর কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,– "নয়পালদেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্ত নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন-মন্দিরের প্রশস্তি রাজী বৈদ্যসহদেব

১. Journal of the Buddhist Text Society vol. I, 1903, pp 9-10. Edited by Rai Saratchandra Das Bahadur,

* (1) Epigraphica Indica vol, VIII, App. I.
(2) I bid' vol II, p. 11 (3) Indian Antiquary, vol, XVII p. 27.

কর্তৃক এবং গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতা-প্রযুক্ত বহু ভুল সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল **গৌড়-মগধ-বঙ্গের** অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। **নয়পালদেবের-রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বতরাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন।**[১]

বৌদ্ধদের– জগতে দীপঙ্কর

বৌদ্ধদের নিকট দীপঙ্করের নাম সুপ্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশের একান্ত সৌভাগ্যবশতঃ তিনি বঙ্গদেশে বাঙালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কথা বাঙালীদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই জানেন। যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষগুরু, যাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট একসময়ে সম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়।"

অতীশ দীপঙ্কর

আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, দীপঙ্কর আনুমানিক ৯৮০ কিংবা ৯৮২-৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ান্তঃর্গত বাঙলাদেশের বিক্রমপুর-বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম– "বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন।" প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দীপঙ্করের জীবন-লেখক বলেন– "He was born in the central palace called Suvarnadhvaja [Dhvaja-ensigns of royalty] of the city of *Vikrampuri* in Bangala. পাগ্-সাম্-জন-জাঙ্গ-এর মতে তাঁহার জন্মভূমি বিক্রমপুর বজ্রাসনের পূর্বদিকে অবস্থিত। (১) অনেকে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের পশ্চিমে বজ্রাসন বিহার ছিল বলিয়া অনুমান করেন। বজ্রাসন বলিতে সাধারণত বুদ্ধগয়াকে বুঝায়। 'বজ্রাসন' শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে বাজাসন। পশ্চিমে ঢাকা জেলার নান্না ও সুয়াপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই পল্লীর সন্ধিস্থলে একটি বড় রকমের বিহার ছিল তাহা এখন উচ্চ ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ ঢিপিগুলির নাম 'বাজাসনের ভিটা'।

দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী (তিব্বতীয় নাম Dge-vahi) এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। দীপঙ্কর যখন বালক মাত্র তখন তাঁহাকে শিক্ষার জন্য জেতারি নামক একজন অবধূতের নিকট প্রেরণ করা হয়। জেতারির নিকট দীপঙ্কর বর্ণ-শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া পরে পঞ্চ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন।

এই জেতারি কে ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বলা কঠিন। পাগ্-সাম্-জন-

১. (১) গৌড়লেখমালা ৪৫ পৃষ্ঠা (২) Indian Pandits in the land of snow, by Rai Bahadur Sarat Chandra Das C.I.E pp. 51-71. বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা। Memorirs of Asiatic Society Bengal, Vol. V P. 77-79. শিবদাস সেন, সম্পাদিত চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা। pag-Sam-jon-zang X C. VII. Index. p. 97.

জাঙ্গের মতে জেতারি বরেন্দ্রের সনাতন নামক এক রাজার ঔরসে ও জনৈকা যোগিনী উপপত্নীর [Yogini concubine] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গর্ভপাদ। পাল রাজাদের অধীনে সনাতন ছিলেন একজন সামন্ত নৃপতি। আর জেতারি ছিলেন তাঁহারই সভার একজন সভাসদ্। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বরেন্দ্র নৃপতি সনাতন একজন ব্রাহ্মণজাতীয় বৌদ্ধ [Brahman-Buddhist] আচার্যের নিকট তান্ত্রিক দীক্ষালাভ করেন এবং তৎ-সম্বন্ধে সিদ্ধি লাভের জন্যই রাজা যোগিনীকে উপপত্নীরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।[১]

---

১. Dipankar was born A.D, 980 In the royal family of Gour at Vikrama (nl) pur in Bangala, a country lying to the east of Vajrasana. His father called Dge-Vahi dpal in Tibetan i.e. "Kalyana Sri" and his mother prabhabati gave him the name of Chandra gurbha, and sent him while very young to the sage Jetari an Avadhuta adept for his education. Under Jetari he studied the five kinds of minor sciences, and thereby paved his way for study of philosophy and religion.

(১) "বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাজাসন সম্বন্ধে বলেন– যে সমস্ত প্রমাণ দেখিয়া স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই বাজাসন বিহারেই দীপঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তিনি সম্ভবতঃ এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয় সেটলমেন্ট অফিসার স্বরূপ এই অঞ্চলটি জরীপ করেন। তিনি বাজাসন-বিহারের বড় ঢিবি খানিকটা খনন করাইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই খনন কার্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে লিখিয়াছেন– "অনুমান ৪/৫ হাত গর্ত করার পর দালানের ভিত্তি (foundation) পাওয়া যায়। তাহার পর আরও কয়েক হাত খোড়া হইয়াছিল। উক্ত foundation নাকি দুই হাত প্রস্থে ৩৫ হাত লম্বা ছিল। ইটগুলি বেশ বড় বড় ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি প্রস্থে এবং উচ্চতায় তিন ইঞ্চি হইবে। স্থানীয় ডাক্তার নরেন্দ্রমোহন আচার্য মহাশয় বলিয়াছেন– খোদাই করা কতগুলো বাসন, পুষ্পপাত্র, কোসাকুসি, টাট, থালা, ঘণ্টা, শঙ্খ এবং একটি বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল এবং নানা রকমের কতকগুলি পাথর পাওয়া গিয়াছে। জিনিসগুলি একটা থলিয়া ভরিয়া কে লইয়া গিয়াছে বলিতে পারিলেন না। বাসুদেব মূর্তিখানা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যপ্রকাশ দাশগুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। নান্নারবাসী প্রাচীন জমিদার শত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন– "বাজাসনে ১৩/১৪টি ভিটা ছিল। দক্ষিণে রোউয়া, পূর্বে নান্না, পশ্চিমে মলঙ্গী ও কৈকেয়ী নামক বিল পর্যন্ত ভিটাগুলি বিস্তৃত ছিল। এই স্থান প্রায় ৩/৪ মাইল লম্বা। তিনি বলেন, আজ ৩০০/৪০০ বৎসরের মধ্যে এখানে কোন বসবাস নাই এখনও নান্নার ও ভাদাউদিয়ার লোকদের বাজাসনের লোক বলিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, বাজাসন হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী সাভার পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ছিল, তাহাতে সাভারের লোক অনায়াসে এই বাজাসনের বিহারে যাতায়াত করিতে পারিত। যখন ধীমন্তসেনের পুত্র রণধীরসেন সাভারে প্রাসাদ নির্মাণ করেন তখন বহু যোদ্ধা ও সেনাপতি তাঁহার সাহচার্য করিয়া সমস্ত কিরাতদেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শিলালিপিতে উক্ত আছে। আমরা এই অঞ্চলের দাশবংশের কুলজীতে দেখিতে পাই যে, এই সময় নীলাম্বর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার বাজাসনে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। "আইন-ই-আকবরীতে" দেখিতে পাই যে, ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের কর্তাকে ফৌজদার উপাধি দেওয়া যাইত। বিষ্ণুদাস ফৌজদার বল্লালের প্রধান সেনাপতি পদ্মদাস হইতে ষষ্ঠস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সাভারের মঠ নির্মিত হয়। রণধীর সেনের পৌত্র এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র এই মঠের স্থাপয়িতা। সুতরাং দেখা যায় যে, বিষ্ণুদাস ফৌজদার এবং রণধীর ইহারা সমসাময়িক। শিলালিপিতে যে সব যোদ্ধৃবর্গের কথা উল্লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুদাস ফৌজদার যে একজন ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখনও তাঁহাদের বংশধরদিগকে প্রাচীন লোকে বাজাসনের দাশ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সংস্রবের হেতু দাশবংশের প্রাচীনরা এই নামে অভিহিত হওয়া পছন্দ করিতেন না। এখনও ঐ অঞ্চলের নাম–"সুয়াপুর নান্না মদে ভাতে পান্না" এই দুর্নাম আছে। সম্ভবতঃ পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক কদাচারের ফলে এ দুর্নাম রটিয়াছিল।

অনেকের মতে এই দুইটি উক্তির একটিও সত্য নহে। জেতারির নিজের লিখিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি গগন ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তবে তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

এখানে একটি কথা এই যে, দীপঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা কোথায় হইয়াছিল? জেতারি যদি বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই উত্তর বঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। এ বিষয়ে এমন কোন প্রমাণ নাই যাহার সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে, দীপঙ্কর প্রাথমিক শিক্ষা জেতারির নিকটই লাভ করিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর তাঁহার আত্মকথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন– "আমাদের দেশে (ভারতে) রাজা এবং রাজবংশীয় লোকেরা বাস করেন। সে সময়ে বাঙলাদেশে ভূ-ইন্দ্রচন্দ্র [Bhu-Indrachandra] নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজবংশীয়দের দেহে রাজরক্ত থাকিলেও তাঁহারা রাজ্য বা সিংহাসনের অধিকারী নহেন। আমি রাজবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতার নাম তিব্-নাম খা হি-দান-পগ্ [Tib-Nam-Mkhahi hi-dvan-phyug], অর্থাৎ, স্বর্গের অধিপতি [Lord of heaven]। আমার পিতা গৃহস্থ উপাসক এবং বিখ্যাত বোধিসত্ত্ব ছিলেন। তিনি মাতৃজাতীয় তন্ত্রমতের উপাসক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট একটি তন্ত্রোপাসনায় দীক্ষা-লাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতার দুই পত্নী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণী এবং অপর ছিলেন ক্ষত্রিয়াণী। আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে একটি মূর্খ পুত্র জন্মলাভ করে। আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমার সেই মূর্খ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। ইহার পর আমার সহিত আর তাহার দেখা হয় নাই।"[১]

কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় আরও বলেন– অনেক দিন পূর্বে একজন সন্ন্যাসী নান্নাগ্রামে আমার নিকট আসিয়াছিলেন, সে সন্ন্যাসী ঐ বাজাসনেই থাকিতেন। তাহার তিন-চারি বৎসর পর আবার এক কাপালিক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছু খাইতেন না বা কাপড় পরিতেন না। জোর করিয়া খাওয়াইলে খাইতেন ও কাপড় পরিতেন। এবং তিনি রাত্রিতে বাজাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন বলিতেন ৩৫০ বৎসর! আমরা তাঁহাকে পাগল বলিতাম কিন্তু একদিন রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে তিনি অনর্গল সংস্কৃত ধর্মকথা বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করেন। তিনি বলিতেন, তোমরা এই ভিটা খনন কর, এখানে পঞ্চমুণ্ড শিব আছেন আরও অনেক কিছু আছেন। অনেক বৎসর পর গভর্ণমেণ্ট হইতে এই স্থান খনন করা হয়, তখন ঐ স্থান হইতে নানা রকমের পাথর পাওয়া গিয়াছিল।

১. (1) During my time the king called Bhu Indra Chandra reigned in Bangala. The extent of his Raj was what could be traversed by a Bal-lan-mo, she-elephant, in seven days. A Bal-lan-mo' she-elephant is very swift. She walks a great distance, only taking a short respite at mid-day.

Rnal-hbyor-pa-chen-po relates the following as having been related by Atisa himself:- "In our (country) India there are Royalty and Royal race. The former owns kingdom. The latter, though royalty in blood, had no Raj. I belong to the Royal race. My father called (in Tib-Nam mkhahi dvan-phyng, the lord of heaven) was a householder upasaka (lay devotee). He was a great Bodhisattva. He practised the Tantra of the Matri class. I obtained an Abhisheka, consecration of one (of the Tantras) from him. There were two wives to my father, one a Brahmani and the other a khatriyani. I am the son of the former. Buddhist Text Society volume 1. Edited by Sarat Chandra Das.

দীপঙ্করের আত্মকথা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার মাতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। অতীশের জীবন-চরিত-রচয়িতা কল্যাণমিত্র [Phys-Sarpa] দীপঙ্করের সহিত উনিশ বৎসরকাল এক সঙ্গে শিষ্যরূপে বাস করিয়াছিলেন– তিনি দীপঙ্করের যে জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কল্যাণ মিত্র একদিন তিব্বতে দীপঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:– "আপনি বেদ সম্বন্ধে এইরূপ সুপণ্ডিত হইলেন কিরূপে?– তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,– "আমার মা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি শৈশবকালে আমাকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।" কাজেই দীপঙ্করের বাল্যজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা যে উত্তমরূপে তাঁহার মাতার নিকট হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা দীপঙ্করের নিজের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। এবং এই কারণেই জেতারি নামক অবধূতের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে পারদর্শিতা

দীপঙ্করের বাল্যজীবনেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাঁহার প্রতিভার বিকাশ পাইতে লাগিল। জেতারি তাঁহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগিরি-বিহারের রাহুল গুপ্তের (Rahul Gupta) নিকট বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞান লাভের জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি বজ্র নামক সাধন মার্গেও দীক্ষা লাভ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর ওদন্তপুরী-বিহারের আচার্য পরম পণ্ডিত শীলরক্ষিতের নিকট হইতে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ করেন।

উপাধি লাভ :

অল্প সময়ের মধ্যেই দীপঙ্কর অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁহার যশ দেশ-বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিল। দীপঙ্করের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য পণ্ডিতেরা সব আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া 'অবনত মস্তকে' দেশে প্রত্যাগমন করেন। দীপঙ্করের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসীম গৌরব লাভ করেন। ইহার পরেই দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বা পুরের বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট হইতে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন এবং বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্মরক্ষিত এ বিষয়ে তাঁহার দীক্ষাগুরু। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ-আচার্যগণের নিকট সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। প্রাচীন মগধ বর্তমান রাজগীরের নিকট প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ একটি পল্লী আজিও 'দীপনগর' নামে পরিচিত হইয়া দীপঙ্করের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর না লিখিয়া দীপঙ্গর লেখা হয়। অতএব দীপঙ্গর বর্তমানে 'দীপনগরে' পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।

সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা

ভিক্ষু হইবার পরে দীপঙ্কর বিক্রমশীলা-বিহারে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের নিকট প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরও অধিক শিক্ষা লাভের জন্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। কিছুতেই যেন তিনি অন্তর-মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,– 'সে সময় মঠের' "বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন।"

মগধে প্রত্যাবর্তন

তিব্বত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাশ লিখিয়াছেন:– "তৎকালে সুবর্ণদ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) প্রাচ্যজগতে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আচার্য চন্দ্রকীর্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহারই নিকটে যাইতে মনস্থ করিলেন। এবং কতিপয় বণিকের সমভিব্যহারে বৃহৎ নৌকারোহণে সুবর্ণদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড তরণী, প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়া-পুত্তলিকা স্বরূপ ভাসিয়া চলিল; পথিমধ্যে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন, পদে পদে তাঁহার মঙ্গল-যাত্রায় নানা অমঙ্গলের সূচনা করিল। অবশেষে তের মাস পরে নৌকা সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপনীত হইল। তথায় দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতিপূর্বক তিনি অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তিনি তাম্রদ্বীপ ও অরণ্যদ্বীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মগধে প্রতিগমন করিয়া শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূত, তম্বী প্রভৃতি যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।"

দীপঙ্কর যখন সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর ছিল। কাজেই তিনি যখন মগধে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪৩ বৎসর।

দীপঙ্কর "ধর্মপাল"

মগধে ফিরিয়া আসিলে পর মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা দীপঙ্করের প্রতিভার ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া তাঁহাকে তথাকার "ধর্মপাল" রূপে মনোনীত করিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে এ অতি শ্রেষ্ঠ সম্মান। দীপঙ্কর যে শুভ মুহূর্তে সেইখানে ধর্মপাল রূপে মনোনীত হইলেন, সেইদিন হইতেই মগধে বৌদ্ধ-ধর্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। এ সময়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাবোধি-বিহারে বজ্রাসনে (Vajrasana) বাস করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত তীর্থিক-ধর্মাবলম্বী

(ভিক্ষাজীবী) হিন্দু পণ্ডিত-গণের ধর্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়, প্রত্যেকবারই পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। এ সময়ে দীপঙ্করের কীর্তি-সূর্য মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছে, ভারতে ও বহির্ভারতে তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্কর যখন বজ্রাসনে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে বাঙলা দেশের পালবংশীয় নরপতি মহীপালদেব দীপঙ্করকে তাঁহার বিক্রমশীলা-বিহারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। মহীপালদেব বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং বৌদ্ধ কীর্তি রক্ষা ও সংস্কারের জন্য তাঁহার অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মহীপালদেবের সারনাথ প্রস্তরলিপির প্রথম পংক্তিতে "গৌড়াধিপ" মহীপালের আদেশে, কাশীধামে 'ঈশান চিত্র ঘণ্টাদির' শত কীর্তিরত্ন নির্মিত হইবার এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে "ধর্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্মচক্র" সংস্কৃত হইবার এবং "অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধ কুটি" পুনরায় নূতন করিয়া নির্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ এই সকল কার্য সম্পাদনের কাল বলিয়া, ইহাতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে, [মহীপাল দেবের শাসন-কালের একাদশ সংবৎসরে] নালন্দার বিশ্ব বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিদাহ-বিনষ্ট মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইবার পরিচয়। [নালন্দা-লিপিতে] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কাজেই মহীপালদেব দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইয়া অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাঁহার ন্যায় একজন বৌদ্ধধর্মানুরাগী নৃপতির পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতই বলিতে হইবে।[১]

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্কর মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশীলা-বিহারে গমন করেন। প্রথম মহী-পালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পালদেব **"গৌড়-মগধ বঙ্গের"** সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পালদেব দীপঙ্করের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলে, দীপঙ্কর তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে কার্ণদেশের [কনোজের] রাজা মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সেনাদল বারবার যুদ্ধে পরাজিত হইল এবং শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নয়পাল কর্ণ রাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দীপঙ্করের চেষ্টা ও যত্নে সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন উভয় রাজা

১. (১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, ২৬৩ পৃষ্ঠা (২) গৌড়লেখমালা–১০৯ পৃষ্ঠা

Acharya Dipankara Cri-Jnana, alias Atica was a contemporary of Naypala Deva, and Buston's Choshybny gives the following relveant facts. Atica residing at Vajrasana (Bodh Gaya) when the king of the Karnya in the west invaded Magadha, and a war ensued between him and Nayapala. The invaders sacked several towns at first, but were ultimately defeated. Atica meditated and succeeded in bringing about a treaty between the two kings. Apparently some time before this he had been appointed by Nayapala, as high priest of Buddhist vihara at vikramsila.

Inscription of Nayapala Deva by M. M. Chakravarty J. A. S. B. 1900. Pl. 1 P. 192.

বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।– এ বিষয় পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস সর্ব প্রথমে ইহার উল্লেখ করেন। পরে স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শরৎচন্দ্র দাস ও মনোমোহন বাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন।

সে সময়ে বিক্রমশীলা-বিহারের খ্যাতি প্রতিপত্তি নালন্দা-বিহারের চেয়ে অধিক ছিল। "অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা।"

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ হইলেন সে সময়ে সেখানে ৫৭ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বিক্রমশীলা-বিহার যেরূপ বৃহৎ ছিল, তেমনি তাহার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এই বিহারের সম্মুখস্থিত প্রাচীর-গাত্রের দক্ষিণদিকে নাগার্জ্জুনের মূর্তি চিত্রিত ছিল এবং বাম পার্শ্বে স্বয়ং দীপঙ্করের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, দীপঙ্করকে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, নাগার্জ্জুনের সহিত সমান মর্যাদা দিতে পরান্মুখ হইতেন না। এবং তিনি সাধারণের নিকট কিরূপ সম্মানিত ছিলেন তাহাও ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। সেই বিহারের আর-এক দিকের প্রাচীর-গাত্রে প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের আলেখ্য অঙ্কিত ছিল, এবং সিদ্ধাচার্যগণের মূর্তির চিত্রও তাহাতে ছিল।

বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্কব অতীশ যখন বিক্রমশীলা-বিহারে বাস করিতেন সে সময়ে তিনি বিহার ও মন্দিরের চাবি নিজের কাছে রাখিতেন। অতীশের আঠারোটি চাবি বক্ষা করিতে হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে, সে সময়ে অষ্টাদশটি বিহার ও মন্দির বিক্রমশীলা-বিহারের অন্তর্ভূত ছিল। দীপঙ্কর– আঠারোজন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন।

দীপঙ্করের তিব্বত গমন

বিক্রমশীলা–বিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পরও তাহাকে কার্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিহারে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ সোমপুরী-বিহারে কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তেঙ্গুরের ক্যাটালগ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিস্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াও তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি লামাও তাঁহাকে "অতীশ" (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। তৎকাল থোলিং

নগরে লামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তদীয় রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধনীতির সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-বিহারে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কাশ্মীরে প্রভৃতি নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ-সকাশে তাঁহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচালকের সহিত একজন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া, রাজদূত বিক্রমশীলায় উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত শত অনুনয় বিনয়, সহস্র প্রলোভন সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে ভুলাইতে পারিল না। দীপঙ্কর কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন– "আমার সোনার দ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সোনা দিয়া কি করিব?" তিনি আরও বলিলেন, আমাকে দুইটি কারণে তোমরা তিব্বতে লইয়া যাইতে চাহিতেছে– প্রথমতঃ সুবর্ণ প্রাপ্তির লোভ, দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধ দেবতারূপে পরিগণিত হইবার জন্য– ইহার একটির প্রতিও আমার আকর্ষণ নাই। কাজেই আমি আমার তিব্বত-যাত্রার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। রাজদূত দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

রাজা লামা জে-সে-হোড (Lha-bla-ma-ye-she-' od) রাজদূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম-সংস্কার করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা লা-লামা বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাং-চুব রাজা হইলেন। চ্যাং-চুব রাজপদ গ্রহণ করিলেও তিনি সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন।– চ্যাং-চুব রাজা হইয়াই এক ধর্মসভার আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তিব্বতের ঐ অঞ্চলের যত সব ধার্মিক শ্রমণগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,– "আপনারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইতেছেন যে আমাদের দেশে ধর্মের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছে। একদল চক্ষু নীলবর্ণানুরঞ্জিত আল্ল-খোল্লা পরিয়া তান্ত্রিক ব্যাভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্বর্গত মহারাজ ধর্মের সংস্কারের জন্য পূর্বে যে তেরোজন পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন তাঁহারাও এখানে ধর্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও কার্য করিতে পারেন নাই। এইরূপ স্থলে যেরূপেই হয়, স্বর্গীয় মহারাজার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। উপস্থিত শ্রমণগণ সকলেই নৃপতি চ্যাং-চুবের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই সভায় বিনয়ধর নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উপস্থিত ছিলেন। ইনি পূর্বেও কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইঁহার পরিচয় ছিল। বিনয়ধরের বয়স তখনও সাতাইশ বৎসর মাত্র ছিল। রাজা চ্যাং-চুব বা বানচুর

বিনয়ধরকে বলিলেন– "তুমি পূর্বে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছ। সে দেশের উষ্ণ জলবায়ুর সহিত তুমি পরিচিত, অতএব তুমিই দীপঙ্করকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য গমন কর। যদি তিনি একান্তই না আসেন তবে তাঁহার পরবর্তী যিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

তিব্বত-রাজা চ্যাং-চুবের দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য বিনয়ধরকে প্রেরণ

বিনয়ধর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জনে মঠে বসিয়া ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা এবং ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু নৃপতি চ্যাং-চুব বিশেষ ভাবে অনুজ্ঞা দেওয়ায় তিনি রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা তাঁহার সহিত ১০০টি অনুচর দিতে চাহিলেন, কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজা তাঁহাকে অনেক স্বর্ণ দিলেন। সেই স্বর্ণের মধ্য হইতে কতক দীপঙ্করকে উপঢৌকন স্বরূপ, কতক বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, কতক বিনয়ধরের যাতায়াতের ব্যয় বাবদ এবং কতক একজন দোভাষীর জন্য।

বিনয়ধর নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গম-পার্ব্বত্য-পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দস্যু-তস্করের হাতে বিড়ম্বিত হইয়া এবং নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক বিক্রমশীলা-বিহারে আসিতে হইয়াছিল।[১]

সে সময়ে বিনয়ধরের অধ্যাপক তিব্বত দেশীয় গ্যায়ৎসনে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য বিক্রমশীলা আসিয়াছেন সে কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। তখন গ্যায়ৎসনে তাঁহাকে বলিলেন যে– একথা এই বিহারের কাহারও নিকট কোন ক্রমেই এখন প্রকাশ করিবেন না। কেন না দীপঙ্কর এই বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি এই বিহার পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা এখানকার কাহারও অভিপ্রেত নহে। আপনারা এ বিষয়টি গোপন রাখিয়া এই বিহারে অবস্থান করুন এবং মহাস্থবির রত্নাকরকে যথোপযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা প্রদান পূর্বক এই বিহারের শিষ্যরূপে অবস্থান করিতে থাকুন। তারপর যদি আপনাদের ব্যবহার দ্বারা মহাস্থবিরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে অতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ সুবিধা হইবে। বিনয়ধর গ্যায়ৎসনের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা-বিহারের

১. Rgya-tson-gru senge, a native of Tag-t-shal in Tsan to proceed to vikramsıla, taking with him one hundred attendants and a large quantity of gold. After encountering immense hardship and privation in the journey, the traveller reached Magadha. Arrived at Vikramsıla. he presented to Dipankara the kings letter with a large piece of bar gold as a present from the soverign and begged him to honour his country with a visit. Hearing this, Dipankar replied: "Then it seems to me that my going to Tibet would be due to two causes: first, the desire of amassing gold, and second the wish of gaining sainthood by the loving others, but I must say that I have no necessity for gold nor any anxiety for the second at present, So saying he declined to accept the present. *** Thinking that it was hopeless to bring Dipankara.......... The king of Tibet dies in captivity. Journal of the Buddhist Text society, vol 1. Page 13.

অধ্যাপকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন।

বিক্রমশীলা-বিহারে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সেখানে প্রায় আট হাজার ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। সেইখানে বিনয়ধর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দীপঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর কয়েকদিন পরে সুযোগক্রমে দীপঙ্করের নিকট ভক্তি-প্রণত-মস্তকে বিনয় সহকারে তাঁহাদের রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দীপঙ্কর ধৈর্য্যসহকারে সব কথা শুনিলেন। তিব্বত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের নানা অবনতির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, কিন্তু কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না– তিব্বত যাইবেন কিনা, সে বিষয়ে মন স্থির করিবার পূর্বে এবং সম্মতি দিবার পূর্বের রজনীতে তিনি বিক্রমশীলা-বিহারের মধ্যস্থিত তারা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। মণ্ডল (Cycle of offerings) স্থাপন করিয়া তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন– "দেবী! আমি যদি তিব্বত গমন করি তবে আমার দ্বারা কি তিব্বতের দূষিত বৌদ্ধধর্মের কোনরূপ সংস্কার হইতে পারিবে? ধর্মপরায়ণ মৃত তিব্বতের মহারাজার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি তিব্বতে যাইয়া ধর্মের সংস্কার সাধন করি। এই প্রবীণ বয়সে আমার পক্ষে কতদূর তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা দেবী! আপনি আপনার উপাসিকা যোগিনীর মুখে ব্যক্ত করুন।"[১]

দীপঙ্করের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ প্রার্থনার পর যোগিনী উত্তর করিলেন– "তুমি যদি তিব্বতে গমন কর, তবে সেখানে মহদ্ধর্মের বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। বিশেষতঃ উপাসক (দলাই লামা) পরম উপকৃত হইবেন। দলাইলামা তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন ও উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। তিব্বত গমন করিলে তোমার জীবনের আয়ু কুড়ি বৎসর হ্রাস পাইবে। আর যদি তিব্বতে গমন না কর তাহা হইলে তুমি বিরানব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবে।"

দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা

এইবার দীপঙ্কর মনঃস্থির করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে তিনি বিক্রমশীলা-বিহারের মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট বলিলেন– "আমি তিব্বতীয় শিষ্যগণের সহিত তীর্থদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকেন ইহাই ভগবান তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।' রত্নাকরও তাঁহার সহিত তীর্থ-যাত্রার অভিলাষী হইলেন। রত্নাকরের এই কথায় দীপঙ্কর নীরব

১. That night Atisa made preparations for conducting a religious service before the image of the goddess Tara. Placing the Mandala (Cycle of offerings). "He made the prayers : If I could go to Tibet, would I be of great service to the religion of Buddha, whether there by the wishes of the saintly king of Tibet would be fulfilled, and least of all if there would any risks to my person and life. ****

Yogini replied, yes, if you go to Tibet you will be of great service to there and particularly to an upasaka (Dalai Lama) by devotion and through him to the whole country. but your life would be shortened by twenty years. If you do not go to Tibet, you will live 92 years

* In Tibet you would live nay up to 72 year Indian Pandits in the Land of Snow.

বলিলেন। রত্নাকর বলিলেন– "দীপঙ্কর" আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি অষ্ট পুণ্যস্থান দেখিবার ছল করিয়া বিনয়ধর (নাগ- চো), গ্যায়ৎসন এবং তাঁহাদের সঙ্গী অন্য পাঁচজন শ্রমণের সহিত তিব্বত-যাত্রার অভিলাষী হইয়াছ। একবার আমি তোমার যাইবার পক্ষে বাধা-স্বরূপ হইয়াছিলাম। এইবারও যদি তোমার যাইবার কথা কোনওরূপে নৃপতির কর্ণে যাইয়া পৌঁছায় তাহা হইলে তোমার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না, বিশেষ এই দুইজন তিব্বতীয় ভিক্ষুরও জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। কিন্তু আমি ইহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহাদের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য নহে। তারপর ইহারা তিব্বতীয় মহারাজার নিকট হইতে যে মহদুদ্দেশ্যের বার্তা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ স্থলে আমি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কি করিব, তবে আমি তিন বৎসরের জন্য তোমাকে যাইতে দিতে পারি।"

মহাস্থবির রত্নাকরের এই অভিপ্রায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা-বিহারের সর্বত্র প্রচারিত হইল। বিহারের ভিক্ষুগণ-অধ্যাপকগণ সকলেই দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দীপঙ্করের প্রাণে নবীন উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতের মৃত মহারাজার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি তিব্বত-যাত্রার জন্য আয়োজন ও উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিব্বতের রাজার প্রেরিত স্বর্ণ, দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ দিলেন বিক্রমশীলার অধ্যাপকদিগকে, অপর এক ভাগ দিলেন স্থবির রত্নাকরের হাতে, তৃতীয় ভাগ তিনি বজ্রাসন-বিহারের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন, আর চতুর্থ ভাগ রাজভাণ্ডারে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন এই স্বর্ণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হয়।

তারপর আসিল একদিন বিদায় মুহূর্ত। সে সময়ে বিক্রমশীলা-বিহারের শ্রমণগণ ও অধ্যাপকগণ, শিষ্যগণ সকলে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীপঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপঙ্কর সেই স্তব্ধ ও শোকাকুল জনতার দিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

দীপঙ্করের প্রভাব ও ন্যায়নিষ্ঠা

দীপঙ্করের মনে পড়িল– বিক্রমশীলা-বিহারের শত স্মৃতি। প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি যখন বিহারের বাহিরে আসিতেন, তখন ভিখারী বালকগণ করুণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছোট ছোট হাতগুলি বাড়াইয়া বলিত "বাবা, ভিক্ষা দে! বাবা ভিক্ষা দে!" মনে পড়িল কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তিনি এই বিহারের প্রধান আচার্যরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন কি দিবাকর চন্দ (Devakar Chanda), রামপাল প্রভৃতির ন্যায় শিষ্যদিগকেও বিক্রমশীলা-বিহার হইতে তাহাদের অপরাধের জন্য বিতাড়িত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।[১]

১. দিবাকর চন্দ একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য। পরে ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নৃপতি নয়পালের রাজত্বকালের লোক। দীপঙ্কর ইহাকে বিক্রমশীলা-বিহার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। (২) রামপাল হস্তীপালের পুত্র। বিক্রমশীলা-বিহারের একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের শিষ্য ছিলেন। দীপঙ্কর ইহাকেও বিহার হইতে বিতাড়িত করেন। Pag-sam Jon Zang-Index XIVI and Index CIX

আজ সেই কীর্তিক্ষেত্র বিক্রমশীলা-বিহার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণে যে কত বড় ক্লেশ বোধ হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দীপঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিহারের শ্রমণগণ, শিষ্যগণ, কেহই তাঁহাকে তিব্বতের ন্যায় দুর্গম প্রদেশে যাইতে দিতে সম্মত হইবেন না। এই জন্যই "অষ্ট মহাস্থান"[১] দেখিবার ছল করিয়া তাঁহাকে বিহার হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই তীর্থযাত্রা যে তিব্বত-যাত্রা তাহা বিক্রমশীলা-বিহারের সকলেই কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল। কাজেই তাঁহার যাত্রাকালে সকলের প্রাণেই এরূপ গভীর বেদনা ও দুঃখ সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রাণ দীপঙ্কর তাঁহার বয়স ও পথের দারুণ ক্লেশের কথাও বিস্মৃত হইলেন, যখন তাঁহার মনে পড়িল পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্মের তিব্বতে কি দারুণ অবনতিই না হইয়াছে! তখন তাঁহার মনে হইল– ধর্মপ্রাণ রাজ-সন্ন্যাসী জে-সে হোড্ তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্যই প্রাণ-বিসর্জন দিয়াছেন। ধর্ম-সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। সেই অর্থ কিরূপে সংগ্রহ হইতে পারে, সে চিন্তায় জে-সে-হোড্ যখন ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, সে সময়েই তাঁহার মন্ত্রী কর্তৃক একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কারের কথা জানিতে পারিলেন। সেই খনির নিকটে গেলে-পর গ্যারলোগ্ (Garlog) নামক স্থানের মুসলমান নৃপতি তাঁহাকে বন্দী করেন। গ্যারলোগ তুর্কীস্থানে অবস্থিত। গ্যারলোগের মোশ্লেম নৃপতি তিব্বতীয়দিগকে বলিলেন– "আমি তোমাদের রাজাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি তোমরা রাজার আকৃতির পরিমাণ ও দেহের ওজনানুরূপ স্বর্ণ দান করিতে পার। তখন সারা তিব্বতে স্বর্ণ-সংগ্রহের জন্য লোক ছুটিল। সুবর্ণ সংগৃহীত হইল, মূর্তিও নির্মিত হইল, কিন্তু রাজার মাথা তৈরী করিবার পরিমাণ সোনা কম পড়িল। গ্যারলোগের রাজার ইহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি রাজা জে-সে-হোডকে এক গভীর অন্ধকারময় কারাগৃহে বন্দী করিলেন। ঐ সময়ে নূতন রাজা বান্-চুব বা চ্যাং-চুব্ (Bang-Chub) হোড্ রাজা জে-সে হোডের মুক্তি-কামনায় তখনও তিব্বতের সর্বত্র স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। জে-সে হোডের সহিত তিনি যখন সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সে সময়ে জে-সে হোড্ তাঁহাকে বলিলেন,– 'বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। মৃত্যু

১. বৌদ্ধদের অষ্ট 'মহাস্থান' বা তীর্থস্থান হইতেছে (১) লুম্বিনী উদ্যান (Modern Rumnidei in Nepal Terci) বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন। (২) বুদ্ধগয়া (Budh Gaya) এইস্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (সম্যক্ সম্বুদ্ধ) লাভ করিয়াছিলেন। গয়া সহর হইতে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। (৩) মৃগদাব (Deer-park-modern Sarnath) সারনাথ। বুদ্ধদেব 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ' এই পদ প্রাপ্তির পর ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বেকার পাঁচজন শিষ্য মৃগদাবে (সারনাথে) আছেন। ইহা জানিয়া তিনি সারনাথে আসিয়া আপনার ধর্মোপদেশ প্রথমে ঐ পাঁচজনকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্মচক্রপ্রবর্তন" নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এইখানেই তিনি তাঁহার সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সারনাথের প্রাচীন নাম ইসিপতন মিগদাব। সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি যাদুঘরও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। (৪) কুশীনারা (বর্তমান কাশিয়া বা কুশীনগর)। ইহা মল্লদিগের নগর ছিল। মল্লদের শালবনে বুদ্ধদেব মহাপরি-নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। (৫) জেতবান-শ্রাবস্তীর নিকট (Moden-Sahreth Maheth) এখানে বুদ্ধদেবের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল। (৬) বৈশালী (Modern-Baisali) এখানে একটি হনুমান বুদ্ধদেবকে ভোজন করাইয়াছিল। (৭) সমকাস্য (Modern Sankish) এখানে তিনি বিমান হইতে অবতরণ করেন। (৮) রাজগৃহ, বর্তমান-রাজগীর এখানে তিনি একটি বন্য হস্তীকে দমন করিয়াছিলেন।

আমার সন্নিকটবর্তী। আমার মনে হয় আমার পূর্বজন্মে আমি কখনও বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে জীবন বিসর্জন দেই নাই। এইবার এই জন্মে আমার নিকট সেই সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, আমাকে মহদ্ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার সুযোগ দাও। আমাকে মুক্ত করিবার জন্য এই সযত্ন সংগৃহীত স্বর্ণের অপব্যয় না করিয়া তুমি ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া অধঃপতিত তিব্বতীয়দিগের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়া দেশে পবিত্রতা আনয়ন কর। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র মহদ্বাণী প্রচারে ব্রতী হও।" চ্যাং-চুব্ নত মস্তকে খুল্লতাতের এই বাণী শিরোধার্য করিয়া লইলেন।– নৃপতি জে-সে হোড্ কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন।[১]– দীপঙ্করের চক্ষের সমক্ষে সেই মৃত্যু-দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের জন্য যিনি এমন করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে পারেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কি অপূর্ণ থাকিবে? তাই দীপঙ্কর দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের পথকে গ্রাহ্য করিলেন না– নিজের বয়স মানিলেন না– ধর্মের জন্য বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা ভারতীয় পণ্ডিতের মহত্ত্ব বিকাশের জন্য বাঙ্গালী দীপঙ্কর বিক্রমপুরের এই বিক্রমশালী সন্তান তিব্বত-যাত্রা করিলেন।

তিব্বত যাত্রাকালে দীপঙ্করের বয়স

দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রাকালে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন।[২] এল, এ, ওয়াডেল [L. A. Waddell] সাহেবের মতে দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স ৫৮-৫৯ বৎসর ছিল রক্‌হিল সাহেবও দীপঙ্কর ৫৯ বৎসরে তিব্বতে গমন করেন সেই কথা বলিয়াছেন।. . . তবে তাঁহার হিসাব মানিয়া লইতে হইলে দীপঙ্করের জন্ম ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু আমরা তিব্বতের ইতিহাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে, দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে অর্থাৎ, আসন্ন ষাট বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন তাহাই প্রামাণিক-রূপে পাইতেছি। তাঁহার জন্মের বৎসর স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের মতে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল, ইহাই এতদিন কিন্তু প্রামাণিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।[৩] অতীশের জন্ম ৯৮২ বা ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হউক না কেন, তিনি যে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহের কারণ নাই। তবে কোন্ সময়ে গিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয় অধিকাংশ লেখকই যখন অতীশ ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন, তখন আমরাও ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে-এর পরিবর্তে ১০৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন সে কথাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার পূর্বে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতের বৌদ্ধ

১. Antiquities of Indian Tibet Pt I, By A. H. Francke, Ph. D. Page 50-52

২. In A. D. 1013, The Indian Pandit Dharmapala came to Tiber with several of his disciples, and in 1042 the famous ATISHA, a native of Bengal, who is known in Tibet as Jo-Vo-rje or Jo-Vo-rtishe, also came here. The Life of Buddha. Translated by W. W. Rock Hill. Page 227. 1884.

৩. Indian Monk Atisa (His proper name was Dipankar Srijnana) who Came to Tibet in 1038 A. D. Lhassa and its Mysteries by L. A. Waddell L. L. D. P. p. 320.

নৃপতিগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল। লামা জে-সে-হোড [Lha Lama Yeces Hod-the Royal Lama] তিব্বতের প্রচলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়াই উহার সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে- প্রাচ্য বা পূর্বদেশ হইতে কাশ্মীরের রত্নবজ্র, মগধের ধর্মপাল, প্রভৃতি তিব্বতে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার যে কয়জন শিষ্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের পশ্চাতেই 'পাল' শব্দ যুক্ত ছিল। ইঁহাদের সহায়তায় রাজসন্ন্যাসী জে-সে-হোড় তাঁহার রাজ্যমধ্যে ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের দিক্ দিয়া কতকটা সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মপালের পর দীপঙ্কর তিব্বতে গমন করেন।[১]

তিব্বতের যাত্রা-পথে

অতীশের তিব্বত-যাত্রার সঙ্গী হইলেন পণ্ডিত ভূমিসঙ্ঘ (Bhumisangha), বীর্যচন্দ্র, নাগ-ছো, গ্যায়ৎসো এবং অনেক অনুচর ও ভৃত্যমণ্ডলী। তাঁহারা যাত্রাপথে প্রথমে মিত্রবিহারে আসিলেন। সেই বিহারের শ্রমণগণ এই যাত্রীদলকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা অতী কে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই বিহার হইতেই তাঁহারা তিব্বতের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন। গ্যায়াৎসোর সঙ্গে ছিল দুইজন ভৃত্য, নাগ্-ছোর সহিত ছিল ছয়জন এবং অতীশের সঙ্গে ছিল কুড়িজন অনুচর। তাঁহারা চলিতে চলিতে ক্রমে ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি ছোট বিহার ছিল- সেই বিহারের শ্রমণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অতীশ এবং তাহার সাঙ্গিগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থিত এই শ্রমণগণ আপনাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন: "যদি অতীশের এই তিব্বত-যাত্রা আমরা প্রতিরোধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত, কেননা আমরা ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে, অতীশের ন্যায় একজন মহাপণ্ডিতের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের গৌরবসূর্য অস্তমিত হইবে। অতএব আমাদের কর্তব্য হইতেছে মহাপণ্ডিত আচর্য অতীশকে তাঁহার তিব্বত-যাত্রার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করা। আবার সঙ্ঘের অন্যান্য শ্রমণেরা বলিলেনঃ "বিক্রমশীলা-বিহারের আচার্যগণ যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই তখন আমাদের এইরূপ চেষ্টা করা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ।"

বিহারের শ্রমণগণ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পর্বতে আরোহণ করিতে দেখিলেন।

.. He quitted his monastery Vikramsila, for Tibet in the year 1042 A. D. at the age of 59. J. A. S. B 18.1. p. 23.

In 1042 A. D. Atisa proceeded to Tibet. J. A. S. b. 1900 Part I. P. 192. Manomohan Chakravatty, M A P I M R.A.S. আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার নৃপতি নয়পালের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার একখানি শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, নয়পাল ১০৩৭-১০৪১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সিংহাসন লাভ করেন। এবং তাঁহার মৃত্যু ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়। অতএব, অতীশ ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেন। ইহা বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তীর মতেও অতীশের তিব্বত-যাত্রা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

অতীশ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তীর্থিকদের গন্তব্যস্থল অতি পবিত্র একটি বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেস্থানে অতীশের মতাবলম্বী পঞ্চদশজন বৌদ্ধাচার্য বাস করিতেছিলেন। এই আশ্রমের আচার্যগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য মনে করিলেন। সারা দিন অতীশের সহিত তাঁহারা ধর্মালোচনা করিলেন। অতীশ তাঁহাদিগকে এইরূপ সরলভাবে বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন যে, সেই আশ্রমবাসী শ্রমণগণ অতীশের পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইয়া প্রত্যেকে তাঁহাকে একটি ছত্র উপহার দিলেন। তাঁহারা অতীশের সহিত একান্ত অনুগতের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পার্বত্য-পথে চলিতে লাগিলেন। এই পথে অনেক তীর্থিকেরা ও তাঁহাদের সঙ্গী ছিল। তীর্থিকদলের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, কপিলাশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী ছিল। ইহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই তীর্থিকদলের মধ্যে কেহ কেহ অতীশকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। একবার তাহারা আঠারো জন দুর্দান্ত দস্যুকে এই কার্যে প্ররোচিত করে, কিন্তু সেই দস্যুগণ অতীশের সৌম্য, শান্ত ও জ্যোতিষ্মান্ মুখশ্রী দেখিয়া এমন ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল– প্রস্তর-মূর্তির মত সকলে নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতীশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন– 'আমার এই হতভাগ্য দস্যুদের জন্য দুঃখ হইতেছে!' এইরূপ বলিয়া তিনি মাটির উপর কয়েকটি মূর্তি অঙ্কিত করিয়া যেমন মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, অমনি নির্বাক্ ও অচল দস্যুদল আবার বাক্‌শক্তি লাভ করিল এবং চলিতে সক্ষম হইল।

অতীশের দয়া ও মহত্ত্ব

একদিন পথিমধ্যে এক স্থানে অতীশ দেখিতে পাইলেন, তিনটি কুকুরের বাচ্চা শীতে জড়সড় হইয়া কষ্ট পাইতেছে। কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। অতীশ কুকুরের বাচ্চা-তিনটিকে তুলিয়া তাঁহার গাত্রাবরণের মধ্যে লইলেন এবং বলিলেন– আহা! বাছারা, তোমরা বড় কষ্ট পাইতেছ! এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি ছিল তাঁহার দয়া ও মহত্ত্ব।

এ স্থানের রাজা (জমিদার) এই যাত্রীদলের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত চন্দন কাষ্ঠের নির্মিত একটি ছোট টেব্‌ল (Table) ছিল। রাজা দীপঙ্করের নিকট সেই টেবলটি অভদ্রভাবে দাবী করিলেন। অতীশ বলিলেন: "আমি তিব্বতের রাজাকে উপহার দিবার জন্য এই টেবলটি লইয়া যাইতেছি। আমি ইহা কোন প্রকারেই হস্তান্তরিত করিতে পারিব না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য পথে এক দস্যুদলকে পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা পরদিন প্রত্যুষে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ যেমন এ পথ দিয়া যাইবেন, সে সময়ে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তাঁহাদের প্রাণনাশ করে।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা যেমন– যাত্রীদলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন

দীপঙ্কর তাঁহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– "তোমরা সতর্ক থাকিবে। আজ পথে পাহাড়িয়া দস্যুরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহাই হইল,– কিন্তু অতীশের মন্ত্র-প্রভাবে তাহারা নির্বাকভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় চলিয়া গেল। এইরূপে অতীশের আরাধ্যাদেবী তারার শুভ সিদ্ধি প্রভাবে তাঁহাদের দস্যুভীতি আর রহিল না।

এইবার তাঁহারা নেপালের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে পুণ্য-পীঠস্থানের আর্য স্বয়ম্ভুর মন্দির দেখিয়া তাঁহাদের মন ও প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট শ্যামল-পত্ররাজি-শোভিত বিরাট বৃক্ষের নীচে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইখানে ভারবাহী জন্তুর পৃষ্ঠ হইতে মালপত্র নামানো হইল। আর্য-স্বয়ম্ভুর মন্দির দর্শনে দীপঙ্করের প্রাণ এতদূর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল যে, তিনি অপলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়াছিলেন। অতীশ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে গ্যায়ৎসো এবং বাম দিকে বসিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র। আর মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন রাজসন্ন্যাসী মহাবীর ভূমিসঙ্ঘ। এই ভূমিসঙ্ঘ অতীশের প্রিয়তম শিষ্য।

স্বয়ম্ভুর নৃপতি অতীশকে সদলবলে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা ও তাঁহার সঙ্গিগণের সর্ববিধ সুব্যবস্থার জন্য রাজকর্মচারীদিগের উপর ভার দিলেন। মগধের শ্রেষ্ঠ আচার্যকে নৃপতি অনন্তকীর্তি অনেকদূর হইতেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া তাঁহার থাকিবার সর্ববিধ সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে সম্মুখে উপবেশন করিয়া আচার্য অতীশের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

গ্যায়ৎসোর মৃত্যু

এই স্থানে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। গ্যায়ৎসো রাহু নামক একজন তীর্থিকের নিকট হইতে 'নবসন্ধি' নামক বিষয়ে সিদ্ধি-লাভ করিতে যাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় গ্যায়ৎসো অতীশের নিকট এই তান্ত্রিক অভিচারের বিষয় বর্ণনা করিলে, অতীশ তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন,– "তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়াছ গ্যায়ৎসু! এই তীর্থিক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীরা নানারূপ মন্দ অভিপ্রায় লইয়া কার্য করে। এখন তোমার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে।"

গ্যায়ৎসোকে আরোগ্য করিবার সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। গভীর রাত্রিতে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। অতীশের অনুচরগণ অতি গোপনে রাত্রিকালেই নদীর তীরে লইয়া যাইয়া তাহার দেহের সৎকার করিল। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রাকালে গ্যায়ৎসোর পরিত্যক্ত শয্যা-দ্রব্যাদি একটা ডুলির মধ্যে এমন ভাবে সাজানো হইল যেন লোকে মনে করে যে, পীড়িত গ্যায়ৎসো ডুলিতে চড়িয়া যাইতেছেন। পাছে নেপাল সরকার কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করে এজন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা অনাবশ্যক ভাবে যাত্রা-পথে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিত।

নেপালে অবস্থানকালে অতীশ, নৃপতি নয়পালকে একখানি উপদেশপূর্ণ লিপি প্রেরণ

করেন। ঐ লিপিখানি 'বিমলরত্নলেখ' নামে পরিচিত। অতীশ তাঁহার সঙ্গীয় দ্বিভাষীর (Lochava) সাহায্যে ঐ সুন্দর উপদেশপূর্ণ পত্রখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।

হোল্কা-বিহার

এইবার পুনরায় অতীশ ও তাঁহার সহযাত্রিগণ নেপাল পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হোল্কা (Holka) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হোল্কার মঠে অতীশের এক বন্ধু প্রধান আচার্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বার্ধক্যের দরুন তিনি বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সকলের নিকট তিনি বধির স্থবির (Deaf Sthavir) নামে পরিচিত ছিলেন। অতীশ তাঁহার পুরাতন বন্ধু এই বধির স্থবিরের নিকট একমাস কাল ছিলেন। এখানকার শ্রমণগণ তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পরম সমাদরে সেবা ও যত্ন করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত এখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল বৃদ্ধ স্থবিরের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। বধির স্থবির মন্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ছিলেন, অতীশ তাঁহাকে সে বিষয়ে বলিতে যাইয়া বলিলেন যে,– 'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্তির জন্য মন্ত্র এবং পারমিতার (Paramita) দুইয়েরই আবশ্যকতা আছে। তিনি এ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত 'চার্য-সঙ্গ-প্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লোচ্ছবা বা দোভাষী অতীশের উপদেশে উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিলেন।

পালপোইথান :

হোল্কা হইতে অভিযাত্রীদল পালপোইথান (Palpoi Than) নামক স্থানে আসিলেন। এসময়ে নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি সেই স্থানে দরবার করিতেছিলেন। তিনি অতীশকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত অভিনন্দিত করিলেন। অতীশ নৃপতি অনন্তকীর্তিকে "দৃষ্ট্যৌষধি" (drishta Ushadhi) নামক একটা হস্তী উপহার দিলেন এবং এই হস্তীটিকে কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে সে বিষয়েও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। অতীশ বলিলেন,– "মহারাজ, আপনি যুদ্ধাস্ত্র বহন করিবার জন্য কখনও এই হস্তী প্রয়োগ করিবেন না। কিংবা ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাহাকেও যুদ্ধ করিতে দিবেন না। এই হস্তীটিকে আপনি পূজোপকরণ, ধর্মগ্রন্থ এবং দেবমূর্তি প্রভৃতি বহন করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন। আপনাকে আমি যেমন এই হস্তীটি উপহার দিলাম, তেমনি আমি এই হস্তীর বিনিময়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি এই স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া দিবেন। সেই বিহারের নাম হইবে **থান-বিহার** (Than Vihara)।

পদ্মপ্রভ; থান-বিহার

রাজা অনন্তকীর্তি অতীশের এই নিবেদন পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বিহার নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার পুত্র পদ্মপ্রভের (Padma-prabha) উপর অর্পন

করিলেন। পদ্মপ্রভ অতীশের শ্রমণ-শিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ভারত পরিত্যাগের পর একমাত্র পদ্মপ্রভই অতীশের নিকট সর্বপ্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। থান-বিহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইলে-পরে অতীশ পুনরায় তিব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গীয় 'লোচ্ছবা' দো-ভাষী রাজপুত্রকে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে রহিয়া গেলেন।

তিব্বতে প্রবেশ

অতীশ ও তাঁহার অভিযাত্রীরা যখন তিব্বতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন রাজা চ্যাং-চুবের (Chan Chub) প্রেরিত ও একশত অশ্বারোহী পুরুষ কারুকার্য-পরিশোভিত শ্বেতপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। তাঁহাদের নাম লা-ওয়াংপো (Lhai Wanpo) লা-লো দোই (Lhai-Lo doi) লা সিরাব (Lha Serab) এবং লা শে জোন (Lahi-Sei-zon) ইঁহাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ষোলটি করিয়া বর্শা। বর্শার উপরে ছিল শ্বেত পতাকা। অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হস্তে ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতপতাকা এবং কুড়িটি শ্বেত স্যাটিনের ছত্র। ইঁহারা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চারিদিক নিনাদিত করিয়া- "ও মণিপদ্মে হুম" এই পবিত্র মন্ত্র গান করিতে করিতে মগধের বিখ্যাত আচার্য দীপঙ্করকে রাজা চ্যাং-চুবের নামে আসিয়া প্রণতি পূর্বক সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সেদিনকার সেই অভিনন্দন, তিব্বতীয়দের ভক্তি-প্রণতভাব অতীশের চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় তখন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়াছিল। দেবী তারা যে তাঁহার এই তিব্বত আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। তিব্বতের গু-জে (Gu-ze) নামক স্থানে তাঁহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

এই গু-জেতেই অতীশ সর্বপ্রথম চা পান করেন। তিনি গুজেতে আসিয়া পৌঁছিলে-পর এবং বিশ্রামাদি করিবার সময়ে গুজের অভিনন্দনকারীগণ তাঁহার নিকট তিব্বতীয় রীতিতে চা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন- "মহাত্মন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে আমাদের দেশের এই স্বর্গীয় পানীয় পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।" অতীশ বলিলেন,-"এই পানীয়ের কি নাম? তোমরা যার এত সুখ্যাতি করিতেছ? তিব্বতীয়েরা বলিলেন,- মহাত্মন্! ইহার নাম চা। এই গাছের ছাল খাইতে নাই, কিন্তু ইহার পাতা চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পান করিতে হয়। এই পানীয়ের অনেক কিছু গুণ রহিয়াছে।" অতীশ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন- "এমন উত্তম পানীয় নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভক্ত শ্রমণগণের প্রার্থনার ফলে বিধাতা দান করিয়াছেন। আমি ইহা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

মানস-সরোবর

গু-জে হইতে এই যাত্রীদল একে একে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ডোক্ (Dok) নামক স্থানে আসিলেন। এই স্থানটি মানস-সরোবর নামক হ্রদের অল্প দূরে অবস্থিত।

এই স্থানে দলে দলে গ্রামবাসিগণ আসিয়া অতীশকে বিবিধ উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। ডোক নামক স্থানে প্রাতঃভোজন ইত্যাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা মানস-সরোবরের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। মানস-সরোবরের নির্মল নীলাভ সলিলরাশি এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া দীপঙ্কর এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি এই স্থানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এই স্থানের সৌন্দর্য তাঁহার চিত্তশতদল নবারুণ-দীপ্তিতে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতীশ যখন মানস-সরোবরের তীরে বাস করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে নাগ-ছোও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতীশ একদিন যখন মানস-সরোবরের পবিত্র পানির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছিলেন, সে সময়ে নাগ-ছো জিজ্ঞাসা করিলেন– "আপনি পানিতে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন?" অতীশ বলিলেন,– "আমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে স্তুতি জানাইয়া পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। কেন, তোমাদের তিব্বতীয়দের মধ্যে কি তর্পণের রীতি প্রচলিত নাই?" নাগ-ছো কহিল– "হ্যাঁ, আমাদের দেশে মঞ্জুশ্রী দেবী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশে অর্চ্চনা করিবার মন্ত্র রহিয়াছে।" অতীশ নাগ-ছোকে তর্পণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতীশ মানস-সরোবরের তীর পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছেন, ইতিমধ্যে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। মানস-সরোবরের তীরবর্তী তিনটি দেশ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তিব্বতের ধর্মবিপ্লবের ও অবনতির যুগে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের আগমন তাহাদের নিকট এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল।

এ সময়ে অতীশকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ৩০০ শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সকলেই ছিল শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিহিত। তিন শতাব্দী পূর্বে আচার্য শান্তিরক্ষিতকে যেমন তিব্বতীয়েরা অভ্যর্থিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন– অতীশকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পরম ভক্তি-সহকারে আজ আবার রাজার অনুচরবর্গ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার অতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :– "হে পরম প্রবীণ, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দেবতা যেমন ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া দর্শন দেন, তেমনি হে মহাপ্রাণ! মহাপুরুষ আপনি তিব্বতীয়গণের সনির্বন্ধ অনুরোধে দয়া করিয়া তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি 'চিন্তামণি', – আপনি পরশমনি, যাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়, যাহার নিকট প্রার্থনা করিলে কোন কিছুই অপূর্ণ থাকে না। তেমনি জানি আপনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের এই দেশ ধর্ম সম্বন্ধে হীন– যে ধর্ম-গৌরবে ভারত গরীয়ান, তবু আমাদের দেশের প্রতি বিশ্ব প্রকৃতির অশেষ-রূপ করুণা ধারা বর্ষিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সূর্যের প্রখর প্রতাপ নাই, আমাদের দেশ শীতল ও শান্তিপ্রদ। আমাদের দেশে নীলসলিলপূর্ণ হ্রদ এবং নির্ঝরিণী রহিয়াছে অসংখ্য। তিব্বতের জলবায়ু মানুষকে সজীব করিয়া তোলে। তিব্বতের পার্বত্য প্রদেশ পর্বতান্তরালে অবস্থিত বলিয়া শীতের প্রখরতা সেখানে উপলব্ধি হয় না। সেখানকার উষ্ণতা শরীর ও মনকে কর্মঠ এবং উৎসাহী করিয়া তোলে।

যখন বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, তখন আমাদের দেশে খাদ্যের কোনওরূপ অপ্রাচুর্য থাকে না। তখন আমাদের দেশে জননী লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টিতে সমুদয় শস্যক্ষেত্র স্বর্ণশস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়। শরৎ ঋতুতে তিব্বতের প্রকৃতি সবুজ সৌন্দর্যে হাস্যময়ী হয়। মাঠে মাঠে, বনে-বনে; পর্বতে পর্বতে শ্যামলশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হে পরম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আমাদের দেশ প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্মভূমি আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আজ আপনার শুভাগমনে আমাদের দেশ পবিত্র হইয়াছে। আপনি আমাদের রাজার পক্ষ হইতে আমাদের মুখে সর্বপ্রথম সাদর স্বাগত বাণী শ্রবণ করুন। যদিও আমাদের বৃদ্ধ নৃপতি লা-জে-শে হোড পরলোক গমন করিয়াছেন, তথাপি আমাদের বর্তমান নৃপতি চ্যাং-চুব অতিশয় বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য, ধর্মের সংস্কারের জন্য, হে মহানুভব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আপনাকে আমাদের তিব্বতে আনয়ন করিয়াছেন। আপনি যখন আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার মহৎ উপদেশে আমরা ধন্য হইব। আমাদের নৃপতি যেমন আপনার শুভাগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি আমরা সকলে আপনার আদেশ ও উপদেশ মান্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তিব্বতের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। আমরাও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আপনার মহিমাগীতিতে ধন্য হইব।"

এইবার অতীশ রক্ষীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া চ্যাং-চুবের রাজধানী থেডিং নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা 'লো আ.'লোমা, লোলা' গীতে চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে চলিল।

অতীশের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য, মধুর হাস্যময় মুখমণ্ডল, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সঙ্গিগণকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই দেব-প্রকৃতির ভারতীয় পণ্ডিতকে দেখিয়া তিব্বতীয় অনুচরবৃন্দ পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল হইতে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বড় মধুর শুনাইত। তিনি চলিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতেন। এই যে অজ্ঞাত দুর্গম গিরিপথে চলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন তবু সকলের সঙ্গে সুমিষ্ট ভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন,– "অতি ভালো! অতি ভালো! অতি ভালো! অতি মঙ্গল! অতি ভালো হে! মহাকরুণিকা তারা! শাক্যমুনি দেখ!" এই কয়েকটি কথা প্রতি-নিয়ত তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল।

চ্যাং-চুবের প্রেরিত লোকজনের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া অতীশ বলিতেছিলেন– "এই রাজকর্মচারীগণ আনন্দে ও হাস্য-কৌতুকে গন্ধর্ব-নৃপতি প্রমোদকেও হার মানাইয়াছে। ইহারা দেখিতে রক্ষজাতীয় যক্ষ-সদৃশ। সত্য সত্যই হিমাবৎ প্রদেশ অবলোকিতেশ্বর দেবের লীলা নিকেতন। তাঁহারই কৃপাবলে তিব্বতীয়দের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির "পার্বত্যজাতীয় লোকেরা' মহদ্ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই দুর্দান্ত জাতীয় লোকেরা দেখিতে কদাকার ও ভীষণাকৃতি হইলেও ইহাদের প্রকৃতি দিব্য বিনয়পূর্ণ এবং ভক্তি অনুগত। ইহারা সত্য সত্যই দেব অবলোকিতেশ্বরের অনুগত সেবক। মনে হইতেছে ইহাদের যিনি নৃপতি, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হইবে।"

থোলিং-এর পথে

এই ভাবে আনন্দ-অভিযান করিতে করিতে দীপঙ্কর যখন রাজধানী থোলিং-এর (Tholin) নিকটবর্তী হইলেন, তখন নৃপতি চ্যাং চুবের প্রধান অমাত্য ওয়ান্ চুগ্ (Hhai-wan-chug) অতীশকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। মন্ত্রী ওয়াংচুগ অতীশের দুই খানি হস্ত নিজ হস্তমধ্যে ধারণ করিয়া বলিলেন,– "হে প্রভু! আমরা আপনাকে রাজ নির্দেশ মত অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আপনি বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনি দয়া করিয়া আমাদের দেশে আগমন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আপনি দারুণ পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে আমাদিগকে মুক্তি-পথের সন্ধান দেখাইতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" মন্ত্রী এই কথা বলিয়া একটি চিত্র-পট (Tapestary) উপহার দিলেন। ঐ পটে অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এই পটটি প্রায় চল্লিশ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। এবং উহা অতি সুন্দর ভাবে স্বর্ণ সুত্রদ্বারা কারু-কার্য খচিত ছিল। অতীশ ঐ প্রতিমূর্তির চিত্রপট পাইবা-মাত্র তাহা অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

রাজা চ্যাং-চুবের নিকট, দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এই সংবাদ যাওয়া মাত্র ন্যাহারি (Nahari) নামক স্থানের লোকেরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এই ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয়গণের একমাত্র আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক গ্রামবাসী, প্রত্যেক নাগরিকের মুখেই এই মহাপণ্ডিতের কথা শুনা যাইতে লাগিল। উচ্চ, নীচ এবং সাধারণ জনগণেরও তাঁহার মুখে ম্যা-ফ্যাম্ (Ma-pham) বা মানস-সরোবরের বিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহ দেখা গেল। রাজা যে মহামানবকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য এত অর্থব্যয় করিলেন, যাঁহাকে আনিবার চেষ্টায় বহু লোকের অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে, না জানি সেই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পণ্ডিত কিরূপ দেখিতে, কিরূপ তাঁহার বাক্য ও উপদেশ। এই রূপ ব্যগ্রতা যে জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সেকথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা চ্যাং-চুব ও তাঁহার কর্মচারিদের প্রমুখাৎ দীপঙ্করের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জানিবার জন্য কৌতূহলি হইয়াছিলেন ।

রাজা চ্যাং-চুব যখন ব্যগ্রভাবে দীপঙ্করের বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী লা-লোদোই (Lha lodi) দশজন অশ্বারোহী শরীররক্ষীসহ নৃপতিসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,– "মহারাজ! যে মুহূর্তে বহু শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত দীপঙ্কর' পাল্পা (Palpa) নেপালে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সে সময়ে নেপালের মহারাজা অতি বিপুল ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এমন কি তাঁহার পুত্র পর্যন্ত অতীশের নিকট দীক্ষিত হইয়া "দেবেন্দ্র" নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীশের সহিত সমগ্র পশ্চিম ভারতের একজন রাজ-শ্রমণও আসিয়াছেন, তাঁহার নাম ভূমিসঙ্ঘ। ভূমিসঙ্ঘ নানা গুণে গুণান্বিত, সসাগরা ধরণীর মহারাজচক্রবর্তী সম্রাট হইবার যোগ্য। ধর্মের জন্য পৃথিবীর সমুদয় বিলাস-সুখ ও ধনৈশ্বর্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তিনি জ্ঞানী মহাপুরুষ দীপঙ্করের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতীশের একান্ত অনুগত বলিয়াই আমাদের তিব্বতে আগমন করিয়াছেন। মানস-সরোবরের তীর পর্যন্ত প্রায় ৪২৫ জন নেপাল-রাজ-অনুচর দীপঙ্করের অনুগামী

হইয়াছিলেন। সেখানে হাজার হাজার কৃষক ও রাখালেরা আসিয়া শ্রীমতি দীপঙ্করকে বন্দনা করিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা

মন্ত্রীর মুখে দীপঙ্কর তাঁহাব যাত্রা-পথে যে সর্বত্র বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন এমন কি নেপাল-রাজও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে ইহাতে নৃপতি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। দীপঙ্কর যখন থোডিং রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন স্বয়ং নৃপতি এবং রাজ দববারের সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অতীশকে অভ্যর্থনা কবিলেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লামা দীপঙ্করকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, সম্ভবতঃ বার্ধক্যের দরুনই তিনি দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই বৃদ্ধ লামার নামছিল, রিন্-চেন্-জং-পো। রিন্-চেন-জংপোর প্রতি (Rinchen-zanpo) এক সময়ে রাজা (Lha-sde-btsan) কর্তৃক তিব্বতের পুরাণ (Phuran) এবং রং (Rong) প্রদেশেব উপর ধর্মনেতৃত্ব ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। রিন্-চেন-জংপো তিব্বতের ঐ সকল প্রদেশে অনেক মঠ; মূর্তি ও বিদ্যা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে দশজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তাহারা "লোচবা" (Lochava) বা দ্বিভাষী নামে পরিচিত ছিল। রিন্-চেন্-জংপো সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত তান্ত্রিক ধর্মাচার তিব্বতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গল্প আছে যে, একবার রিন্-চেন্-জংপো একটা দুরন্ত দৈত্যকে দমন করিয়াছিলেন!

দীপঙ্করের সহিত রিন্-চেন-জংপোর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৫ বৎসর। দীপঙ্কর তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ, এজন্য রিন্-চেন্-জংপো ভারতীয় পণ্ডিতকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, কিন্তু পরে দীপঙ্করের মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ দেবতাগণের স্তোত্র প্রভৃতি শুনিয়া তিনি একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সর্বোপরি দীপঙ্করের তাঁহার প্রতি বিনয়পূর্ণ ব্যবহার তাঁহাকে একান্ত মুগ্ধ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রিন-চেন্-জংপোও বিনীত ভাবে দীপঙ্করের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ রিন্- চেন্- জংপো ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এইভাবে তিব্বত-রাজ দীপঙ্করকে পরম সমাদরের সহিত আপনার দেশে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাজা, প্রজাদের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যেঃ– "তাহাদের দীপঙ্করের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ধর্মপথে পরিচালিত হইতে হইবে।" ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দীপঙ্কর যে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রাজা দীপঙ্করের বিদ্যাবত্তা ও বিবিধ গুণ দেখিয়া তাঁহাকে জো-বো-জে (Jovo-Je) অর্থাৎ, প্রভুস্বামী বা স্বামী ভট্টারক (Supreme Lord) উপাধি প্রদান করিলেন।

দীপঙ্কর থোলিং (Tholin) উপনীত হইয়া তিব্বতে মহাযান মত প্রচার করিলেন। এবং তাঁহার প্রস্তাবিত মত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ তিব্বতের ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সংস্কার করিতে সমর্থ

হইলেন। অতীশের চেষ্টা ও যত্নে তিব্বতের লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের গরিমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

দীপঙ্করের উপদেশানুসারে চলিয়া তিব্বতীয় লামারা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রকৃত মর্ম কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতীশ প্রায় বারো বৎসরকাল তিব্বতে বাস করেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্যটন করিয়া বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতা এবং প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জনগণ-মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ, ধর্ম-জীবন, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি এবং অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেখিয়া তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর কি ভাবে তিব্বতবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়া নৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লেখ করিলাম।

দীপঙ্করের মৃত্যু

লাশার নিকটবর্তী ন্যাথ্যাং (Nethan) নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বা ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গ্রামটি নেতাং (Netang) নামে পরিচিত। কেহ কেহ এই স্থানের নাম নের্তাম্ (Nyertam) বলেন। চীনারা বলে ই-তাং (Yettang)। এশিয়ার সর্বত্র, তিব্বতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে সেই সেই স্থানে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সকলের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ধর্ম-নেতা ব্রোমতোনের (Bromton) ছিলেন তিনি ধর্মাচার্য।

দীপঙ্কর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং তিনি একশতটি মহাযান ধর্ম-সম্পর্কিত উপদেশ দিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার লিখিত কতিপয় পুস্তকের নাম দিলাম,– (১) বোধিপথপ্রদীপ, (২) চর্য্যা সংগ্রহ-প্রদীপ, (৩) মধ্যমোপদেশ, (৪) সংগ্রহগর্ভ, (৫) মহাযান পথসাধন বর্ণ সংগ্রহ, (৬) মহাযান পথ সাধন-সংগ্রহ, (৭) দশ কুশল কর্মোপদেশ, (৮) বর্ণ বিভঙ্গ, (৯) সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ, (১০) সপ্তকবিধি, (১১) গুরুক্রিয়াক্রম, (১২) সরঙ্গতায়দশ। দীপঙ্কর নয়পালকে উপদেশপূর্ণ যে পত্র লেখেন, তাহা 'বিমল-রত্ন-লেখ', নামে পরিচিত। তিব্বতে দীপঙ্কর ক-দং (Kah-dam) নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতীশের সমাধি-মন্দির

অতীশের সমাধি-মন্দির গ্রো-ম (Song-ma) নামে পরিচিত। নাম (Nam) নামক গ্রামের যে স্থানে অতীশের সমাধি-মন্দিরটি অবস্থিত, সে স্থানটি অতি নির্জন। যে দীপঙ্কর তিব্বতীয়দের ধর্ম-সংস্কারের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাহারা কিন্তু অতীশের সমাধি-মন্দিরটির রক্ষার দিকে একান্ত উদাসীন। ওয়াডেল্ সাহেব অতীশের সমাধি-মন্দিরটি দেখিয়া লিখিয়াছেনঃ– "আমি নাম গ্রাম দীপঙ্করের সমাধি মন্দিরটির ধ্বংসপ্রায় অবস্থা দেখিয়া অবাক হইলাম। যে ধর্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা তিব্বতের ধর্ম-সংস্কারের জন্য সুদূর তিব্বতের নির্জন প্রান্তরে জীবন বিসর্জন দিলেন, অকৃতজ্ঞ

তিব্বতীয়েরা কিনা তাঁহার সমাধি-ভবনটিকে রক্ষা করিবার প্রতি একান্ত উদাসীন। যে গৃহের মধ্যে অতীশের দেহাবশেষ রক্ষিত, তাহা একটা গোলাঘরের ন্যায় কক্ষ মাত্র। বাহিরের দিকটা পীতবর্ণানুরঞ্জিত, উহার চারিদিকে কতকগুলি প্রাচীন উইলো (Willow-trees) তরু মাথা তুলিয়া একটি বীথি রচনা করিয়াছে। মন্দিরটির আকার অনেকটা চুরতেনের (chorten) মত। উহার উচ্চতা ১৪ ফিট পরিধিও তদনুরূপ। ইহার উপরটা বালিচুনের কাজ করা এবং মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র অপটু চিত্রকরের অঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধ এবং অতীশের নিজেরও কয়েকটি চিত্র দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। দীপঙ্করের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। নিম্ন ভাগে শ্বেত হস্তী, শ্বেত ছত্র, প্রভৃতি পবিত্র সপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে। ছয় জন অশিক্ষিত লামার উপর এই সমাধি-মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রহিয়াছে। ইহারা সমাধি-মন্দিরের ২০০ শত গজ দূরে একটি তরুলতা গুল্মহীন প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতের নিম্ন ভাগে বাস করে। এই ছয়জন লামার মধ্যে মাত্র একজন সামান্য ভাবে কিছু লিখিতে-পড়িতে জানে। এখানকার পর্বত-গাত্রে খোদিত মূর্তি ও নিকটবর্তী স্থানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি দেখিয়া মনে হয় যে, অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগন এই স্থানের কাছাকাছি কোথাও হয়ত বা বাস করিতেন।"[১]

ন্যাথ্যাং-বিহার

দীপঙ্কর ন্যা-থ্যাং (Nye-thang) নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ন্যা-থ্যাং লাশা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ন্যাথ্যাংয়ের বিহারটি বর্তমান সময়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখানে এখনও প্রায় পঞ্চাশ জন লামা বাস করেন। আজ পর্যন্ত বংশপরম্পরাগত ভাবে তিব্বতীয় গল্পপ্রিয় বৃদ্ধগণ ও লামাগণ ভারতীয় মহাপুরুষ দীপঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গিগণের মহানুভবতার কথা বলিয়া থাকেন।[২]

"খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙলা দেশ (বিক্রমপুর) হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি তথায় একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই স্থানে পরবর্তী কালে ক্রেডিং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহাতে ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইবে। আমি দিব্য চক্ষুতে এই স্থানে ষোড়শ স্থবিরের মূর্তি দেখিতেছি।"

এইরূপে নানা দিক্ দিয়াই আমরা দীপঙ্করের প্রতিভা ও তিব্বতে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সমাদর এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয় পাইয়া থাকি। অতীশ দীপঙ্করই প্রকৃতপক্ষে তিব্বতে তান্ত্রিক বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার পথ নির্দেশ করেন। দীপঙ্করের বিরচিত গ্রন্থ-নিচয় নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে [He wrote a great number of works which may be found in the Bstan-hgyur, and translated many others, relating principally to Tantrik theories and practices]।

দীপঙ্করের ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাঁহার উপদেশে তদীয় প্রিয়

১. Lhasa and its Mysteries by L. A. Waddell. Page 321-322.

2. Atisha founded A monastery at Nye-thang, a few miles, from Lhasa an institution which still flourished, with fifty resident Lamas. The Land of Lama by David Macdonal Page 40. (১) সাহিত্য ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ষোড়শ মহাস্থবির ৩০ পৃষ্ঠা– সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। The life of Budha translanted by W. W. Rockhill 1884.

শিষ্য বুস্তন্ (Bustan) একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন– [The jewel of the manifestation of the Dharma, or Tchos-hbyung rin-Tchen' is one of the principal authorities in Tibetan History]

দীপঙ্করের গ্রন্থাগার

অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে আগমন করেন, সে সময়ে ইউ-ৎসি (Wu-tse) (অমিতাভ) নামক স্থানে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার দেখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ পাঠাগার হইতে দীপঙ্কর নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তিনিও নানা গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন।[১]

তাবোর-বিহার

স্পিতি (Spiti) নামক স্থানে একটি বিহার আছে। সেই বিহারটির নাম তাবো (Tabo)। ঐ বিহারের মধ্যে একটি খোদিত-লিপি আছে। উহা গুজের (Guze) রাজা চ্যাং-চুব-হোডের সমকালীন। এই নৃপতিই অতীশকে তিব্বতে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাবো-বিহারের প্রধান হলটির নাম "নাম-পার-স্রাঙ্গ-জ্যাড্" (Nam-par-srang-mdzad) নামে আখ্যাত। এই হলটি অতীশের সময় যেমন ছিল এখনও তেমনি রহিয়াছে, উহার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই। এই কক্ষের মধ্যে যে সব সুন্দর সুন্দর প্রাচীন-মিত্র এবং দেবতাদের মূর্তি আছে তাহা দেখিবার মত। এই সমুদয় চিত্র ও মূর্তি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া দর্শন করিলে এবং গবেষণা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে, ঐ পাণ্ডুলিপিখানা একাদশ শতাব্দীর।

এই বিহারের দুইটি খোদিত-লিপি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই লিপি-দুইটি মেজের (Floor) অতি অল্প উপরে খোদিত। ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, যাঁহারা এখানে পদ্মাসনে বসেন তাঁহাদের পড়িবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়াই এত নিম্নে দেয়ালের গায়ে কালির দ্বারা উহা লিখিত হইয়াছে। একটি লিপিতে এই বিহার প্রতিষ্ঠাতার নাম রহিয়াছে, সে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বের কথা, সে সময়ে এই বিহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁহারা যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের নামও রহিয়াছে। অপর লিপিটি হইতে জানা যায় যে, গুজের রাজ-সন্ন্যাসী চ্যাং-চুব-হোড এই বিহারটির সংস্কার করেন। এবং উহাতে সেকালের দুইজন প্রধান লামার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, একজনের নাম রিন-চেন্-জঙ্গ-পো (Rinchen-zanpo) অপর জন হইতেছেন অতীশ। অতীশের বা অতীশার তিব্বতীয় নাম হইতেছে ফুল-ইয়াং (Phul-byung)

আমরা ঐ লিপি হইতে জানিতে পারি যে, অতীশের সাহায্যে রিন-চেন্-জঙ্গ-পো জ্ঞানের আলো [Light of wisdom] লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে বৃদ্ধ পণ্ডিত রিন-চেন্-জঙ্গপোর কথা বলিয়াছি। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এই বৃদ্ধ

১. Journey to Lhasa and Central Tibet by Sarat Chandra Das. P. 222.

পণ্ডিত প্রকৃত ভাবেই দীপঙ্করকে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরে মানিয়া লইয়াছিলেন।[১]

এই খোদিত-লিপি দুইটি যখন রাজা চ্যাং-চুব-হোডের সময়ে সংস্কৃত হয় তখন আনুমানিক ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। গুজে প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী থো-লিং (Thol-ding)-এর নিকটবর্তী 'পু' (Poo) নামক স্থানে রাজা জে-শে হোডের যে খোদিত-লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও অতীশের বিষয় অবগত হওয়া যায়।[২]

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পি. ইগারটন [Mr P. Egerton, of the civil service] (A. H. Heyde)-এর সহিত স্পিতি-বিহার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই পর্যটনের ফলে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থে স্পিতি-বিহারের বহু ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে স্পিতি-বিহার সম্ভবতঃ অতীশের শিষ্য ব্রোমতোন্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।[৩] সে যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, অতীশ গুজে প্রদেশের একটি বিহারে প্রায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। সেই বিহারটির নাম 'নিরাভোগ-মহাবিহার' এই বিহারে থাকিবার সময় তিনি লোকাতিত-সপ্তাঙ্গ-বিধি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এখান হইতে পরে তিব্বতে গমন করেন।

অতীশ দীপঙ্করের চিত্র

আমরা হ্যাকিন সাহেবের লিখিত Asiatic Mythology নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, মুজে গীমে (Muse Guiemet)-র বাকোট সংগ্রহাগারে অতীশের একখানি চিত্র আছে। সেই চিত্রে অতীশ এবং তাঁহার একজন শিষ্য– Rta-nag-gos lo-tsa-ya-khug-da-L. lhasirtis, এবং বজ্রসত্ত্ব শক্তিকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ ভাবে অঙ্কিত চিত্র ও যমের চিত্র রহিয়াছে। এই চিত্রখানি অতি সুন্দর।[৪]

হয়গ্রীব মূর্তির প্রকাশ

কথিত আছে, দীপঙ্করের ধ্যান-প্রভাবে হয়গ্রীব মূর্তির রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। [The horse-necked one] হয়গ্রীবের ঘোড়ার মত গলা, তিনটি মাথা, চারিটি হাত এবং চারিটি পা। মাথার চুল উস্কখুস্ক, মড়ার মাথার খুলির দ্বারা গঠিত মুকুট, মৃতমুণ্ড দ্বারা গ্রথিত কোমরবন্ধ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। উর্ধ্ব দিকের হস্তে তীর-ধনু। পদতলে দৈত্য বা

---

১. Archaeological Survey of Indial, Annual Report 1909-10.

২. Antiquities of Indian Tibet, by A. H. Francke, Pages 1, 19, 23, 41, 42, 45, 50, 51, 52.

৩. Monastery of spiti was probably founded by Brom-Ston, the famous pupil of the famous teacher Atisa, in the 11th century, Antiquities of Indian Tibet, by A.H. Francke. Part 1 1914 cal. Page 45.
Cordier, 11. P. 251.

৪. দীপঙ্কর সম্বন্ধে Asiatic Mythology-তে এই চিত্রের বিষয় লিখিত আছে এবং দীপঙ্কর ও তাঁহার শিষ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য রহিয়াছে, Rta-nag-gos-lo-tsa-ya-khug– A scholar and translator of high repute, people of the great master Atisa (Eleventh century) head of a school of copy-ists. In a painting in the Bacot collection he is depicted with the reformer Atisa (Dipangkara Srijnana) on his right, on the left Vajrasattva embraching his sakti, then to the right again Yama, the king of the hells. Page 173, Asiatic Mythology by J. Hackin, Clement Huart & and translated by F. M. Atkinson.

রাক্ষস।[1]

এইভাবে নানা দিক দিয়াই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, দীপঙ্করের সেকালে ভারতবর্ষের পণ্ডিতসমাজেও যেমন, তেমনি তিব্বতেও তাঁহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি যখন তিব্বত গমন করেন, তখন বিক্রমশীলা-বিহারের প্রধান আচার্য রত্নাকরের সহিত এইরূপ কথা ছিল যে, তিনি তিন বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আর ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইল না। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি তিব্বতে কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং জনপ্রিয় ছিলেন।

বরদা তারাও ষোড়শ মহাস্থবির

দীপঙ্কর বরদা, তারা এবং ষোড়শ মহাস্থবিরের ভক্ত ছিলেন এবং তিব্বতে উহার পূজা প্রবর্তন করেন্ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন :– স্থবির শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। মনু বলেন :–

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥ মনু, ২।১৫৬।

"যাহার কেশ পক্ব হইয়াছে, তাহাকেই স্থবির বলে না। যিনি যুবক হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন। অতএব, মহাস্থবির শব্দের অর্থ,– পরমশাস্ত্রজ্ঞ। পালি ভাষায় স্থবিরকে থের্ বলে। থের্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর এক সম্মান-সূচক উপাধি। যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি থের্ পদবাচ্য। এইরূপ যে ভিক্ষু অন্ততঃ বিশ বৎসর কাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে মহা থের্ বলে। তিব্বতীয় ভাষায় মহাস্থবির বা মহাথের্– কে, নে-তেন্-ছেম্-পা বলে। এ শব্দের আবয়বিক অর্থ মহা-আসন-স্থির।"

খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সাত শত বৎসর মধ্যে ষোল জন মহাস্থবির আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরোপকারিতায় বিস্মিত হইয়া পরবর্তী বৌদ্ধগণ এই ষোলটি নাম একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায়, ষোড়শ স্থবিরকে নেতেনচুরুক্ বলে। তিব্বতের সর্বোত্তম বিহার-সমূহে অদ্যাপি মহা আড়ম্বরে নেতেন্-চুরুকের পূজা হয়। 'পাগ্সাম্ জোন্ জাঙ্গ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ইতিহাসে ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠায় স্থবির পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে।[2]

১. The Gods of Northern Buddhism by Alice Getty, Oxford. 1928. Page 163.
২. তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির– (১) বিভুজ, (২) অঙ্গণিক, (৩) অজিত, (৪) বনবাসী, (৫) কালিক, (৬) বজ্রীরণী পুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) ধৃতবর্ত্ম (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) নাগসেন, (১৪) ভবিক বা সিবক, (১৫) ধর্মত্রাত বা ধর্মাত, (১৬) রাহুল। সাহিত্য, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১২। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ লিখিত তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তিব্বতে দীপঙ্করের শিক্ষা ও প্রভাব

আমরা দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার ইতিহাস বলিলাম। কিন্তু বাঙলা দেশের এই মহাসাধক তিব্বতে যাইয়া, সেখানকার ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিয়াছিলেন এইবার সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি। আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হইয়া থাকে। দীপঙ্করের সম্পর্কেও তাঁহার সমসাময়িক জীবন-চরিত লেখকগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহা হইতেছে "পূর্বজন্মানুস্মৃতি" অর্থাৎ, পূর্বজন্মের সমুদয় কথা তাঁহার এজন্মেও স্মরণ ছিল। এক কথায় তিনি জাতিস্মর ছিলেন।

দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া বারো বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই বারো বৎসরকাল তিনি তিব্বতের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান নগরী এবং পুণ্যপীঠসমূহ পর্যটন করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। একজন বাঙালী ধর্মাচার্যের পক্ষে বিদেশী তিব্বতীয়দিগকে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া যে কত বড় গুরুতর কাজ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দীপঙ্কর কিন্তু এই কার্যটি অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যেমন জাতকের গল্প বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, দীপঙ্করও তাঁহারই আদর্শে প্রত্যেকটি বক্তৃতা বা উপদেশের পর তাঁহার পূর্বজন্মের এক একটি গল্প বলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতেন। তিব্বতীয়েরা শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিস্ময়ের সহিত তাঁহার বর্ণিত গল্প এবং উপদেশগুলি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। দীপঙ্করের পবিত্র জীবন, তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও তিব্বতীয়দের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা অতি সহজেই তিব্বতবাসীদিগকে ধীরে ধীরে ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকে বলেন, দীপঙ্করের শিক্ষা ও জাতকের গল্প বলার জন্যই তিব্বতের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গল্প বলিবার ক্ষমতা এইরূপ অসাধারণ ছিল যে, বালক, বৃদ্ধ, তরুণ, তরুণী সকলেই তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। অতীশও তাঁহার শিষ্যগণের সাহায্যে তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীদের মন হইতে অনেক অন্ধ সংস্কার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নরহত্যা, পশুবলি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, ব্যাভিচার এই সকল দূষিত কার্য তাঁহার প্রভাবে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

তিনি ধর্ম কি? কর্ম বলিতে কি বুঝায়, এবং বৌদ্ধধর্মের মূল আনন্দ পরম প্রার্থিত 'নির্বাণ' কাহাকে বলে এ-সমুদয় ধীবে ধীরে তিব্বতীয়দের নিকট ব্যাখা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই আদর্শ অনুসরণ কবিয়াই বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যকে প্রকৃতভাবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মতে; "He gave a thoroughly spiritual turn to the minds of the Tibetan People."

অতীশের শিষ্য-সম্প্রদায়

তিব্বতের শত শত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতীশের নিকট বৌদ্ধধর্মে যেমন দীক্ষালাভ করেন তেমনি জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্যদের মধ্যে জীনকর প্রধান ছিলেন। তাঁহার পরিবারিক

নাম হইতেছে ব্রোমতোন। ব্রোমতোন অতীশের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। অতীশ যখন যে স্থানে গমন করিতেন জীনকরও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। এইজন্য ব্রোমতোন-কে বুদ্ধদেবের নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত তুলনা করা হইত। অতীশ ও ব্রোমতোন জার্পা (Yerpa) নামক বিহারে তিন বর্ষা (তিন বৎসর) অর্থাৎ বর্ষাকাল বাস করিয়াছিলেন। এই বিহারটি তুষার-ধবল-শৃঙ্গরাজী পরিবেষ্টিত একটি অতি সুন্দর উপত্যকায় অবস্থিত। তিব্বতের এই স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এই স্থানে দীপঙ্কর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ব্রোমতোন সম্বন্ধে অপর একজন শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন: "ব্রোমতোন অবলোকিতেশ্বর দেবের অবতার স্বরূপ। তাহার জ্ঞান, তাঁহার ভক্তি এবং ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান ও সিদ্ধি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সে শুধু তিব্বতের নয়, বৌদ্ধজগতের উজ্জ্বল মণি। আমি তোমাদের নিকট এক সময়ে ব্রোমতোনের পূর্ব জন্মের কাহিনী বলিব। ধর্ম সম্বন্ধে ব্রোমতোন এতদূর উন্নত যে, তাহা একটি রত্নখনির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।" দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া যে শিষ্য ব্রোমতোন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনয়ী ব্রোমতোন্ং বলিলেন: "হে পূজনীয় গুরুদেব, আমি আপনার চরণতলে বসিয়া যে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহার জন্য আপনার এইরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা আমার নাই।"

আমরা এই ভাবে দেখিতে পাইলাম দীপঙ্কর কিরূপ ভাবে তিব্বতীয়দিগের মনোরঞ্জন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের জীবনে পবিত্রতার পূর্ণধারা প্রবাহিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লামাদের ত্রিকোণাকার উষ্ণীশ

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাত্মা অতীশের (শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের) জনৈক প্রসিদ্ধ শিষ্য তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। সেই জীবন-বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেকালের বৌদ্ধ-লামারা ও শ্রমণেরা কিরূপ উষ্ণীশ (শিরোস্ত্রাণ) ব্যবহার করিতেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমশীলার মঠে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের এক অধিবেশনে তিব্বত রাজদূত নাগটাহো নাচোডা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিখিবার জন্য মগধে আসিয়াছিলেন। নাগটাহো এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, উপাসনার সময়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ টুপি বা উষ্ণীশ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত টুপি ত্রিকোণাকার ছিল। কথিত আছে, তিব্বতের লামারা যে ত্রিকোণাকর টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা দীপঙ্কর কর্তৃকই তিব্বতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিব্বতে অতীশের যে মূর্তি অঙ্কিত আছে, তাঁহার মস্তক যে রক্তবর্ণ উষ্ণীশে পরিশোভিত, তাহা ত্রিকোণাকার। এই ত্রিকোণাকার টুপিই লামারা শিরোস্ত্রাণরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

অতীশের জীবন-চরিত

অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতীয় ভাষায় অনেক জীবন-চরিত আছে। সে সমুদয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিস্তারিত ভাবে দীপঙ্করের জীবনী লিখিতে গেলে তাহা একখানি বৃহৎ

গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেনঃ – "তিব্বতে দীপঙ্করের জীবন-চরিত-অনেক আছে। আমরা কেহই তাহার সন্ধান করি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক লামা দাউসনদুপ কাজি মহাশয়ের নিকট·প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীপঙ্করের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাঁহারই সাহায্যে পুস্তকখানির অনুবাদ করিব। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বইখানি যে কোথায় গেল, তাহাও জানিনা। তিব্বতে সন্ধান করিলে আরও এরূপ পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ব্রমটব্ লিখিত (১০৫৫ খ্রী :) দীপঙ্করের জীবন-চরিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। এই একজন পূর্ববঙ্গের বাঙালী ছিলেন যিনি তৎকালীন জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জন করিয়াছিলেন।[১]

দীপঙ্করের জন্মভূমি

আমরা দীপঙ্করের সম্পর্কে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত সমুদয় জীবন-চরিত হইতেই জানিতে পারি যে, তিনি বাঙলা দেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিক্রমপুর, অর্থাৎ, শ্রীবিক্রমপুর নামক সুবৃহৎ রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রজযোগিনী নামক অংশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। আমি এ-বিষয়ে মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছিলাম তখন অনেকেই আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন– "বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিল না। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরের কোন স্থানটি তাঁহার জন্মস্থান তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন।' *** যোগেন্দ্রবাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের এ-বিষয়ের যথার্থ নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"[২]

এই বিষয়েটি লইয়া এবং আমার লিখিত "বাঙলায় নটরাজ"[৩] শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া একটু আন্দোলনের পর দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানকে আমি কোন কোন প্রমাণবলে বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহানুভব মাহমহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহার

১. বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা।

২. বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ১৬ পৃষ্ঠা।

৩. বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিবমূর্তি- শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত- ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড পৌষ ১৩২০

(১) বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩০, ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা। ৮৭ পৃষ্ঠা ফণীন্দ্রনাথ বসু। (২) Index pag-sam Jon-Zang.

প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল:

My dear Jogendra Babu,

I am glad to hear that you have discovered two images of Nataraja from Eastern Bengal, your discovery confirms my theory that the worship of Nataraja was very common in early times but has almost disappeared from Bengal at the present day. *As regards Dipankar I long ago gave out my view that he was a native of Vajrajogini in Vikrampur.*

He flourished during the reigon of the Pal kings and belonged to the Vajra sect of Mahajan Buddhist. That sect still exist in Tibet, Their Tantrik Practice called Mahasiddhi requires the Company of women called Yoginis * * *

Three Lamas from Tibet came to invite Dipankara at Vikrampur where they resided for two years. There was a Buddhist University at Vikrampur.

এখানে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমশীলা বিহারের সহিত বিক্রমপুরের নাম সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভুল অনেকেই করিয়া থাকেন। * * * বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব যে বিশেষ ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। সে সময়ে বিক্রমপুরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কিনা তাহার কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। তবে দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের বাসভূমি বজ্রযোগিনীর একটি স্থান এখনও 'টোলবাড়ির ভিটা' নামে পরিচিত।

এক সময়ে বিক্রমশীলা-বিহার সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিয়াছিল তাহাতে কেহ কেহ বিক্রমপুরের সহিত বিক্রমশীলা-বিহারকে জড়িত করিয়াছিলের। স্বর্গত অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন:– "আজকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশীলা-বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তাঁরা ব'লতে চান যে, বিক্রমপুরে বিক্রমশীলার মঠ ছিল। এখানে নামের সামঞ্জস্য খুব আছে বটে। কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ হতে পারে না। এ বিষয় লামা তারনাথের কথা আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। লামা তারনাথ তাঁর 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে' এই বিক্রমশীলার মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্দেশ করেন। [জার্মান পণ্ডিত Schiefner-এর অনুবাদ Taranath পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য] এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করে আমরা বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরে নিয়ে যেতে পারিনে * * * যতদিন না এই স্থানটি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খনন কবা হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হবে না। পণ্ডিত অভয়কর গুপ্তও দীপঙ্কর নালন্দা এবং বিক্রমশীলা দুই যায়গারই বই রচনা করেছিলেন।"

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যোগিনীগণের ও তান্ত্রিকগণের বাস-হেতু তাঁহাদের উপাস্যা দেবী বজ্রযোগিনীর নামের অনুযায়ী যে এই গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়।[১]

১. [Vajrajogini, the chief Tantric ascetical Goddess, as whose request Buddha, in his terrific form of Vajra Bhairava, had delivered the Mula Tantra scriptures.]
Vajrajogini, Consort of Heruka. Buddhist Iconography-Binoytosh Bhattacharjya pages 155. 156.

নেপালের সাঙ্কু (Sanku) নামক স্থানে বজ্রযোগিনীর একটি মন্দির আছে। সেই মন্দির-মধ্যে উগ্রতারা দেবীর (Ugra-Tara) মূর্তি– প্রতিষ্ঠিতা আছেন। আমাদের মনে হয় বজ্রযোগিনী গ্রামেও বজ্রযোগিনী দেবীর কোনও মন্দির থাকা সম্ভবপর এবং তনদুসারে বজ্রযোগিনী নামটি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রাম্য লোকেরা সাধারণত এ গ্রামের নাম "বদর যোগিনী" এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অনেক দিন পূর্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী 'হেলেনা কাব্য' প্রণেতা স্বর্গত কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় লৌকিক কিংবদন্তী-মূলক "রাজকুমারী" নামক উপন্যাসে এই গ্রামের নাম "বরদা যোগিনী" উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাল্পনিক যুক্তি এই যে, "পাল বংশীয়রা বরদা নাম্নী কোন রাজকন্যা যোগিনীবেশে এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহা 'বরদা যোগিনী' বা বজ্রযোগিনী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যোগিনী মুন্সীগঞ্জের পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছেন বলিয়াই ঐ ঘাট 'যোগিনী ঘাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর অষ্টমী স্নানোপলক্ষে এই ঘাটে পূর্বে বহু যাত্রীর সমাগম হইত।" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তনুযায়ী আনন্দ বাবুর লিখিত এই কিংবদন্তী সত্য নহে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধখণ্ডিত দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী দেবীর উপাসক ছিলেন। বজ্রযোগিনী দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়াই ইহা বজ্রযোগিনী নামে খ্যাত।[১]

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার আয়তন প্রায় চারি বর্গ মাইল। এই-গ্রাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সমীপবর্তী। ইহা যে প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরীর (বর্তমানে রামপাল নামে পরিচিত) অন্তর্ভূত একটি অংশ ছিল তাহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রাম পূর্বে নিম্নলিখিত কতকগুলি পাড়ায় বিভক্ত ছিল। (১) আট পাড়া, (২) পানহাট্টা, (৩) আচার্যপাড়া, (৪) বরলিয়া, (৫) ধামদ, (৬) মামাসার, (৭) আজিমপুরা, (৮) ধামারণ, (৯) কল্যাণসিংহ, (১০) ডেকরাপাড়া, (১১) চূড়াইন, (১২) নাহাপাড়া, (১৩) ভট্টাচার্য পাড়া, (১৪) সোমপাড়া, (১৫) পুকুর পাড়া, (১৬) গুহপাড়া, (১৭) পুরোহিত পাড়া, (১৮) বসুপাড়া, (১৯) শঙ্করবাঁদ, (২০) সুখবাসপুর, (২১) সরস্বতী, (২২) রামসিংহ, (২৩) মহাকালী, (২৪) দেওসার, (২৫) রঘুরামপুর, (২৬) ধলগাঁ।

ইহা হইতেই এই গ্রামটি যে কত বড় বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমিত হইবে। এই গ্রামের মৃত্তিকা খননে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও বিবিধ দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সরস্বতী মূর্তির কথা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটি বজ্রযোগিনী গ্রামের যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের নিকটবর্তী উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" নামে অদ্যাপি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ ভিটার বা বাড়ির সংলগ্ন তিনটি প্রাচীন দীঘি পরস্পর কোণাকোণি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ দীঘি তিনটি লালমতি, বোলমতি এবং ইছামতি নামে পরিচিত। সেই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন প্রথম এ ভিটা-সংলগ্ন নানা স্থান পর্যবেক্ষণ করি, তখন যেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল সেই স্থানটিও দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানের সহিত একটি অংশ টোলবাড়ির ভিটাটিও

১. সত্তর বৎসর পূর্বে মুন্সীগঞ্জের পূর্বদিকস্থ যোগিনী ঘাটে অষ্টমী-স্নান করণার্থ যাত্রি সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম-কর্ম সমাপনান্তে অনেক যাত্রিকে বল্লাল রাজার কীর্তিকদম্ব সন্দর্শন্ জন্য রামপালে উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রিত হইয়া থাকে। পল্লীবিজ্ঞান ১২৭৩-৭৫।

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পরবর্তীকালে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও এ বিষয়ে আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।[১] এ পর্যন্ত বাঙলা দেশের, কি বাঙলার বাহিরের, কি ইউরোপীয় পণ্ডিত যে-কেহ দীপঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তিব্বতীয় ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া এবং তিব্বতে গমন করিয়া তাঁহার কীর্তি-পরিচয়, তদরচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন কলিয়া একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দীপঙ্কর বাঙলার অধিবাসী (বিক্রমপুর) ছিলেন। দীপঙ্কর আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, একথাও অপ্রকৃত নহে। তিব্বত দেশীয় লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সমগ্র দেশে কেহ একচ্ছত্র নৃপতিরূপে আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই দীপঙ্কর আপনাকে যে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। তাঁহার পিতা ঐরূপ কোনও রাজবংশের লোক ছিলেন ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সংস্কার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী পণ্ডিতেরাই নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রদ্ধার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়াছে। তিব্বতের ইতিহাসে সগৌরবে উহা উল্লেখিত আছে।

দীপঙ্কর বাঙালির গৌরব

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন:– "দীপঙ্কর বৃদ্ধ বয়সেও তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধধর্মের লোপ হইবে এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযান অধিকারী নয়; কেননা তখনও তাঁহারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগের প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গালীর গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?"[২]

১. বিক্রমপুরের বিবরণ, প্রথম-খণ্ড– শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। ২৬৯-২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum. Page 190.

২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪র্থ সংখ্যা ১৩২১ সন ২৬৩ পৃষ্ঠা। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত– Modern Buddhism and its Followers in Orissa নামক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (১) Encyclopaedia of Religion and Ethies. Volume II. page 194. Edited by James Hastings. (২) During the reign of Mahipal's successor Nayapala, and headed by Atisa, from the Vikramsila monastery in Magadha, continued the work and firmly re-established Tibetan Buddhism. The Early History of India-vincent A. Simth, pages 400-402.

দীপঙ্করের জন্মস্থান

দীপঙ্করের জন্মস্থান যে বাঙলা দেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল তৎ সম্বন্ধে আমরা বিবিধ প্রমাণ সহকারে আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ইহা বিশেষ ভাবেই জানা আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব হইতেই সমতট বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্করের সমকালে এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবিধ পরিচয় নানারূপে পাওয়া যাইতেছে। সেই সব প্রমাণ একেবারে যাহাকে বলে 'পাথুরে প্রমাণ'। বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি সমূহই তাহার প্রধানতম সাক্ষী। আমরা পরে যখন মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিব তখনই উহা পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামক একজন লেখক দীপঙ্করকে বিহারের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে দীপঙ্কর বিহারের সাহোর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি বা তর্কের অবতারণা করেন নাই। আমাদের দেশে অনেকেই নিজ নিজ কল্পিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ভাবে একটা তর্কের সৃষ্টি করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নও তাহাই করিয়াছেন।[১]

রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় সহোর মাণ্ডলিক রাজ্যের কথা বলিয়াছেন ও সহোর প্রদেশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, আমরা সেই সহোর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের লেখা হইতে যাহা জানিতে পারি, তাহাও সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মতের

১. পণ্ডিতবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন দীপঙ্কর সম্বন্ধে "প্রবাসী" মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন :– "ভোট দেশে ভারতীয় আচার্যদের মধ্যে শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম "অতীশা" জোবো (স্বামী) বা "জোবো-জে (স্বামী ভট্টারক)। ইঁহারা দুইজনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ "অতীশকে" বাঙালী বলিয়া প্রমাণ করেন।" বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালন্ধরী কাহ্ন সরজ আদি কবিদের দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হৌক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চল "ভাগল" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল, উহার রাজধানী ছিল বর্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোনও স্থানে; দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী ইঁহার শাসক ছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গের পালবংশের বিজয়ধ্বজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। তাঁহার রানী শ্রীপ্রভাবী "কাঞ্চনধ্বজ" রাজপ্রাসাদে ভোটীয়-জল-পুরুষ-অশ্ব বর্ষে (৯৮২ খ্রীঃ) এক পুত্ররত্নের জন্মদান করেন। উত্তরকালে ইতিহাসে ইনিই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ, ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম।–নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর। রাহুল সংকৃত্যায়ন, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫ সন্ ১-৪ পৃষ্ঠা।

দীপঙ্করের জন্মস্থান সম্বন্ধে রাহুল সাংকৃত্যায়ন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে তিনি কোনওরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তিনি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহাও সমীচীন হয় নাই। শাস্ত্র মহাশয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে নানারূপ নূতন তথ্য দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মত একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে কোন কথা বলা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ আমরা নানা দিক দিয়া নানা ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদয় লেখকগণই একবাক্যে দীপঙ্কর যে বঙ্গদেশের অর্থাৎ, পূর্ববাঙলার অধিবাসী ছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্বেই এবিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণ ও শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দীপঙ্কর যে বাঙলার অধিবাসী ছিলেন সে কথা বলিয়াছেন, কাজেই এজন্য সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মন্তব্য একেবারেই সমীচীন হয় নাই। এ বিষয়ে অনাবশ্যক এবং অহেতুক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতবাদের উপর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রে যাহা বলিয়াছেন

পরিপোষক নহে। এমন কি সহোর ও বাঙলা দেশের অন্তর্ভুত বলিয়াই উল্লিখিত আছে :–To the East of vajrasana [Buddha Gaya] lies the great country of Bangala in which there was the lace called Das-hor containing twenty hundred thousands habitations. At its centre was situated the capital which was prosperous, opulent, spacious, filled with a large population, well swept and kept clean. The Kings palace stood at the middle of city, furnished with many golden Dhwaja (ensigns of royalty). It will be seen that the name Das-hor has been elsewhere confounded with the name of a Khetria tribe. According to Cosma de Koros the name Das-hor, is same as sahor the common name for a city, but it remains to be shewn if the name *sahor* is derived from Maghhadi or Bengali. It is considered, I believe, by same as derived from Urdu. [Buddhist Text society, Volume I. Page 8] অর্থাৎ, বজ্রাসনের (বুদ্ধগয়া) পুর্বে বিখ্যাত বাঙলাদেশে অবস্থিত। বঙ্গদেশে সহোর নামক একটি স্থান আছে। ঐ স্থানে দুই লক্ষ লোকের বাস। ঐ সহরের মধ্যবর্তী স্থানে রাজধানী বিরাজিত। রাজধানীতে বহু লোকের বাস এবং নগরীটি বহু স্বর্ণ-ধ্বজ [রাজ-চিহ্ন] সমন্বিত বাড়িঘরে সুশোভিত। সহরটি সমৃদ্ধ, জনতাবহুল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। রাজপ্রাসাদ নগরীর মধ্যস্থলে বিদ্যামান। রাজপ্রাসাদের উপর বহু কাঞ্চন-ধ্বজ শোভমান। অনেকে এক ক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত এই স্থানের গোল করেন। Cosma de Koorosi- সহোর নামটি হইতেছে সহর বা সহোর অর্থাৎ, নগর অর্থবোধক। অনেকের মতে সহোর শব্দ মাগধি বা বাঙলা শব্দ হইতে উদ্ভুত। আবার অনেকে মনে করেন উহা উর্দু হইতে উদ্ভুত। কাজেই রাহুল সংকৃত্যায়ন যে সহোর মান্ডলিক রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বাঙলা দেশেরই অন্তর্গত ছিল, বিহারে নহে।[১]

তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম :– "অতীশ দীপঙ্কর সহোরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, একথা নিতান্ত ই নূতন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় এই তথ্য কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কি সেকথাও বলেন নাই। বাঙালী পণ্ডিতগণ কোনও বাঙালীর রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙালী প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদের উপজীব্য একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ।

সকল গ্রন্থের উক্ত হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'বোধিমার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা নাম' বলিয়া অতীশের স্বরচিত একখানি গ্রন্থে যে বিবরণ আছে, তাহাতে অতীশের বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিনি "বাঙলার রাজপরিবারে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [Dipankara Srijnana de souche royale Bengalie-Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, Troisieme Partie, par P, Cordier, P 327] ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'একবীর সাধন নাম' বলিয়া অতীশের যে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহাতেও আচার্য পৈণ্ডপাতিক শ্রীদীপঙ্করকে 'বাঙলার' (du Bengale) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (Ibid, Deusieme Partie P, 46) "প্রবাসী" আশ্বিন ১৩৪৪, অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান, ৮৯০ পৃষ্ঠা।

১. Alex Cosma de Koorosi-a native of Hungary, who, to follow out philological researches, resorted to the east, and for years passed under privation, such as seldom has been endured, and patient labour in the cause of science, compiled a Dictionary and Grammer of the Tibetan language, his lasting and real mounment. On his road to H'lasa to resume his labours he died at Darjeeling on the llth: April, 1842, Aged 44 years. Darjeeling past and present by E. C. Dozey P. 147.

অতীশের জীবন-চরিত লেখকগণ :

তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর অতীশের অনেকগুলি জীবন-চরিত রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কল্যাণমিত্র– (Phyag-sorpa), নাগ-সো- (H Borm-Ston-Pa), বুস্তন-(Bu-Ston), এবং "অতীশাই নামথর" নামক দীপঙ্করের জীবনীখানি বিশেষরূপে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। আমরা এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, দীপঙ্কর বাঙলা দেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। "অতীশাই নামথরের" ইংরেজীতে কিংবা পাশ্চাত্য অন্য কোনও ভাষায় কোনরূপ অনুবাদ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানি না। বিখ্যাত পর্যটক স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় বলেন:– "আমি তিব্বতীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনকারী বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত পাণ্ডুলিপি-সমূহের মধ্যে "অতীশাই নামথর" নামক অতীশের জীবনী-গ্রন্থ আমি "পান্সা" বা পণ্ডিতের টুপি ধারণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাত্মা অতীশ তিব্বত-যাত্রাকালে মস্তকে টুপি পরিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে মস্তকাবরণ ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। পাগ্-সাং জোং-জাঙ্গ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের শিরোস্ত্রাণ ধারণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।"

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনচরিতকার বুস্তন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বুস্তন দীপঙ্করের জীবন-চরিত লিখিতে যাইয়া তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,– "প্রাচীনকালে বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে রাজগৃহ নামক স্থানে জিনপুত্র ভদ্রাচার্য নামে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১,৮১৫ বৎসর পরে পূর্বভারতের বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নগরে অতীশরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশেই শান্তি বা শান্তরক্ষিতও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর রাজধানীর মধ্যবর্তী প্রাসাদে জন্মলাভ করেন। ঐ প্রাসাদ "সুবর্ণধ্বজ" নামে পরিচিত ছিল। ইঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম পদ্মপ্রভা। ইঁহাদের তিন পুত্র ছিল। দীপঙ্কর মধ্যম এবং তাঁহার নাম চন্দ্রগর্ভ রাখা হয়। দীপঙ্করের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। তাঁহার পাঁচটি স্ত্রী ছিল। ইঁহাদের গর্ভে নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এক পুত্রের নাম পুণ্যশ্রী।" [In ancient time when the Buddha had come to this world, there was a householder in Rajagriha named Jinaputra. *In later time he was born as Atica according to Bu-Ston, 1815 years after the death of the Buddha, at the city of Vikrampur in Bengal, in Eastern India*, in the Royal house from which the great Sage Canti Raksita had sprung. His birth took place in the central palace called Suvarnadhvaja. He is father was king Kalyan Cri and mother Queen Padma– prabha, He was the second of the three sons they had and was named Chandragarbha. He was married while young to five wives by whom he had nine sons, one of whom was punyaCri][১]

১. (১) pag-Sam-Jon Zang, Part II XVIII. (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস, সেন রায়-চৌধুরী ৯৪ পৃষ্ঠা। pag-Sam Jon-Zang. Part I Cx liv Index.
সাহিত্য ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১২ সাল, "বৌদ্ধ-লামার শিরোস্ত্রাণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ১৮৯ পৃষ্ঠা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী বলেন:- "পাল রাজগণের আনুকূল্যেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বাঙালী প্রচারকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।"

পাগ্-সাম্-জোন্-জাঙ্গে বঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের পরিচয় লিখিত আছে। আমাদের মনে হয় সে-সময়ে যাঁহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতেন তাঁহারা নিজেদের বংশ বা জাতির পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে দিতেন। এইজন্য আমরা তিব্বতের ইতিহাসে যে-সকল বাঙালী বৌদ্ধের পরিচয় পাই, তাহাতে "ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

ধীমপা ব্রাহ্মণ-শ্রমণ বিক্রমপুর

আমরা এইখানে বিক্রমপুরের আর একজন ব্রাহ্মণ-শ্রমণের পরিচয় দিতেছি, ইঁহার নাম ধীমপা। ইনি কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য ছিলেন। [Dhimapa a Brahman Buddhist of Vikrampure, a novice monk who served Krishnacarya.]

আমরা দীপঙ্করের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। তাঁহার জন্মস্থান, বংশ-পরিচয়, পাণ্ডিত্য এবং তিব্বত-যাত্রা এবং তথায় তিনি যে ভাবে ধর্ম সংস্কার করিয়া তিব্বতবাসীর নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন- তাহা বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের কারণ। বাঙালী দীপঙ্করকে স্মরণ করিয়া আজ আমরা বাঙালী মাত্রেই গর্ব অনুভব করিতেছি।

পালরাজাদের শেষকথা

আমরা প্রসঙ্গক্রমে পালরাজাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী পালরাজাগণের অর্থাৎ, ধর্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি নৃপতিগণের গৌড়-বঙ্গ-মগধ পর্যন্ত যে প্রভাবের বিষয় জানিতে পারি, পরবর্তী পালরাজাগণের সেই প্রভাব ছিল না।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন:- "অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাঙলা দেশকে আমরা কেবল দুইটি বিভাগে বিভক্ত মনে করিয়া ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বুঝিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইব, উত্তরে "গৌড়" বা "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে 'বঙ্গ'। এই সময়ে 'বঙ্গ' বলিলে পূর্বকালের 'সুহ্ম' 'বঙ্গ' ও 'সমতট' এই তিন দেশের অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তখন 'বর্ধমানপুর' হরিকেলের একটি স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগের উত্তর বাঙলার নরপতি 'গৌড়াধিপ'- 'গৌরেশ্বর' প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ববাঙলার বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর 'বঙ্গপতি'গণও বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন।" কাজেই দীপঙ্করের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্ভূত বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

"খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ সর্বদাই পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নরপতিরূপে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই তাহা বলিলে ইতিহাসের মর্যাদা অতিক্রম করা হয়। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই গৌড়েশ্বর পাল-নরপতিগণের রাজত্বের সময়ে, বিশেষতঃ তাঁহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ও তদ্বিস্তারের প্রথম যুগে, বঙ্গরাজ্যকে পাল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ও পাল রাজগণের শাসনাধীন মনে করিয়া থাকেন।... কেবল বাঙলা দেশের বিভাগ সমূহের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, উত্তরবঙ্গই গৌড়েশ্বরগণের অপরোক্ষ অধিকারে ছিল এবং অনুত্তর-বঙ্গ অর্থাৎ, পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বঙ্গপতিগণের শাসনাধীনে ছিল।[১]

তৃতীয় বিগ্রহপাল

আমরাও ডাক্তার বসাক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করি। নয়পালের পরবর্তী রাজগণের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা আমরা অনাবশ্যক মনে করিতেছি। কেন-না তাহাদের প্রভাব বঙ্গরাজ্যে ছিল না। নয়পালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:– "তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়, মগধ এবং বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।"[২] একথা যে প্রমাণসহ নহে তাহা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যখন স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ও রাজধানী বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন উল্লেখ করিব। এই তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সময় হইতেই পালসাম্রজ্যের অধঃ-পতন আরম্ভ হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। ইহারা সকলেই একে একে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল জীবিতকলে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বরেন্দ্রভূমে [উত্তরবঙ্গ] কৈবর্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' এই বিদ্রোহের বর্ণনা রহিয়াছে, কাজেই মহীপাল রাজা হইয়া যে রাজ্যালাভ করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ বিস্তৃত ছিল না।

দ্বিতীয় মহীপাল : কৈবর্ত্য বিদ্রোহ ও মহীপালের মৃত্যু

মহীপাল রাজা হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শে অনেক গর্হিত কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া "রামচরিতে" লেখা আছে। তিনি তাঁহার ভ্রাতা শূরপাল এবং রামপালকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ভয়ে যে– তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে। কিন্তু মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্তগণকে দমন করিতে যাইয়া নিহত হইলে-পর রামপালদেব কারামুক্ত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে মহীপালদেবের মৃত্যুর পর শূরপালদেবও সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী কিন্তু এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই।

---

১. ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম.এ. পি.এইচ-ডি, বঙ্গসমতটের কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশ। প্রাচী ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

২. বাঙ্গালার ইতিহাস– রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা।

রামপাল : রামপালের জনক-ভূ উদ্ধার

মহীপালদেবের মৃত্যুর পর রামপাল কারামুক্ত হইলেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের রাজ্য শত্রুকরতলগত। রামপাল কি ভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন সেজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে তিনি বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সামন্ত গণকে একত্রিত করিবার জন্য রাঢ়, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি পর্যটন করেন এবং সামন্তগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা রামপালকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তৎপর রামপাল এক মহাবাহিনী লইয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। পালরাজের সেনার সহিত কৈবর্ত-রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ হইল, করিপৃষ্ঠে অবস্থিত কৈবর্তরাজ ভীম বন্দী হইলেন। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকরনন্দী একপক্ষে রামের এবং অপরপক্ষে ভীমের চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন।[১] রামচন্দ্র যেমন রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেমনই মহারাজ রামপাল 'যুদ্ধ-সাগর' লঙ্ঘন করিয়া, ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনক-ভূ উদ্ধার করিয়া, রামপাল ত্রি-জগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশোবিস্তার করিয়াছিলেন। রামপালকে রামচরিতার রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'জনক-ভূ' বরেন্দ্র অর্থে গ্রহণ করিলে এই শ্লোকেও কৈবর্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। জনক-ভূর এক অর্থ সীতা-জনক হইতে যিনি উদ্ভূত হইয়াছেন, আর এক অর্থ জনকের অর্থাৎ, পিতার ও জন্মভূমি অর্থাৎ, পিতার রাজ্য বরেন্দ্রী দেশ।

রামাবতী :

ভীম রামপালের সহিত যুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। ভীম যখন হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হন তখন তাঁহার বন্ধু হরি, কৈবর্ত-সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ ভীম ও হরি উভয়েই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। রামপাল এইভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া

১. রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবও [যথাবৎ] এইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক ক্ষৌণী-নায়কের বধ সাধন কবিয়া, জনক-ভূমি (বরেন্দ্রী) লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তার কবিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকোক্ত 'জনক–ভূ'– শব্দের মিথিলা অর্থ গ্রহণ করিয়া, রামপাল কর্তৃক ভীম নামক মিথিলাধিপতির পরাজয়-সাধনের ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন– I cannot identify the name। এই শ্লোকের সহিত মিথিলার সম্পর্ক নাই। 'জনক–ভু' শব্দে পাল রাজগণের জন্মভূমি "বরেন্দ্রী" সূচিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরলোকগমনের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেবের যথেচ্ছ শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রজাপুঞ্জের নায়ক কৈবর্ত-জাতীয় দিব্য তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলে কিছুকালের জন্য পালরাজগণের 'জনক-ভূ' [বরেন্দ্রী] তস্য ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের করতলগত হইয়াছিল। রামপাল বহু চেষ্টায়, বহু ক্লেশে সেই 'জনক-ভূ'র উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, [স্বনাম-সাদৃশ্যে এবং স্বকার্য-সাদৃশ্যে] দ্বিতীয় রামচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। রাজকবি এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, রামপক্ষে এবং রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য 'জনক-ভূ লাভাৎ' 'ভীম–রাবণ-বধাৎ' এবং 'যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ' এই তিনটি শিষ্ট পদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত 'রাম চরিত' কাব্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার কোন কোন স্মৃতি-চিহ্ন বরেন্দ্রভূমিতে অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই প্রশস্তিতে কৈবর্তরাজ ভীম 'ক্ষৌণী নায়ক' বলিয়া উল্লিখিত–রাজকবি তাঁহাকে নায়ক মাত্রই বলিয়াছেন, রাজা বলেন নাই। গৌড়লেখমালা-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৮ পৃষ্ঠা।

বরেন্দ্রীতে 'রামাবতী' নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'রামাবতী' পাল রাজবংশের শেষ রাজধানী। রামপাল দেব এই নগরে 'জগদ্দল-মহাবিহার' নামে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 'রামাবতী' রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের সময়েও গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল। আবুল ফজল তৎপ্রণীত 'আইন-ই-আকবরী'তে 'রমৌতি' নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেনঃ- "লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্ণৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতি পারস্য ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে।"[১] রামাবতী নগরী প্রতিষ্ঠার পর রামপাল দেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। রামপালের পর অল্পদিনের মধ্যেই পাল রাজবংশের অবনতি ঘটে এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের সময় হইতেই যে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, 'শ্রীবিক্রমপুর' বা 'বঙ্গরাজ্য' দশম-একাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র- এবং স্বাধীন ছিল এবং গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। স্বাধীন বঙ্গ-দেশের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর এবং সেই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের গৌরব-কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

১. রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জগদ্দল-মহাবিহার' তাহার কাছেই ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না- পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও এক সময়ে বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে হইবে। আমি একথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কণিষ্ক-বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদত্তম-বিহার, সেইরূপ বাঙ্গালায় মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গালায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব ভারতে। যাহা হউক, উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। [মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা সন ১৩২১] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন রামাবতী সরকার জান্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমা-মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিস্কৃত হইতে পারে না। বগুড়া সরকার ঘোড়াঘাটে এবং সরকার বাজুহায় অবস্থিত এবং রামপাল সরকার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। বাঙ্গলার ইতিহাস-২৭২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীন বঙ্গ-রাজ্য— রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

বঙ্গ নামের প্রাচীনত্ব

'বঙ্গ' নামটি অতি প্রাচীন। এ বিষয়ে পূর্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই নাম বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধগ্রন্থে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকবি ভাসের নাটক প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেকালের বঙ্গদেশের সীমা কিরূপ ছিল, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই, এজন্য এখানে ভৌগোলিক বৃত্তান্তও কিছু আলোচনা করিব।

প্রত্যেক দেশেরই প্রাকৃতিক সীমা নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নদী-মাতৃক-দেশে, নদীর গতি-পরিবর্তন হেতু, দেশের সীমার পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেও দেশের সীমার পরিবর্তন হয়। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বর্তমান সময়ের কথাই বলি, তাহা হইলেও বর্তমান ইংরাজ-রাজত্বে বঙ্গদেশের সীমা কতবার কতরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সকলেরই সুবিদিত।

বঙ্গ, সমতট

আমরা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের যে পরিচয় পাই, তাহা যে সমতট প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র এবং পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত দেশ-সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগস্তম্ভলিপি হইতেই জানিতে পারি। তখন বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমতট প্রত্যন্ত দেশ রূপে পরিগণিত ছিল।

বঙ্গ ও উপবঙ্গ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেনঃ— "ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ গণিতাচার্য বরাহমিহির পূর্বদিকের মগধ, মিথিলা, প্রাগজ্যোতিষাদি দেশ-সমূহের মধ্যে সুহ্ম, সমতট, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক ও বর্ধমান এই কয়টি দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং অগ্নিকোণে অঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশ-সমূহের মধ্যে বঙ্গ ও উপবঙ্গের নামও নির্দেশ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের পূর্বে ও তাঁহার সমসময়ে দেশবিভাগ সমূহের নাম ছিল গৌড়ক ও পৌণ্ড্র— তাহাই কোটিবর্ষ প্রভৃতি 'বিষয়' লইয়া গঠিত 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি' নামে, আবার কখনও 'বরেন্দ্রী' নামেও আখ্যাত হইত, এবং তাহাই মোটামুটিভাবে বর্তমান সময়ের 'উত্তর বঙ্গ', অর্থাৎ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জিলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ। আর যে দেশবিশেষের নাম ছিল 'সমতট', তাহাই মোটামুটিভাবে বর্তমান সময়ের "পূর্ববঙ্গ" অর্থাৎ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশবিশেষ

ইহাতে অন্তর্ভূত ছিল না, এইরূপ কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না।[১] "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,– "সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ববঙ্গই প্রাচীনকালে সমতট, বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।"

ইউয়ান্ চোয়াং (৬৩০-৬৪৪ খ্রীঃ অঃ)

চীন দেশীয় পর্যটক ইউয়ান্ চোয়াং [হিউয়েন সাঙ] বাঙলা দেশ পর্যটন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণে পৌণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বঙ্গ ও সমতট এই উভয় স্থানকেই 'সমতট' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছেন কিনা তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

চৈনিক পর্যটক ইৎসিং (৬৭১-৬৯৫ খ্রিঃ অঃ)

ইউয়ান চোয়াংয়ের পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক ইৎসিং ভারতে আসেন। হরিকেল অর্থাৎ, বঙ্গে ["বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া" ইতি হেমচন্দ্র] এ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হরিকেল হইতেছে পূর্ববঙ্গের [বঙ্গের] প্রাচীন নাম। তিনি হরিকেল পূর্ব ভারতের পূর্ব সীমায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হরিকেলকে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানকার শিললোকনাথ বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার চিত্র আছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুশেও তাঁহার লিখিত Etude sur L' Iconographic Bouddhique de-L' Inde, P. 200. নামক গ্রন্থে একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাঁহার পূর্ববর্তী "সেঙ্গচি" নামক অন্য একজন চীন-দেশীয় পর্যটক যে সমতট দেশে রাজভট্ট নামক একজন নরপতিকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি একথারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিঙ্গের সময়ে এই দুইটি নাম যে এক দেশকে বুঝাইত তাহাও বলা কঠিন।

গৌড় বা পুণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাঙলা দেশ দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তখন– বঙ্গ বলিলে পূর্বকালের সুহ্ম, বঙ্গ ও সমতট এই তিন দেশের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তখন "বর্ধমানপুর" হরিকেলের একটি স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগের উত্তর-বাঙলার নরপতি "গেওড়াধিশ"– "গৌড়েশ্বর" প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন।

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ববাঙলার বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গপতিগণও বিক্রমপুর রাজধানী হইতে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন [বিক্রমপুর নগরীতে] রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের

১. বঙ্গ-সমতটের কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ রাজবংশ– ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ.– 'প্রাচী' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা–১৩৩০, আষাঢ় ৪০-৪২ পৃষ্ঠা।

তাম্রশাসনে, "আধারো **হরিকেল** রাজ-ককুদচ্ছত্র স্মিতানাং শ্রিয়াম্" উক্তিতে **হরিকেল** শব্দ রহিয়াছে। বল্লাল-চরিতে আছে, মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় শ্রেষ্ঠি বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলে, বল্লভানন্দ বলিয়াছিলেন যে- যদি মহারাজা বল্লালসেন হরিকেলীয় প্রদেশ তাঁহার অধিকারে রাখেন, তাহা হইলে তিনি ঋণ দিতে সম্মত আছেন। কাজেই '**হরিকেল**' শব্দ-দ্বারা যে অঙ্গ রাজ্যকে বুঝাইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহেরেই কারণ নাই।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চাং সমতট-রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ:-

"সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্তী; ভূমি নিম্ন ও উর্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০ লি বা ৪ মাইল। প্রচুর-পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার-ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্নসহকারে বিদ্যা উপার্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) উভয় ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই-সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এইস্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত-প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্তি আটা ফিট উচচ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ"- ইউয়ান- চোয়াং এর বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় সে সমস্ত বঙ্গ, উপবঙ্গ বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ সমতট রাজ্যভুক্ত ছিল। আমরা পূর্বে এ বিষয়ে বলিয়াছি।

সমতটের সীমা সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক ও আলোচনা আজ পর্যন্তও সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তবে এ বিষয়ে বিশেষরূপে তর্কের প্রয়োজন নাই। কেন-না বঙ্গ-সমতটে প্রাপ্ত মূর্তি ইত্যাদি হইতেই তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ যুক্তিযুক্ত ভাবে জানিতে পারিতেছি। বঙ্গ-সমতট রাজ্যের বিবিধ স্তূপ ইত্যাদি খনিত হইলে একদিন অশোকস্তম্ভ কিংবা বৃহত্তম বুদ্ধদেবের মূর্তি আবিস্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

সমতট বর্তমান সময়ের বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ লইয়াছিল, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্র-তট-লগ্ন অংশ-বিশেষ

* (১) সাহিত্য, ১৩২৫, পৌষ সংখ্যা, (২) Indian Antiquary, 1919. P. P. 98-101 (৩) বৃহৎ-সংহিতা- ১৪শ অধ্যায়, (৪) Takakusu's Itsing, Oxford, 1896, XI V. I. (৫) Beal's "Life of Hiuen-Tssiang," London 1911, Introduction, P. XI. (৬) ঢাকার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা শ্রীযতন্দ্রীমোহন রায়। (৭) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol I. P. 86. (৮) প্রতিভা ১৩২০ চৈত্র সংখ্যা (৯) J. A. S. B/ 1914. P. P, 86-87 (১০) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন- ৫ম শ্লোক, সাহিত্য ১৩২০ ভাদ্র।

ইহার অন্তর্ভূত ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তবে কতকটা যে ছিল তাহা সুনিশ্চিত।

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন: "সমতট বিস্তীর্ণ রাজ্য। আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুলনার বাহিরে সমতটের অনেক অংশ ছিল। ইউয়ান-চোয়াং-এর বর্ণিত ৩০টি সংঘারাম ও ১০০টি দেবমন্দিরের মধ্যে কয়টি এ প্রদেশে ছিল এবং কয়টি বাহিরে ছিল, তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। একস্থানে সমতটের রাজধানী ছিল বলিয়া আমরা কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি; সে প্রমাণ যে পর্যাপ্ত নহে, তাহা আমরাই সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝি। হয়ত সেখানে একটি সংঘারাম মাত্র ছিল এবং সমতটের রাজধানী প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গে ছিল। যতদিন অকাট্য প্রমাণ বলে এই বিপ্লব- বহুল দেশের পুরাতত্ত্ব মীমাংসিত না হয়, ততদিন শুধু মানসিক স্মরণে পরকে নিজের মতাবলম্বী হইতে বলা যায় না।"[১] সতীশ বাবুর এ উক্তি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতই হইয়াছে। শিববাড়ির বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যে প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের চাক্ষুষ নিদর্শন অতীব বিরল, সেখানে এমন মূর্তির আবির্ভাব বিস্ময়কর," কিন্তু পূর্ববঙ্গ-বিক্রমপুরে চাক্ষু নিদর্শনও যেমন বহু রহিয়াছে। তেমনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও অনেক কিছু নিদর্শন রহিয়াছে।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তির পাদপীঠে খোদিত-লিপি হইতে জানা যায় যে, নৃপতি মহীপাল সমতট প্রদেশের রাজা ছিলেন। পাল বংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। প্রথম মহীপাল দেব ছিলেন পাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম মহীপাল ছিলেন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা– যতীন্দ্র বাবু বলেন– "বাঘাউরা লিপির দ্বিতীয় মহীপাল কে? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট-বঙ্গে বর্মবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাঘাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত বাঘাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমালা এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।" [ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রথম মহীপাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর বঙ্গ কম্বোজ জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ চন্দেল-বংশীয় যশোবর্মার সাহায্যে গুর্জররাজ মহীপাল মগধ পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপাল দেব, পিতার মৃত্যুর পরে রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পূর্ববঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। * * রাখালবাবুর মতে নারায়ণ পালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তির পাদ পীঠস্থ খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির তুলনা

---

১. 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড– ২১২-২১৩ পৃষ্ঠা– সতীশচন্দ্র মিত্র।

করিলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বাণগড় লিপি গরুড়স্তম্ভ লিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষর-তত্ত্ব হইতে কল্পনার ইতিহাসে কাম্বোজ জাতির আক্রমণের কাল স্থির-নির্দেশ করা যায়। যাঁহারা অক্ষর-তত্ত্বের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্ন-বিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড় স্তম্ভ-লিপিতে কম্বোজ জাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। * * * এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দিরনির্মাতা কম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের পূর্ববর্তীর; সুতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজবংশীয় গৌড়রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ, তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক সমতটে একটি নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।" [বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা] বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

সমতট রাজ্য

কাজেই আমরা নিরপেক্ষ ভাবে সমতটের যে ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছি তাহাই প্রকৃত ভাবে যথার্থ বলিয়া মনে হয়। চৈনিক পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে,– সমতটে ৩০টির অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম এবং বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের ২০০০-এর অধিক শ্রমণ ছিল। একথা অপ্রকৃত নহে। তাহা না হইলে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এত মূর্তি আসিল কোথা হইতে? মূর্তি যখন ছিল, তাহাদের উপাসকও ছিল। কেননা যাঁহারা সামান্য ভাবেও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যটা চাক্ষুষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিক্রমপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতির বহু গ্রামেই নানা শ্রেণীর মূর্তি পাওয়া যাইতেছে। কত যে স্তূপ, কত যে বৌদ্ধ দেব-দেবী ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি অযত্নবিন্যস্তভাবে পড়িয়া আছে তাহার সংখ্যা নির্দেশ করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবং "সমতটে 'বৃদ্ধারধি ভগবতী তারা' এইরূপ A. S. B. Mansucript No A. 15. উল্লিখিত আছে।[১] কোন কোন প্রস্তর-মূর্তির পাদপীঠেও সমতট নামের উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীকালের প্রাচীন লিপিতেও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটির অধিক প্রচলন হইলেও সমতট শব্দটিও সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ রূপে আমরা ভাগলপুরে আবিস্কৃত নারায়ণপাল দেবের তাম্রশাসনের "সৎ সমতট জম্মা" শিল্পীর এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণমূর্তির পাদপীঠে খোদিত প্রথম মহীপাল দেবের রাজ্যসম্মত সমন্বিত ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিতে পারি যথা– "সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য" ইত্যাদি কাজেই নানা দিক দিয়াই দেখিতে পাইতেছি যে, সমতট রাজ্য সম্পর্কে– এই সিদ্ধান্তই ঠিক যে, পূর্ববঙ্গই সমতট রাজ্য ছিল। এবং যে যে জেলা উহার অন্তর্ভূত ছিল তাহাও বলা হইয়াছে। এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারেও তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে।

---

১. Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum-Plate II. Page 14.

বঙ্গ ও উপবঙ্গ

বরাহ মিহির– যে দেশগুলিকে 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে দক্ষিণ ও মধ্য বাঙলার দেশসমূহ অর্থাৎ, যশোহর, খুলনা, (সুন্দরবন সহ) চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ দেশ-সমূহের ভাগ বা অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

একটা কথা প্রণিধানযোগ্য এই যে, ইউ-য়ান-চোয়াং তাঁহার বর্ণনায় বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন:– It is very curious that the pilgrim does not mention the country of Vanga. It can be specified as the country lying between the Meghna river on the east, the sea on the south and the old Budi-ganga course of the Ganges on the north. The western boundary of Vanga appears always to have been indefinite. Yuan Chuang must have passed over Vanga in going from Samatata to Tamralepti. The reason of his silence appears to have been the fact that owing to general subsidence of the country towards the end of the 6th century A. D. It had rapidly sank very low in geographical and political importance and did not recover from this set back for some centuries. When the pilgrim passed over this tract by the middle of the 7th century A. D., there was nothing to attract and detain him there."

সমতট সম্পর্কে এবং উহার সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে সকলেই আমাদের সহিত একমত। উহা একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল এবং ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশও উহার অঙ্গীভূত ছিল। সমতট ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ছিল না।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বঙ্গ ও সমতট দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া মনে করেন এবং 'বঙ্গাধিপ' বা বঙ্গপতি বলিলে তাঁহার অধিকার 'সমতট' প্রদেশেও বিস্তৃত ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, 'বঙ্গ' শব্দটি 'সমতট' দেশকে লইয়াও প্রযুক্ত হইত। এই বুঝাইত যে– সমতট প্রদেশ তাঁহার রাজ্য পর্যন্ত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ, সমতট-পূর্ববঙ্গ

খ্রীষ্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের উত্তর ভাগ এবং মধ্যভাগ গুপ্ত বংশীয় রাজাদের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক শাসিত হইত। এবং এক সময়ে গুপ্তদের সামন্ত নৃপতি রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাই গুপ্তদের প্রভাব হ্রাস পাইলে স্বাধীন হইলেন। আদি গুপ্তবংশীয়দের শাখার একমাত্র পুরগুপ্ত মগধের কিয়দংশ এবং অঙ্গরাজ্য লইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ববঙ্গ– বঙ্গ-সমতট রাজ্য ও গুপ্তদের প্রাধান্য সময়ে সামন্ত রাজ্য ছিল।

+ বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি
(১ম) ওঁ সম্বত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭? (১৪?) শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে
(২য়) কীর্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারাখ্য সমতটে বিলকীন্ন
(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য ব সুদত্ত সুত
(৪র্থ) স্যমাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যষশো অভিবৃদ্ধয়ে।

সমতট, [প্রত্যন্ত দেশ] ডবাক (১) কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের নৃপতিরাও গুপ্ত নৃপতিগণের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহারা গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হূনদের আক্রমণে এবং মালব নৃপতি যশোবর্ধনের প্রভাববশতঃ গুপ্তরাজাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল।

কোটালিপাড়া গুপ্তরাজাদের মুদ্রা, মূলচর ও সাভারে প্রাপ্ত

বঙ্গ-সমতট প্রদেশে অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে যে আদি গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সে-কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। [৮২-৯৯ পৃষ্ঠা] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের এবং স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা এবং ময়ূরাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার গ্রামের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। আমি মূলচর গ্রামেও মৃত্তিকার নীচে হইতে একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলাম। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একদিন বৃষ্টির পর আমাদের বাড়ির পথের মাটি সরিয়া যাওয়ায় একটি প্রাচীনা রমণী ঐ মুদ্রাটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ঐ মুদ্রাটি আমি বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে প্রদান করিয়াছি। ঐ সুবর্ণ মুদ্রাটির চিত্র মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত করিয়াছিলাম।[১] এইবারও মুদ্রিত হইল। কাজেই পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ, বঙ্গ ও সমতট রাজ্যে গুপ্তরাজাদের যে প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কোটালিপাড়ার ন্যায় মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত এবং সাভারে প্রাপ্ত গুপ্তরাজাদের স্বর্ণমুদ্রা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ বিশেষ বিক্রমপুর অঞ্চল দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের অধীনে কিছুকাল ছিল।

বাঙলার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মগধের শেষ গুপ্ত-রাজবংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তই কাণ্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মা কর্তৃক নিহত গৌড়-মগধ-নাথ। আবার অনেকে এইরূপ মতও পোষণ করেন যে, এই নৃপতি আর কেহই নহেন, খড়্গবংশীয় নৃপতি বঙ্গ এবং সমতটের অধিপতি রাজরাজভট্ট। এই রাজরাজভট্টের কথাই আমরা চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি।

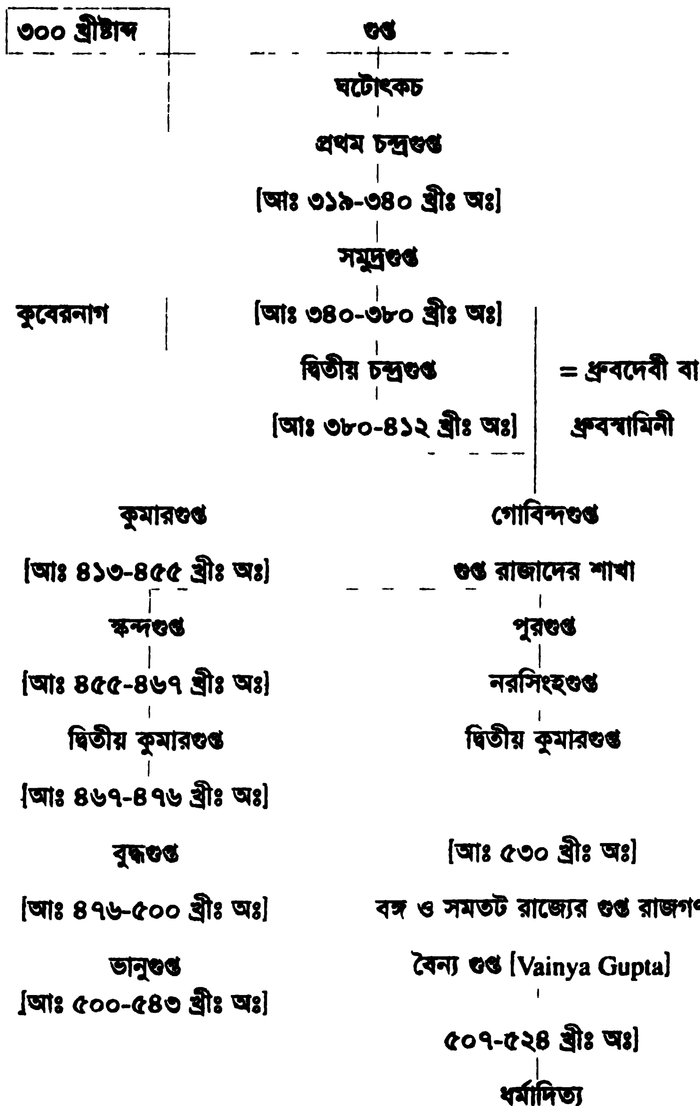
আমাদের এই স্থানে বাধ্য হইয়া নানা কারণে একটু পূর্বানুবৃত্তি করিতে হইতেছে। আমরা– পূর্বে গুপ্তরাজবংশের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের প্রভাব এবং কতদূর পর্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, সে-কথাও বলিয়াছি। গুপ্তরাজবংশ বিধ্বস্ত হইলে-পর বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে আমরা জানিতে না পারিলেও ইহা জানা যায় যে, তাঁহাদের অধঃপতনের পর বঙ্গরাজ্যের অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে স্থানীয় নৃপতিগণ, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১. "The discovery of gold coins of Chandra Gupta II and Skanda Gupta, and also silver coins with the peacock symbol in or near Kotalipara in the Faridpur district is an evidence in point, for supporting the theory that the Eastern Bengal Kingdom rem[illegible] under the para-mount power of the early Guptas," The History of North-Eastern India by Radha Govinda Basak M. A. Ph. D. Chapter IX Page 181.

* বিক্রমপুরের ইতিহাস– প্রথম সংস্করণ, ৬৮ পৃষ্ঠা।

এখানে আমরা গুপ্ত রাজাদের একটি বংশলতা প্রদান করিলাম। আদিগুপ্তরাজ-বংশের যে শাখা বঙ্গ-সমতট রাজ্যে রাজত্ব করেন, এই বংশলতা হইতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে।

আদি গুপ্ত সম্রাটদের ও বঙ্গে গুপ্ত নৃপতিগণের বংশলতা :



[আঃ ৫২৫-৫৫০ খ্রীঃ অঃ]
|
গোপচন্দ্র
|
[আঃ ৫৫০-৫৭৫ খ্রীঃ অঃ]
|
সমাচার দেব
|
[আঃ ৫৭৫-৬০৭]
|
(?) নাথ
|
শ্রীনাথ

ভবনাথ   ভ্রাতা
|
লোকনাথ
[আঃ ৬৬৩-৬৬৪ খ্রীঃ অঃ]

এই বংশলতা হইতে পাঠকগণ পূর্ববঙ্গের [বঙ্গ-সমতট রাজ্যের] গুপ্ত নৃপতিগণের পরিচয় পাইবেন এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে তাঁহাদের প্রভাব বঙ্গ সমতট রাজ্যে বিদ্যমান ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিক্রমপুরে বা বঙ্গ-সমতট রাজ্যে যে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তৃত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। এজন্যই কিংবদন্তী-মূলক বিক্রমাদিত্যের কথা একেবারে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

গুপ্ত রাজাদের প্রভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমাদের কিছু বলার নাই। তাঁহাদের সমসাময়িক কোনও প্রাচীন মূর্তি পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে গুপ্তযুগের কিছু নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সকলই পালরাজাদের সময়ের।[১]

রামপালের রাজত্ব

আমরা রামপালের বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলেন যে, রামপাল বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

---

১. The rise of thd Gupta Dynasty in Northern India in the 4th century A. D. ushered in the golden age of Indian art in every branch of fine arts. * * * The best sculptures of this period have been found at Sarnath, Mathura and Deogarh in the United Provinces, while examples of terra-cotta and minor arts have been found practically in all the excavations in North India. An out- line of Archaeology in India by Rai Bahadur K.N. Dikshit, M.A.F.R.A.S.B. Director General of Archaeology in India [An outline of the Field Sciences in India Page 166.

ভীমকে পরাজিত করিয়া তিনি মিথিলা বা উত্তর বিহার, চম্পারণ এবং দ্বারভাঙ্গা জেলা, এমন কি, কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুমারপাল প্রধানমন্ত্রী বৈদ্যদেবের উপরে কামরূপের শাসনভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বা হিন্দুস্থানের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবনতি ঘটিলেও রামপালের সময়ে মগধ এবং বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

উত্তরবঙ্গে কম্বোজীয়দের অধিকার

দিনাজপুরের মহারাজের উদ্যানে একটি কারুকার্য-খচিত শিলাস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভটি বাণগড় হইতে আনীত হইয়াছিল। উহার গায়ে যে খোদিত-লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, কম্বোবংশীয় অজ্ঞাতনামা জনৈক গৌড়পতি কর্তৃক একটি শিবালয় নির্মিত হইয়াছিল এবং ঐ স্তম্ভটি সেই শিবালয়ের সংলগ্ন ছিল। এই শিবমন্দির বাণগড়ের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা এখনও পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। শিলালিপির অক্ষর দেখিয়া– অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কম্বোজবংশীয় কোনও নৃপতি এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ পালরাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া কম্বোজ বংশের হস্তগত হইয়াছিল। এই কম্বোজবংশীয়েরা কোথা হইতে আসিলেন সে-বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুদিন হইল উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দা (Irda) গ্রামে কম্বোজবংশের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৯৩৪-৩৫ খ্রীঃ অঃ]।[১] এই তাম্রফলকে কম্বোজবংশীয় নৃপতিদের উল্লেখ আছে। এই বংশীয় নৃপতি নয়পাল দেবের একাধিক্রম দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই তাম্রলিপিতে রাজ্যপাল, নারায়ণপাল, নয়পাল প্রভৃতি রাজার নাম রহিয়াছে। অনেকে এই নৃপতিদের সহিত, বাঙলার পালরাজাদের সংস্রব রহিয়াছে মনে করেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কম্বোজ বংশীয়দের সহিত বাঙলার পালরাজাদের কোনও সংস্রব নাই। পালরাজাদের পরে কম্বোজীয় নৃপতিরা উত্তর বাঙলায় আধিপত্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাণগড়ে খনন-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই খননের ফলে আশা করা যায় যে, হয়তো এই কম্বোজবংশ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিব। তবে এই কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায় যে, কম্বোজবংশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজাদের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল এবং উহা কম্বোজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত-বিদ্রোহের দরুন পালরাজাদের যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল তাহাও হ্রাস পায়, তাহারই ফলে সেনরাজগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই প্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় আসরফপুর তাম্রশাসনের ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত শ্রীহর্ষের তাম্রশাসনদ্বয়ের ও সম্রাটের কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের রাজা আদিত্যসেনের সাহাপুর ও অপসড় শিলালিপির অক্ষর-সাদৃশ্য আছে বলিয়া, যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিজ্ঞাপিত

১. Progress of science in India, Page 273.

করিয়াছেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে রাঁজেন্দ্র লাল মিত্রও গঙ্গামোহনের উপর যেরূপ কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।" ডাঃ রাধাগোবিন্দ বাবুর এই উক্তি আমরা সমর্থন করি।

আমাদের মনে হয় মহারাজাধিরাজা শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর যখন বঙ্গদেশে নানারূপ বিপ্লব ও অশান্তির আবির্ভাব হইল এবং প্রত্যেকেই আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইলেন– সেই "মাৎস্যন্যায়ের" যুগেই সম্ভবতঃ আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা দেবখড়্গ ও তদ্বংশীয় বৌদ্ধ রাজগণ, পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খড়্গবংশীয় নৃপতিদের নামের বিশেষণরূপে পরম ভট্টারক পরমেশ্বর প্রভৃতি সার্বভৌমত্ব সূচক কোনও উপাধি দেখা যায় না, এজন্যই রাধাগোবিন্দ বাবুর ভাষায় বলিতে হয় যে– "ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্বল্প-বিস্তর স্থান লইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, These kings were local kings of no very extensive dominion. কাজেই ভট্টশালী মহাশয়ের কল্পিত সিদ্ধান্ত রাজভট্ট ও তাঁহার পিতা ও পিতামহ দেবখড়্গ ও জাতখড়্গ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃপতিগণ সকলেই সমতটের রাজা ছিলেন, ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেন না তাহার মূলে তেমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ও ভট্টশালী মহাশয়ের মতাবলম্বী। তিনিও বলিয়াছিলেন যে– খড়্গবংশীয় দেবখড়ের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন পরিব্রাজক বর্ণিত "সমতটরাজ রাজভট্ট একই ব্যক্তি।"

আসরফপুরের লিপিকলা ও খগড়বংশের কাল-নির্দেশ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না। তাঁহারা বলেন শ্রীহর্ষ, ভাস্করবর্মা, আদিত্য সেন, লোকনাথ প্রভৃতির লিপিসমূহ হইতে দেবখড়্গের লিপিতে মাত্রার ক্রমিক-বিকাশ অধিকতর। এই সমস্ত কারণেই আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া কিছু পরবর্তী কালেরই হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।"– অনেকের মত এই যে– "কান্যকুজাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য ধ্বংসের বহুকাল পরে নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে খড়্গোদ্যম এবং ঐ শতাব্দীর শেষপাদে দেবখড়্গ ও রাজরাজভট্টের আবির্ভাবকাল অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, ইৎসিং কথিত সমতটরাজের সহিত দেবখড়্গের তনয় রাজরাজভট্টের একত্ব প্রতিপাদন নিষ্ফল।"

বৌদ্ধধর্ম ও খগড়রাজ বংশ

খড়্গ রাজবংশীয়েরা যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা তাঁহাদের "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তৎ প্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভব– বিভব-ভেদকারী, যোগিগণের যোগগম্য ধর্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধগুণ-সম্পন্ন সংঘের পরম

ভক্তিমান উপাসক" প্রভৃতি বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। নৃপতি খড়্গোদ্যমের পর 'পরম সৌগতোপাসাক' জাতখড়্গ পরে "অশেষ-ক্ষিতি-পাল-মৌলি-মালা-মণি-দ্যোতিত-পাদ-পীঠ" অরিজিৎ দেবখড়্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং এই নৃপতিই আসরফপুর তাম্রশাসন দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা।

প্রথম তাম্রশাসন খানি দ্বারা দেবখড়্গ দশদ্রোণাধিক নব পাটক ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ে দান করিয়াছেন। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে, ১৩ই বৈশাখ তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্পাটক ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দকস্থিত আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানিও দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

সুবর্ণগ্রামের বুদ্ধমণ্ডপ ও শালিবর্ধক-বিহার : সুবর্ণগ্রাম বর্তমান সোনারগাঁ

পূর্ববঙ্গে [বঙ্গদেশে] বৌদ্ধ প্রভাব যে কিরূপভাবে বিস্তৃত ছিল তাহা এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেবখড়্গের শাসনকালে সুবর্ণগ্রামেব কোনও স্থলে একটি বুদ্ধ-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইহাও জানিতে পারা যায় যে, সংঘমিত্র শালিবর্ধক-নামক বিহারের আচার্য ছিলেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন যে,– "তাম্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম; সুতরাং বুদ্ধ-মণ্ডপটি যে আসরফপুরের অনতি দূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।"– আমরা ইহা প্রমাণ-সহ মনে করি না। আমরা মনে করি 'বুদ্ধ-মণ্ডপ' ও বিহার সুবর্ণগ্রামেরই কোন না কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই সম্বন্ধে আমরা তিব্বতের ইতিহাস পাগ্-সম-জঙ্গ-জংয়ের হইতে জানিতে পারি যে,– বিক্রমপুরের ন্যায় সুবর্ণগ্রাম সে সময়ে পূর্ব ভারতে বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ- কেন্দ্র ছিল। ঐ গ্রন্থের বহুস্থানে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ের উল্লেখ আছে যথাঃ– Svanargaon (Sonargaon) a city in Bengala where a Brahman named Kacijita established a religious institution in which every ten house-holders supplied food to a Bhikhu.[১]

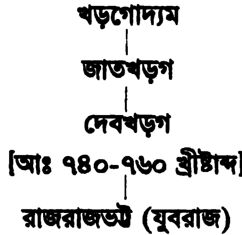
বাঙলা দেশে সোনারগাঁ সহর। সেখানকার কাশীজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ রীতি প্রবর্তিত ছিল যে, দশজন গৃহস্থ একজন ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিবেন।' ইহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সুবর্ণগ্রাম বৌদ্ধগণের কেন্দ্রস্থান ছিল। যতীন্দ্রবাবু শালিবর্ধক-বিহারকে শাবর্দিয়া মৌজা বা গ্রাম বলিতে চাহেন। এ-বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ঐ বিহারটি যে একটি শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল এবং তাহার ভার আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল, কাজেই বিহারটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, খনন-কার্য ব্যতীত এ বিষয়ে কোনরূপ

১. Pag sam-Jan-zang-Index cxx vii.

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

পালরাজাদের পতনের সমকালে পূর্ববঙ্গে এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজ্যের শেষভাগে এই রাজ্য খড়গোদ্যম কর্তৃক স্থাপিত হয়। খড়গেদ্যামের পর তাঁহার পুত্র জাতখড়গ পৌত্র দেবখড়গ পূর্ববঙ্গে অধিকার লাভ করেন। আমরা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিষয় জানিতে পারি। ইঁহারা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গের খড়্গরাজ বংশঃ



খড়্গরাজাদের লাঞ্ছন

খড়গরাজাদের দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানির মধ্যস্থলে একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে "শ্রীমদ্দেবখড়্গ" এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। অর্হৎগণের ধ্বজা ও বাহন মধ্যে বৃষ অন্যতম; ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৃষ খড়্গ-নৃপতিদের লাঞ্ছন ছিল। তাঁহারা [খড়্গরাজগণ] সম্ভবতঃ বৃষভলাঞ্ছিত ধ্বজা ব্যবহার করিতেন।

খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তার

খড়্গরাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল এবং তাঁহাদের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গের বিস্মৃত জনপদ' A Forgotten Kingdom of East Bengal' নামক প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করেন যে– "খড়্গরাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন, এবং কুমিল্লার অনতিদূরবর্তী বড়কামৃতা বা কর্মান্তনগর খড়্গরাজাদের রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মূলে কুমিল্লার নর্তেশ্বর মূর্তির পাদ-পীঠ লিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ– যথা:–

[পাঠ] ১। ওঁ। (?) হচন্দ্র দেব পাদীয়-বিজয় রাজ্যে অষ্টা...ষ্ণ চতুর্দশ্যা (१) তিথৌ বৃহস্পতিবারেষু (পু) ষ্যা- নক্ষত্রে কর্মান্ত পালশ্রী

[পাঠ] ২। কুসুম-দেব-সুত-শ্রীভাবুদে [ব] কারিত-শ্রীনর্তেশ্বর ভট্টা...[চন্দ্র শর্মা?] আষাঢ় দিনে ১৪ ॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্বাক্ষরঃ [বং] খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি ॥

আসরফপুর শাসন-দ্বয়ে এবং কুমিল্লার শিলালিপিতে 'কর্মান্ত' শব্দটির উল্লেখ দেখিয়া ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় খড়্গবংশীয় রাজাদের কাল নির্ণয় এবং তাঁহাদের রাজধানী কর্মান্তনগর বা বর্তমান বড়কামৃতা নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমতটের রাজধানী : সমতট রাজ্য

আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রথম শাসনের শেষ পংক্তিতে লিখিত আছে,– "লিখিতং জয়-কর্মান্ত বাসকে পরম-সৌগতোপাসক-সুরদাসেন 'এবং দ্বিতীয় শাসনের ধর্মানুশংসিনী শ্লোকাবলীর পর লিখিত আছে,– জয়-কর্মান্ত বাসকাৎ লিখিতং পরমসৌগত সূর দাসেনিতি।" "জয়-কর্মান্ত বাসকে" [এবং তথা হইতে] লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল মাত্র। লেখক সৌগত সুরদাস। কোন রাজধানী বা নগর হইতে রাজা "সমাজ্ঞাপয়তি"– আদেশ করিতেছেন,– লিপিদ্বয়ে আদৌ তাহার উল্লেখ নাই। স্বর্গত গঙ্গামোহন বাবু ভ্রান্তভাবে মনে করিয়াছিলেন যে, "Both the charters were issued (?) in the same year [Sambat 13] from the place Jaya-Karmanata-Vsaka"– অর্থাৎ, "রাজ্যের ত্রয়োদশ বর্ষে, রাজা "জয় কর্মান্ত-বসাক" (স্থান) হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন।" ইহা হইতেই ভট্টশালী মহাশয়ও মনে করিয়া লইয়াছেন যে, খড়গবংশীয়গণ "কর্মান্ত নামক নগর" হইতে সমতটের রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কুমিল্লার অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ে, হঠাৎ নটেশ শিবমূর্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে সেই "কর্মান্ত" নগরটিও তাহার "রাজার" নাম পাইবামাত্রই তিনি "কর্মান্তের খড়গবংশীয়" রাজগণের সহিত কুমিল্লার খোদিত লিপিতে উল্লিখিত 'কর্মান্ত-রাজগণের' সম্বন্ধ স্থাপন কার্যে ব্রতী হইয়া থাকিবেন। এ-বিষয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে "কর্মান্ত" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া এবং অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে– "যেহেতু বড়-কামতার নিকট প্রাপ্ত এই প্রাচীন নর্তেশ্বর মূর্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে একটি "কর্মান্ত" শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, অতএব বড়-কামতাই কর্মান্ত-নগর। এদিকে আবার কুমিল্লার অপর পারে আসরফপুরে প্রাপ্ত খড়গ-বংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়গের সময়ে তাম্রশাসন লিপিতেও যখন "কর্মান্ত বাসকের" উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সেই কর্মান্তও বড়-কামতাই হইবে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কামতা বা কুমিল্লার অংশ বিশেষই সে কালের সমতটের রাজধানী ছিল। এবং লোকে এই স্থান বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নাম রাখিয়াছিলেন,– "পূর্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ।" সুধিগণই এইরূপ বিচার-পদ্ধতির বিচার করিবেন। যদি বা কালে ইউয়ান্- চোয়াঙ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি ইহা "কর্মান্ত" নামক নগর বলিয়া গণ্য হইবে না।"[১]

সমতটের রাজধানী কোথায়

এখন কথা হইতেছে যে, সমতটের রাজধানী কোথায় ছিল? এবং খড়গদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল? খড়গদের সম্বন্ধে স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় বলিয়াছেন : "These kings were local kings of no very extensive dominion." অর্থাৎ, খড়গ-নৃপতিগণ স্থানীয় নৃপতি ছিলেন, তাহাদের রাজ্য তেমন বিস্মৃত ছিল না, তাঁহারা সমগ্র সমতটের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার এই উক্তি প্রমাণ সহ নহে। খড়গ-নৃপতিগণের ভূমিদান বিষয়ে এই তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহারা 'বিভিন্ন

১. Me[illegible]s of the Asiatic Society of Bengal, Vol I. PD-85P.9.

রাজ-কর্মচারীবৃন্দ জানাইয়া কিংবা রাজাদেশও প্রচারিত হয় নাই, কেবলমাত্র 'বিষয়পতি' এবং 'কুটুম্ব' গণকেই দানের বিষয় বলা হইয়াছে। এইজন্যই গঙ্গামোহন বাবু প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, খড়গ রাজগণের রাজ্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল। তাম্রশাসনদ্বয়ের প্রাপ্তিস্থান এবং তাম্রশাসনোক্ত উল্লিখিত স্থানসমূহের পরিচয় হইতে এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ) এবং ভাওয়ালের কতকাংশ লইয়াই খড়গ-রাজগণের রাজ্য বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর। ইৎসিংয়ের সমতটের বর্ণনা হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, সমতটের যিনি নৃপতি ছিলেন, তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতি খড়গবংশোদ্ভব রাজরাজভট্ট যে নহেন, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। খড়গবংশীয় নৃপতিদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা আজ পর্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ইহা বিশেষভাবে জানা গিয়াছে যে, তাঁহারা পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবিক্রমপুরের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সংস্রব ছিল কিনা তাহাও জানা যায় না।

ডাঃ ভট্টশালী "কর্মান্তকে" একটি নগরের নাম স্থির করিয়া 'কুসুমদেবকে' তথাকার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন এবং তিনি আসরফপুরের উৎকীর্ণ লিপিদ্বয়ের "জয়-কর্মান্ত বাসক" ও কামতা শিলালিপির 'কর্মন্তকে' অভিন্ন স্থান বিবেচনা করিয়া, ইৎসিং কথিত সমতট রাজ্যের নৃপতি রাজরাজভট্ট এবং তাঁহার রাজধানী কর্মান্তনগরকে যে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কুমিল্লা যে কমলাঙ্ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিছুতেই ইহা হইতে পারে না, কেননা 'শ্রীক্ষেত্র' বা শ্রীক্ষত্র-দেশ ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া বিস্তৃত, ইহাই পণ্ডিতগণ চীন পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণী হইতে নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব সমতটের রাজধানীর সন্ধান করিতে হইলে অন্য দিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।[১]

বিক্রমপুরের সমতট নগরী

আমি 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণেও বলিয়াছি এবং এইবারও বলিতেছি যে, সমতট নামে একটি স্বতন্ত্র নগরী ছিল, তাহাই ছিল সমতট প্রদেশের রাজধানী। [১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] সেই সমতট নগরী কোথায় ছিল?– রেনেলের দশম সংখ্যক মানচিত্রে সমকূট [somkoot] নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংস-চিহ্ন সহ উহা কীর্তিনাশার বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান হয় যে, এই 'সমকূটই' ছিল সমতটের রাজধানী সমতট নগরী। উহাই কালক্রমে 'সমকূট' নামে পরিণত হইয়াছিল। এই সমতটের রাজধানী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

১. ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রে সমতটের রাজধানী শীর্ষক প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিবিধ যুক্তিও প্রমাণ সহকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে খড়্গরাজগণ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, বড়-কামতা কর্মান্ত নগর নহে। আমাদের এ-বিষয়ে অধিক আলোচনা নিস্প্রয়োজন, তবে প্রয়োজন বোধে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রাধাগোবিন্দ বাবুর প্রবন্ধ ও রায় মহাশয়ের ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ফার্গুসনের মতে সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রাম, ওয়াটার্সের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে [সমকূট বলা যাইতে পারে] কার্নিংহামের মতে যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে আমরা বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ-বলে এবং তাম্রশাসনাদি হইতে এবং খোদিত লিপি হইতেও সমতটের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। নারায়ণপাল দেবের 'ভাগলপুর লিপির' [৫০-৫৪ পংক্তি] সৎ সমতট জন্মা শুভদাস পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস নামক শিল্পী-কর্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার বাঘৌরা বা বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির পাদ-পীঠে সমুৎকীর্ণ মহীপাল দেবের রাজ্যসংবৎ সমন্বিত লিপিতেও সমতটের উল্লেখ আছে, "সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য" ইত্যাদি। কিছুদিন হইল দ্বিতীয় গোপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীমদ্বিমল দাসেন মদ্যদাসস্য সূনুনা। ইদং শাসনমুৎকীর্ণং **সৎমতটজন্মনা** লিখিত আছে। অর্থাৎ সৎসমতট জন্ম মদ্যদাসের পুত্র শ্রীমান্ বিমল দাস কর্তৃক এই শাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'মদ্যদাস'কে কেহ কেহ 'মজ্খদাস'ও পড়িয়া থাকেন।[১]

বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজগণ

বিক্রমপুরের চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশ

আমরা যখন "বিক্রমপুরের ইতিহাস" [প্রথম সংস্করণ] প্রকাশ করি, তখন দুইটি নূতন রাজবংশের পরিচয় জানিতে পারি নাই। এই দুইটি নূতন রাজবংশ হইতেছে– চন্দ্রবংশ ও বর্মবংশ। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড় রাজমালা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। স্বর্গত বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২২ বঙ্গাব্দে বাহির হইয়াছিল। কাজেই রমাপ্রসাদ বাবু, রাখাল বাবু এবং যতীন্দ্রবাবু ও স্বর্গত 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলিয়তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে' চন্দ্র-রাজ বংশ ও বর্ম রাজবংশের উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। এ প্রসঙ্গে রাখালবাবু বলেন,– খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড়-বঙ্গ-মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে দুইটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে তিন খানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়া এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজবংশদ্বয়ের কথা জনসমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশদ্বয় বর্মবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে।"

ইদিলপুর ও রামপাললিপি

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা চন্দ্র রাজগণ প্রসঙ্গে লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন– "কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন

১. দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন [জাজিলপাড়া লিপি] শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্মণ এম্-এ. ভারতবর্ষ ২৫ শ বর্ষ-১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৪।

করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সমর-বিজয় যাত্রার সুযোগেই সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রী হরিকেল বা পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া পাল রাজগণের সংস্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালগণের রাজমুদ্রা। সুতরাং, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।" এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা কবিব।

পূর্বে জনসাধারণ, সেনরাজবংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ছিল তাহাই জানিত। কিন্তু শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন তিনখানি আবিষ্কারের পর বিক্রমপুর অঞ্চলে যে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের আজ পর্যন্ত তিনখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। এক খানি তাম্রশাসন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর নিবাসী কোনও জমিদারের গৃহে আছে। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 'ঢাকা রিভিউ' [১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] পত্রিকায় মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম জীবনে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে ঢাকা বিভাগের কমিশনার হন। র‍্যাঙ্কিন সাহেব ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বিলাত হইতে বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার সাক্ষ্য দিতে আসিয়া কলিকাতা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। র‍্যাঙ্কিন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় এবং লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেও জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানির ছাপ মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত করিতে পারেন নাই। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই তাম্রশাসনখানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের একটি উচ্চশিক্ষিত সম্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসনখানি (১) **'ইদিলপুর লিপি'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপর লিপিখানি (২) **রামপাল লিপি** [Rampal Copperplate of SriChandra] নামে পরিচিত। এই লিপিখানির উদ্ধারকর্তা এবং ইহার পাঠোদ্ধার-কার্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। (৩) **কেদারপুর লিপি**, এই লিপিখানি **দক্ষিণ বিক্রমপুরের** কেদারপুর গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল। এই তিনখানি লিপির বিষয়েই আমরা আলোচনা করিব।

বিক্রমপুরের ইতিহাসের দিক দিয়া চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের তাম্রশাসনের মূল্য খুব বেশী। আমরা প্রথমে রামপালে প্রাপ্ত লিপিখানার বিষয় বলিতেছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের ভাষায় তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির ইতিহাস বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন : 'বঙ্গের বর্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে] পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া বিগত ২৯শে এপ্রিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে [১৬ই বৈশাখ ১৩২০] তারিখে, কতিপয় বন্ধুসহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত [বর্তমানে স্বর্গত] যোগীন্দ্রচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়িতে বহু বৎসর যাবৎ একখণ্ড তাম্রশাসন যত্ন-সহকারে রক্ষিত হইতেছে,– এ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।" এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়িতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫/৭৬ বৎসর পূর্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা খনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগবন্ধু বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগবন্ধু প্রায় ৪৫/৪৬ বৎসর নিজগৃহে উহা সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।"

লিপি-পরিচয়

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভারও বসাক মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। কালপ্রভাবে যদিও তাম্রফলকখানির কোনও অনিষ্ট হয় নাই, তথাপি প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে যদুনাথ বণিক্য উহার অক্ষর-পাঠে সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাম্রফলকখানির উপরে তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ [নাইট্রিক এ্যাসিড] প্রয়োগ পূর্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানির আয়তন ৯$\frac{১}{২}$ × ৮ ইঞ্চি। ইহার শীর্ষ দেশে [মধ্যস্থলে] একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে "শ্রী-শ্রীচন্দ্র দেবঃ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক "ধর্ম-চক্র-মুদ্রা"। ধর্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগমূর্তি। রাজার-নামের নিম্ন ভাগে [মধ্যস্থলে] অর্ধচন্দ্র চিহ্ন;– তাহার উভয় পার্শ্বে ও নিম্ন ভাগে ফুলপাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্র মূর্তির লাঞ্ছন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্রশাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম-চক্র-মুদ্রা" সংযুক্ত আছে। এই তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষায় রচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই তাম্রফলকটি ৫০টি পংক্তিতে পূর্ণ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজকবি নিজ প্রভুর বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্বশেষে ধর্মানুশংসী শ্লোক পঞ্চক। তাম্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে শাস্ত্রীর প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,– রাজা ["স্ব-হস্ত-কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্রশাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন;– কিন্তু এই তাম্রশাসনে সন-তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোনও প্রধান কর্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের-শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে অক্ষরে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতার কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। [৪র্থ ২১, ৩১ পংক্তি] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম, ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন রামপাল নামক স্থানে আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার বলেন– The characters are a type of Northern Nagari which is allied to the alphabet found in the copper-plates of the Later Palas and was current in North-eastern India towards the close of the tenth and begining of the eleventh century A. D. The language is Sanskrit.

বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম-চক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া চন্দ্রবংশীয় পরম সৌগত, মহারাজাধিরাজ শ্রীমত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবপাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [১৫-১৬ পংক্তি মুক্করগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত-শর্মাকে ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া] মাতাপিতার ও নিজের জন্য পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [২৬-৩১ পংক্তি] সমস্ত রাজা-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্র সূর্য ও ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্বক পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তঃপাতী নান্যম-মণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের প্রশস্তি-পাঠ মুদ্রিত করিলাম। এই পাঠ ডাঃ বসাক মহাশয়ের কৃত। ডাঃ বসাক মহাশয় ১৩২০ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে এবং পরে Epigraphia Indica Vol. XII, PP. 836-42– চিত্র-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের পর ঐতিহাসিকগণ নানারূপ বিতর্ক এবং আলোচনা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, আমরা এই লিপি হইতে যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতেছি, তাহা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র-শাসন

প্রশস্তি-পাঠ

(সম্মুখের পৃষ্ঠা)

১। ওঁ স্বস্তি

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈ-[ক]-পাত্রং

ধর্ম্মোপ্য সৌ

২। বিজয়তে জগদেক– দীপঃ।

যৎ সেবয়া-সকল এব মহানুভাবঃ

সং

৩। সার-পার মুপ গচ্ছতি। ভিক্ষু- সঙ্ঘঃ ॥ [১ ॥]
চন্দ্রাণামিহ রোহিতা- [গি] র শ্বি (?) ভুজামবংশে

৪। বিশাল-শ্রিয়া
ম্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ্ন চন্দ্র-সদৃশঃ শ্রীপুর্ণ্ন চন্দ্রোহভবৎ
অর্চ্চা

৫। নাস্পদ- পীঠিকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত-
ষ্টঙ্কোৎকীর্ণ্ন- নবপ্রশস্তিষু জয়-স্তম্ভেষু তাম্রেষুচ ॥ [২ ॥]

৬। বুদ্ধস্য যঃ শ-
শক-জাতক-শঙ্ক সংস্থং
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতা করাঙ্ক শুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধ [ঃ]
পুত্রঃ

৭। শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণ্ন চন্দ্রঃ ॥ [৩ ॥]
[দর্শে] স্য মাতা কিল দোহদেন
দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র- বিম্বং।

৮। সুবর্ণ্ন-চন্দ্রেণ হি তোষিতেতি
সুবর্ণ্ন চন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [৪ ॥]
পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-

৯। ভীতাশয়ে-
স্ত্রৈলোক্য বিদিতো দিশামতিথিভি স্ত্রৈলোক্যচন্দ্র গুণৈঃ

১০। রা-জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি র্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ [৫ ॥]
জ্যোৎস্নের চন্দ্রস্য

১১। শচীব জিষ্ণো
গৌগ্ রী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি রাশী
চন্দ্রী (শ্রী) কাঞ্চনেত্যঙ্কিত-

শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপট্টে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাবে বা অন্য কারণে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহা [ ] প্রকার বন্ধনী মধ্যে প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর ( ) এইরূপ বন্ধনী মধ্যে সংশোধিত হইয়াছে। ১। বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'একপাত্রং' পদের 'ক' অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় নাই।

১২।　　　　শাসনস্য ॥ [৬ ॥]

স রাজা- যোগেন শুভে মুহূর্ত্তে

মৌহূর্ত্তিকেঃ সূচিত রাজ-চিহ্নং।

অবাপ তস্যাং তনয়ং

১৩। নয়জ্ঞঃ

শ্রীচন্দ্রমিন্দ (ন্দু) পমমিন্দ্র- তেজাঃ ॥ [৭ ॥]

একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো

বিধায় বৈধেয় জনাবিধে-

১৪।　　　　য়ঃ।

চকার কারাসু নিবেশিতারি-

যশঃ-সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥ [৮ ॥]

স খলু শ্রী বিক্রমপু-

১৫। র-সমাবাসিত- শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো

মহারাজাধিরাজ-শ্রীমত্রৈলোক্য চন্দ্র দে

১৬। ব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ

শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব কুশঃ-

১৭। লী ॥ শ্রী পৌণ্ড্র-ভুক্ত্য-ন্তঃপাতি-নান্যমণ্ডলে।

নেহকাষ্টি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ ॥ সমুপগতাশে-

১৮। য- রাজপুরুষ-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য

-মহাব্যূহপতি-মণ্ডলপতি মহাসান্ধি-

১৯। বিগ্রহিক। মহাসেনাপতি। মহাক্ষপটলিক।

মহাসর্ব্বাধিকৃত। মহাপ্রতীহার। কোট্টপাল। দৌঃ

২০। সাধ-সাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবল হস্ত্যশ্ব-গো

মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক। গৌল্মিক শৌ-

২। শার্দ্দুল বিক্রীড়িত। এই শ্লোকে প্রথম পাদে "রোহিতা" অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই এবং তাহার পরবর্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয় তাহা "শ্বি" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভুজাং' অক্ষরদ্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।' "রোহিতাবনি ভুজাং" অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ কর্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩। বসন্ত তিলক। এই শ্লোকে তৃতীয় পাদে "বৌদ্ধ" শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে।

৪। উপজাতি। এই শ্লোকের "দর্শে" অক্ষরদ্বয় একটু অস্পষ্ট।

৫। শার্দ্দুল বিক্রীড়িত।

৬। ইন্দ্র বজ্রা। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে "শ্রী" শব্দ দুইবার উৎকীর্ণ হওয়াতে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে।

২১। ষ্কিক-দাণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যদি (ত্যাদি)

১

নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো [প] জীবনোহধ্যক্ষ প্র-

২

২২। চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্। চাটভ [ট] জাতীয়ান

ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মান–

২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশত্তি চ। মতমস্তু ভবতাং।

যথোপরি-লিখিত ভূমিরিয়ং। স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি)

২৪। ন্না। তৃণ-পুতি- গোচর- পর্য্যন্ত। সতলা।

সোদ্দেশা। সাম্র-পনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা স–

২৫। জল-স্থলা। সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা। সচৌরোদ্ধরণা

পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া অচাট-ভট-প্র–

২৬। বেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্ত-রাজভোগ–

৩

কর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা। শখল্য-(শাণ্ডিল্য) স্য (স) গো–

২৭। ত্রায় এ [র্ষি] প্রবরায়। মক্করগুপ্তস্য প্রপৌত্রায়

বরাহগুপ্ত- পৌত্রায়

সুমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রা–

২৮। য়। শান্তি-বারিক– শ্রীপীতবাসগুপ্তশর্ম্মণে।

বিধবদুদক-পূর্ব কং কৃত্বা

৪

কোটিহোমি (?) দগ (ঙ্গ)

[পশ্চাতের পৃষ্ঠা]

৫

২৯। তবতে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টা [র] কমুদ্দিশ্য

মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

১. এই স্থানের (প) অক্ষরটি তাম্র-পট্টে ক্ষোদিত দেখা যায় না।
২. এই স্থানের 'ট' অক্ষরটিও উৎকীর্ণ নাই।
৩. 'শখলা' কোনও ঋষির নাম বলিয়া বোধ হয় না, এই নিমিত্ত "শাণ্ডিল্য" পাঠ শুদ্ধ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।
৪. এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জন্য "কোটি-হোমিঙ্গতবতে" পাঠ ধৃত হইল। তাম্রপট্টে "হোমেদগ" পরিদৃষ্ট হয়। 'হোমি'র ইকারের উপরের টানটি এবং 'ঙ' শূন্য চিহ্নটি বিলুপ্ত বলা যাইতে পারে।
৫. এই স্থলেব 'র' অক্ষর তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হয় নাই।

৩০। পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে। আচন্দ্রার্ক [৩] ক্ষিতিসমকালং

৭

যাবৎ ভূমি [চ্ছি] –

৮

৩১। দ্র-ন্যায়ের। শ্রীমদ্ধর্ম্ম [চ] ক্র-মুদ্রয়া

তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈঃ

৩২। রনুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভুমের্দ্দান-ফল

৯

গৌরবাদপহরণে মহা-নরক-পা–

৩৩। ত– ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্ [প্র]

তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্ঞাশ্রবণ-বিধে

১০

৩৪। য়ী-ভূ [য়] যথোচিত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি ॥

ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥

ভূমিং যঃ

৩৫। প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [।]

উভৌ-তৌ-পুণ্য-কর্ম্মাণৌ-নিয়তং স্বর্গ গামিনৌ ॥

ষষ্টিশ্বর্ষ-সহস্রা–

৩৬। নি স্বগ্‌র্গে মোদতি ভুমিদঃ।

১১

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ [ত্]

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হ–

৩৭। রেত রসুন্ধরম।

১২

স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ [সহ পচ্যতে] ॥

১৩

বহুভি র্ব [সু] ধা দত্তা রাজভিঃ সগ–

রাদিভিঃ [।]

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥

---

৬. এই শব্দটি তাম্রপট্টেং– চিহ্ন-বিহীন।
৭. এই শব্দের চ্ছি' অক্ষরটি তাম্রফলকে ক্ষোদিত নাই।
৮. 'চক্রের' 'চ' অনুৎকীর্ণ।
৯. এই স্থলের 'প্র' অক্ষরটি ক্ষোদিত নাই।
১০. এই স্থলের 'য়' টি উৎকীর্ণ হয় নাই।

১৪
ইতি কমল-দা (দ) [লা] ম্বু-বিন্দু-লোলাং
৩৯। শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
ন হি পুরুষৈঃপর–
১৫
৪০। কীর্ত্তয়ো বি [লো] প্যাঃ ॥*

বঙ্গানুবাদ

১। করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান্ (১) **জিন** [বুদ্ধদেব] এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তাঁহার ধর্ম (উভয়েই) বিজয়-লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষু-সংঘই তাঁহাদের [বুদ্ধ ও ধর্মের] সেবা করিয়া সংসার [সাগর] পারে উপস্থিত হন।

২। **বিপুল লক্ষ্মীক, রোহিত.......ভোগকারী,** চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ **পূর্ণচন্দ্র**-নামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদপীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ (২) নব-প্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও তাম্রপট্টে তাঁহার নাম পঠিত হইত।

৩। যে ভগবান্ অমৃত-রশ্মি [চন্দ্রমা] ভক্তিবশতঃ [বুদ্ধস্য] বুদ্ধরূপী শশক-শিশুকে (৩) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,– সেই [চন্দ্রমার] কুল-জাত বলিয়াই যেন তাঁহার [পূর্ণচন্দ্রের] পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে (৪) "বৌদ্ধ" বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।

৪। (৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবস্যা-রজনীতে তাঁহার [সুবর্ণ চন্দ্রের] মাতা [গর্ভাবস্থায়] (৭) স্পৃহাবশতঃ উদয়ি চন্দ্র বিম্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে [স্বামী কর্তৃক] সুবর্ণ নির্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিতা হইয়াছিলেন,– এই নিমিত্ত লোকে [তাঁহার পুত্রকে] সুবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত।

৫। [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণ-চন্দ্রের] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজ-চিহ্নসূচক পুত্র যে রাজ্যলক্ষ্মীর হাস্যরূপে,উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে (১০) 'নৃপতি' হইয়াছিলেন।

১১. 'নরকে' হওয়া উচিত ছিল।
১২ এই শব্দদ্বয় অস্পষ্ট।
১৩. 'বসুধা' শব্দের 'সু' ক্ষোদিত নাই।
১৪. 'দলাম্বুর 'লা' অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না।
১৫. 'বিলোপ্যা' শব্দের 'লো' ক্ষোদিত হয় না।
১৬. এই স্থলের* এই চিহ্নটি টীকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৬। চন্দ্রের কান্তা জ্যোৎস্না, (১১) ইন্দ্রের কান্তা শচী, হরের কান্তা গৌরী এবং হরির কান্তা স্ত্রীর ন্যায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী কাঞ্চন-কান্তি কান্তা ছিলেন।

৭। ইন্দ্রতেজা ঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ত্রৈলোক্যচন্দ্র] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত শুভ-মুহূর্তে প্রিয়ার [শ্রীকাঞ্চনার] গর্ভে (১৩) জ্যোতিষিক-সূচীত-রাজ-চিহ্নধারী ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। মূর্খ-জনের অবাধ্য (১৪) এই [শ্রীচন্দ্র] রাজ্যকে একতাপত্র সুশোভিতা করিয়া এবং অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিঙমণ্ডল যশঃ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কাবার হইতে– মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব পাদানুধ্যাত, পরমসৌগত (বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, কুশলময়; সেই শ্রীমান শীচন্দ্রদেব– শ্রী পৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী–নান্য-মণ্ডলে, নেহকাষ্টি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে, সমুপগত– (সংবিদিত) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষদিগকে রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাতা, (১৭) মহাব্যূহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষপটলিক (লেখ্যরক্ষক), (১৯) মহা-সর্বাধিকৃত মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), (২০) কোট্টপাল (দুর্গ-রক্ষক), দৌঃসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক) চৌরোদ্ধরণিক (দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশ কর্মচারীবিশেষ), নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ), হস্তি ব্যাপৃতক (গজাধ্যক্ষ), অশ্ব-ব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ) মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধক্ষ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ) 'গৌল্মিক' ('গুল্ম' নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক), (২১) শৌল্কিক (শুল্ক-সংগ্রহকারী), দাণ্ডপাশিক (বধাধিকৃতক পুরুষ), দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি [রাজকর্মচারীদিগকে] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষতালিকাভুক্ত) কিন্তু বর্তমান-শাসনে [পৃথক্ ভাবে] অনুল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে, চাট-ভট-জাতীয়গণকে ক্ষেত্রকরদিগকে এবং ব্রাহ্মণোত্তম দিগকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন। [নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে] আপনাদের সকলের অভিমত হউক। যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপূতিগোচর পর্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ আম্র-পনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ সমেত, (২২) লবণোৎপাদক ভূমিসহ, জল-স্থল-গর্ত-ঊষর ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সচৌরোদ্ধরণা, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত চাট-ভট-জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না (অর্থাৎ নিষ্কর করিয়া) রাজপ্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি [সর্বপ্রকার] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি মক্করগুপ্তের প্রপৌত্র বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, শাণ্ডিল্য (?) সগোত্র, ত্র্যর্ষিপ্রবর, (২৩) শান্তি-বারিক, (২৪) কোটি-হোম-সম্পাদনকারী (?) শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্মাকে যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্বক ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারকে উদ্দেশ করিয়া, পিতা-মাতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির

জন্য, যাবৎ-সূর্য-চন্দ্র, এবং ক্ষিতিসমকাল-পর্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্-ধর্মচক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া প্রদান করিলাম। অতএব, আপনারা সকলেই ইহার অনুমোদন করুন। ভাবি ভূপতিগণও ভূমিদান-ফল-গৌরব ও তদপহরণে মহানরক-পাত ভয় [স্মরণ করিয়া] এই দান অনুমোদন-পূর্বক পরিপালন করিবেন, এবং প্রতিবাসী ক্ষেত্রকরগণও এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রত্যায় [প্রতিগ্রহীতার নিকট] নিকট উপস্থিত করিবে। এই অভিপ্রায়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছে [যথা]–

১। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমি-দান করেন, তাঁহারা উভয়েই পূণ্যকর্মা এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন।

২। ভূমিদাতা ষষ্ঠি-সহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করেন, এবং ভূমির অপহর্তাও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকে বাস করেন।

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।

৪। সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন [ভূমিদানের] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে।

৫। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য-জীবনকে পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে করিয়া, এবং [উপরি] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্তির লোপসাধন কর্তব্য নয়। (২৬) ॥

(১) জিন :– "সব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।

সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ ॥ ইত্যমরঃ।

এই শ্লোকে রাজকবি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ্যাখ্য ত্রি-রত্নের উল্লেখ করিয়া নিজ প্রভুকে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া সূচিত্ব করিয়াছেন।

(২) অর্চ্চা–প্রতিমা। "টঙ্কঃ পাষাণ-দারণঃ ইত্যমরঃ। "টঙ্কৈমনঃ শিলগুহের বিদার্য্যমাণা" ইতি মৃচ্ছকটিকে ১/২০ "পীঠমাসনম্" ইতি চামরঃ। সন্তানি-শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বোধ হয়।

(৩) বুদ্ধদেব শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাণিক কাহিনী। বৌদ্ধ-জাতকমালায় বর্ণিত আছে। যব-দ্বীপের বোর-বুদুরের স্থাপত্য-শিল্পে বুদ্ধদেবের "শশক-জাতক" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "Monumental Java" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৪) সুবর্ণচন্দ্রকুলজাত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [উপর্য্যুক্ত টীকাতে উল্লিখিতরূপ] সম্বন্ধ আছে– এই নিমিত্তই লোকে সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিত।

(৫) কিল– ঐতিহ্যে।

(৬) দর্শ– "অমাবাস্যাত্বমাবস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুমসঙ্গম" ইত্যমরঃ। একত্র-স্থিতচন্দ্রার্ক-দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।

(৭) দোহদ– "অথ দোহদং ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা– স্পৃহেহা-তৃড্‌বাঞ্ছা-লিপ্সা-মনোরথঃ,

কামোহৃমিভলাষস্তর্ষশ্চ ইত্যমরঃ। গর্ভাবস্থায় স্পৃহার্থেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ। যথা, "প্রজাবতী দোহদ-শংসিনীতে"– রঘু, ১৪।৪৫। কিঞ্চ,– "যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোহস্যাঃ সোহবশ্যমচিরাসম্পাদয়িতব্য ইতি"– উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক।

(৮) "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইত্যমরঃ। যথা, [রঘু, ১৪।৮৪] "কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা, মনস্তঃ। নিন্দা-অর্থেপ্রয়োগ– [রঘু, ১৪।৩৬] "কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্।"

(৯) হরিকেল– বঙ্গের প্রাচীন নাম। "বঙ্গাস্ত হরিকেলীয় অঙ্গাশ্চম্পোলক্ষিতাঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেলরাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়ায় আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়া থাকিতে পারেন।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ– মধ্যযুগে এই প্রদেশ বর্তমান বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়াই সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যে এই চন্দ্রদ্বীপই 'বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ' পরগনা নামে অভিহিত হইত। বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ ভাগ, ১৪৫ পৃঃ) ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,– "বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

(১১) জিষ্ণু– এই স্থলে ইন্দ্র-সমানার্থক। যথা, 'জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ ইতি ইন্দ্র-পর্য্যায়ে অমরঃ। পুরুষোত্তম, সূর্য ও অর্জুন অর্থেও 'জিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১২) রাজযোগ– গ্রহনক্ষত্রাদির যে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে ভূমিষ্ট শিশুকালে 'রাজা হইবে বলিয়া সূচিত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ' বলে। 'শ্রীচন্দ্র' বঙ্গের 'রাজা' হইবেন ইহাই শ্লোকে ইঙ্গিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি এইভাবে ব্যাখ্যাত"– "a configuration of planets, asterisms etc. at the birth of a man. Which indicates that he is destined to be a king.

(১৩) মৌহূর্ত্তিক– "সাংবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞ-গণকাবপি।
স্যামৌহূর্ত্তিক- মৌহূর্ত-জ্ঞানি-কার্ত্তান্তিকা অপি ॥" ইত্যমরঃ।

(১৪) বৈধেয়– "অজ্ঞ-মূঢ়-যথাজাত মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ" ইত্যমরঃ। শ্রীচন্দ্র সর্বদাই পণ্ডিত-মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাঁহাদেরই 'বিধেয়' ছিলেন।

(১৫) এ স্থলে কোন্ 'অরি' সূচীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। হয়ত বর্ম-বংশের শেষ রাজাই শ্রীচন্দ্র কর্তৃক কারা-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবেন; এবং বৌদ্ধ

শ্রীচন্দ্র এই ঘটনার পরেই বঙ্গের রাজসিংহাসন বর্ম-রাজের হস্ত-ভ্রষ্ট করিয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য-শাসন-পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন।

(১৬) 'মহাব্যূহপতি'– শব্দটি বেলাব লিপিতে ও হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে।

(১৭) মণ্ডলপাত–শব্দটি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহামাণ্ডলিক' শব্দ পারিবারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিশ্বে' মণ্ডল-শব্দের বিবিধার্থ বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সেকালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা দ্বাদশ রাজক নামক কথিত হইত যথা,–

সান্মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ।

দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ ॥

ভরত অমর টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশ রাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসনকর্তা 'মণ্ডলেশ, "মণ্ডলাধিপতি" "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন; অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে দেখিতে পাওয়া যায়, মণ্ডলাধিপেরও কাষদণ্ড অমাত্য মন্ত্রি দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা,– সাহিত্য, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।

দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাবিপঃ ॥

ইহাই মণ্ডলাধিপতি "দুর্গস্থ" থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়, **"মণ্ডলেশ্বরের"** পদমর্যাদা **নৃপ-শব্দবাচক** সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা–

চতুর্যোজন পর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।

যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর ॥

এই বচনের প্রমাণে মণ্ডলেশ্বরও "রাজ" পদবাচ্য ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ "রাজ" পদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। "মণ্ডলাধিপতিগণ" পরমেশ্বর পরম ভট্টারক রাজাধি রাজের "সামন্ত" মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সেকালের শাসন-ব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টারক" ছিলেন; তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

মাণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে "মাণ্ডলিক" ও"মহামাণ্ডলিক" শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, "রামচরিত" কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীয় মঙ্গলাধিপতি" প্রভৃতি রাজপুরুষগণ [টীকায়] "সামন্ত" বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়– তৎকালে "মণ্ডলাধিপতিগণ বা "মাঙ্গলিকগণ"

রাজাধিরাজ "সামন্ত" মধ্যেই পরিগণিত হইতেন।

(১৮) "মহাসর্বাধিকৃত"– শব্দটিও হরিবর্মার ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 'সর্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধহয় এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে।

(১৯) 'কোট্টপাল' শব্দটি পৃথীপালগণের তাম্রশাসনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

(২০) শৌল্কিক' শব্দটি আধুনিক 'Custom officer'-এর পদ-বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

'সলবণা'–ভূমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উৎসৃষ্ট ভূমিখণ্ড সমুদ্র তীরবর্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা? আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

(২১) 'শান্তি-বারিক'– যজ্ঞের শান্তি– জলাধিকৃত ব্রাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া থাকিবে।

(২২) 'হোমি'– এই শব্দটি ঘৃত, জল, বর্তি ও চিত্রক-বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে ইহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়া 'কোটি-হোম'কে 'কোটি-হোমি' সমানার্থক ধরা যাইতে পারে।

(২৩) 'ক্রিমি'-'কৃমি' রূপেও গঠিত হয়।

(২৪) এই কেন্দ্র-চিহ্নটি কি সূচিত করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। লিপি-শেষ-বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে; ইহার দ্বারা বৌদ্ধ দিগের শূন্য-বাদও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা তাম্রশাসন সম্পাদন-বিজ্ঞাপক শ্রীচন্দ্রের সাঙ্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর-লিপি

আমরা রামপাল লিপির বিষয় বলিয়াছি, এইবার শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কেদারপুরের তাম্রশাসনখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যত্নে ও শ্রমে পাঠোদ্ধার হইয়াছে এবং জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই তাম্রফলকের পাঠোদ্ধারকারী এবং আবিষ্কারক ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় বলেন:– এই তাম্রশাসনখানি শ্রীচন্দ্রদেবের তৃতীয় তাম্রশাসন। উহা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে মৃত্তিকা-খনন-কালে পাওয়া গিয়াছে। কেদারপুর মধ-ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত হয়। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট ইহা অবগত হই। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এন. রায়, আই-সি-এস ও মাদারীপুরের মহকুমার হাকিম মিঃ এন. সেন মহোদয়দ্বয়ের সৌজন্যে মাননীয় মিঃ টি. ইমারসন, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় কর্তৃক ঢাকা যাদুঘরের জন্য উহা সংগৃহীত হয়।

কেদারপুর লিপির পরিচয়

এই তাম্রশাসনখানি ৮½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৭¼ ইঞ্চি প্রস্থ, রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি ৯½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চি প্রস্থ, সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই তাম্রফলকের শীর্ষদেশের ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্র রাজগণের রাজকীয় মোহর অঙ্কিত আছে। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি শায়িত উন্নত-শীর্ষ মৃগ "ধর্মচক্র" সূচনা করিতেছে এবং উহা ডিয়ার-পার্কের (মৃগদাব) কাশীর অন্তর্গত বর্তমান সারনাথের "ধর্ম-চক্রের প্রথম ঘূর্ণনের" নিদর্শন স্বরূপ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রদেবের পূর্ববর্তী বঙ্গের "পালবংশের" রাজগণেরও অনুরূপ মোহর ছিল এবং এই পালরাজগণও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই চক্রের নিম্নদেশে 'চন্দ্রদেবের' নাম গ্রথিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধ হয় ইহার দ্বারা কোনও "দান" সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রা-গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানি মুদ্রাকরের গুরুতর ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কেদারপুর গ্রাম, যেখানে এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানে প্রশস্ত পরিখাবেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও বিনষ্টপ্রায় এক বিশাল দীর্ঘিকার চিহ্ন বর্তমান। দীর্ঘিকাটি মোগল শাসনের প্রাক্কালে যে পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিকগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়ের স্মৃতির সহিত বিজড়িত।

এই তাম্রফলকের কেবল একদিক মুদ্রিত এবং নিম্নদেশে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য। ইহাতে ১৮ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই অক্ষরগুলি ৩৪ হইতে ৪০ ইঞ্চি উচ্চ, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষর-খোদাইকার বা লেখকের ভ্রম প্রচুর-পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্দরুন পরিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার কার্যও বিষম কষ্টকর ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই অনুশাসনে চন্দ্ররাজ বংশোদ্ভব– শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের উল্লেখ আছে। উত্তর বঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বর্ম ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে ইঁহারা পূর্ববঙ্গে কতিপয়-শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা দশম-একাদশ শতাব্দীর বাঙলা অক্ষরে খোদিত। কেবল মুদ্রাকবের ভ্রমাত্মক অংশ ব্যতীত সমুদয় উৎকীর্ণ বিবরণটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ও পদ্যে লিখিত। শেষ তিন পংক্তি গদ্যে লিখিত।

বর্ণাশুদ্ধি-বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব ভারতীয় গৃহগাত্রোৎকীর্ণ লিপিতে "র"-এর পরিবর্তে "ব" লেখাই একরূপ রীতি ছিল এবং আধুনিক বাঙলা ভাষার ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারে তখন কোনও বৈষম্য– করা হইত না। "অবগ্রহ" কখনও ব্যবহৃত কখন বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুস্বার সম্বলিত "নিস্ত্রিংশ" শব্দের বর্ণবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য। (রেফ্) অধিকাংশ স্থলেই ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়াছে।

"ঢাকা রিভিউ"তে প্রকাশিত ইদিলপুরের শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের সহিত বর্তমান তাম্রশাসনের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় তাম্রফলক একই

মুসাবিদার প্রতিলিপি। ইদিলপুর তাম্রশাসনের শেষভাগে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন হইতে গৃহীত একটি শ্লোক অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উহার প্রতিলিপি ইদিলপুর ও কেদারপুর তাম্রশাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এস্থলে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনখানি তাম্রশাসনেরই আবাহন-শ্লোক অভেদাত্মক।

এ পর্যন্ত চন্দ্ররাজগণের যে তিনখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকখানিই শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত, কাজেই মনে হয় তিনিই চন্দ্র বংশের একমাত্র প্রতাপশালী রাজা; যিনি তাম্রশাসন প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলনের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলিপি উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা একত্র সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু গঙ্গামোহন লস্করের ইদিলপুর, অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাম্রশাসনখানি এখনও বর্তমান আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু উহা যাহাদের হেপাজতে আছে, তাহারা উহা অন্য কাহাকেও দেখাইতে অনিচ্ছুক।

"অনুশাসনে তিন জন রাজার নাম খোদিত আছে– (১) **সুবর্ণচন্দ্র**। (২) তাঁহার ছেলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র (শ্রী) **চন্দ্রদেব**। এই রাজাদের মধ্যে শেষোক্ত রাজা সতত **পদ্মাবতী ভুক্তির** অধীন কুমার তালিকা মণ্ডলে অবস্থিত লেলিয়া গ্রামে কতকগুলি জমি দানের আদেশ **বিক্রমপুর** ছাউনি হইতে প্রদান করেন। সতত পদ্মাবতীর আক্ষরিক অর্থ তীর সমাহিত পদ্মার ঘর এবং খুব সম্ভবতঃ পদ্মার তীরে অবস্থিত কোন ভুক্তির নাম ছিল। কোন কোন দানে গৃহীতার নাম এখনও পড়া যায় এবং আসরফ্পুর অনুশাসেনর ন্যায় পরিমাপ কাঠিকে দানের ভূমির দ্রোণ এবং পাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার্ব-ভৌমিকত্ব সূচক উপাধি, যথা– পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ (শ্রী) চন্দ্রদেবের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরম সৌগত (সৌগত বুদ্ধের পরম ভক্ত পূজক) উপাধি দাতার নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১২শ শতাব্দীর বাঙলা অক্ষরের অনুরূপ লিলি সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনের উর্ধ্বভাগের মোহর বঙ্গদেশের পালরাজাদের অনুশাসনের মোহরের অনুকৃতি।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বৌদ্ধ রাজত্ব যে পুর্ববঙ্গে বর্তমান ছিল, আসরফ্পুরের দেবখড়্গ অনুশাসনের ন্যায় বর্তমান আলোচনার বিষয়ভূত অনুশাসনখানি তাহার পরিচয় দেয়, তজ্জন্য এই অনুশাসনখানি অতি প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনখানি এক দিকে সম্পূর্ণভাবে খোদিত, বিপরীত দিকে কতকাংশ খোদিত। বিপরীত দিকের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। লুপ্তপ্রায় অংশে দান-গৃহীতার নাম ও জমির পরিচয়। সর্বসাকুল্যে ৩৬ লাইন লেখা ইহাতে আছে।

পংক্তি ১-৪– সম্ভবতঃ বুদ্ধের সম্মানের জন্য এক পংক্তি পদ্য।

পংক্তি ৪-৫– সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজা যাঁহাকে অগ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত কিংবা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় নাই, যিনি প্রকৃতি কর্তৃক মহত্ব দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন, যাঁহার কার্যসকল সাধু ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পংক্তি ৫-৬– রাজাকে কেন সুবর্ণচন্দ্র বলা হইত, ইহা পদ্যে বলা হইয়াছে।

পংক্তি ৬-৯– উপরিলিখিত রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পবিত্র দর্শন ছিলেন– তাঁহার পরলোকের ভয় ছিল। তিনি জীব-জগতের সান্ত্বনা-স্বরূপ ছিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার যশস্বী কার্যাবলী সকল সর্বত্র বিদিত ছিল।

পংক্তি ৯-১০– সেই রাজা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি শব্দ-তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আশা পূরণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার শত্রুদের অগ্নি নির্বাপণ করিয়াছিলেন।

পংক্তি ১১-১৩– ত্রৈলোক্য দেব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসাসূচক (শব্দ) বাক্য।

পংক্তি ১৪-১৫– উপরিউল্লিখিত রাজার (শ্রী) চন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার বীর্য ইন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং তিনি শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-সময়ে শুভ-চিহ্নসকল রাজৈশ্বর্য দ্যোতক ছিল।

পংক্তি ১৫-১৮– (শ্রী) চন্দ্রদেব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশংসা-বাক্য।

পংক্তি ১৮-১৯– বিক্রমপুরস্থিত বিজয়-বাহিনী ছাউনী হইবে।

পংক্তি ২০– সৌগতের (বুদ্ধের) ঐকান্তিক পূজক পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের পাদপদ্ম ধ্যানকারী পুত্র।

পংক্তি ২১– মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেবের সুস্থ শরীরে লেলিয়া গ্রামে সমবেত নিম্নলিখিত রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দকে ও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান করিয়া–

পংক্তি ২২– সতত পদ্মাভুক্তিতে অবস্থিত কুমার তালিকা মণ্ডলে।

পংক্তি ২২– এইরূপে উপরিউল্লিখিত কর্মচারীবৃন্দকে আদেশ দিতেছেন।

পংক্তি ২৯-৩০– দান গৃহীতাদের নাম লেখা আছে।

বর্তমান কেদারপুর অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :– বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ অভিবাদন প্রণাম (নমস্কার) করিয়া অনুশাসনখানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন লোক ছিলেন– তাঁহার বহু সৈন্য-সামন্ত ছিল। তিনি রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন না, কিন্তু কোন উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল) পবিত্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র ধার্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্যের দেশ-জয় বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তাঁহার শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক ছিলেন। ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্র–তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বিজয়ী ছিলেন–তাঁহার যুদ্ধ-খ্যাতি স্বর্গে পৌছিয়াছিল। এই শেষ রাজা শ্রীচন্দ্রদেব– যাঁহার শ্রীবিক্রমপুরের বিজয় ছাউনি হইতে এই অনুশাসনখানি প্রদান করিবার কথা ছিল– এই পর্যন্ত আসিয়া অনুশাসন-লিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির বিষয়ে ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় তাম্রলিপির চিত্র ব্যতীত একটি প্রবন্ধও Epigraphia Indica. Vol XVIII P.P. 188-92তে প্রকাশ করেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এম. এ. মহাশয় তৎসম্পাদিত Inscriptions of Bengal. Vol III-এর ১০-১৩ পৃষ্ঠায়ও এই লিপিখানির

প্রতিলিপি ও পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য- "এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধহয় ইহার দ্বারা কোনও 'দান' সম্পাদিত হয় নাই- ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানু- যায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রাগৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল।" এ সম্বন্ধে বলেন:-

"Mr. Bhattasali thinks that it is no grant at all, but only a plate kept ready, with the stereo-typed portion of the grant inscribed in the office of issue to be filled in with the necessary remaining portions as occasion arose (Loc. cit. p. 188)- How far this view is tenable it is not possible to say. But other explanations such as the collapse of the power of the Chandras under Srichandra or the death of the donee, just when the plate was being engraved, may not be altogether unworthy of Consideration."

তাম্রশাসনখানির পাঠ সম্পর্কেও ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠের সহিত অন্য পাঠের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টশালী মহাশয় প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন- সিদ্ধিরস্তুস্বস্তি, মজুমদার মহাশয় পাঠ করিয়াছেন- ওঁ স্বস্তি। মূল লিপি দৃষ্টে মজুমদার মহাশয়ের পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। আমরা নিম্নে শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের যে-পাঠ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠ এবং ননীবাবুর পাঠ মিলাইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর তাম্র-শাসন

প্রশস্তি-পাঠ

১। ওঁ স্বস্তি। বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং।

২। ধর্ম্মোচ্যসৈ বিজয়তে জগদেকদীপঃ যৎসেবয়া।

৩। সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসঙ্ঘঃ ॥ পূর্ণ

৪। চন্দ্র ইতি শ্রীমানাসীন্নাসীরজং,রজঃ। যস্যো ষষমাত পত্র মপত্র

য়োষৎ বৃ-

৫। পাঃ ॥ নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরুঢ়ঃ কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিমণা।

তথাপি ক-

৬। ল্যাণ সুবর্নকল্পঃ সুবর্ণচন্দ্রস্মকৃতী ততোভূত ॥ পুণ্যাবলোকঃ

পরলো-

৭। কভীরোর্লোক্যঃ সমাশ্বাসিত জীবলোকঃ ত্রৈলোক্যসংকীর্ত্তিত পুণ্যকীর্ত্তে

৮। লোক্যচন্দ্রোহস্য [র] ভুব পুত্রঃ। চতুঃপয়োরাশিসমাপ্ত পৃথ্বীজয়া

ভিলাষী বি-

৯। বরেষবলুব্ধঃ যুদ্ধেষু নিস্ত্রিংশলতাজলেন যো বৈরিবহ্নি সময়াঞ্চকার।

১০। শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেবঃ সমজনি তনয়স্তস্য মদ্বর্ত্মব (র) ন্ধ্যোঃ ক্রুরারম্বে (দ) য়ালুঃ

১১। পরগুণমুখরো দোষবাদৈকমূকঃ প্রেক্ষ্যঃ পীনো গুণানাং নিধিরিতি

১২। বিষয়াসক্তি পক্ষ-দ্বিপক্ষে যস্মিমা (ন্না) ধও বেধা (ঃ) শ্রিয়মতিরভসা দথ তো না-

১৩। মতশ্চ। স্পৃষ্টঃ পার্থিব পাংসুদোহরসশ্লঘাঘনগ্ গজৈ র্নেত্রাণা মণিমে-

১৪। যতঃ পরিহৃতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ কেশেমবম্পরসাম-পূর্ব্বপলিতভ্রান্তিং

১৫। সমারোপয়ন্ সন্তানো রজসাং রণেসুষু জয়িনো যস্য দ্যুমমাগর্গৎ গতঃ।

১৬। স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমসৌগতো

১৭। মহারাজধিরাজঃ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ প-

১৮। রমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশলী।

অনুবাদ

১। সিদ্ধি লাভ হউক। মঙ্গল হউক;

করুণার একমাত্র পাত্র, ভগবান জিন বন্দ্যনীয়। জগতে একমাত্র আলোক-ধর্মেরই জয় হয়। ইহাদের উপাসনা করিয়া উদারচেতা ভিক্ষু-সঙ্ঘ পারপারে চলিয়া যান।

২। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার যুদ্ধ-বাহিনী উত্থিত ধূলিকণায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পূর্ণচন্দ্রকে সূর্যদেবের পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩। (সুবর্ণ ও রাজার ন্যায়) অগ্নিদ্বারা শুদ্ধিকৃত অথবা তুলাদণ্ডে তৌলিত না হইয়াও প্রকৃতি-দত্ত মহত্ত্ব থাকায় তাঁহা হইতে সুবর্ণ-দীপ্তি-বিশিষ্ট সুবর্ণচন্দ্রের উদ্ভব হইল।

৪। পরলোক-পাপভীত, ত্রিভুবনবিদিত যশস্বী সুবর্ণচন্দ্রের পুণ্যদর্শন, সুশ্রী ও মানব জাতির সান্ত্বনাদায়ক ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল।

৫। বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও চতুঃসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী জয়াভিলাষী হইয়া তিনি জলদ্বারা অগ্নিনির্বাপণের ন্যায় যুদ্ধে তরবারীদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন।

৬। সাধুজনের বন্ধু এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীচন্দ্রদেব নামে মহা সৌভাগ্যশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের প্রতি এমন কি ক্রুরকর্মাদের প্রতিও দয়ালু, পরগুণ কীর্তনকারী, পরের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন সুগঠিত দেহ সর্বগুণের আধার ছিল। জাগতিক সর্ববিষয়ে অনাসক্ত

ইঁহাকে সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ নামেও কার্যতঃ "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীযুক্ত করিয়াছিলেন।

৭। সমরজয়ী সেই নৃপতি যে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়াছেন, দিঙ্নাগগণ সেই ধূলিপটলের সংস্পর্শ লাভ-জনিত গর্ব অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেবতাগণ দূর হইতেই সেই পাংশুজাল পরিহার করিয়াছিলেন,- কেন-না, তাঁহাদের লোচন নিমেষ শূন্য (সুতরাং তাঁহারা লোচন নিমীলিত করিতে অসমর্থ)। সেই রজোরাশি আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া অপ্সরোগণের কেশে সংলগ্ন হইয়াছিল। এবং বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহাদের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, এই অপূর্ব ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬-১৮ পংক্তি:- পরম সৌগত (সৌগত- সুগতের উপাসক, বৌদ্ধ) মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক (প্রজাগণের রক্ষাকর্তা), শ্রীমান্, কুশলী চন্দ্রদেব শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার সমৃদ্ধিশালী (শ্রীমৎ) **রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে**- [Now from the illustrious 'camp of victory' situated in *Vikrampura*, the devout worshipper of Sugata (i.e.Buddha) the *Paramesvara, Paramabhattarak*, Maharajadhiraja the illustrious *Srichandradeva*, meditating on the feet of the *Maharajadhiraja* Trailokyachandra deva being in good health]

আমরা বিক্রমপুরেরএই স্বাধীন বৌদ্ধ নৃপতিগণের যে বংশাবলী তাঁহাদের লিপি হইতে জানিতে পারিতেছি তাহা এইরূপ:-

রামপাল-লিপি	**ইদিলপুর-লিপি**	**কেদারপুর-লিপি**
পূর্ণচন্দ্র	সুবর্ণচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র
|	|	|
সুবর্ণচন্দ্র	ত্রৈলোক্যচন্দ্র	ত্রৈলোক্যচন্দ্র
|	|	|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র	শ্রীচন্দ্রদেব	শ্রীচন্দ্র
|		
শ্রীচন্দ্রদেব		

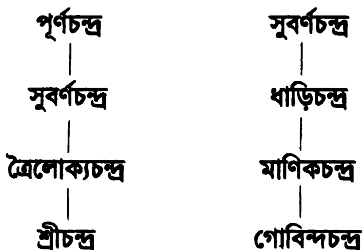
আমরা ইদিলপুর, রামপাল এবং কেদারপুর-লিপি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারিতেছি যে, বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তিনি বঙ্গপতি ছিলেন। **বিক্রমপুরে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত চন্দ্রবংশীয়েরা রাজত্ব** করিতেন। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধনরপতি ছিলেন।

বিক্রমপুর রাজধানী ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কি ভাবে কেমন করিয়া কোন্ অবস্থায়, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রই বা কোন্ সময়ে

কিরূপ ঘটনা-চক্রের আবর্তে পড়িয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোনরূপ কারণ নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তখন বাঙলার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি।

স্বর্গত ঐতিহাসিক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় রামপালের তাম্রশাসন হইতে এবং ময়নামতীর ও গোপীচাঁদের গানের পুঁথি হইতে চন্দ্রবংশের নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন:–



নগেন্দ্র বাবু এই বংশলতা হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রকে এক বংশোদ্ভব মনে করেন। তাঁহার মতে:– "যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত ময়মনামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বা তিলকচাঁদের কন্যা বলিয়াই পরিচিতা হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র মাণিকচন্দ্রের পিতা না হইয়া শ্বশুর হইয়া পড়েন।" [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২৬১] গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছেঃ

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

"বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই চন্দ্র রাজ-বংশীয়দের বিষয়ে লিখিয়াছেন: "বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাস্-নগরের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের [ত্রিপুরা] রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাঁহার রাজধানী ছিল পটিজায়,– আধুনিক পাটিকারতে। এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরম সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্র মেলের শিলালিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ময়মনামতীর বা গোপীচাঁদের গানের উল্লিখিত রাজগণের সহিত বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয়গণের ঐক্যতা সম্পাদনের অনুরাগী। তবে সেন মহাশয় এ বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে ভালরূপ সমাধান হয় নাই। ১ গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়। ২। গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের কাল। ৩। গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রচোলের সময়ের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না?" আমরা এ বিষয়ে একমত নহি। রাখালবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে:- "বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে চন্দ্রবংশের সহিত ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোন সম্পর্কই এখন পর্যন্তও স্বীকার করা যাইতে পারে না।" আমরাও এই মতের পরিপোষক।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন সম্পর্কে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন:- "শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ- এই "ত্রিরত্নের"- উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোনও সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্র বংশে জন্ম বলিয়া, এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,- এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।"

পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই, তিনি একজন বীর মাত্র ছিলেন। ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণ-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি 'হরিকেল' রাজলক্ষ্মীর আধার রূপে চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"- হেমচন্দ্রেরই এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্রদ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই পরবর্তীকালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজ-যোগ-মুহূর্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে মাত্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নৃপতি-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,- তিনি কোনও প্রবল-পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিগণ তাঁহার জন্ম-সময়ে সূচিত করিয়াছিলেন, অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র

সতত বিবুধ মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্মযশে দিক্‌মণ্ডল সৌরভ-যুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরস্থিত রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,– সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিবেন কেন? **বিক্রমপুরই শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত।** শ্রীচন্দ্রের পর তাঁহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কিনা, তাহা বর্তমান অবস্থায় [অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

শ্রীচন্দ্রদেবের রাজ্যকাল নির্ণয় : বিক্রমপুরে বৌদ্ধমূর্তি

এখন জিজ্ঞাস্য– কোন্ সময়ে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্য-স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন,– এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রেই-বা এই অভিনব চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ নরপতির [বা নরপতিগণের] রাজ্য পতন সংঘটিত হইয়াছিল? এই প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপি-কাল–বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের 'ত' 'ন' ও 'ম' বর্ম বংশীয় ভোজবর্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির 'ত' 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'খ' কিছু বেশী আধুনিক। 'র' বিজয়সেন দেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাব-লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে অবগ্রহ চিহ্ন– আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির-কাল যেন বর্ম রাজগণের লিপি-কালের অব্যবহিত পরে এবং সেনরাজগণের লিপি-কালের পূর্বে নির্দেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বে এবং বর্মরাজ হরিবর্মদেবের পুত্রের রাজ্য নাশের পরেই কোন সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মধ্যযুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। বেলাবলিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরে বর্মরাজগনের অভ্যুত্থানের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছি যে, ভোজ বর্মদেব এবং তৎপরবর্তী বর্মরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনুত্যাগের পর তৎপুত্র[১] কুমারপাল দেব বরেন্দ্র ভূমিতে (রামাবতীর নগর হইতে) রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কুমারপালদেবের সময় হইতেই পারল সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি

১. গৌড় রাজমালা ৫২-৫৩ পৃঃ।

বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত হইলেই হয়ত পাল-রাজ সর্ব-গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত-রূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ-সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্মরাজগণের দুর্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজ কবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে 'হরিকেল' (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভব-দেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্মা-তদাত্মজ [অজ্ঞাতনামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন[১] তিনি সামন্ত রূপে চন্দ্রদ্বীপকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপে বোধহয়, পাল-রাজাগণের ও বর্মরাজগণের দুর্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্র ও বর্ম বংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন অথবা, বর্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মুলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম-শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল সাম্রজ্যের দুরবস্থা ও দুর্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে সেই বিজয় সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেন দেবের একত্রিংশদ্বর্ষীয়-লিপি বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং কুমারপালদেবের দক্ষিণ-বাহু-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্যদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র, বর্ম রাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বর্ম রাজ্যের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সমর্থিত হইবে কিনা, তাহা বলা যাইতে পারে না।"

আমরা ডাক্তার বসাক মহাশয়ের এই মত সমর্থন করি না। আমাদের মতে শ্রীচন্দ্ররাজগণের পরে বিক্রমপুরে বর্মরাজবংশীয়দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বর্মরাজগণের বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি। একথা সত্য যে, শ্রীচন্দ্রদেবের যে তিন খানি তাম্রফলক আবিস্কৃত হইয়াছে, উহাতে সন-তারিখ না

---

১. গৌড় রাজমালা ৫২-৫৩ পৃঃ।

থাকিলেও তাম্রফলকের অক্ষর দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা প্রায় সকলেই উহার লিপিকাল দশম কি একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

আমরা নানাদিক দিয়া এবং বিক্রমপুরের অসাধারণ বৌদ্ধ প্রভাব এবং অসংখ্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি দেখিয়া ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাকের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়াই মনে করি। অতি অল্প দিন হইল বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রামের একটি খাল খনন করিতে যাইয়া অবসর-প্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন মহাশয় একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ মূর্তিটির পাদ-পীঠে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে- "দানপতি শ্রীনিরুপমস্য" কাজেই বৌদ্ধ নৃপতি শ্রীচন্দ্রদেবের সমকালে বিক্রমপুরে বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বিহার বা মন্দিরে বোধ হয় তাহার প্রতিষ্ঠাও করিতেন।

শ্রীচন্দ্রের অধিকৃত বঙ্গরাজ্য

এখানে একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা এই যে, শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে যে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই বঙ্গরাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল। তাহা জানিবার জন্য সকলের মনেই একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সে কালের বঙ্গরাজ্য কিরূপ বিস্তৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মতবাদও আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গ কোন দেশ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরীও চন্দ্র রাজগণের সময়ে বঙ্গরাজ্য কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ডাক্তার রায়- চৌধুরীর "বঙ্গ কোন্ দেশ" নামক সুলিখিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পুনরাবৃত্তি বিবেচিত হইলেও একটি অমীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বোধেই উহা উল্লেখ করিলাম। ইহার দ্বারা পাঠকগণ সহজেই সে কালের বিক্রমপুর বা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বঙ্গ নামে কোন্ জনপদ বিশেষ ভাবে সূচিত হইত তাহা বুঝা কর্তব্য। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে লিখিত আছে-

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রান্তগঃ শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

অর্থাৎ, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই বঙ্গ বলিয়া কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন,- "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণঃ"

অর্থাৎ, বঙ্গদেশবাসীরা (লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরবাসী। বর্তমান কালেও ব্রহ্মপুত্র যমুনার পূর্বকূলে অবস্থিত মৈমন্সিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি

অঞ্চলের অধিবাসীগণই বিশেষ ভাবে "বাঙ্গাল" বলিয়া অভিহিত হন। যশোধর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমেও যে বঙ্গদেশ বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মধ্যম পাণ্ডব গিরিব্রজ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকী– কচ্ছ জয় করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন– "বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ।" পরে তাম্রলিপ্ত কর্বট, সুহ্ম, এবং সাগরতীরবর্তী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিয়া লৌহিত্য তীরে উপনীত হন। তিনি লৌহিত্য অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ডে গিয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং, মহাভারত রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।"

"মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধর-কৃত জয়মঙ্গলা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে, "বঙ্গ" দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক, অপরটি সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব হইতে কপিশা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত। সঙ্কীর্ণ বঙ্গ– মগধ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত কর্বট, সুহ্ম এমন-কি সাগরানুপ হইতেও পৃথক বলিয়া মহাভারতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে এবং যশোধরের টীকার বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ' প্রভৃতি বাক্যে মনে হয় বিক্রমপুরও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব কূলস্থিতভূখণ্ডই এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ। উত্তরকালে বঙ্গ যে সাগরানুপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, "শক্তি সঙ্গম-তন্ত্রই" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির কর্তৃক রচিত বৃহৎ-সংহিতায় কূর্মবিভাগ নামক চর্তুদশ অধ্যায়েও সমুদ্রকূলবর্তী "সমতট" ভূমি বঙ্গ হইতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।"

"রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয়-লিপি ও চেদিপতি কর্ণদেবের গোহেরবা-লিপিতে "বঙ্গাল" নামক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অভিনব নামটি কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। প্রাচীন সাহিত্য, শিলালেখ বা তাম্রপট্টে "বঙ্গ" নামেরই ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি দেখা যায়। অদ্যাবধি আবিস্কৃত প্রমাণ-দৃষ্টে মনে হয় যে, দক্ষিণাপথ ও তুরস্ক দেশাগত ভূপতিগণই মধ্যযুগে "বাঙ্গাল" বা বাঙ্গালা এই অভিনব নামের প্রয়োগ আরম্ভ করেন। (১) আইন-ই-আকবরি প্রণেতা আবুলফজল লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদ্ অঞ্চলের রাজণ্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ উর্ধ্ব ও বিংশ গজ আয়ত এক-একটি আল অর্থাৎ, মৃত্তিকা-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ + আল্ এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে।"

"আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলচুর্য্য-বংশোদ্ভব বিজ্জলের অবলুর-লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল পৃথক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। (১) অভিধান-চিন্তামণি-প্রণেতা জৈন হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন) "বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়া"। বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে "বঙ্গাল" দেশ নহে, পরন্তু একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, ডাকার্ণব গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) অতএব, আবুলফজলের গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশেরই ভিন্ন নাম বলিয়া লিখিত

১. শব্দকল্পদ্রুমে "বঙ্গ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

২. Kamasutra, Published by the Proprietor of the Chowkhamba Sanskrit Book Depot P 295.

৩. Keith-Sanskrit literature P 459.

4. Ind Ant 1891, 375, J A S B 1908, 290.

হইলেও পূর্বে যে ঐ দুই নামে দুইটি পৃথক দেশ সূচিত হইত, তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বঙ্গ বা হরিকেল হইতে স্বতন্ত্র "বঙ্গাল" বলিতে কোন্ রাজ্য বুঝাইত এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না– বঙ্গাল যে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়া হইতে বিভিন্ন এবং চন্দ্রোপাধি বিশিষ্ট গোবিন্দ নামক নরপতির অধীন ছিল, তিরুমলয়-লিপিই– তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন যে,– সুলতান সুজার রাজত্বকালে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড "বঙ্গাল ভূম" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু Blaev, Sansson, Purchas প্রমুখ লেখকগণের মানচিত্র ও গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে অবস্থিত সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডে Bengala নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্লকম্যান এই নগরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, (৩) কারণ ইবনবতুতা, সিজার ফ্রেডারিক, De Barros' প্রভৃতি পর্যটক ও লেখকগণ ইহার কথা লিখিয়া যান নাই। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত Gsataldı-র মানচিত্রে কিন্তু Bengala-র স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, সাগরানূপে সত্য-সত্যই এই নামে একটি নগরী ছিল এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।"

আমি The 'Travels of Cornelius Le Bruyan নামক একজন ভ্রমণকারীর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট Routh Exacte De Gramron a Batavia Gramron-এর মানচিত্রে বাঙলা দেশের একটি নগরী "Bengale" -র নাম দেখিতে পাই। উহার অবস্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্দিষ্ট আছে। এই বইখানি মদীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত আছে। বইখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর [১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ]। এই বইখানিতে ভারতের আরও মানচিত্র আছে।

ডাক্তার রায় চৌধুরী বলেন:–

এই Bengala নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থিত রাজ্যই কি চন্দ্রোপাধিক নরপতি-শাসিত বঙ্গালদেশ? শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপি পাঠে কিন্তু তাহাই মনে হয়। উক্ত লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি এবং **"হরিকেল রাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়ামাধারঃ"** বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বলিতে সমুদ্রতীরবর্তী বর্তমান বরিশাল এবং তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড বুঝাইত। ইহাই শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের স্বরাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গ ইহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, হরিকেল ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। রাজশেখর রচিত কর্পূরমঞ্জরী নামক গ্রন্থে পূর্ব দিগঙ্গনাগণের সম্পর্কে চম্পা, রাঢ়া, কামরূপ ও হরিকেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল উক্তির সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, **বিক্রমপুর লৌহিত্যের পূর্বতীরস্থ ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত "বঙ্গ" বা হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল**। সাগর-তীরবর্তী "সাগরানূপ" বা "সমতট" যে ইহার বহির্ভূত ছিল মহাভারত ও বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "চন্দ্রদ্বীপ" ও "বঙ্গাল" এই উভয় দেশই বঙ্গ বহির্ভূত সাগরানূপে অবস্থিত এবং

১ অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদাব মহাশয় কর্ণ দেবের Gohaswa Plate-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। উক্ত লিপিতে কর্ণদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণরাজ "বঙ্গাল ভঙ্গ নিপুণ" বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ রাজও উত্তরাপথের রাজা ছিলেন।

(১) Ep Ind, v 257 of Ellıot, ııı 295 (As ıf) (২) Majumdar Inscrıptıons of Bengal P 61 (৩) J A S B, 1873, 233

চন্দ্রোপাধিক নৃপতি শাসিত। ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং চন্দ্রবংশের সহিত সংযোগ বিচার করিলে এই দুই দেশ যে অভিন্ন বা পরস্পর সংসৃষ্ট ইহা অনুমান করা বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।"

বিজ্জন বা বিজ্জল দেবের অবলূর-লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচন্দ্রদেবের বিক্রমপুর-বিজয় সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বঙ্গ এবং বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ভাবে একীভূত হয় নাই। "রাঢ়" ও "বরেন্দ্র"ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকগণ "বঙ্গ" শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। "তবকাৎইনাসিরি" গ্রন্থে বঙ্গ-স্পষ্টতঃ যাজনগর, কামরূপ, ও ত্রিহুতের ন্যায় লক্ষ্মণাবতী হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রাল (রাঢ়) ও বরিন্দ (বরেন্দ্র) লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে, তুঘলুক শাহের রাজত্বকালেই (১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম মিলিত হইয়া অখণ্ড বাঙলা দেশ গঠিত হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায়। বঙ্গপতি পালরাজগণ এবং প্রৌঢ়া রাঢ়ার অধীশ্বর সেন-নৃপতিবৃন্দ রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভাবী মিলনের পথ ও আরও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমানগণ-কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী জয়ের ফলে এই মিলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। কিন্তু তুঘ্‌লুক্‌সাহ পুনরায় একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী ঐক্যবিধান করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা-বাঙলা সুরমা-তীরবর্তী-শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী-ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণস্থিত Kankjol (কাঁকজল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলী, চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভূত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজলী উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোচবিহার সীমান্তবর্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে এই সকল ভূখণ্ড বাঙলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রত্যেক শ্বেতদ্বীপের মহামাত্রগণ বাঙলার উত্তর সীমা হিমবন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু লৌহিত্য ও কৌশিকীর পূর্বতীরস্থিত শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে সুবা-বাঙলা অপেক্ষা হ্রস্বায়ত করিয়াছেন।"

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন হইতে আমরা স্বাধীন বঙ্গ-রাজ্য বলিতে যে বঙ্গ-রাজ্য এবং রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের পরিচয় পাইতেছি, তাহা হইতে সেকালের শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী ও তাহা হইতে শাসিত বৃহৎ বঙ্গ-রাজ্যের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা যে কত বড় গৌরব-ব্যঞ্জক এবং বাঙালী মাত্রেরই গৌরবের কারণ তাহা সকলেরই বোধগম্য।

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন তিনখানি আবিস্কৃত হওয়ায় বিক্রমপুরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জল হইয়াছে।

চন্দ্র রাজাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

চন্দ্ররাজবংশীয়েরা বাঙলার আদি অধিবাসী নহেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পারিতেছি যে, বিপুল লক্ষ্মীকে, রোহিত... ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ পূর্ণচন্দ্র নামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা

হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চন্দ্রেরা পূর্বে বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার রোটাসগড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ পাল নৃপতিগণের ক্ষমতা হ্রাস দেখিতে পাইয়া তাহাদের শক্তিহীনতার সুযোগ পাইয়া বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] একটি রাজ্য সংস্থাপনের জন্য মনোযোগ হইয়াছিলেন। এবং [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণচন্দ্রের] পুত্র অপবাদ-ভীরু গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন * * দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে উপলব্ধি হয় যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পূর্ববঙ্গে চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্য হরিকেল- পূর্ববঙ্গের [প্রাচীন নাম] এবং সমুদয় চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"The Chandras do not seem to have originally belonged to Bengal. In verse 2 it is stated that they were rulers of Rohitagiri, which is identifiable with Rohtasgudh in the Sahabad district of Bihar. They emigrated to Eastern Bengal and most probably taking advantage of the weakness of the declining Pala power carved out kingdom for themselves. Trailokya Chandra, to whom the title of Maharajadhiraj has been assigned, was very likely responsible for the rise of this new power in Eastern Bengal. His kingdom was Harikel i. e. Eastern Bengal, including Chandradipa, which was the home territory of this dynasty. Inscription of Bengal N. G Mazumdar."

চন্দ্রদ্বীপ যে অতি প্রাচীন স্থান তাহা সহজেই সপ্রমাণ হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত পুস্তাকাগারে "অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে, ঐ গ্রন্থখানা ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ 'ভগবতী তারা' নামক এক দেবীর চিত্র আছে। ভগবতীতারাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ আসিতেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্র ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্রদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিব্বতের জ্ঞানভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগোমির জন্ম। আচার্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। * * চন্দ্রগোমির নামানুসারে এই ভূ-ভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল।[১]

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান প্রচলিত ছিল তাহা এখন অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১. চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ- শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নারায়ণ- প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা। ১১৮৮-১১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। J. A. S. B, 1874. History of Bakarganj Beveridge. ফরিদপুরের ইতিহাস-আনন্দনাথ রায় প্রণীত। স্বর্গত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় লিখিত- রাজা দনুজমর্দনের গুরু চন্দ্রশেখরের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নাম হইয়াছে, ইহা কাহিনী মাত্র, তাহা বোধ হয় এখন সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge by Cecil Berdull M. A., P. 151. A. Foucher Page 192. * ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- রাজন্যকাণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিক্রমপুরে স্বাধীন বর্ম-রাজগণ

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা বলিয়াছি। এইবার বিক্রমপুরের বর্ম রাজাদের কথা বলিতেছি। চন্দ্রবংশীয় ও বর্মবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কে পূর্বে এবং কে পরে রাজধানী "শ্রীবিক্রমপুরে"র রাজধানী হইতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয় বিভিন্নরূপ মত চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন– "সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বে এবং বর্মরাজ হরিবর্মদেবের পুত্রের রাজ্য-নাশের পরেই কোন সুযোগে শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্বক বৌদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন।" আবার কেহ কেহ বলেন– "চন্দ্ররাজগণের শাসনপাট উন্মুলিত হইবার পরেই বর্মরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন:– "যে সময়ে বরেন্দ্রে বা গৌড়ে পালবংশ, বঙ্গে চন্দ্রবংশ ও রাঢ়ে শূরবংশ আধিপত্য করিতেছিল, সেই সময়েই প্রথিত বর্ম বংশের অভ্যুদয় হয়।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গত বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'আর্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচী যাদব জাতির পুরাতন রাজধানী। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ইউয়ান্-চোয়াং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর-রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন।

"হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্মবংশীয় দ্বাদশজন রাজা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেব চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে বোধ হয়, এই সিংহপুরের যাদবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরা-পথের পশ্চিমার্ধ হইতে পূর্বার্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে আবিস্কৃত বজ্রবর্মার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব-সেনার সমর বিজয়-যাত্রা-কালে বজ্রবর্মা মঙ্গল স্বরূপ গণ্য হইতেন। **বজ্রবর্মার পূর্বে বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিকার ছিল।**"

বর্মরাজবংশীয় নৃপতিরা বিক্রমপুরে বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই। [The Varmans, who ruled over Vikrampura for only a short period came originally form sinhapur.]

শ্রীচন্দ্রদেবের পরে ভোজবর্ম বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন ইহাই তাম্রলিপি-বিচারে অনুমিত হয়।[১]

১. বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
[About this time probably occurred a migration of people from West to East Bengal, and in the Belava plate we find Jatavarma's grandson, Bhojavaram ruling at Vikrampur. He came there evidently after Srichandra, whose grants are also issued from Vikrampur. The Indian Historical Quarterly Vol VII. No. 3 September, 1931.]

ভোজবর্মদেবের বেলাব-লিপি, ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি, হরিবর্মদেবের বেজনীসার তাম্রলেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গ রাজ্যের অধিপতি [বিক্রমপুর রাজধানী] বর্ম বংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বেজনীসার তাম্রলেখের প্রথমাংশ অগ্নিদাহে দগ্ধ হওয়ায় অক্ষরসমূহ অস্পষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের পরিচয় জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ তাম্রশাসনে "সখলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ" ইত্যাদি রহিয়াছে। কাজেই তাঁহারা যে **"শ্রীবিক্রমপুর"** রাজধানী হইতেই বঙ্গদেশ শাসন করিতেন, তদ্বিষয় কোনরূপ দ্বিধা করিবার কারণ বিদ্যমান নাই।

বেলাব-লিপি

বেলাব-লিপি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপঃ- ঢাকা জেলার [ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতললক্ষার মধ্যবর্তী] মহেশ্বরদি পরগণার অন্তঃপাতী "বেলাব" নামক গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ নিজ কুটীরের নিকট গর্ত খনন করিবার সময় [এপ্রিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ] এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয়। সে এই শাসনখানিকে আকাশ হইতে পতিত সুবর্ণ পাত্র মনে করিয়া ইহাকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রফলকের শীর্ষ-দেশস্থ রাজ মুদ্রাটি চাঁছিয়া ফেলিয়াছিল। সেটেলমন্টে কার্যোপলক্ষে সাবডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি.এ.মহাশয় এই তাম্রশাসনের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া [১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে] ইহা ২ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ঢাকা নগরীতে আনয়ন করিলে, এই তাম্রশাসনের কথা প্রকাশিত হয়। সে সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্রশাসনখানি বসাক মহাশয়ের পূর্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্যামলাসুন্দর করের ও শ্রীমান নিকুঞ্জবিহারী সেনের দ্বারা তাঁহার নিকট [২৪শে জুন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ] প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লিপি পরিচয়

এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার ডাক্তার বসাক মহাশয় কর্তৃকই প্রথম সম্পাদিত হয়। এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১০ ১/৪ × ৯ ১/২ ইঞ্চি। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই। আরম্ভে "ওঁ সিদ্ধি" লিখিত আছে। তাহাতে বিসর্গ চিহ্নের অভাব। বংশ-বিবৃতি সূচক ১৩ টি শ্লোকের শেষে ২৪ পংক্তি হইতে ৪০ পংক্তি পর্যন্ত গদ্যাংশ এবং সর্বশেষে একটি শ্লোক, তৎপরে লিপিকাল ও স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদারের মতে - 'The characters represent a type of Northern Nagari that was current in Eastern India about the 12th century A. D. being somewhat more advanced than those of the Rampal copperplate of sirchandra and akin to those of the inscriptions of the Senas. অর্থাৎ, এই তাম্রফলকের অক্ষরগুলি পূর্ব ভারতে প্রচলিত উত্তর নাগরীর অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। রামপাল-লিপির অক্ষর হইতে

ইহার অক্ষর অনেকটা উন্নত এবং সেনরাজাদের তাম্রশাসন-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য ইহাতে অধিক। রাধাগোবিন্দ বাবুর মতে– "অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর।"

"এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া [চন্দ্রবংশীয়] মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্ম-দেবপাদানুধ্যাত-পরম-বৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজ [২৫। ২৬ পংক্তি] তদীয় রাজ্য সংবতের পঞ্চম সংবৎসরে ১৯ শ্রাবণ দিনে [১৯ শ্রাবণ দিনে [৫১ পংক্তি] সাবর্ণ গোত্রীয় ভৃগু-চ্যবন-আপ্লুবৎ-ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবরের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র শ্রীরাম দেবশর্মাকে [৪১-৪৫ পংক্তি] 'সপাদনবদ্রোণাধিকপাটক' পরিমিত ভূমি [২৮।২৯ পংক্তি] ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [৪৬।৪৭ পংক্তি] দান করিয়াছিলেন।

এই তাম্রলিপিটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায়ও [Dacca Review, Vol. II. No 4 July 1912] এই লিপির বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম ছিল The Belabo Copper Plate of Bhojavarman. এই প্রবন্ধে প্রারম্ভেই তদনীন্তন সেটেলমেণ্ট আফিসার মিঃ এফ. ডি. অ্যাস্কলি [F. D. Ascoli] লিখিত একটি ভূমিকা-লিপি [Prefatory note] ছিল। তাহাতে তিনি লিপিখানি কিরূপে আবিস্কৃত হয় সে কথা বলিয়াছেন।

অ্যাস্কলি সাহেব উহার আবিষ্কার কাহিনী বলিয়া লিপিখানির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলিবার পর তিনি পাঠোদ্ধারকারী ঢাকা কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত বিধুভূষণ গোস্বামী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং স্বর্গত কামিনীকুমার সেন মহাশয়গণকে পাঠোদ্ধার, অনুবাদ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মিঃ অ্যাস্কলির ভূমিকালিপিতে সেকালের অর্থাৎ, বর্ম রাজাদের রাজত্বকালে বিক্রমপুরের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখযোগ্য।

এই তাম্রশাসনখানির আবিষ্কারের ফলে বিক্রমপুরের বর্ম-রাজগণের প্রামাণিক ইতিহাসেরও যেমন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনি ভৌগোলিক সিদ্ধান্তেরও সুযোগ ঘটিয়াছে। বিক্রমপুর রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল এই তাম্রশাসনখানির সাহায্যে তাহার সন্ধানের পথ আমরা পাইয়াছি। [The Copperplate is of great importance from the points of view of both historical and geographical research].

যে মুসলমান কৃষক এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ইহার রাজমুদ্রাটি চিহ্নহীন করায়, তাহার 'লাঞ্ছন' কিরূপ ছিল, তাহা দর্শন করিবার উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৪৮ পংক্তিতে রাজমুদ্রাটির যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজমুদ্রায় বিষ্ণুচক্র মুদ্রিত ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে রাজার নাম খোদিত ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

ভোজবর্মদেবের বেলাব-লিপি

প্রশস্তি-পাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠা]

ওঁ সিদ্ধি [ঃ]

১। স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনি রাত্রি দি (র্দি) বৌকসাং।
তস্য যন্নায়নং তেজ স্তেনাজা–
য়ত চন্দ্রমাঃ ॥ (১)

২। রৌহিণেয়ো বুধ স্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ [।]
জজ্ঞে স্বয়ংবৃতঃ কী [র্ত্ত্যা]
চোর্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ ॥ (২)

৩। সোপ্যায়ুং সমজীজনন্মনুসমো রাজ্ঞ স্ততো জজ্ঞিবান্
ক্ষ্মা–

৪। পালো নহুষ স্ততোজনি মহারাজো যযাতিঃ সুতম্ [।]
সোপি প্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতি [ভু]–
জাং বংশোয় মুজ্জম্ভতে

৫। বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বস্তু [হু] শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষ্যত ॥ [৩]
সোপী [হ]

৬। গোপীশত- কেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারত-সূত্রধারঃ [।]
অর্ঘ্যঃ পুমানংশ-কৃতাবতা–
রঃ

৭। প্রাদুর্ব ভূবোদ্ধৃত ত-ভূমিভারঃ ॥ (৪)
পুংসা মাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি

৮। ত্রয্যান্ (ং) চাদ্ভূত-সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদগমৈ বর্ম্মিণঃ [।]
বর্ম্মাণোক্তি-গভীর-নাম দধতঃ

৯। শ্লাঘ্যৌ ভুজৌ বিভ্রতো
ভেজুঃ সিংহপুরঃ গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে বার্দ্ধবাঃ ॥ (৫)

১০। অভবদথ কদাচিদ্যাদবীনাং চমুনাং
সমর– বিজয়যাত্রা– মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা [।]
শম–

১১। ন ইব রিপুণাং সোমবন্ধান্ধবানাং
কবি রপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ [প] ণ্ডিতানাম্ ॥ (৬)
জা–

১২। ত–বর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্ত নোঃ [।]
দয়া ব্রতং রণঃ ক্রীড়া [ত্যা] গো যস্য মহো–
১৩। ৎসবঃ ॥ (৭)
গৃহ্নন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণ্নস্য বীরশ্রিয়ং
যো * * প্রথয়ন্ত্রিয়ং পরিভবং–
১৪। স্তাং কামরূপ-শ্রিয়ম্ [।]
নিন্দন্দিব্য–ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়–
১৫। সাচ্ছিয়ং বিততবান্ যাং সার্বভৌম- শ্রিয়ম্
বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ
১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ– প্রথম মঙ্গল-নামধেয়ঃ [।]
কিম্বর্ণ্নয়াম্যখিল ভূপ-গুণোপপন্নো
দোষৈ–
১৭। [র্ম্মা] নাগাপি পদং ন কৃতঃ প্রভু র্ম্মে। (৯)
তস্যোদয়ী-সূনু রভূৎ প্রভূত
*** বীরেস্বপিং সঙঘ–
১৮। রেষু [।]
য শ্চন্দ্রহা [স]– প্রতিবিম্বিতং স্ব–
মেকং মুখং সম্মুখ মীক্ষতে স্ম ॥ (১০)
তস্য মালব্যদেব্যা–
১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্য–সুন্দরী [।]
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥ (১১)
পূণ্রেপ্যংশে
২০। য-ভূপাল পুত্রীণা মবরোধনে [।]
তস্যসীদগ্র-মহিষী [সৈব] সামলবর্ম্মণঃ ॥ (১২)
আসী–
২১। ওয়োঃ সু (সৃ) নু রিহান্তরং (?) যঃ
শ্রীভোজবর্ম্মোভয়– বংশ [দী] পঃ [।]
২২। পাত্রেষু সর্বাসু যে–
ন
স্নেহো ন লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ ॥ (১৩)
হা ধিক (ক) ষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োপি কং

(কিং) রক্ষসা–

২৩। মুৎপাতোয় মু [প] স্থিতোস্ত কুশ-লী শঙ্কাস্ব-

লঙ্কাধিপঃ ॥ (১৪)

ইতি যং গুণগাথাভি স্তুষ্টা–

২৪। ব পুরুষোত্তমঃ [।]

মজ্জয়ন্নিব বাগব্রহ্ম-ময়ানন্দ-মহোদধৌ ॥ (১৫)

স খলু শ্রীবিক্রমপু–

২৫। র-সমাবাসিত– শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ

মা (ম) হারাজাধিরাজ– শ্রীসামলবর্ম্ম– দেবপা–

২৬। দানুধ্যাত– পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-রমভট্টারক–

মহারাজধিরাজ-শ্রীমদ্ভোজ [ঃ]

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।]

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-অধঃপত্তনমণ্ডলে

কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ– খ–

২৮। গুল– সং [বদ্ধ] (১৬) উপ্যলিকা-গ্রামে গুবাকাদি

সমেত-সপাদ–

নবদ্রোণাধি–

২৯। ক-পাটকভূমৌ–সমুপগতাশেষ-রাজরাজন্যক-রাজ্ঞীরাণক-রা

৩০। জ পুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-পীঠিকাবিত্ত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ

মহাসান্ধিবি–

৩১। গ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ–

বৃহদুপরিক–মহাক্ষপ–

৩২। টলিক-মহা প্রতীহার মহাভোগিক-মহাব্যূহপতি–

মহাপীলুপতি-মহাগ–

৩৩। ণস্থ-দৌস্সাধিক-চৌরেদ্ধরণিক-(নৌবলহস্ত্য) শ্ব–

গোমহিষাজাবিকাদি–

৩৪। ব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক–

বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সক–

৩৫। ল-রাজপাদোপজীবিনো ধ্যক্ষ-প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্

চট্টভট্টজাতী–

৩৬। য়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্

যথার্হম্মানয়তি
৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভ [ব] তাম্
যথোপরিলিখিতো ভূমি রিয়ং স্ব–
৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তা সতলা– সোদ্দেশা
সাম্রপনসা স–
৩৯। গুবাক-নালিকেরা (নারিকেলা) সলবণা সজলস্থ
[লা] (১৮)
৪০। সগর্ত্তোযরা-সহ্যদশাপরাধা পরি–
হৃতসর্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা
অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত– রাজভোগ (গ্য) ক–
৪১। র–হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা
সাবর্ণ্ন-সগোত্রায় ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্-ঔ–
৪২। বর্ব-জমদগ্নি-প্রবরায়
বাজসনেয়-চরণায় যজুর্ব্বেদ-কণ্বশাখাধ্যায়ি–
৪৩। নে মধ্যদেশ-বিনিগ্গর্ত্ত [স্য] উত্তর-রাঢ়ায়াং
সিদ্ধলগ্রামীয়– পীতাম্বর দেব–
৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
বিশ্বরূপ দেবশর্ম্ম–
৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত-শ্রীরাম দেবশর্ম্মণে।
শ্রীমতা ভোজ–
৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুকপূর্বকং
কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেবভ–
৪৭। ট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুন্যযশোভিবৃদ্ধয়ে
আচন্দ্রার্কং ক্ষি–
৪৮। তি-সমকালং যাবদ্ভূ (স্তু) মিচ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীমবিদ্ধষ্ণুচক্র
মুদ্রয়া-তাম্রশা
৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ (?) ॥ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাং
সিনঃ শ্লোকাঃ ॥
৫০। স্বদত্তা স্পরদত্তা ম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ [।]
সবিষ্ঠায়াং কৃি (কৃ) মি ভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ প–
চ্যতে ॥ (২০)
৫১। শ্রীভোজবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৫ শ্রাবণদিনে ১৯
নি অনু মহাঙ্ক নি।

বঙ্গানুবাদ

১। এই বিশ্বে দেবর্ষি অত্রি সয়ম্ভুর অপত্য [ছিলেন]। তাঁহার নয়ন হইতে যে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। সেই [চন্দ্রমা] হইতে রোহিণী-নন্দন বুধ [জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়া কীর্তি এবং উর্বশী এবং বসুন্ধরা কর্তৃক [স্বয়ংবৃত] স্বয়ংবরে পতিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

৩। সেই মনু-প্রতিম [পুরূরনাও] আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই রাজা [আয়ু] হইতে পৃথিবী-পালক নহুষ জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যেক্ষ-বৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

৪। [ইহ] এই বংশে, সেই পূজ্য পুরুষ [বলরামের] অংশাবতার, মহাভারত-সুত্রধার শ্রীকৃষ্ণও প্রাদুর্ভূত হইয়া শত শত গোপীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৫। ত্রয়ী [বেদবিদ্যাই] পুরুষের [প্রকৃত] পরিধেয় (১০)। তাহার অভাব ছিল না বলিয়া অনগ্না অপিচ [বেদবিদ্যা-সংযুক্ত বলিয়া] বৌদ্ধ ক্ষপণকাদি হইতে বিভিন্ন বেদ-চর্চায় এবং অদ্ভুত সমর-ক্রীড়ায় অনুরাগবশতঃ যে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, তাহাতেই [বর্মিণঃ] বর্মাবৃত-কলেবর [বলিয়া প্রতিভাত] হরির জ্ঞাতিবর্গ, বর্মা [উপাধিধারী] গণ অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া, সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

৬। অনন্তর কোনও এক সময়ে, যাদব-সেনার সমর-বিজয়যাত্রা-মঙ্গলরূপী বজ্রবর্মা [নামক ব্যক্তি] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধব-কুলের পক্ষে [প্রিয়দর্শন] চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত-কুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

৭। শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্মা হইতেও জাতবর্মা জন্মগ্রহণ করেন দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল, এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল।

৮। তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের [কন্যা] বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * * শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই [সুবিখ্যাত] কামরূপ [রাজ্য] শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য [নামক কৈবর্ত নায়কের] ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া গোবর্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় [ব্রাহ্মণগণকে] ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

৯। জগতে প্রথম মঙ্গলনামধারী শ্রীমান্ সামলবর্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি আর বর্ণনা করিব? অখিল-নরপাল-গুণ-বিভূষিত

আমার প্রভুতে দোষ-সমূহ কিয়ৎপরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

উদয়ী সূনু তাঁহার [সামলবর্মদেবের] ... ... ছিলেন। তিনি বীর [পরিপূর্ণ] যুদ্ধক্ষেত্রে ও [স্বহস্ত ধৃত] খড়্গ-ফলকে তাঁহার আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন।

১১। তাঁহার মালব্যদেবী নাম্নী, জগদ্বিজয়-মল্ল কামদেবের বিজয়- বৈজয়ন্তী-রূপিণী ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন।

১২। অশেষ-ভূপাল-কন্যাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পরিপূর্ণ থাকিলেও সেই [মালব্য দেবীই] এই সামলবর্মার "অগ্র-মহিষী" [প্রধানা মহিষী] ছিলেন।

১৩। অন্তর [পিত-মাতৃ] উভয়কূল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্মা নামক তাঁহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল প্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না, [হৃদয়ের] অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

১৪। হা ধিক্। কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। রাক্ষসকুলের উৎপাত-বিধাতা [অলঙ্কাধিপঃ] রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি! [এই] শঙ্কাকুল অবস্থায় [অয়ং] ভোজবর্মদেব কুশলী হউন।

১৫। এইরূপে বাগ্– ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া যাঁহাকে পুরুষোত্তম গুণগাথা-সমূহে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেনঃ–

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (সেনা নিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ–শ্রীসামলবর্মদেব-পাদানুধ্যাত, পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদভোজ– শ্রীপৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন-মণ্ডলে কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খণ্ডল [সম্বন্ধ] উপ্যলিকা গ্রামে, ১ পাটক, ৯$\frac{১}{৪}$ দ্রোণ (পরিমিত) ভূমিতে,– সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, রাজপুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্মাধ্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ বিচারাধিপতি), মহা সান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত (রাজকীয় "মোহরের" রক্ষক), অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (রাজাপ্তজনদিগের অধিনায়ক), মহাক্ষপটলিক (অধিকরণিক, অথবা রাজকীয় লেখ্যের রক্ষক), মহাপ্রতীহার (দৌবারিক শ্রেষ্ঠ), মহাভোগিক (প্রধান অশ্বরক্ষক), মহাব্যূহপতি মহাপীলুপতি (প্রধান গজ-রক্ষক), মহাগণস্থ ("গণ" নামক সেনা-মণ্ডলীর নেতা), দৌঃসাধিক (দ্বারপাল অথবা গ্রাম-পরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশ-কর্মচারী বিশেষ), নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ সেনাধিকৃত পুরুষ), হস্তিব্যাপৃতক (হস্ত্যধ্যক্ষ), অশ্বব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ্য), গো ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ্য, মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ) ও অবিকাদি ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ("গুল্ম" নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক), দণ্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ), দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ), বিষয়-পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি (রাজকর্মচারী-দিগকে) এবং অধ্যক্ষ-প্রচারে উক্ত (অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত), কিন্তু এই শাসনে (পৃথগ্‌ভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে, চট্ট-ভট্ট-জাতীয় জনপদবাসিগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণগণকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন এবং আজ্ঞা করিতেছেন, (নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে)

আপনাদের সকলের অভিমত হউক– যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন তৃণ-পূতি-গোচর পর্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ সমেত, লবণোৎপাদক ভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত গর্ত ও উষর ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ, যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট-ভাট জাতির প্রবেশাধিকারবিরহিত, যাহা হইতে কোন প্রকারের করাদি গৃহিত হইবে না, রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদি (সর্বপ্রকারের) আয়ের সহিত উপরি লিখিত ভূমিখণ্ড সাবর্ণ গোত্রোৎ-পন্ন, ভৃগু-চ্যবন-আপ্লুবান– ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, যজুর্বেদের কণ্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত– সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র, শান্তি গৃহ্যাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্মাকে– এই পুণ্য দিবসে যথাবিধি উদকস্পর্শ-পূর্বক ভগবান বাসুদেব-ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ সূর্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণু-চক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীমান ভোজবর্মদেব প্রদান করিলাম।

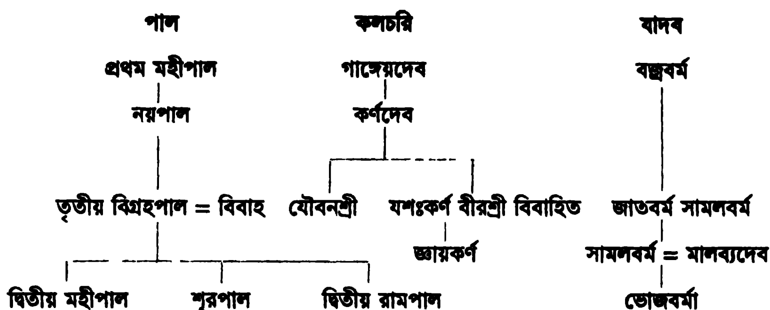
এই অভিপ্রায়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছেঃ– ভূমি স্বদত্তই হউক, আর অন্য দত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ ভোজবর্মদেব-পাদীর সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে, নি-বদ্ধ অনু। মহাক্ষ (পাটলিক) নি (বদ্ধ)।

বিক্রমপুর জয় স্কাম্ধবাবার

এই তাম্রশাসনখানি পাঠে অবগত হই যে, শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ-শ্রীসামলবর্ম দেব-পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্ভোজ ইত্যাদি। 'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে রাজধানীকেও' বুঝায়। এখানে 'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরকেই বুঝাইতেছে। তবে সকলেই প্রায় জয়স্কন্ধাবার শব্দে (সেনানিবেশ) বা Victorius camp অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বর্গত রাখাল বাবু এই তাম্রশাসন-প্রসঙ্গে বলেন– "The inscription is written in protobengali characters of the eleventh or early twelfth century A. D. It refers itself to the reign of PARAMAVAISNAVA- PARAMESVAR-PARAMA-BHATTARAKA-MAHARAJA-DHIRAJ SRIBHOJA (DEVA) who meditated on the feet of MAHARAJA-DHIRAJ SAMALVARMADEVA, and was issued from the victorius camp of Vikrampur.

এই তাম্রশাসনখানা আবিস্কৃত হইবার ফলে আমরা যে রাজবংশের পরিচয় পাইলাম, তাঁহাদের বংশীয় নৃপতিরা পূর্বেও বিক্রমপুরে শাসন করিতেন। বর্ম-বংশীয় যাদব নৃপতিরা যে পাল রাজাদের রাজ্যসীমা উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন এ বিষয়টিই আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বর্ম-বংশীয় যাদব নৃপতিরা তিন পুরুষ পর্যন্ত যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা

করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। নিম্নে বাঙলা দেশের পাল নৃপতিদের, এবং ত্রিপুরির কলচুরির হৈহয় এবং যাদবদের বংশ-তালিকা উদ্ধৃত হইল:–



ভোজবর্মদেবের বেলাব-লিপি হইতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, একাদশ শতাব্দী কিংবা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ স্বাধীন রাজ্য ছিল। [The inscription proves that for three generations at least in the 11th or 12th centuries A. D. Eastern Bengal was independent.] এই তাম্রশাসনখানি হইতে আরও জানিতে পারি যে– বর্মা নৃপতিরা যাদব বংশীয় ছিলেন। [তৃতীয় পংক্তি] আর তাঁহারা সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। [শ্লাঘ্যো ভুজৌ বিভ্রতো ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিবঃ মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ।]

সিংহবিবরতুল্য সুরক্ষিত সিংহপুরে বর্ম-বংশ বা যাদব-বংশীয় নৃপতিগণের আদিম বাসস্থান ছিল। সিংহপুরে এই বংশীয়েরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছিলেন। এই সিংহপুর কোথায়? এসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত চলিয়া আসিতেছে। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সিংহপুরকে 'মহাবংশের' উল্লিখিত সিংহপুরম্ বলিতে চাহেন। অধ্যাপক স্টেন্ (Prof sten)-র সহিত ["We know of princes with names ending in Varman, who ruled in Simhapura, and who were kings of Kalinga] অর্থাৎ, কাহারও মতে ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুর। কেহ দক্ষিণ রাঢ়ায় এই সিংহপুর অবস্থিত বলেন। সিংহপুরের অবস্থা সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।[১] স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়

১. ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা। Inscriptions of Bengal Vol III by N. G. Mazumdar দ্রষ্টব্য। "The identification of Sinhapura is not certain, According to some it may be the same as modern Singuputam between Chicacole and Narasamapeta. This records proves that a dynasty, who had varman as heir title and Yadava lineage, ruled over Sinhapura. Another inscription, to which Mr. R. D. Banerjee draws our attention, bears testimony to the same fact. This is Lakkhamandal inscription from the Jaunsar Bawar District on the Upper Jamuna, which records the dedication of a siva temple by Isvara, wife of a king of Jalandhara in the Punjab, She is described as having descenbded from a line of Yadava Kings of singhapura. From a list of twelve kings of the dynasty given in the inscription it appear that all of their names ended in varman. Bulher thinks it very probable that the ancestors of Isvara, queen of the Jalandhara prince, ruled over a district that lay also in the Punjab and identified Sinhapura with Sangho-pu lo described by Hinen Tsang. But it should be noted that there nothing in the epigraph itself which supports this conclusion, or makes it in any way necessary."

সিংহপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাদটিকায় উদ্ধৃত হইল।

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন– "সিংহপুর রাজধানীর বর্তমান নাম কেতস্। ইউয়ান চোয়াং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর-রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন।" পণ্ডিতেরা "তর্ক করুন কোথায় সিংহপুর!" সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক, তবে যাদব-বর্ম-বংশ যে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া তাঁহারা পূর্ববঙ্গ অধিকার করিলেন, তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে।

বর্ম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

আমরা ভোজবর্ম-র বেলাব-লিপি হইতে কোনরূপ সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না যে, বর্ম রাজাদের মধ্যে কে কবে প্রথম পূর্ববঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন! [The inscription does not state definitely who founded the kingdom of the Jadavas in the extreme east.] এই বংশের বংশ-লতা বজ্রবর্মা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বজ্রবর্মা যাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন, তিনি রাজা ছিলেন না। কেননা তাম্রফলক হইতে জানিতে পারিতেছি যে– তিনি (বজ্রবর্মা) যাদবসেনার সমর-বিজয়-যাত্রা-মঙ্গল-রূপী ছিলেন, তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন ছিলেন।

বজ্রবর্মাঃ জাতবর্মাঃ জাতবর্মা কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিজয়

বজ্রবর্মা হইতে জাতবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। জাতবর্মা সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহাকে "সাচিহ্নয়ং বিততবান্দ্যাং সার্বভৌম শ্রিয়ম্" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, জাতবর্মা স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন– "তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে অর্থাৎ, বিপুলশ্রী ধারণ করিয়া, কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া * * শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই [সুবিখ্যাত] কামরূপ [রাজ্য] শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য [নামক কৈবর্তনায়কের] ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্ধনের [ব্যক্তি বিশেষের নাম] শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় [ব্রাহ্মণগণকে] ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেও প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের পিতা নয়পালের শাসন সময়ে, কর্ণের সহিত যুদ্ধে গৌড় সেনার প্রথমে পরাজয়ের এবং পরে বিজয় লাভের ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে মৈত্রী সংস্থাপিত হইবার একটি কাহিনী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের [তিব্বতীয় ভাষায় রচিত] জীবন-চরিতে উল্লিখিত আছে। এই কর্ণ কর্ণচেদী নামে কথিত। রামচরিত কাব্যে [১।৯ শ্লোকে] লিখিত আছে– তিনি পরাজিত হইয়া, গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপালকে "যৌবনশ্রী" নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কন্যা "বীরশ্রীর" সহিত 'জাতবর্মার পরিণয়ের কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়া 'জাতবর্মার' অভ্যুদয়-কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পরলোক-গমনের সঙ্গে সঙ্গে, কৈবর্তনায়ক দিব্যের বা দিব্যোকের বিদ্রোহে, বরেন্দ্রী হইতে পালাজগণের শাসন উন্মুলিত হয়, এবং পাল-সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সেই

সুযোগে পাল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত "কামরূপ"অধিকার করিয়া জাতবর্মা পূর্ববঙ্গে "সার্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"[১] এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

জাতবর্মার বীরত্ব: দিব্য ও জাতবর্মা

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতাবলম্বী। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা বেলাপ-লিপি হইতে জানিতে পারি যে, জাতবর্মা কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাজেই জাতবর্মা এবং পালনৃপতি তৃতীয় বিগ্রহপাল বিবাহ সম্পর্কে পরস্পরে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন : [Jatavarma married Virsri, the daughter of Karna, so he was the brother-in-law of the pal Emperor Vigrahapal III] কেন-না সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতে" লিখিয়াছেন যে, তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদীরাজের কন্যা যৌবনশ্রীকে' বিবাহ করেন। জাতবর্মা অঙ্গ রাজ্য পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি কলচুরি চেদী গাঙ্গেয় এবং কর্ণদেব এক পক্ষে এবং প্রথম মহীপাল, নয়পাল ও বিগ্রহপালের মধ্যে যে দীর্ঘকাল রণ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল তাহাতে জাতবর্মাও যোগদান করিয়াছিলেন। জাতবর্মা তৃতীয় বিগ্রহ পালের ভৃত্য দিব্য বা দিব্যোকের বিদোহও দমন করেন। জাতবর্মা গোবর্ধনের শ্রীকেও বিকল করিয়া অবশেষে "সার্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই গোবর্ধন কে ছিলেন? "রামচরিতে" "দ্বোরপবর্ধন" (Dvorapavardhana) নাম আছে। রাখালবাবু বলেন– [which seems to be the copyists mistake for Govardhan] তাঁহার মতে "রামচরিতে দ্বোরপ-বর্ধন" নামক জনৈক কৌশাম্বী অধিপতির নাম আছে। লিপিকর-প্রমাদে শ্রী গোবর্ধন স্থানে তাহা "দ্বোরপোবর্ধন" হইয়াছে, এই গোবর্ধনই জাতবর্মা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবর্ধন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত 'মুসুম্বা' বা কুসাম্বি'র একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, এলাহাবাদের কৌশাম্বী বা কোসাম নহে। [It should be noted that the King of Kausambi mentioned in the Ramcharita of Sandhyakar Nandi was not a king of Kausambi in the *Madhyadesha* (kosam near Allahabad) but a *minor prince of Bengal,* because the Belabo grant proves that there was a Kausambi in the *Pundrabhukti.* It is most probably the modern Pargana of or kusambi in the Rajshahi District].

আমরা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কৌসম্বা দেখিয়াছি। উহা কুসাম্বি নামেই পরিচিত। ঐ স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। কাজেই রাখাল বাবুর সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়।

জাতবর্মার পুত্র সামলবর্মা

জাতবর্মার পুত্র সামলবর্মা। সামলবর্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাম্রফলকে লিখিত আছে, "জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান সামলবর্ম দেব বীরশ্রীর

১. সাহিত্য ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আখিল-নরপাল গুণ-বিভূষিত ছিলেন এই সামলবর্ম দেব। জাতবর্মার মৃত্যুর পর সামলবর্মা পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। সামলবর্মার শ্বশুর-কুলের পরিচয়ও বেলাব-লিপির ১০ম ও ১১শ শ্লোকে আছে। "উদয়ী সূনু তাঁহার [সামলবর্মদেবের] * * * ছিলেন। তিনি বীর [পরিপূর্ণ] যুদ্ধক্ষেত্রের [স্বহস্ত ধৃত] খড়্গ-ফলকে তাঁহার আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মালব্য দেবী নাম্নী জগদ্বিজয়-মল্ল কামদেবের বিজয়-বৈজয়ন্তী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। * * * * সেই (মালব্য দেবীই) এই সামলবর্মার 'অগ্রমহিষী' [প্রধানা মহিষী] ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের 'উদয়ী' এবং "জগদ্বিজয় মল্ল" সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া উদয়ী নামের সহিত পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১ শ্লোকের জগদ্বিজয়মল্লকে উদায়দিত্যদেবের তৃতীয় পুত্র জগদ্দেব বলিয়া নিদের্শ করিয়াছেন। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন, "উদয়ী" শব্দ কোনও যোদ্ধৃ পুরুষের নামবাচক সংজ্ঞা শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার সূনু'র সহিত সামলবর্মার সেনাবিভাগের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল।" *** আবার উদয়ীকে মালব্য দেবীর জনককুলের ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ না করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকল বিভিন্ন মত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে– "The identity of Jagadvijayamalla the father-in-law of Samalvarman, must remain an open question so long as material is not available."

সামলবর্মা ও শ্যামল বর্মা

সামলবর্মার পর তাঁহার পুত্র শ্রীভোজবর্মা নৃপতি ছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ উভয় কুল-প্রদীপ ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত এই তাম্রশাসন। এবিষয় পূর্বেও বলা হইয়াছে।

ভোজবর্মাদেবের এই তাম্রশাসনখানি আবিস্কৃত হইবার বহু পূর্বে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলশাস্ত্র হইতে শ্যামলবর্মার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎ প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড ১৩২-১৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে তদীয় ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮১-২৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :

১. কুলশাস্ত্রের শ্যামলবর্মা ও যাদব বংশের জাতবর্মার পুত্র সামলবর্মা এক ব্যক্তি নহেন।

২. শ্যামলবর্মা ও সামলবর্মা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, কুলশাস্ত্রে কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ কুলশাস্ত্রের লিখিত শ্যামলবর্মার পরিচয়ের সহিত

বেলাব তাম্রশাসনোক্ত সামলবর্মার বংশ-পরিচয়ে ঐক্য নাই।"

সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিতের' একটি শ্লোক :

স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্-দিশীয়েন।
বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দসদানেন বর্ম্মণারাধে ॥

রামচরিত, ৩। ৪৪।

বর্ম-বংশীয় নৃপতি ও রামপাল

অর্থাৎ, বর্মবংশীয় পূর্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য, নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। বর্মবংশীয় নরপতি কর্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম রামপাল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার। সম্ভবতঃ ভোজবর্ম। অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইহা অনুমান মাত্র। কেননা 'রামচরিতে' বর্মবংশীয় পূর্বদেশের কোন্ নৃপতি নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। কাজেই বর্মবংশীয় এই নরপতি কে ছিলেন? তৎ-সম্বন্ধে অনুমান ব্যতীত সঠিক ভাবে কিছু বলা যাইতে পারে না। কামরূপের বর্ম রাজারা যে নহেন, তাহা নিশ্চিত, কেন-না, নবম শতাব্দীর অবসানের সহিতই কামরূপে বর্মরাজগণের শাসন লোপ হইয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীতে কামরূপে রামপালের সমসাময়িক-রূপে পালরাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। কাজেই 'প্রাগ্-দিশীয়েন্' নৃপতি কামরূপের বর্মরাজদের মধ্যে কেহই নহেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেনঃ– "যেখানে সামলবর্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল" নামে পরিচিত হইয়াছে।' নগেন্দ্রবাবুর মতে রামপালের অর্চনাকারী এই প্রাগ্‌দেশীয় বর্মরাজা ভোজবর্মার পিতা সামলবর্মা। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালীও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেনঃ– "ভোজবর্মার বেলাব-শাসন রাক্ষসদের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় ভোজবর্মাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্মরাজা।" বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছেঃ–

হা ধিক (ক্ক) ষ্ট মবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োপি কং [কিং] রক্ষসামুৎপাতোর মু [প] স্থিতোস্তু কুশলী শঙ্কাস্ব-লঙ্কাধিপঃ। হা ধিক্! কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে! রাক্ষসকুলের উৎপাত-বিধাতা [অলঙ্কাধিপঃ] রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি? এই শঙ্কাকুল অবস্থায় [অয়ং] ভোজবর্মদেব কুশলী হউন।

বর্ম-বংশীয় রাজগণের কথা বলিতে যাইয়া "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেনঃ– "পালবংশীয়-গণের রাজত্বকালের শেষভাগে তাঁহাদিগের অধীন যে-সকল রাজবংশ সামন্ত-রাজরূপে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তন্মধ্যে বর্মবংশ

বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] বর্মবংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, তখন বিক্রমপুরের পার্শ্ব দিয়া পদ্মা প্রবাহিত ছিল। এখন উহার মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায় বিক্রমপুর দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। বর্মরাজারা পাল রাজাদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না, একমাত্র একজন বর্ম-নৃপতির রামপালের আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে মাত্র।

ভোজবর্মা দেবের বেলাব-লিপি হইতে জানা যায় যে, হরিবর্মদেব "যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, "যাদব-বর্মবংশে হরিবর্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই হরিবর্ম রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আবিস্কৃত হইয়াছে। একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম দেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপিখানি উড়িষ্যা প্রদেশে পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্ত-বাসুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিস্কৃত হইয়াছিল। ইহা হরিবর্ম দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ় প্রদেশের সিদ্ধল গ্রাম নিবাসী শ্রোত্রিয় বংশে প্রথম ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজেব মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র "বালবলভীভুজঙ্গ" উপাধিধারী ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বর নারায়ণ, অনন্ত ও নরসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

এই শিলালিপির অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিহারে আবিস্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নেপালে হরিবর্মদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে। প্রথম খানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা", ইহা হরিবর্ম দেবের ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রযান, টীকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্মদেবের ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম দেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্মদেব, শ্যামলবর্মা অথবা ভোজবর্মার পরবর্তীকলে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্মা বা জাতবর্মার পূর্ববর্তী নহেন।"

নৃপতি হরিবর্মা "নিখিল-শাস্ত্র-নিপুণ, বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়– "মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক

১. "গৌড়ের ইতিহাস"– রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রথম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব ১৪৪-১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালার ইতিহাস-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা Epigraphia Indica. Vol, VI, P.P. 2057.

মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্মদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেনঃ– "ভবভূমিবার্তা ও ভবদেবের প্রশস্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গাধিপ হরিবর্ম দেবের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। হরিবর্মা অস্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীর যুক্তি বলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যেমন বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে দক্ষিণাপথ-পতি জৈনধর্মানুরাগী রাজেন্দ্রচোল রাঢ়-বঙ্গ আক্রমণ করেন, হরিবর্মদেবের হস্তে তাঁহারা পরাজিত হন। খুব সম্ভব সেই সময়েই হরিবর্মা কলিঙ্গ পর্যন্ত অধিকার করেন এবং ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ১০৮ দেব মন্দির নির্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। * * * হরিবর্মদেবের রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বৌদ্ধ প্রভাব-শূন্য হইতে পারে নাই, এই সময়ে বহু সংখ্যক বৌদ্ধাচার্য হরিবর্মদেবের অধিকার-মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের হস্তলিখিত বা রচিত গ্রন্থ এখনও নেপাল হইতে বাহির হইতেছে। তিব্বতের টেঙ্গুর গ্রন্থ-মধ্যেও হরিবর্মদেবের সময়ে রচিত বহু বৌদ্ধতন্ত্রের অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, প্রথম প্রথম হরিবর্মদেব বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই, ক্রমে ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত বা মীমাংসকগণের পরামর্শে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।"

হরিবর্মদেবের রাজত্বকাল লইয়া নানারূপ গোলযোগ চলিতেছে। কিলহর্ণের মতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। তিনি ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির লিপিকাল হইতে উহা নির্দেশ করিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও মতে হরিবর্মার রাজত্বকাল ১০২৫-১০৬৭ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে হরিবর্মা ভোজবর্মার পরবর্তী, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে তিনি বজ্রবর্মারও পূর্ববর্তী।[১]

'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন :–"কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রে হরিবর্মার অনামক পুত্রের অধিকার বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন্ সুযোগে যাদববর্ম-বংশ, বঙ্গের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বেলাব-লিপিতে এই বর্মবংশের যেরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতির বংশে এই রাজ-বংশের উদ্ভব এবং বজ্রবর্মা হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ভ।" স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেনঃ– "রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের

---

১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস– রাজন্যকাণ্ড ২৮৪-২৮৫ পৃষ্ঠা। The Dacca Review, 1912, July, P. 138. প্রবাসী ১৩২০, ৪৫৭ পৃষ্ঠা।

পশ্চিমার্ধ হইতে পূর্বার্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।[১]

আমরা রাজা হরিবর্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রামে প্রাপ্ত একখানি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি– (১) হরিবর্মার পিতা জ্যোতিবর্মা ছিলেন। (২) বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেবভট্টের পিতা। গোবর্ধন ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। (৩) হরিবর্মা বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন। (৪) হরিবর্মা পরম-বৈষ্ণব-পরমেশ্বরপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। (৫) তাঁহার প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী পঞ্চকুসুম শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের বড় পর্বত গ্রামে ছিল। (৬) স্ব শ্রী ত্রিষষ্ট্যাধিকষড়্-দ্রোণ্যুপেতহলভূমৌ শব্দে বোধ হয় প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। (৭) বাৎস্য-গোত্রীয় ভার্গবচ্যবন আপ্লুবৎ ঔর্ব জামদগ্ন্য প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী, ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্ট পুত্র বেদগর্ভ শর্মার পৌত্র, ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র, ভট্টপুত্র বেদার্থ বাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে তাম্রশাসন লিখিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। হরিবর্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২ বৎসর এই তাম্রশাসন প্রদান করেন। এই তাম্রশাসনেও চট্ট ভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

রামচন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্তা পাঠে জানা যায় : (ক) হরিবর্মা প্রথম অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের নরপতি ছিলেন, পরে বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। (খ) বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাতজন পণ্ডিত হরিবর্মার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। (গ) হরিবর্মা একাম্রকাননে অর্থাৎ, ভুবনেশ্বরে হরিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত বিগ্রহ, বহু সংখ্যক মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। (ঘ) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে হরিবর্মার ধর্ম-কাহিনী বিস্তারিত হইয়াছিল।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন

সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের সময় তিনি যখন কনোজ-আক্রমণ করেন "সে সময়ে সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। হরিবর্মদেব তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে গঙ্গাপতি বৈষ্ণব মিশ্র একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কান্যকুব্জের কর্ণাবতী সমাজে বাস করিতেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কোটালিপাড়া নামক স্থানে আপন বাসস্থান মনোনীত করেন [৯৪০ শক]। কনোজ রাজ্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। হরিবর্মা হিন্দুধর্মের উৎসাহদাতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের "শর্মসংমর্দনকারী" ছিলেন। ভবভূমিবর্তায় লিখিত আছে যে, হরিবর্মা নগেন্দ্র পত্তনাদি জয় করিয়াছিলেন, এবং জননীর বারাণসী গমন পূর্বক, বিশ্বেশ্বর পাদপদ্ম দর্শনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দগমনের জন্য একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্মাণ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতদূর পর্যন্ত বর্ম্ম নির্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। হরিবর্মদেব ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।"

---

১. বাঙ্গালার ইতিহাস ২৪৬ পৃষ্ঠা। (গৌড়ের ইতিহাস–শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়–১৪৪-১৪৭ পৃষ্ঠা। ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।)

"হরিবর্মদেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্‌বিজয়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্রচোল গৌড়-বঙ্গ-রাঢ় ও দণ্ডভুক্তিকা জয় করিতে এই সময় আগমন করেন। তিনি পূর্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও হরিবর্মদেবকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

অনেকে অনুমান করেন বিক্রমপুর-রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্মার রাস্তা।

বর্মরাজাদের বিক্রমপুর রাজ্যসীমা

বেলাব-লিপি আবিষ্কারের পর হইতেই বর্মরাজগণের সম্পর্কে আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য জানিতে সক্ষম হইয়াছি। মিঃ অ্যাস্কলি সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন:- [Historically we are given a clue to the origin of the Varma dynasty of Vikrampur, the line of descent is traced from the first king Brajavarma, through Jait varma and Syamala varma to Bhoja varma, the 4th representative of the dynasty. Much of this Information is new, and, to the best of my knowledge, it forms the first connected account of any historical facts in Bikrampur, previous to the Sen dynasty.] বর্ম রাজাদের বিক্রমপুর রাজ্য সীমা বর্ম রাজাদের সময় বিক্রমপুরের রাজ্য-সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এইবার সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের রাজ্য-সীমা সে সময়ে উত্তর দিকে সুবর্ণগাম বা সোনারগাঁর প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিঃ অ্যাস্কলি সাহেবের মতে- "In all probability the Kingdom must have extended to the first natural physical boundary of the old Brahmaputra near Rampurhat this brings us in dangerous proximity to the old remains of the Lakhma, and Banar Rivers. The extent of the Kingdom opens up a vast field for future enquiry; for we now find that at least the whole area of Sunargaon, which in the time of Bara-Bhuiya as was under the Sway of Isha Khan, must be added to the Bikrampur of Chand Ray and Kedar Ray, to form the Kingdom of the Varma dynasty."- সম্ভবতঃ বর্মরাজাদের সমকালে বিক্রমপুরের রাজ্যের সীমা রামপুরহাটের নিকটবর্তী প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্যন্ত প্রাকৃতিক সীমা রূপে নির্দিষ্ট ছিল। লক্ষ্যা ও বানার নদীর প্রাচীন গতি-প্রবাহও বোধ হয় ঐদিকেই ছিল। সমুদয় সুবর্ণগ্রাম ও বর্ম-রাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারভূঁইয়াদের সময়ে সুবর্ণগ্রাম ঈশাখাঁর অধিকারভুক্ত ছিল, পরে উহা চাঁদরায় কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বর্মরাজাদের সময়ে সুবর্ণগ্রাম যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ বিদ্যমান নাই।

বর্মবংশ বিক্রমপুর হইতে কি ভাবে কোন্ সময়ে লোপ পাইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় এই রাজবংশের নিম্নলিখিতরূপ বংশ-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন:-

বজ্রবর্ম
|
জৈত্রবর্ম
|
সামল বর্ম
|
ভোজ বর্ম
|
জ্যোতি বর্ম
|
হরি বর্ম
|
তাঁহার অনামক পুত্র

এবং তাঁহার মতে হরিবর্মদেবের পুত্রের সময় বিক্রমপুরের বর্ম-রাজ্যের অবসান হয় এবং সেন রাজাদের করতলগত হয়। [The dynasty perhaps came to an end with the son of Haribarman and the Sovereignity of Vikrampura passed into the hands of the Sena kings]। কুলপঞ্জীর মতে হরিবর্মার ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। বর্মরাজাদের তিনজন নৃপতি আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিক্রমপুরে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ের পালরাজাদের পূর্ববঙ্গে কোনও প্রভাবই ছিল না বলিয়া জানা যায়।

ভোজবর্ম দেবের বেলাব-লিপি হইতে জানা যাইতেছে যে– সিদ্ধলের সাবর্ণ ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশ কনোজ হইতে এ সময়ে বঙ্গদেশে আসেন। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় ইহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিয়াছেন।[১]

---

১. The Dacca Review Vol 2 No. 4 July, 1912. Pages 128-129.

সপ্তম অধ্যায়
স্বাধীন সেনরাজবংশ–বিজয়সেন-বিক্রমপুর

বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত সেনরাজবংশের নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। আমরা বাল্যকালে পাল, চন্দ্র বর্ম-বংশীয় রাজাদের কথা শুনি নাই, কিন্তু সেনরাজাদের কথা শুনিয়াছি; বিশেষ করিয়া নৃপতি বল্লালসেনের সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে কতরূপ অদ্ভুত গল্পই না শুনা গিয়াছে। কতদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যায় দিদিমার মুখে বল্লালের নানা অদ্ভুত কীর্তি-কাহিনীর কথা, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনিয়াছি। বল্লালসেনের নাম বিক্রমপুরবাসীর কাছে কতই না বিচিত্র স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন– সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব-পুরুষ কবে কোন্ শুভ মুহূর্তে বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্তও সঠিক্ ভাবে জানা যায় নাই। সেন রাজগণের যে সমুদয় তাম্রলিপি ও শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে– তাঁহারা কর্ণাট দেশবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

সেনরাজাদের পূর্বকথা

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়রাজমালার" উপক্রমণিকায় সেন রাজাদের কথা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন– "সেনরাজ-বংশ বাঙলার শেষ হিন্দু রাজবংশ হইলেও, কিরূপে যে রাজবংশ এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার-সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। জনশ্রুতি, এই রাজবংশকে নানা কল্পনা-জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয়-কাহিনীও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।"

কথা কয়টি অতি সত্য।

সেনরাজ-বংশের প্রকৃতপক্ষে প্রতাপশালী প্রথম রাজা বিজয়সেন দেবের [রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়:

বংশে তস্যামরস্ত্রীবিতরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্যে–
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচর্য্যৈর শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব শ্রবণপরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥

উমাপতি ধরের এই বাক্যে জানা যাইতেছে– সেন বংশ, কৌরব বা পাণ্ডব-বংশ হইতে উৎপন্ন।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতেও জানিতে পারি:

"পৌরণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণর্গণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণ্ণাট ক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ ॥
কৃত্বা নির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মধিকতরাস্তু প্যতানক নদ্যাং
নির্ন্নিক্তো যেন যুব দ্রি পুরুধিরকণা কীর্ন্নবীরঃ
কৃপাণঃ ॥"

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেন রাজারা "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনের বংশত-শম্ভূত।" 'বল্লাল-চরিতের' দ্বাদশ অধ্যায়ে এই বীরসেনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।[১]

বীরসেন

"গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা সেনরাজবংশের প্রবর্তকের নাম বীরসেনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছন:- "বীরসেন দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন, এবং চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্য বীরের নাম আছে; যথা-

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিলাখ্য-ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ত তোহভূত্তব শঙ্করঃ।
তদম্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদম্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমাল ততোহপি চ ॥"

সহ্যাদ্রি খণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪। ২৫-২৬ শ্লোঃ।

হাণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙলায় আগমন করেন। দেবীপুরাণে "অযোধ্যায়" বীরসেন নামক রাজার নাম আছে। আনন্দভট্টের "বল্লাল-চরিতে" আছে- বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন।[২] ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "হর্ষ-চরিতে" আছে- রাজ-গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া মহাদেবীর ভ্রাতা বীরসেন স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিঙ্গ-রাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। "হর্ষচরিতেই" সৌবীরপতি অন্য এক বীরসেন নাম পাওয়া যায়। এই সকল বীরসেন- সেনবংশের পূর্বপুরুষ নহেন; উমাপতি ধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন,- "বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন। সেন রাজবংশীয় অনেক রাজা শঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন; ইহাতে বোধহয়, সহ্যাদ্রি খণ্ডে যে বীরসেনের নাম আছে, তিনিই সেনবংশের পূর্বপুরুষ।" বলা বাহুল্য ইহা বিচারসহ নহে, অনুমান মাত্র।

১.২. Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. New series P .471.

সামন্তসেন

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ সামন্ত সেনের পূর্ববর্তী সেন নৃপতিরা রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কাটোয়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী সীতাহাটি গ্রামে আবিস্কৃত বল্লাল সেন দেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্বনিবাসীগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং ধবল কীর্তিতরঙ্গে আকাশ-তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচার পালন-খ্যাতি গর্বে গর্বান্বিত রাঢ় দেশকে অননুভূত [অশ্রুতপূর্ব] প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

"তাঁহাদিগের বংশে,– প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রু-সেনা সাগরের প্রলয়-তপন, সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্তি-জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল শোভাপ্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদ-বনের উল্লাস-লীলা সম্পাদক শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশ-নিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।

আমরা পূর্বে দেবপাড়া গ্রামে আবিস্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, "সামন্ত সেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকী বধ করিয়াছিলেন। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে হোমধূম-সুগন্ধী ঋষিগণের বাসস্থানে বিচারণ করিতেন। সামন্ত সেনের কোন খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই। তাঁহার পত্নীর নামও সেন রাজগণের কোনও লিপিতে দেখা যায় না।

সামন্ত সেন শেষ বয়সে গঙ্গা-পুলিনে আসিয়া বাস করেন যথাঃ

"উদগন্ধীন্যাজ্য ধূমৈর্মৃগ শিশুরপীতখিন্ন বৈথানসস্ত্রী
স্তন্য ক্ষীরাণি কীর-প্রকর-পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্তে শেষ বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যশ্রমাণি ॥

সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মপারায়ণানি" বা ব্রহ্মবাদী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি কর্ণাট হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া, গঙ্গাতীরে বাস-পূর্বক শেষ বয়স ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। প্রথম ভবদেবভট্ট সামন্তসেনের মন্ত্রী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, সামন্ত সেন হইতে নবদ্বীপের পত্তন হয়।"

হেমন্তসেন

সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষভলাঞ্ছন মহাদেবের পদপঙ্কজে ভ্রমরবৎ [লীন] থাকিতেন। গুণগ্রামই তাঁহার অহঙ্কার ছিল। তিনি [সরোবর-শোভা বিধ্বংসী] হেমন্ত কালের ন্যায়-মাত্র সরোবরের প্রলয় বিধান করিতেন। দেবপাড়ার শিলা-লিপিতে হেমন্ত সেন সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনিঃ

"অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীস্মাদমুস্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তা রাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদন বসানোদ্ভিন্ন নির্নীক্ত তশুদ্
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্ত সেনঃ।

নিজ ভুজমদমত্ত অরাতিগণকে বিনাশ করিয়া তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম ছিল যশোদেবী।

যথাঃ

"ম-হারাজ্ঞী যস্য স্বপর নিখিলান্তঃ পুরবধূ-
শিরোরত্ন শ্রেণী কিরণ সরণি স্মের চরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বী-ব্রতবিতত নিত্যোজ্জ্বল বশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।

কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, হেমন্ত সেন,- সুবর্ণরেখাতীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেখান হইতে দক্ষিণ-বঙ্গ দিয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গাধিকার করেন। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ির প্রাচীন নাম কাশীপুরী। ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী হতে জানা যায়, হেমন্ত সেনের নামান্তর ত্রিবিক্রম। রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে হেমন্ত সেন ত্রিবিক্রম নামে অভিহত হইয়াছেন।[১]

হেমন্ত সেন হইতে বিজয় সেন নামধেয় পৃথ্বীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক [বিক্রমাদিত্যকে] তিরস্কৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার যশোগীতি দিক্‌পাল গণের রাজনগরীতে কীর্তিত হইত।"

বিজয় সেন-শ্রীবিক্রমপুর

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- "বিজয় সেনই সেনরাজ বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। অনুমান হয় যে, বিজয় সেন প্রথমে রাঢ়দেশের অংশ-বিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকলরাজ অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বিজয় সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তর-রাঢ়া ও দক্ষিণ-রাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয় সেনই বোধ হয় পূর্ববঙ্গে বর্ম-বংশীয় ভোজবর্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। পাল-বংশীয় গৌড়েশ্বর-

১. About the time of the Kaivarta rebellion (C.A.D 1080) or a few years later, Chorganga the powerful king of Kalinga (A.D. 1076), extended his conquests to the extreme north of Orissa. Either a chief named Samanta Deva who came from the Deccan, and probably was an officer of Choraganga, -- Samanta Deva's son Hemantasen, founded a principality at Kasipuri, now Kasiari in the Mayurbhanja State. Neither of those chiefs seems to have acquired extensive power. V. A. Smithis Early History of Northern Inda, P. 403, গৌড়ের ইতিহাস, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৪৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গণের সহিত সেন-বংশীয় রাজগণের প্রীতি-বন্ধন ছিল না, কারণ রামপাল যখন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া সাহায্য ভিক্ষার জন্য দেশ-ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেন রাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা কৈবর্তবিদ্রোহ দমনে যোগদান করিলে সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্যই রাম-চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেন।"

বিজয় সেন বীরপুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন হইতে তাহা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায়। "তাঁহার শত্রু বণিতাগণ বিধবা হইয়া পলায়নার্থ বনান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জল-চিহ্নিত হার-মুক্তাদল সমূহ ছিন্ন করিয়া (ইতস্ততঃ) ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত করিলে, তাঁহাদিগের কুশবিক্ষত চরণতলের রুধির লিপ্ত (সেই) মুক্তাফল-সমূহ, গুঞ্জামালাধারিণী রমণীয় রমণীগণের স্তনকলসে ঘনালিঙ্গন লোলুপ পুলিন্দগণ (গুঞ্জা-ভ্রমে-লালকুঁচ) সযত্নে চয়ন করিয়া লইত।"

[এই] রাজা অবিনয়ের নিরাকরণ মানসে [স্বয়ং] ধনুর্বাণ হস্তে, কার্তবীর্য্যের ন্যায় প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ায় [উচ্চারিত] মন্ত্রপদ সকল জীব-লোককে [সর্ব প্রকার] ঈতি শূন্য করিয়া বিনয় মার্গে সংস্থাপিত করিয়াছিল।"

গৌড়েশ্বরের পরাজয়

দেবপাড়া-লিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন সমগ্র বরেন্দ্রভূমি স্বীয় করতলগত করিয়াছিলেন। বিজয় সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বিজয় সেন রাজা, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয় সেন মিথিলার রাজা নান্যদেবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।[১]

বিজয় সেন– "পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায় চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর চূড়ামণি প্রধান মহিষী বিলাসদেবী দীপ্তিলাভ করিতেন। তিনি সুতপস্যার পূণ্য ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় বল্লাল সেন [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন।

বিজয় সেন শূরবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহকরেন, তাঁহার পুত্রের নাম বল্লাল সেন। বিজয় সেন প্রায় পঁয়িত্রিশ বৎসর-কাল রাজত্ব করেন।

তাম্রশাসনের পরিচয়

বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি

১. The real founder of the Sena kingdom was Hemanta sen's son, Vijayasena who reigned from about 1100 to 1165. His wife was a member of the Sura family, and this alliance may have increased his prestige. * * He defeated Navya and Vira, attacked the lord of Gauda, humbled the king of kamrupa, protected the king of Kalinga, made many lesser rulers captive and sailed his fleet up the Ganges. Of these the lord of Gauda has been identified as Madanapala, who was driven out of Bengal by the Senas * * Vijayasena found Pala territory divided up among a number of Petty dynasties, of which till his time the Senas had themselves been one. Cambridge shorter History Page 148.

প্রচারের জন্য স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক মহাশয়ের নিকট বাঙালী মাত্রেই ঋণী থাকিবেন। তিনি এই তাম্রশাসনের বিবরণ ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রিকায় এবং ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন– "বিজয় সেনের ৩১ শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বিলাস দেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন পিতৃরাজ্যের অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হ্রদ-তীরে পাষাণ নির্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেন্দ্রক শিল্পী-গোষ্ঠীচূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়সেনের তাম্রশাসনখানি কোন স্থানে আবিস্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্র ব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা সুমেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পত্তি, তৎকালে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তদবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানির দ্বারা বিজয়সেনদেব তাঁহার মহিষী বিলাসদেবীর কনকতুলা-পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভাট্ট বড়া গ্রামে চারিটি পাটক, কান্তিজোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশবিনির্গত রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্মার পৌত্র, ভাস্কর দেবশর্মার পুত্র বাৎস্য গোত্রীয়, ঋগ্বেদের আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয়কর শর্মাকে তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন 'বিক্রমপুররোপকারিকামধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাত।"[১]

বিজয়সেন রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ও বিক্রমপুর রাজ্য

আমরা ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, বিজয়সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই বিক্রমপুরে বিজয় সেনের রাজ্য এবং রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং বর্মরাজগণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিজয়সেনই বর্মবংশীয় ভোজবর্মা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হাত হইতে বঙ্গের আধিপত্য হস্তগত করিয়াছিলেন। 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন,– "বর্মবংশের অভ্যুদয় এবং

১. বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা।

মদনপালের দুর্বলতা-নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র [হেমন্ত সেন ও রাজ্ঞী যশোদাদেবীর পুত্র] বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড় রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্মরাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই সম্ভবতঃ স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন।"[১] "গৌড় রাজমালার" এই মত নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা হেমন্তসেন যে বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

বিজয় সেনের আবির্ভাব কাল

বিজয় সেন, সেন বংশের প্রধান নৃপতি এবং তাঁহার সময় হইতেই যে রাজ্য বিস্তৃত হয় সেকথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনেক রাজাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। বল্লাল সেন স্বকৃত "দানসাগর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,–

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতা প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীর-বারেন্দ-দোষ নামক কারিকায় আছে,–অনেক বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন;– বিজয়সেনের গোড়াধিকারের পর বৈদিক ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হন।

উমাপতিধর লিখিয়াছেন,– বিজয়সেনের কীর্তিমালা প্রাচেতম্ অর্থাৎ, বাল্মীকি কিংবা পরাশরনন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,– আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। উমাপতিধর কৃত এই প্রশস্তি-পত্র বারেন্দ্র-শিল্পী-কুলচূড়ামণি রাণক শুলপানি খনন করিয়াছিলেন [চখান] শুলপাণি, ধর্মোপনপ্তা মদন দাসের নপ্তা ও বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন। এখন যেমন দলিলে লেখকের নাম থাকে, তখনও সেইরূপ তাম্রশাসনে খনকের নাম থাকিত।

বিজয়সেনের রাজত্বকালে মহাপ্রতাপশালী চোড়গঙ্গদেব কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। চোড়গঙ্গদেব ৯৯৯ শকে কলিঙ্গের রাজা হন। বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে, বিজয়সেন কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিজয়সেনের সহ চোড়গঙ্গের বন্ধুত্ব ছিল। বিজয়সেন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া বন্ধু চোড়গঙ্গকে প্রদান করেন, ইহাই সম্ভব। ৯৯৯ শকে বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর ছিল। নীলকণ্ঠ রচিত "যশোধর বংশমালা" নামক

১. গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃষ্ঠা।

বৈদিককুলগ্রন্থ মতে বিজয়সেন ৯০৪ শকে গৌড়ে রাজা হন। বিজয়সেনের নামান্তর ধীসেন, যথাঃ

"ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোহসৌ বিজিতারাতি সংহতিঃ।
বিজয়নামকশ্চাসৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ ॥
[সাতকড়ি ঘটক কৃত কুলপঞ্জী]

বিজয়সেনের [বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর] উপাধি ছিল, উপাধি দেখিলে বোধ হয় তিনি শৈব ছিলেন। "সেকশুভোদয়ায়" লিখিত আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ১০৪১ শকে ৯০ বৎসর বয়সে বিজয়সেনের মৃত্যু হয়।

'গৌড়রাজমালার' লেখক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসরণ করিয়া সামন্ত সেনকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে হেমন্ত সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয়পাদ [আনুমানিক ১১২৫-১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ] স্থাপিত করিতে চাহেন।

বিজয়সেনের নৌবিতান

বিজয় সেন যে অমিতবিক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছেঃ–

"সেই হেমন্তসেনদেব হইতে বিজয় সেন নামধেয় পৃথ্বিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক বিক্রমাদিত্যকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার যশোগীতি দিক্‌পালগণের রাজনগরীতে কীর্তিত হইত।"[১]

দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, বিজয় সেনের নৌ-বিতান বা নৌ-বিহার ছিল। যথা :

"পাশ্চাত্য জয়-চক্র কেলিষু যস্যযাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে
ভর্গস্য মৌলি সরিদম্ভাসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্‌ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥
[দেবপাড়া প্রস্তরলিপি ২২ শ্লোক]

অনেকে অনুমান করেন যে, বিজয়সেন সাহসাঙ্ক নামক একজন নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। আমাদের মনে হয় প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত করিয়াছেন।

[In verse 7, Vijayasena is qualified by the phrase Nirvayaja Vikrama tiraskrita-Sahasanka which according to Mr. Banerji means– that

১. গৌড়ের ইতিহাস ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা। Epigraphia Indica Vol. 1, page 309.

"Vijayasena defeated a king naed Sasanka (Sahasanka). He concludes that Sahasanka is to be identified with a prince called Salvahandndeva, mentioned in a grant of his son Somavarmadeva, which the late Professor Keelhorn referred to about 1050 A.D. But it is doubtful whether the passage in question has any historical bearing at all. The poet seems to indicate by means of a rhetoric that Vijayasena weilded great power (Vikrama) which eclipsed even that of Vikramaditya. This most probably bears an allusion to the mythical hero of that name and not to any of Vijayasena's contemporaries. See Inscriptions of Bengal N. G. Majumdar, Rajshahi, 1929].

অর্থাৎ, "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়াচ্ছলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ-পথে যে নৌ-বিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্দুকলার ন্যায় জ্বলিতেছে।"

এই নৌ-বিতান বিজয়সেন গঙ্গার বীচিমালা বিক্ষুব্ধ করিয়া কোন্ রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।– 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার মতে "গৌড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [পাশ্চাত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে 'নৌ-বিতান' প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্মরাজ" কর্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় যে, "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয়সেনের যে নৌ-বিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ বর্মরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে সম্ভবতঃ এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল।" 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবুর এই অনুমান আমরা সমর্থন করি। আমাদেরও মনে হয় যে, নদী-মাতৃক-দেশ বিক্রমপুর হইতেই পরবর্তীকালে এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যেঃ

"It was Vijaya Sen who once for all established the supremacy of the Senas, and practically brought the whole of Eastern India under his sway. It was he who conquered Varendera and Pundra from a Pala king described as Gaudendra in Sena Epigraphs."

বিজয়সেন যে পূর্ব-ভারতের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ বিদ্যমান নাই। এই নৃপতি বিজয়সেনই গৌড়েন্দ্র উপাধিক একজন পাল-নৃপতির হস্ত হইতে বারেন্দ্র এবং পৌণ্ড্র অধিকার করিয়াছিলেন।[১]

---

১. Samantasen's grandsom, Vijayasena, certainly raised himself to the rank of an independent sovereign early in the twelfth century (? A. D. III) and wrested a large part of the Bengal province from the Palas, thus firmaly establishing the Sena dynasty. He also carried on successful wars with other powes, and enjoyed a long reign of about forty years, more or less. He kept on terms of friendship with Choragang of kalinga who ruled that kingdom for the extraordinary term of seventy one years. The Early History of India of Vincent A. Smith, Page 103.

বিজয়সেনের মাত্রী

দায়ভাগ রচয়িতা জীমূতবাহন, বিজয়সেনের অমাত্য ও প্রাড়্বিপাক্ ছিলেন। বিজয়সেনের এক নাম ছিল বিস্মক্সেন। এড় মিশ্রের কারিকায় আছে:

"পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট্ বিস্মকসেনো মহাব্রতঃ।
জীমুতোহপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ ॥

বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর ও শ্রীবিক্রমপুর

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন– "বিজয়সেন, ভূরশুটে বিজয়পুর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন।" অনেকে অনুমান করেন যে, রাজসাহীর নিকটবর্তী বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন বিজয়পুর। দেবপাড়া-প্রশস্তি অর্থে বিজয় সেনের স্তুতিপূর্ণ শ্লোকসমূহ হইতে বিশেষ করিয়া বিজয়সেন কর্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। দেবপাড়া লিপির পরে আমরা বিজয়সেনদেবের যে তাম্রশাসনখানা [বারাকপুর] পাই, তাহার ২২-২৩ পংক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে:

"শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"

কাজেই ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিজয়সেন বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেও তাঁহার প্রকৃত রাজধানী স্কন্ধাবার শ্রীবিক্রমপুরেই ছিল। যদি তাহা না হইতে তাহা হইলে তাঁহার পত্নী বল্লালসেন দেবের জননী বিলাসদেবী "কনক-তুলা-পুরুষ মহাদান' বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে, করিবেন কেন?

'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে যে রাজধানী বুঝায় তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার কিলহর্ণের (Dr. Kielhorn) মতে স্কন্ধাবার [Skandhavara] শব্দে রাজধানীকেই বুঝায়। হেমচন্দ্র কৃত 'অভিধানচিন্তামণিতে'[১] আছে:

স্কন্ধাবারো রাজধানী কোট্ট দুর্গৈঃ পুনঃ সমে।
গয়াষু গয়ারাজর্ষে কন্যা কুব্জং মহোদয়ম্ ॥

হলায়ুধ বলেন:

স্কন্ধাবারঃ ইতি প্রাক্তৈঃ রাজধানী নিগদ্যতে।
শানানগরমাখ্যাতং তথোপনগরংবুধৈ ॥

'স্কন্ধাবার' শব্দ যে চন্দ্র, বর্ম ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও 'সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ বলিতে 'সেনানিবাস' বিক্রমপুরকে না বুঝাইয়া রাজধানী বিক্রমপুরকেই বুঝাইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে[২]:

"বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে সতি সোমগ্রহে অস্মন্মহাদেবী শ্রীমদ্বিলাসদেব্যা কনকতুলাপুরুষমহাদানে হোমকর্ম দক্ষিণ......."

১. *Abhudhan chintamani* by Hemchandra, edited by N.G. Bhattachariya Caclutta P. 25. *Abhidhanaratnvmala* by Halayudha, edited by Thomas Autrecht 1861.

২. The Capital of the sena king of Bengal. India Culture Vol. II No 9 Adris Banerji.

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইল:

To this Mr. Majumder had added a lengthy note, suggesting that this passage makes it highly probable that *Vikrampura* was one of the Capitals, if not the capital of Vijayasena; and in our opinion he is right when he says, that *The word upakarika,* it may be argued, means only a temporary camp for royal residence, and not a fixed palace, But the very fact that the queen performed an elaborate *tulapurusha-mahadana* within the *Vikrampura-upakarika* is itself sufficient to show that Vijayasena had something like permanent residence, and not a temporary camp at Vikrampura. *This together with the fact that the Sena inscriptions invariably mention Vikramapura as the Skandhavara, unmistakably demonstrates, that it was Vikrampura which was the capital of the Sena kings of Bengal.*

বল্লাল সেন

বিজয়সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লালসেন রাজা হইলেন। তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে: পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায়, চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর-চূড়ামণি প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী দীপ্তি লাভ করিতেন।"

"তিনি সুতপস্যার পুণ্য ফলে গুণগৌরবে অতুলনীয় বল্লালসেন [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় বীর, নরদেব সিংহ পুত্র পিতার অব্যবহিত পরেই সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

বল্লালসেনের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে নানা অলীক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে সমুদয় যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা সুধী ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমাদের দেশে যাঁহারা বড় হন, তাঁহাদিগকে 'অবতার' করিয়া তোলা এবং তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই আমরা ঐ সমুদয় কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জীর উপন্যাস সযত্নে পরিহার করিলাম।[১]

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন– "বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।" একথা সত্য। তাঁহার লিখিত 'দানসাগরে লিখিত সেনবংশ-বর্ণনা হইতে জানা যায়:

> "ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃকলৌ।
> শ্রীকান্তোহোপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।"

"বল্লালসেনের জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যাঁহারা কিংবদন্তী ইত্যাদি জানিতে সমুৎসুক তাঁহারা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস", 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী, 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড– শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সেনরাজ বংশ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রতিভা, ১৩১৮, ৪৬২-৪৭৮ পৃষ্ঠা। বিবিধ কুলপঞ্জী, ঢাকুর, রামজয় কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জী, প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

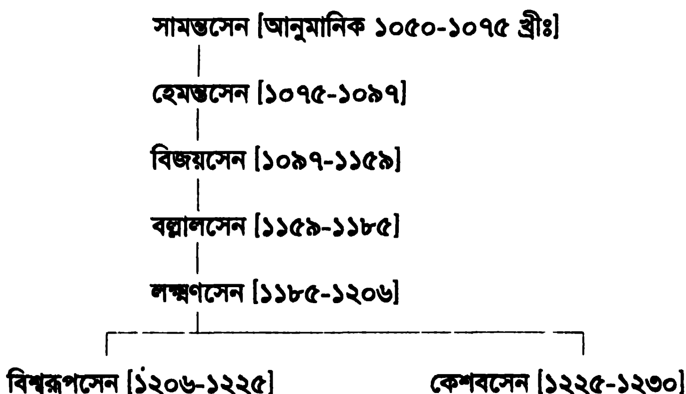
বল্লালসেন সম্বন্ধে বিবিধ কিংবন্তীর মূলে 'প্রত্যক্ষ নারায়ণ' এই শব্দ দুইটি যে অনেক কাজ করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি 'প্রত্যক্ষ নারায়ণ' তাঁহার জন্মের ইতিহাসে অলৌকিকত্ব আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বল্লালসেনের আবির্ভাব-কাল

বলালসেনের আর্বিভাব-কাল সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়াছে। বর্তমান সময়ে পণ্ডিতগণ বিবিধ গবেষণার দ্বারা সেনরাজাদের একটা কাল-নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দান–সাগরের" এবং 'অদ্ভুতসাগরের' রচনা-কাল বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। বিক্রমপুর ধলছত্র গ্রামনিবাসী বৈদিক-ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ও বাগ্মী স্বর্গত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের বাড়িতে বল্লালসেন-কৃত একখানি 'দানসাগর' গ্রন্থ ছিল, সেই বইখানা ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টী. র‍্যাঙ্কিন মহাশয় উক্ত সাংখ্যসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই মূল গ্রন্থখানা বর্তমানে কোথায় আছে তাহা আমরা অবগত নহি, সে বইখানার অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহা হইলে হয়ত-বা প্রকৃত সত্য কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

বর্তমান সময়ে সেনরাজগণের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে:

সেনরাজ বংশলতা



এ বিষয় বাদানুবাদ নিস্প্রয়োজন। সেন-নৃপতিরা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে গৌড়-বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।[১] 'দানসগর' রচনা-কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

১. গৌড়রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা। (1) The Chandra dynasty ruled over the entire realm of Vanga including Samatata, Harikela and Chandra dwipa (Mod. Backergonj District). But they were supplanted by the Varmans in the beginning of the 11th centruy who in their turn were very soon ousted by the senas. During their rule Vanga was included in Pundravardhan bhukti. Dr. B. C. Law, Indian Culture. July 1934. Page 63.

যাইয়া সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ 'গৌড়রাজমালায়' লিখিয়াছেন:- "দানসাগর স্মৃতি নিবন্ধ এবং "অদ্ভুতসাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাঁহারা স্মৃতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল-বিজ্ঞাপক রচনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন।" আমাদের নিকট 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

বল্লালের রাজ্য-শাসন ক্ষমতা

বল্লালসেন শাসন-দক্ষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নাম বর্তমানকাল পর্যন্তও সমভাবে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন:- "বাঙলার কোন হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই জন্যই নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, তিনি বাঙলা দেশের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বারেন্দ্র[১], বঙ্গ[২], বাগ্‌ড়ি[৩], রাঢ়[৪], মিথিলা[৫] সমগ্র বঙ্গদেশকে এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

নৃপতি বল্লাল শাসন-শৃঙ্খলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক-একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে হেমিল্টনের গ্রন্থ হইতে ঐ বিভাগের বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন।" একথা সত্য যে, বল্লালের অনেক পূর্ব হইতেই রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, উপবঙ্গ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা বলেন- "সুতরাং বল্লালসেনকে এই বিভাগের কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হেমিল্টন সাহেব কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসনসৌকর্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ-বিষয়ে

---

১. Barendra-Bounded by the Mahananda on the west; by Padma or great branch of Ganges, on the south; by the Korotoya on the East by adjacent Governments on the North.

২. Banga-or the territory east from Krotoya towards the Brahmaputtra. The capital of Bengal both before etc. afterwards, * * * in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

৩. Bagri-or the Delta called also Dwipa, or the island bounded, on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by sea and other bounded by the Hughly River or Bhagirathi.

৪. Rarhi-bounded by the Hughli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the west and South.

৫. Maithila-bounded by the Mahananda and Gour on the esat the Hughli or Bhagirathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan Vol No. 1, P. 114.

আনন্দভট্ট কর্তৃক বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' পরিশিষ্টে লিখিত আছে:

"দানসাগর গ্রন্থস্য প্রণেতা লিখিতস্তথা।
বিজয়সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্তসেন পৌত্রকঃ ॥
বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চখণ্ডেন্ তদ্ যথা।
বঙ্গ বাগড়িবারেন্দ্র রাঢ়াশ্চ মিথিলা তথা ॥

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন- "বল্লালসেন রাজা হইয়া আপনার রাজ্য রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে এক-একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ববঙ্গের ভার পান। পূর্ব হইতে গৌড় রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। শূর বংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্র দেশের বারেন্দ্র নাম হয়। পরবর্তী কালে উপবঙ্গের বাগড়ি নাম হয়।[১]
"দিগ্বিজয়প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে;-

ভাগীরথ্যাঃ পূর্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে
পঞ্চমযোজন পরিমিতোহ্যু পবঙ্কোহি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্য নৃপ-শার্দুলবহুলাসু নদীষু চ ॥"

· বল্লালসেনের পক্ষে রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য এইরূপ বিভাগ বা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। বল্লালসেন রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়াছিলেন, ইহা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস'প্রণেতা বলেন:

"বল্লালসেনের সমগ্র রাজ্য পাঁচটি প্রধান "ভুক্তি" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা: বঙ্গ, মিথিলা, বারেন্দ্র, রাঢ় ও বাগড়ী; মিথিলার পূর্ব নাম তীরভুক্তি। এই ভুক্তিগুলি পুনরায় "মণ্ডল" বা মণ্ডলিকায় বিভক্ত ছিল। মণ্ডল অতি প্রাচীন হিন্দু শব্দ। ভাগবতাদি পুরাণেও মণ্ডলের কথা আছে। মুসলমান যুগ হইতে মহল বা জেলা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক জেলায় যেমন এক্ষণে কতকগুলি করিয়া সবডিভিসন বা উপবিভাগ আছে, সে রাজত্বে মণ্ডলসমূহও সেইরূপ কতকগুলি "বিষয়" বা শাসনে বিভক্ত ছিল। এখনও 'বিষয়' কথা চলিয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার প্রভৃতি "বিষয়ী" লোকে বিষয়-কার্য দেখে এবং বিষয় রক্ষা করে। দেশে কুশাসন থাকিলেও এখন আর "শাসন" কথার পূর্ব অর্থ নাই, ব্রহ্মশাসন প্রভৃতি গ্রামের নাম পূর্ব-শাসনের নাম চিহ্ন

১. এই উপবঙ্গ নদী ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। বোধ হয় বাগুরি বা বাউরি জাতির নামানুসারে বাগড়ি নাম হইয়াছে। উপবঙ্গের গঠনকালে বারংবার আগ্নেয়-উৎপাত ঘটিয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চল খনন করিয়া দেখা গিয়াছে- সে-প্রদেশের অরণ্য, অরণ্য-জন্তু সহ বারংবার বসিয়া গিয়াছিল। বঙ্গ ও উপবঙ্গ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ (মেঘনা) ও গঙ্গার বদ্বীপে গঠিত। রাঢ়, বরেন্দ্র, ও মিথিলা পূর্ব হইতেই ধন-জন পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু বাগড়িতে মনুষ্যের বাস ছিল না; এই স্থান সমুদ্র-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। আকবরনামায় ইহার ভাটি নাম দেখা যায়। বাগড়ির দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল। পূর্বে বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে ছিল; তখন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত; অতএব বিক্রমপুর, পূর্বে বাগড়ির অন্তর্গত ছিল। এখন উহা বঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। বাগড়ির এই অংশই প্রাচীন সমতট।" তাঁহার এই উক্তি প্রমাণসহ নহে।

রাখিয়াছে।" বিক্রমপুরে 'শাসন' সংযুক্ত অনেক গ্রাম আছে। এখানে শুধু একটি গ্রামের নাম করিলাম, যেমন– 'শাসন গাঁ'।

বল্লালসেনের পূর্বেও এইরূপ বিভাগ ছিল এবং তাহা স্বাভাবিক, কেননা শাসন সৌকার্যার্থে এইরূপ বিভাগ ভারতের সর্বত্রই নৃপতিরা করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই বল্লালসেনের ন্যায় একজন নৃপতির পক্ষে এইরূপ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য বা ভুক্তির জন্য স্বতন্ত্র রাজধানী এবং শাসনকর্তা নিয়োগ করা স্বাভাবিক, ইহাতে বল্লালের কৃতিত্বেরই কারণ রহিয়াছে, অকৃতিত্বের কোনও কারণ বিদ্যমান নাই।

বল্লালের নাম একটি কারণে বাঙলা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, তাহা হইতেছে তৎকর্তৃক কৌলিন্য, বা আভিজাত্য সংস্থাপন। এক সময় বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-সমাজে কৌলিন্যের নিদারুণ পীড়নে সমাজ যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন বিক্রমপুরের গ্রামে-গ্রামে, মাঠে-মাঠে গীত হইত:

"ভাল ফল্‌লো ফল বল্লালীতে,
মিল্‌লো বর এক কচমা ছেলে!"

কিংবা–

বল্লালী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।
ডুবলো ভারত কদাচার, সোনার বাংলা যায়রে ছারেখারে!

ইত্যাদি গীত শুনা যাইত– এজন্য বল্লালের নাম বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। কৌলিন্যের প্রবর্তক বল্লালসেনের নাম বংশপরম্পরাগত পরিকীর্তিত হইয়া আসিতেছে।

বল্লালসেন ও কৌলিন্য-প্রথা

কোন কোন ঐতিহাসিক বল্লালসেন কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তক কিনা সে-বিষয়েই সন্দেহ করেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই এই সংশয় উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন– "বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্র-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপ তাঁহাদিগের তাম্রশাসন-সমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই। এবং শাসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্য-প্রথা বল্লালসেন কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।"

এ সম্বন্ধে আমরা রাখালবাবুর অভিমত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বংশপরম্পরাগত প্রবাহ ও বিবিধ কুলগ্রন্থ হইতে আমরা এই কৌলিন্য সংস্থাপনের প্রমাণ পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ইহা অবিশ্বাস্য এবং কুলশাস্ত্রে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত কথা থাকে বলিয়াই যে তাহার সমুদয় অংশই পরিত্যজ্য তাহা নহে।

"বল্লালী কুলপ্রথা বলিতে কোন জিনিস ছিল না, এরূপ বলা যায় না। দেশশুদ্ধ পণ্ডিত-ঘটকেরা একেবারে বায়বীয় মন্দির গঠন করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। বিশেষতঃ এই কৌলিন্য সম্বন্ধীয় প্রবাদ-কথা এরূপ ভাবে বাঙালীর অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাঙালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বল্লালী আভিজাত্যের সহিত পরিচিত যে, ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। প্রবাদ বাদ দিয়া বোধ হয় জগতের কোন দেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রবাদে রঞ্জিত পল্লবিত কাহিনী থাকিলেও সকল ঐতিহাসিকের নিকট ইহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙলাদেশে বল্লালসেনের মত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই; বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না, আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্যাস এই আভিজাত্য।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদ্‌রচিত 'বৃহৎ বঙ্গে' রাখালবাবুর কৌলীন্য-প্রথার মন্তব্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন– "বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলীন্য যে বল্লাল কৃত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তিনি বলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই।* তাম্রশাসনে কোন রাজার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়।* * যদি বল্লালসেন এই প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া থাকেন, তবে এই অদ্ভুত কৌলীন্য-প্রথার উদ্ভাবক অন্য কেহ অবশ্যই থাকিত, অন্ততঃ জনশ্রুতিতেও তাহার নাম পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রন্থে এই কথাটি পাওয়া যায়–

কৌলীন্য-প্রথা বল্লালসেন প্রবর্তিত। যাঁহারা এই কৌলীন্য-লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই কথা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কুলজী-পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। দান-সম্বন্ধীয় পুস্তকে কিংবা জ্যোতিষের গ্রন্থে বল্লালসেন কেনই-বা সমাজ-সংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন। সুতরাং, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরে কৌলীন্যের অনুল্লেখ অগ্রাহ্য হইতে পারে না।" রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[১]

চাকুরে বল্লালসেন সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল
কাহার কুলিন পদ কাড়িয়া লইল।"

বৈদ্যকুল গ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলিয়াছেনঃ

"তেন হি ভূমি পালেন বল্লালসেন মাহাত্মনা।
স্থাপিতা কুল মর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাং ॥

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন– "বল্লালসেনের সময় রাঢ়, বরেন্দ্রে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন। বল্লালসেন ইহাদিগকে রাজসংসারের সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিবার জন্য ইহাদের সংখ্যা গ্রহণ করেন ও গুণানুসারে ইহাদের মধ্যে পদমর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন। মর্যাদা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কুলীন নামে খ্যাত হন। এই

১. বৃহৎ-বঙ্গ প্রথম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা।

কার্যের জন্য বল্লালসেনের নাম বঙ্গদেশে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বল্লালসেন যে সম্মান দান করেন, তাহা বংশগত নয়– ব্যক্তিগত, এখন কৌলীন্য বংশগত হওয়ায়, বিবিধ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। বিজয় সেন বৈদিক মার্গানুগত ছিলেন, বল্লাল সেন তান্ত্রিক মতের সমাদর করিতেন। যাঁহারা বল্লালসেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলিন্য-মর্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার আছে, বল্লালসেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বল্লালসেনের পূর্বেও সমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত ছিল।"[১]

বল্লালসেন নিয়ম করেন যে, প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর, কুলীনদের নির্বাচন হইবে। এই সময়ে কৌলিন্যপদপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ কৌলিন্যভ্রষ্ট এবং অকুলীন সদাচার ব্যক্তিও কৌলিন্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময় ইহার নির্বাচনের সময় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নির্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং নিয়ম করেন যে, কৌলিন্য-মর্যাদা বংশানুগত হইবে।

আদিশূর-নৃপতি শকাব্দ সহস্র শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনেন। কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানেরা বারেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে বসতি করিয়া বংশবিস্তার করেন। আদিশূরের ৭।৮ পুরুষ পরে যখন বল্লালসেন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানগণকে অসদাচারপরায়ণ এবং বেদজ্ঞানী-বিমূঢ় দেখিয়া তাঁহাদের উন্নতির মানসে তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, রাঢ় দেশবাসী রাঢ়ীয়গণের মধ্যে আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর কর্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য-মর্যাদার উৎকর্ষ-বিধান তথা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলিন্য-মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন ঐরূপ কৌলিন্য-মর্যাদার উৎকর্ষ-বিধান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, যাহাতে কুলীনগণ সদাচারপরায়ন থাকেন, তদর্থে ঘটক নিয়োগ করিয়াছিলেন। যথাঃ

"বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্ত্তা, ন্যূনাতিরিক্তপরিণামযথার্থবক্তা।

পর্য্যাংবিপর্য্যগণনঞ্চ্য করোতি যশ্চ, শশ্বনৃপেন গদিতো ঘটকঃ স এব ॥

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রণীত। ২।৭ কৌলিন্য-প্রথা, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' ও 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, এবং 'ঢাকার ইতিহাস প্রণেতাও বিস্তারিত ভাবে কৌলিন্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বল্লালসেন কর্তৃক শ্রেণী বিভাগ এবং ঘটক নিয়োগ হইবার পূর্বে রাঢ় দেশগামী শ্রীহর্ষ তনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে, একখানি গ্রন্থ লেখেন। পরে উদায়নাচার্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রকুল বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কুলঘটিত প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করা বৃথা। বর্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়; তাহার কোনখানিই শকাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা।

কাহারও কাহারও মতে যাঁহারা বল্লালসেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলিন্য-মর্যাদা প্রদান করেন।

· আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধাকুললক্ষণম্ ॥

সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত

রাঢ়ীয় ঘটকদিগের নিকট, ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলী, মিশ্রাচার্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ, [সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত] শ্লোক সংখ্যা ২,১২০। ইহাকে মিশ্রগ্রন্থ কহে। ইহা হইতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নাম মিশ্রগ্রন্থ হইয়াছে, গোপাল শর্মা কৃত ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা। ফুলিয়া কুল বর্ণন। বাচস্পতি মিশ্র ঘটক-কৃত কুলরাম। রামহরি তর্কালঙ্কার কৃত মেলমালা [বাঙলা পদ্যে লিখিত, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে। কুলার্ণব-সাগর-প্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে কৌলিন্যের নানা কথা আছে। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। ঘটকের কার্য দোষাবহ বিবেচনায় বারেন্দ্র অধ্যাপকগণ ঘটকের কর্মে না যাওয়াতে বারেন্দ্র কুলের কুলগ্রন্থ বাঙলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এখনও রাঢ়ীয় ঘটকদের মধ্যে বিদ্বান্ ও সংস্কৃতজ্ঞ লোক পাওয়া যায়। বারেন্দ্র ঘটকদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ ইহা মনে করা দুরাশা মাত্র, অনেকে বাঙলাভাষাই ভালরূপ জানেন না।– গৌড়ে ব্রাহ্মণ, উপক্রমণিকা ৫।৬ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক ঐতিহাসিকই একবাক্যে বল্লালসেনের দ্বারা কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্তনের কথা স্বীকার করিয়াছেন।[১]

---

১. ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন: (১) বিজয় সেন বঙ্গ দেশে যে নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন তাহা সেন বংশ পরিচিত। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্ত সেন নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্ব ইঁহারা পশ্চিম বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন শূরবংশের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গদেশে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তক। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' ৯৪ পৃষ্ঠা।
(২) The dominions acquired by Vijayasena were transmitted (C.A.D. 1158) to his son Vallalsena, famous in Bengal tradition as Ballalsen, who is credited with having reorgaized the caste system and introduced thc practice of Kulinism among Brahmans, Baidyas, and kayasthas. Early history of India, V A. smith P. 403"
(৩) বল্লালসেন [আনুমানিক ১১৫৯-৮৫] বিজয়সেনের শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেন। সেন বংশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নরপতি। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বল্লালের স্থান অতি উচ্চে। তিনি এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৮১ পৃষ্ঠা। গৌড় বঙ্গের সেনবংশ। শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ৮১ পৃষ্ঠা।
The sena kings were Saivas. Their seal bore an image of Sadasiva and as the Gupta Emperors had *virudas* ending with aditya, they had virudas ending with sankara : thus Vijayasena was Vrsabha-Sankara, *Vallalsena was Nihasanka Sankara* and so on. It is curious to note that sone Vaidya families of Bengal affect this sort of name even at the present day– Finger posts of Bengal History P. 455. Bijoy Nath Sarker. The Indian Historical quarterly, Vol. VII. No 3 September, 1931.

The Combridge Shorter History of India Cambridge P. 148.

বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা : পুরাণ

বল্লালসেন প্রতিভাশালী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" বিখ্যাত গ্রন্থ। 'দানসাগর' গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ১৩০৫ প্রকার দানের বিষয়, সময় ও পত্রাদির আলোচিত হইয়াছে। "অদ্ভুত সাগরে"– বৃদ্ধগর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, বরাহমিহিরাচার্য, আর্য ভাগবত, আগ্নেয়, মৎস্যপুরাণ, রামায়ণ, ভারতাখ্যান, হরিবংশ, বিষ্ণুবর্মোত্তর প্রভৃতি উপপুরাণ ও শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেন: He was celebrated for his learning, several compilations being attributed to him. He regined from about 1165 to 1185.

১০৯১ শকে 'দানসাগর' এই গ্রন্থ বিরচিত হয়;– নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্ বল্লালসেনের পূর্ণশশি নবদশমিতে শক বর্ষে 'দানসাগরো রচিতঃ। রচনায় দুই বৎসরকাল লাগিয়াছিল। এই গ্রন্থে অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে সবিশেষ সমাদৃত।

বল্লালসেন "দানসাগর" গ্রন্থে নিজ বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতেই বল্লালসেন কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে।

ছন্দোভিশ্চৈকন্দ্যেশ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ত্মোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ।
তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দ প্রণয়োপভোগ সুলভ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্ত পরিপন্থি পঙ্কজসরঃ স্যান্দস্যনৈঃ সন্ধিকৈ-
রুদগীত স্বগুণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্ত সেনোহজনি।
তদনু বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরোন্দ্রো-
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখর বিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তং
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবোরাজ বংশাঃ ॥
সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্নুচিত শ্রীর্দ্দানবায়াং ঘনৈ
রাসারৈরভিষিক্ত নির্ম্মল যশঃ শালেয় ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদ সর্ব্বোত্তরক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোহজনি গুণাবির্ভাব গর্বেভশ্বরঃ ॥
বেদার্থ স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যোবরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্ কর্ম্মাভবদার্য্য শীল মলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো

বৃত্রারেরিব গীষ্পাতির্ণরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥
বিদ্বৎসভা কমলিনী রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্‌বল্লালসেন কৃতোহয়ং "দানসাগরঃ।"

'সময়প্রকাশ' গ্রন্থকার ও স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'দানসাগর', গ্রন্থ হইতে প্রভূত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের রচিত একটি শ্লোক 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে:

বিরম তিমির সাহসাদুস্মা-
দ্দিনমমণি নিরস্ত মুপাগতস্ততঃ কিং।
কলয়সি ন পুরোমহো মহোর্ম্মি-
প্লাত বিয়দভ্যুদয়ত্যয়ং সুধাংশু।"

বল্লালসেন অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১০৯১ শকে এই গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার দরুন বল্লালসেন ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনকে নিজকৃতি নিস্পত্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া যান, লক্ষ্মণসেন উহা পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। বল্লালসেন, 'দানসাগর' গ্রন্থে আপনাকে **"নিঃশঙ্ক-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর'** বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়ায় নৃপতি বল্লালসেন সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ- 'সীতাহাটির জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটি রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাট ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটি কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটির নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবু মজুরদিগের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। সীতাহাটি কাটোয়া হইতে দু'মাইল মাত্র ব্যবধান। "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ তাম্রশাসন প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া সীতাহাটি গমন করেন এবং বৈদ্যনাথ বাবুর নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিঃ বাবু শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে তাম্রশাসনখানা দেখিতে দেন। উহা প্রাপ্তির পর কাটোয়ার তদানীন্তন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও তারকচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পাঠোদ্ধার কার্যে ব্রতী হন। এবং অবশেষে সন ১৩১৭ সালের সপ্তদশ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' নবাবিস্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন নাম দিয়া শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পাঠ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় উক্ত তাম্রশাসনের পাঠ-লিপি ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী' পত্রের ৫৩০-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রে উহার

একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Epigraphia Indica পত্রে Vol XIV pp. 156-63 পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি সহ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় নূতন করিয়া ছাপ লইয়া ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই তাম্রলিপিখানি কলিকাতা যাদুঘরে [Indian Museum] সুরক্ষিত আছে।

তাম্রশাসনখানির আকার হইতেছে ১৩ $\frac{৫}{৮}$× ১৫´´ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশিব মূর্তি সংযোজিত। এই তাম্রফলকে মোট ৬৪টি পংক্তি রহিয়াছে। এক দিকে বত্রিশ অপর দিকে বত্রিশটি পংক্তি। অক্ষরের আকার ৫´´ ইঞ্চি পরিমিত। সংস্কৃত ভাষায় এই দানপত্র খোদিত। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের মতে [The characters belong to a variety of the Northern alphabets, which may be called the precursors of the modern Bengali, as current in North-Eastern India in the 12th century A.D.] এই তাম্রশাসনখানি গদ্যে ও পদ্যে বিরচিত। শার্দুল বিক্রীতা, মন্দাক্রান্তা, শ্রগধারা, আর্যা, বসন্তলিতক এবং শিখরিণী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে বিরচিত।

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলময় [সেই] শ্রীমদ্ বল্লালসেন দেব "সমুপগত" [সংবিদিত] সমস্ত রাজা, রাজন্যক রাজ্ঞী, রাণক, ইত্যাদিকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন। অন্যান্য দানলিপিতে যেরূপ থাকে ইহার পরবর্তী অংশেও তদ্রূপ রহিয়াছে– "নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাদের সকলের অভিমত হউক।" ইত্যাদি।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন

প্রশস্তি-পাঠ

১। ওঁ নমঃ শিবায় ॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সম্বিধান–
বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভি-নির্ম্মর্য্যাদর–

২। সার্ণ্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োহর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধ
ললিতাঙ্গহার-বলনৈরর্দ্ধে চ

ভীমো–

৩। দ্ভটৈ র্ন্নাট্যারম্ভ-রয়ের্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥
হর্ষোচ্ছালপরিপ্লাবো নিধিরপাং

৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো
বিশ্রান্তমানাধয়ঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে–

৫। চকোরনগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ স শ্রীকণ্ঠশিরোমণি–
র্ব্বিজয়তে দেবস্তমীবল্লভঃ ॥ বংশে

৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরুঢ়ি-প্রৌঢ়াং

রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ। শশ্ব–
৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লো–
লৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥ তেষাম্বং
৮। শে মহোজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা–
৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্য–
সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি–
১০। রুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥ তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্পদো গুণাভরণঃ।
১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ– প্রলয়হেমন্তঃ ॥ লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত–
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়–শ্রদ্ধয়া মা–
১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিথ-সুরধুনীশঙ্কয়া-শঙ্করেণ।
হংসশ্রেণী-বিলাসোজ্জ্বলিত–
১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সুত্রামারামসীবিহরণ-ললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ ॥–
১৪। স্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত–
সাহসাঙ্কঃ। দিক্পালচক্রপু–
১৫। ট– ভেদন-গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্ব্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ ॥
ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-নান্তে যদরি-মৃ-
১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি চ্ছিন্নাকীর্ন্নানিভূমৌ নয়নজলমিলৎ–
কজ্জলৈ– র্ম্লাপ্রিতানি। যত্নাচ্চি–
১৭। ম্বত্তি দর্ভক্ষতচরণতলাসৃগ্মিলিপ্তানি গুঞ্জা-স্রগ্‌ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশঘনা-শ্লেষলোলাঃ
১৮। পুলিন্দাঃ ॥ প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ
কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ। অস্যা–
১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ন্নিরীতি-রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥
পদ্মালয়েব দয়ি–
২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল– রজনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বর–
২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাসদেবী। এষা সুতং সুতপসাং
সুকৃতৈরসুত বল্লালসেনম–

২২। তুলং গুণগৌরবেন অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনা-
দ্রি-শিখরং নরদেব-

২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীক-
নরনাথ পদেহভিষিক্তাঃ দৃপ্তাঃ প্রমোদ-

২৪। তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ।
ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েনরভ-

২৫। সাদালিঙ্গ্যং বিদ্যধরী-রাকলপং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু
সংসপ্তকাঃ। ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ

২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীকৈ শ্রিতঃ সর্ব্বধূনেত্রন্দীবরতোরণাবলিময়ো
যস্যাসি-ধারাপথঃ ॥

২৭। দদানা সৌবর্ণ্নঃ তুরগমুপরাগেম্বরমণের্যদস্যোদস্রাক্ষীদহনি
জননী শাসনপদম্।

২৮। নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণ্নঃ তদয়মদিতো [তৈ] বাসুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপ-
প্রশমন- ফলাকালজলদঃ ॥

২৯। সখলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।
মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়-

৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর- পরমমাহেশ্বর- পরমভট্টারক-
মহারাজাধিরাজ শ্রী-

৩১। মল্লালসেনদেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশোষ রাজরাজন্যক-
রাজ্ঞী-রাণকরাজপুত্ররাজা-

৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-
মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত- ইত্যাদি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাঠ অপ্রয়োজন বোধে উদ্ধৃত হইল না। এই তাম্রফলকের অনুবাদ, প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেন দেবের জননী সূর্যগ্রহণবাসরে "হেমাশ্ব" দানকালে [দক্ষিণারূপে] যে শাসনপদ [ভূমি] উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার কথা তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া সজ্জনগণের দৈনোত্তাপনিবারক অকালজলদরূপী এই রাজা বল্লালসেনদেব তাহা পণ্ডিত ও বাসুকে দান করিয়াছিলেন।

শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ বীথিতে,- খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচ-শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিমোত্তর, অম্বয়িল্লা-শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদীর) পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণ, কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগড্ডি সীমালির দক্ষিণ, আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ, আবার আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ-নিঃসৃত পশ্চিমগতি

সুরকোলাগড্ডিআকীয়ের উত্তরালি পর্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, লাড্ডিনা-শাসনের পূর্বসীমালির পূর্ব, জলসোথী-শাসনের পূর্বস্থিত গোপথার্ধের পূর্ব, মোলাড়ন্দী-শাসনের পূর্বস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদী) পর্যন্ত (গত) গোপথার্ধের পূর্ব,– এই চতুঃসীমায় বেষ্টিত, '**শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের**' পরিমাণে বাস্তুভূমি, মালভূমি ও খিলভূমির সহিত, নবদ্রোণ এক আঢ়ক, চত্বারিংশৎ উন্মান ও তিন কাক পরিমিত সপ্তভূপাটকে বিভক্ত প্রতিবর্ষে পঞ্চশত কপর্দকপুরাণ-আয়-বিশিষ্ট ঝাট [কান্তার বা নিবিড়ারণ্য] ও বৃক্ষসমেত গর্ত ও উষরভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত, গুবাক ও নারিকেল সমেত, যাহার [অর্থাৎ, যে গ্রাম সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার] দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার-উৎপীড়ন-রহিত তৃণ-যুতি-গোচর পর্যন্ত চট্টভট্টের প্রবেশাধিকার-বিরহিত যাহা হইতে কোন প্রকারের (করাদি) গৃহীত হইবে না। রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদির (সর্বপ্রকারের) আয়ের সহিত যে বাল্লহিটা নামক গ্রাম আমার মাতা শ্রীবিলাসদেবী গঙ্গাতীরে সূর্যগ্রহণকালে সুবর্ণাশ্ব-মহা-দানের দক্ষিণাস্বরূপে, বরাহদেবশর্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন, ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবর, সামবেদের কৌথুমশাখাচরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, আচার্য শ্রীওবাসুদেবশর্মাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; – সেই গ্রামেই আমার দ্বারা মাতাপিতার এবং নিজের পুণ ও যশোবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাবৎ-সূর্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত যত দিন ভূমিতে ছিদ্র থাকিবেক, ততদিনের জন্য, তাম্রশাসন করিয়া প্রদত্ত হইল। অতএব ইহা আপনাদের সকলেরই অনুমোদিত হউক; এবং ভাবী নরপতিগণও (ভূমি) অপহরণের নরকপাতের ভয়, এবং তৎপাদনে ধর্মগৌরবের কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহা পালন করিবেন। (এই অভিপ্রায়ে) ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছেঃ– "সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন (ভূমিদানের) ফল তাঁহারই হইয়া থাকে। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমিদান করেন, তাঁহারা উভয়েই পূণ্যকর্মা, এবং উভয়েই (সেই হেতু) নিযত স্বর্গ-গামী হয়েন। "আমাদের বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (এবং) তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা হইবেন," এই মনে করিয়া পিতৃগণ করবাদ্য করিতে থাকেন, এবং পিতামহগণ (আনন্দে) উল্লম্ফন (নৃত্য) করিতে থাকেন। ভূমিদাতা ষষ্টি-সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং ভূমির অপহর্তা ও (অপহরণের) অনুমোদনকারী তৎপরিমিত (৬০০০০ বৎসর) নরকে ভ্রমণ করেন। ভূমি স্ব-দত্তই হউক, আর অন্যদত্তই হউক, যিনি ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।' ইতি। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল মনে করিয়া, এবং (উপরি) উদাহৃত সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্তির লোপবিধান উচিত নয়। নিখিল-ক্ষিতিপালের জেতা ভূপাল শ্রীমদ্ বল্লালসেন ও বাসুশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ (নামক ব্যক্তিকে) দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাং (সাল) ১১, বৈশাখ মাসের ১৬ই তারিখ। শ্রী নি (বদ্ধ) মহাসাং (ধিবিগ্রহিক) করণ (কায়স্থ) নি (বদ্ধ)।

এই তাম্রশাসনে "শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের" উল্লেখ আছে। মদনপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বল্লালসেনদেবের পিতা বিজয়সেনদেব 'অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে,

বল্লাসেনেদেবের সময়েও ভূমি পরিমাপকালে তাঁহার পিতার নামই প্রচলিত ছিল এবং তাহাই 'শ্রীবৃষভশঙ্কর নলিন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়ায় প্রাপ্ত শাসনেও 'বৃষভশঙ্কর নলেন' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লালসেনের ধর্মমত

বল্লালসেনের দানলিপির দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আদি সেনরাজগণ রাঢ়দেশেও রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরে তাঁহাদের রাজধানী বিজয় সেনের সময় হইতেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করে যে- "প্রথম হইতেই পূর্ববঙ্গ তাঁহাদের অধিকারে থাকিলে, রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।"[১] ইহার কোনও অর্থ হয় না, কেননা সেনরাজারা যে পরবর্তীকালে বিজয়সেনের সময় বঙ্গরাজ্য (পূর্ববঙ্গ) অধিকার করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সেন নৃপতিরা শৈব ছিলেন। বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই দেখিতে পাইতেছি, "ওঁ নমঃ শিবায়[২] ॥ যাঁহার একার্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে এবং অপরার্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভ বেগে বিবিধ অভিনয়সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে; সন্ধ্যা-তাণ্ডবনৃত্যে বিকশিত আনন্দ-নিনাদ লহরী-লীলার অকূল রসসাগর (সেই অর্ধনারীশ্বর (মহাদেব) আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

যাঁহার তাম্রশাসনের উপরে সদাশিব মূর্তির রাজমুদ্রা, এবং যিনি অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন, তিনি যে শৈব ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ আছে কি?

বল্লালসেন এই তাম্রশাসনখানি রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে প্রদান করিয়াছেন। বল্লালসেনের সর্বপ্রধান রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুরে ছিল তাহার কতকগুলি প্রমাণ বিশেষ ভাবে বিক্রমপুর হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল বিক্রমপুরের অন্তর্গত আপরকাঠি নামক গ্রামে একটি প্রস্তর-নির্মিত সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি এখন বিক্রমপুর চিত্রশালায় [অড়িয়ল গ্রামে] আছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তি

বল্লালসেনের মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্তির সহিত বিক্রমপুরের প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তির সাদৃশ্য সহজেই অনুভূত হইবে। সদাশিব মূর্তির ধ্যান নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার হস্তস্থিত আয়ুধ সমূহও বিভিন্নরূপ থাকে। মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্তির ধ্যান এইরূপঃ .

মুক্তাপীতয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পুর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র দহনান্ নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥

---

১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

২. The record opens with the auspicious formula *om om namah sivaya* followed by an invocation to Siva a Ardhanariswara. Inscription of Bengal. N.G. Majumder, Page 69.

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার "Elements of Iconography, vol II pt. ii app. p. 187- এ সদাশিবের যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ:

বদ্ধপদ্মসনং শ্বেতং স্থিতং পঞ্চাস্য সংযুতম্।
পিঙ্গলাভ জটা চূড়ং দশ দোর্দণ্ড মণ্ডিতম্ ॥
অভয়ং চ প্রসাদং চ তথাশক্তিং ত্রিশূলকম্।
খট্টাঙ্গং দক্ষভাগস্থৈর্বহস্তং করপল্লবৈঃ ॥
ভুজঙ্গং চাক্ষমালা চ ডমরু নীলপঙ্কজম্।
বীজপুরা চ বামস্থৈর্ব হস্তং সুপ্রসন্নকম্ ॥

"বায়ুপুরাণে" রহিয়াছে,-

পঞ্চবক্ত্রো বৃষারূঢ় প্রতি বক্ত্রং ত্রিলোচনঃ।
কপালমূলখট্টাঙ্গী চন্দ্রমৌলিঃ সদাশিব।

ধ্যানে আছে সদাশিবের পঞ্চাস্য থাকিবে, কিন্তু আমরা যে মূর্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে পঞ্চমুখ নাই।

"গরুড় পুরাণে" সদাশিব মূর্তির ধ্যান এইরূপ:

বদ্ধপদ্মাসনাসীনঃসিত ষোড়শবর্ষকঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রৈঃ স্বৈর্দশভিশ্চৈকব ধারয়ন্ ॥
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীশ্বরঃ।
দক্ষৈঃ করেবামকৈশ্চ ভুজগঞ্চাক্ষসূত্রকং ॥
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূয়ক মুক্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তি স্ত্রিনোত্রোহি সদাশিবঃ।
[গরুড়পুরাণ পূর্বার্ধ ২৩ শ অধ্যায়]

"মহানির্বাণ তন্ত্রে"ও সদাশিবের ধ্যান দৃষ্ট হয়:

ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতনম্ ॥
বিভূতি লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কার ভূষিতম্ ॥
ধূম্রপীতারুণ শ্বেতকৃষ্ণৈ পঞ্চাভিয়াননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজুট ধরং বিভূম্ ॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিত মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥
বামে দর্ধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈ দেবৈ মুনিবরৈঃ স্তুতম্ ॥
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল- লোচনম।
হিম-কুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃষাসন বিরাজিতম্ ॥

পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্‌।
গীরমানমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্‌ প্রিয়ম্‌ ॥

সদাশিব মূর্তি দশভুজ এবং দ্বাদশভুজ হইয়া থাকেন। তাঁহার দশভুজে যথাক্রমে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, ঘণ্টা অঙ্কুশ, পাশ, অক্ষমালা এবং অভয় মুদ্রা প্রভৃতি রহিয়াছে। মূর্তির মস্তকোপরি জটা-মণ্ডিত-মুকুট! ললাটে ত্রিনয়নের এক নয়ন। অপর দুই নয়ন অকর্ণ-বিস্তৃত। সদাশিব পদ্মের উপর পদ্মাসনে বা বদ্ধপর্যঙ্কাসনে ধ্যান মগ্ন। প্রসন্ন নত দৃষ্টি। কণ্ঠে মালা দোদুল্যমান। ঊর্ধে চালচিত্রের উভয় পার্শ্বে কিন্নর বা অপ্সর-যুগল। সদাশিবের মুখমণ্ডলে সুগম্ভীর ধ্যানের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদাশিব মূর্তি তান্ত্রিকদের 'ষট্‌চক্র' অনুভূতির অঙ্গীভূত। সদাশিব ষট্‌শিবের একশিব। ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এবং পরশিব।

[রুদ্র যামলতন্ত্র– রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ৫৬,৮৮,১২৮ পৃষ্ঠা] সদাশিব পঞ্চ মহাপ্রেতের একজন [Avalon, principles of Tanta, Vol II. P. 390, n-4 and p-392] এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন:– "A description corresponding to the figure on the seals is according to A. K. Moitra, found in **Mahanirvan Tantra,** ullasa XIV. [See Banerjee, EP. Ind. Vol. XII p. p. 6-7] But it must be observed that some of the attributes assigned to the deity are not traçeable on the seals and in the stone images deposited in the Museums of the Varendra Research Society, Rajshahi and the Calcutta Sahitya Parisha. Inscriptions of Bengal-p. 81.]

বল্লালসেনের তাম্রশাসনের মুদ্রার লাঞ্ছন সদাশিব এবং ইষ্টদেবতা অর্ধনারীশ্বর দেব দুইয়েরই উল্লেখ আছে। সদাশিব মূর্তি এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বাঙলা দেশে কেন ভারতবর্ষেই খুব কম পাওয়া গিয়াছে। সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা সদাশিব মূর্তি এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দুই মূর্তিই বিক্রমপুরে পাইতেছি।

আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হইতে একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ মূর্তিটি এক্ষণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত রাজসাহী চিত্রশালায় আছে।[১]

বিক্রমপুরের ও বাংলার সর্বপ্রথম অর্ধনারীশ্বর মূর্তি :

বল্লালসেন দেব যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির উপাসক ছিলেন তাহা তাঁহার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। সীতাহাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি শ্রীবিক্রমপুর

১. সদাশিব মূর্তি বাঙলাদেশে খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায়ও সদাশিব মূর্তি আছে। স্বর্গত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন– Eastern Indian School of Me-di-eval sculpture p 10.9. বন্ধুবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট ধাতু-নির্মিত একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র সদাশিব মূর্তি আছে। তাঁহার সংগৃহীত কিংবা পরিষদের সংগৃহীত মূর্তির সহিত আমাদের এই চিত্রের মূর্তিটির বিশেষ প্রভেদ নাই। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তি– শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত– পৌষ ১৩৪৩।

রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। যিনি অর্ধনারীশ্বর দেবের উপাসক ছিলেন, তিনি কি রাজধানীতে অর্ধনারীশ্বর দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই? এইরূপ একটি প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে আসে। কিন্তু সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন এই মূর্তিটি বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই বোধ হয় এই প্রশ্ন সমাধানের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

এইখানে নৃপতি বল্লালসেনদেবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে যদি অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি, তাহা হইলে উহা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না। আমি একথাটা বিশেষ গৌরবের সহিত বলিতে পারি যে, আমার পূর্বে কেহ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রবন্ধও লেখেন নাই।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহের ইতিহাস

সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একবার বর্ষার সময় যখন বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকাযোগে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন বেলা-শেষে শ্রাবণের অশ্রান্ত বারিবর্ষণের মধ্যে পুরাপাড়া নামক গ্রামের খালটি দিয়া যাইবার সময় এক বাড়ির পাশের একটি ডোবার নিকট অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় সুন্দর একটি মূর্তি দেখিতে পাইলাম। আমি নৌকা ভিড়াইয়া সেই বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী সেই অযত্ন-বিক্ষিপ্ত শ্রীমূর্তিখানি আমাকে প্রদান করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিলেন না।

দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি যে অর্ধনারীশ্বর দেবের তাহা চিনিতে পারিলাম। কি সর্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন, কি সুন্দর মসৃণ অবয়ব, কি কোমলতা, কি শিল্প-নৈপুণ্য, দেখিবামাত্রই আনন্দে অভিভূত হইলাম। বিক্রমপুরে বাঙালীর একটা নিজস্ব শিল্পধারা ছিল। বারেন্দ্রভূমের ধীমান্ ও বীতপালের ন্যায় বিক্রমপুরেও একটি শিল্পীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিক্রমপুরেই এই সকল মূর্তি গড়িত। সেই শিল্পিগণ রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের আশেপাশেই বাস করিত। আমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচ করিব।

হেমাদ্রিকৃত "চতুর্বর্গচিন্তামণি" নামক গ্রন্থের ব্রতখণ্ডেও অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বর্ণনা আছে। তাহা এই–

"অর্দ্ধং দেবস্য নারী তু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণ।
অর্দ্ধন্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্বলক্ষণভূষিতঃ ॥

এক সময়ে বাঙলাদেশে অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের পূজাবিধি প্রচলিত ছিল। আজ পর্যন্ত বাঙলার অন্য কোনও স্থান হইতেই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।[১]

বিক্রমপুরে যে সকল দেউলবাড়ি আছে, তাহর মধ্যে পুরাপাড়ার দেউল বাড়িটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দেউলবাড়ির নিকটেই "তাম্রকুণ্ড" নামক গভীর কুণ্ডের বা ডোবার পাশে এই মূর্তিটি ছিল। আমি তাম্রকুণ্ডের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূর্তিটি দেখিতে

১. up to now however, so far as known, only one image of Ardhanariswara has been discovered in East Bengal, Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors; in Dacca Museum. p. -130. N. K. Bhattasali, M. A.

পাইয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম একথা প্রথমেই বলিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইল পুরাপাড়ার দেউলবাড়ি হইতে একটি উমামহেশ্বর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

"মৎস্যপুরাণে" যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির স্তব আছে। তাহা এইরূপঃ–

অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারী রূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ ॥
উমার্দ্ধে তু প্রদাতয়ৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥
বামতো দর্পণং দদ্যাদ্যুৎপলং বা বিশেষতঃ।
স্তনভারময়ার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েত ॥
ইত্যাদি।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই মূর্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন। একবার ভাল করিয়া দেখুন– ঊর্দ্ধে বামদিকে ফণিময়– বিলম্বিত জটাজাল, কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ললাটে অর্ধ চন্দ্র। বামদিকে সিন্দুরবিন্দু, আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়ন, কর্ণে, কর্ণ-ভূষা। অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবু কি তার বিচিত্র গঠন-নৈপুণ্য। আর দক্ষিণে ফণি-কুণ্ডল। কণ্ঠে নরকপাল-মালা– বামে মণিময়-মালিকা। দক্ষিণে স্থূল যজ্ঞোপবীত, বাম কণ্ঠে পার্বতীর লম্বিত দোদুলমান মণিমালার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন। যদি অভঙ্গ থাকিত, তাহা হইলে সে হাতে থাকিত ত্রিশূল। বাম হস্তটিও সম্পূর্ণ ভগ্ন। যদি ইহা অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম বাজু ও বলয় এবং অন্যান্য অলঙ্কার। বামে পীন স্তন। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে আবৃত। দক্ষিণে মুক্ত ও বিশাল বক্ষস্থল, পুরুষোচিত দৃঢ়তার সহিত খোদিত। আর পরিধানে বাঘছাল। কটীতে নরহস্ত। ঊর্ধ্ব লিঙ্গ। বামে স্তরে স্তরে মাল্যাকারে ভূষণসমূহ দোলায়মান।

মূর্তিটির পদদ্বয় ভগ্ন। যদি মূর্তিটির পদযুগল অভগ্ন থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, দক্ষিণ পদখানি বিকশিত শতদলোপরি সুরক্ষিত আর বামপদখানি থাকিত লোহিত-রাগরঞ্জিত-পদালঙ্কার-শোভিত শতদলের উপর।

কবি ভারতচন্দ্রের অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া এই মূর্তিটি দেখিলে পাঠকগণ আনন্দ উপভোগ করিবেন।

মূর্তির বর্ণনা

আমার সংগৃহীত "অর্ধনারীশ্বর" মূর্তির বদনমণ্ডলও নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এজন্য মুখমণ্ডলের অনেকখানি শোভা হ্রাস পাইয়াছে। তবু কি মসৃণ, কি কোমল! এই মূর্তিখানি যদি অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে এই মূর্তিখানি সৌন্দর্য-শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হইত। এখনও এই মূর্তির উভয় পার্শ্বের সৌন্দর্য ভাস্কর-শিল্পানুরাগী ব্যক্তিরই চিত্ত মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের ভাস্কর্য-শিল্প যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এই মূর্তিই ছিল তাহার প্রমাণ এবং এই মূর্তি গঠনের জন্য বিক্রমপুরের কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

পুরাপাড়া দেউল

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী বর্তমানে পরিচিত রামপালের বিস্তৃত সীমা-মধ্যে পুরাপাড়া দেউল অবস্থিত। দেউল বলিতে দেবালয় বুঝায়। "দেবকুল" শব্দ হইতে 'দেউল' শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। "দেবকুলিকা" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিলহর্ণ "দেবকুলিকাকে" ক্ষুদ্র দেব মন্দির (small temple) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'দেউল' বলিতে বৃহদাকার দেবমন্দিরকেও বুঝাইয়া থাকে। বোধ হয় এই কবিতাটি অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে, "আছিল দেউল এক পর্বত-প্রমাণ"। কাজেই দেউল বলিতে বৃহদাকারের দেবমন্দিরও বুঝাইতে পারে।

দেউলবাড়ি

শ্রীবিক্রমপুর রামপালের চারিদিকেই দেউল আছে। পূর্বে পুরাপাড়ার দেউল বেশ বৃহদাকারের স্তূপ ছিল। এখন বিলীয়মান হইয়া আসিয়াছে। ঐ দেউল বা দেবালয়ের কাছেই ছিল বৃহদ তাম্রকুণ্ড। তাম্রকুণ্ড শব্দের অর্থ সকলেরই জানা আছে। দেবপূজার জন্য যে তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই তাম্রকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। পূজা শেষে বিল্বপত্র ও পুষ্প ইত্যাদি ঐ কুণ্ডটির মধ্যে সম্ভবতঃ ফেলা হইত, ঐ জন্য আজও ঐ স্থানটি তামাকুণ্ড নামে পরিচিত।

একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে যখন সেনরাজাদের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে সময়ে অর্ধনারীশ্বর দেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ নৃপতি বল্লাল অর্ধনারীশ্বর দেবের এই সুন্দর শ্রীমূর্তিটি গঠন করিয়া উহার জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে তাঁহার আরাধ্যদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেবতার অর্চনার জন্য পুরোহিতগণের বাসস্থানও সেখানই নির্দিষ্ট ছিল, সেই পুরোহিতপাড়াই কালবশে পুরাপাড়া নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। তারপর কে জানে কোন্ এক দুর্দিনে হয় মানুষের হাতে কিংবা কোন দৈব দুর্বিপাকে [মানুষের হাতেই সম্ভবতঃ] ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইল,– মূর্তি পাদপীঠ হইতে ভূলুণ্ঠিত হইল,– কে জানে কি-ভাবে দেব-মূর্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শৈব সেনরাজাগণের ধ্যান-ধারণার আশ্রয় এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়।

আমরা ভক্ত নৃপতি বল্লালের তাম্রশাসনে এই জন্যই নৃত্যোৎফুল্ল অর্ধনারীশ্বর দেবের স্তুতি দেখিতে পাই।

বল্লালসেনের সর্বপ্রধান রাজধানী জয়স্কন্ধাবার যে শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, এই মূর্তিটিও তাহার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বাঙলা দেশে এই একটি মাত্র 'অর্ধনরীশ্বর' মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। আমি খিচিং (ময়ূরভঞ্জ) যাদুঘরে একটি অর্ধ-ভগ্ন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখিয়াছি।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধ্যান-ধারণার সামগ্রী। নৃতত্ত্ববিশারদ কোন কোন পণ্ডিত ইহার আদর্শকে যৌন-মিলনের বা দাম্পত্য মিলনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা বলিয়া থাকেন।

আমার লিখিত "বিক্রমপুর ও বাঙলার সর্বপ্রথম অর্ধনারীশ্বর মূর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ

"ভারতবর্ষ" ষড়বিংশ বর্ষ প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা– আশ্বিন ১৩৪৫-এ প্রকাশিত হইলে-পর উহা পাঠ করিয়া আমাকে পাটনার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখেন:

"প্রিয় যোগেন বাবু,

ভারতবর্ষে আপনার "অর্ধনারীশ্বর" সংক্রান্ত প্রবন্ধ আগ্রহসহকারে পড়িলাম। আপনি যে সমস্ত পৌরাণিক উল্লেখ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "মৎস্যপুরাণই' প্রাচীনতম। "মৎস্যপুরাণের" সমসাময়িক অথবা তদপেক্ষা কিছু প্রাচীন একটা উল্লেখ পাইয়াছি, আপনাকে তাহা জানাইতেছিঃ–

"The earliest authentic allusion to it seems to be that of the Indian ambassador to Bardisanes [Birca A.D. 220] who described a cave in the norht of India which contained an image of a god, *half-man, half-woman* [fergussion, History of Indian and Eastern architecture Vol. 1.427.]

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য তদরচিত "Indian Images" নামক গ্রান্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ–A type of Sive and Parvati in amorous is known as *Ardhanariswar*. Its description is– one half of Siva has the form of a goddess. The part representing siva has plaited hair, a crescent, and a trident. The other part representing Uma should have parted hair, a cobra in the right ear, a mirror or a lotus, and thick breast][১]

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন– "ইংরাজবাজারের তিন মাইল পশ্চিমে বাগবাড়ি নামক স্থানে বল্লালের একটি উদ্যানবাটিকা ছিল। শুনা যায়, উহার দরজায় অর্ধনারীশ্বর শিব মন্দির ছিল; এখন ঐ মন্দির বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" ইহা অনুমান মাত্র, আজ পর্যন্তও বরেন্দ্রের কোনও স্থান হইতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আবিস্কৃত হয় নাই।

সেন রাজগণের সময়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির অর্চনা বাঙলার নানাস্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বল্লালসেন হিন্দুধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মগধ, ভুটান, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা এবং নেপাল হিন্দুধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[২]

---

* মূল কথাগুলি বোধ হয় Mc crindle Ancient India as described in Classical Literature. নামক গ্রন্থে আছে। Half man, Half woman অন্য কোনো দেবতার মূর্তি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বলিয়া অবগত নহি, সেইজন্য এখানে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ। Archaeological Survey-Central circle, Patan. 14. 9. 38.

১. ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তদ্ রচিত– "Icnography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum নামক গ্রন্থের ১৩০-২৩৮ পৃষ্ঠায় অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

২. The Hinduism of Ballal Sen was of the tantric kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries, all Brahmans, to Magadha, Bhotan Chittagong, Arakan, Orissa and Nepal. V.A. Smiths-Early History of India, p.403.

বল্লালসেনের চরিত্র

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল-চরিতে" অনেক কথা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, বল্লালের চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে সিংহগিরি নামক ব্যক্তির প্রবর্তনায় ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়েন। বল্লাল ডোম জাতীয় একটি স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন এবং সেই ডোমকন্যাকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন; তজ্জন্য অনেকে বিরক্ত হইয়া বল্লালের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্তদিগের কুর্চীনামায় আছেঃ

চন্দ্রর্তুশূন্যাবনি-সংখ্য শাকে বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।

শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্ ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও আনন্দভট্ট বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন।[১] বলা বাহুল্য যে, "বল্লাল-চরিত" নৃপতি বল্লালসেনের মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল। কাজেই বল্লাল-চরিতের লিখিত বিবরণী বা কাহিনী-সমুদয়, কোন সুধী-ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না– এজন্য আমরা বল্লালসেন সম্বন্ধে প্রকাশিত কিংবদন্তী ইত্যাদি সযত্নে পরিহার করিলাম।

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে কোন তাম্রশাসনেই কোনরূপ নিন্দার উল্লেখ নাই বরং তাঁহাকে গুণ-গৌরবে অতুলনীয়, অদ্বিতীয় বীর বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার নামের পূর্বে পরমেশ্বর, পরমমাহেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময় ইত্যাদি বিশেষণ সংযুক্ত থাকায় বরং তাঁহার মহত্ত্বই সূচিত হইতেছে। বল্লালসেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বল্লালসেন আনুমানিক ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন।

তপন-দিঘির তাম্রশাসন

লক্ষ্মণসেন দেবের যে-সমুদয় তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে তপনদীঘির তাম্রশাসনখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার পূর্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিত-লিপি বা তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েস্টমেকট সাহেব [E.V.Westmacott] উক্ত জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপনদীঘি গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পুষ্করিণী খননকালে আবিস্কৃত এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনখানি প্রকাশিত হইবার পর সেই প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই তাম্রশাসনখানি নানা হাত ঘুরিয়া অবশেষে স্বর্গত কাশীমবাজারের মহারাজা বদান্যবর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অর্থব্যয়ে "বঙ্গীয়-

১.বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রত্রিকা- ১৭শ ভাগ ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-পরিষদে"র চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ওয়েস্টমেকট সাহেবের পাঠ প্রকাশিত হইবার পর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায়" ইহার একটি পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

লক্ষ্মণসেন দেবের যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে আমরা এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। **তপনদীঘির তাম্রশাসন**– এই তাম্রশাসনখানি শ্রীবিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। ইহার দ্বারা হুতাশন দেবশর্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তান্তঃপাতী বেলহিষ্ট [কেহ কেহ বিল্বষ্টী পাঠ করিয়াছেন] গ্রামখানি "পুণ্যোযশোহভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্দথ মহাদানের সময় দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভূমিতে সংবৎবরে দেড় শত কদর্পক পুরাণ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।" এই তাম্রশাসন লক্ষ্মণসেন পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ-উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। গ্রহীতা ঈশ্বর দেবশর্মা সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ও তিনি হেমাশ্বরথ মহাদানচার্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

তপনদীঘির তাম্রশাসনের প্রথম দুইটি শ্লোকে সেনবংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের প্রশংসা রহিয়াছে। তাহার পরের সাতটি শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত সেনরাজগণের পরিচয় রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনে রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাতা, পুরোহিত, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্ক, দৌসসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ-বলহস্তশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি প্রভৃতি। এই সব বিভিন্ন রাজপুরুষগণের নাম যেমন আছে, পূর্বে যে-সমুদয় তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও তেমনি আছে।

প্রদত্ত ভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎকপর্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমাঃ–

পূর্বে বুদ্ধবিহারীদেবতানিকরদেয়াম্মণ ভূম্যাটাবাপপূর্বালীঃ সীমা। দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা। এই তাম্রফলকে অনেকগুলি শব্দ ভুল লিখিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানির আকার ১৩½ × ১১½ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশব মুদ্রা-সংযুক্ত। তাম্রফলকখানিতে ৫৬ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপ। বাঙলা হরফের পূর্বাবস্থা।

এই তাম্রফলকে যে যে গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আজ পর্যন্তও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। এই তাম্রফলকের তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। আনুলিয়া এবং গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অনুরূপ সাতটি শ্লোক রহিয়াছে। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়

১. Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XIIV Part I. P. 128-154. 18. 75 Epigraphia Indica. Vol 305-315. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সপ্তদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫-১৪০ পৃষ্ঠা।

বলেন : The document was issued from the "Campt of Victory" situated at VIKRAMPURA. এই তাম্রফলকে 'বুদ্ধবিহারের' উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে [বারেন্দ্রে] বুদ্ধ প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

২। **জয়নগর তাম্রশাসন**– চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে এই তাম্রশাসনখানি আবিস্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন"–

তাম্রশাসনের ইতিহাস

বাঙলা অক্ষরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তদঙ্কিতই সমগ্র বিষয়টি লিথোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তক-মধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে, সেই সময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসনখানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজীলপুরে জমিদার শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উহার একটি প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।– অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজন করিয়া দিয়াছেন। সন-তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনক বিকৃত হওয়ায় স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।– এইজন্য আমরা উহার বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম না, সংস্কৃত পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহার অর্থ করিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে "খাড়ী-মণ্ডলী" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি সুন্দরবন-মধ্যে ঐ খাড়ী পরগনা ও খাড়ীগ্রাম বর্তমান আছে।"

এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ওয়েস্টমেকট সাহেব ১৮৭৫ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় ন্যায়রত্ন মহাশয় দত্ত এই তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন।

সুন্দরবনের এই তাম্রশাসনখানিও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ– জগদ্ধর দেবশর্মার প্রপৌত্র নারায়ণ দেবশর্মার পৌত্র, নরসিংহ দেবশর্মার পুত্র, গার্গ-গোত্রীয় অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শীলগর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর-ঋগ্-বেদাশ্বলয়ানশাখাধ্যায়ী, শ্রীধর দেবশর্মাকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী খাড়ীমণ্ডলিকার মধ্যস্থ শান্ত্যশাবিক গ্রামে ছিল। বোধ হয়, কৃষ্ণধর দেবশর্মা শান্ত্যশাবিক গ্রামবাসী ছিলেন, শান্ত্যশাবিক, কৃষ্ণধরের বিশেষণ রূপে

ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা তিন দ্রোণ পরিমিত ভূমিতে পঞ্চাশৎ পুরাণ মূল্যের শস্যোৎপাদন করিত। পূর্ববাঙলায় এখনও দ্রোণ পরিমাণ প্রচলিত আছে, ৪৬ $\frac{১}{২}$ × ২ $\frac{১}{২}$ হাতে দ্রোণ জমি হয়।

প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তপাতী খাড়ীমণ্ডলিকার মধ্যবর্তী তল্পপুর চতুরক গ্রামে পূর্বে শান্ত্যশাবিকপ্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্ধ সীমা, পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক-রামদেবশাসনপূর্ব সীমা, উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলী কেশবগড়োলী ভূমি সীমা, ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনভূমি উগ্রমাধব নামীয় তত্তাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্তদ্বারা মাপ করা হইয়াছিল।[১]

৩। আনুলিয়ার তাম্রশাসন– এই তাম্রশাসনখানি রাণাঘাটের অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

এই তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাম্রশাসনখানি-সহ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২]

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিপ্রদাস শর্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্মার পুত্র কৌশিক গৌত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্বেদ কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তপাতি ব্যাঘ্যতটিস্থিত পূর্বে অশ্বত্থবৃক্ষ সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপশাসন সীমা, উত্তরে মালামণ্ড-বাটী সীমা। এই চতুঃসীমাচ্ছিন্ন মাথুরিয়া-খণ্ড ক্ষেত্রনারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা ও স্বীয় পুণ্য যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমিতে সম্বৎসরে এক শত কপর্দক পুরাণ ও মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।

ইহার অক্ষর দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যবর্তী। এই তাম্রশাসনখানির আকার ১৩ $\frac{১}{২}$ × ১১ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমিত। উর্ধ্বে দশভুজসমন্বিত সদাশিব মূর্তি সংযোজিত। ৫৬ পংক্তি খোদিত। এই লিপি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত।

আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানিও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। মাধাইনগর তাম্রশাসন– এই তাম্রশাসনখানা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাধাইনগরে পাওয়া গিয়াছে। মাধাইনগরের নিকটবর্তী নিমগাছি জঙ্গলে রঘুনাথ বুনিয়া নামক এক ব্যক্তি উহা পায়। পাবনার সরকারী উকীল প্রসন্ননারায়ণ রায়-চৌধুরী মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঠ প্রকাশিত হইবার পর উহা স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্করের হাতে আসে। তাঁহার

১. গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা বলেন– উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয় তাঁহার মন্দিরের নিকটবর্তী কোন উচ্চতা পরিমিত প্রমাণদণ্ড দ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা হইত। ভূমি-মাপক রাজকর্মচারিগণের কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিবার উপায় ছিল না, নিতান্ত মূর্খ প্রজাও উগ্রমাধব সংলগ্ন স্তম্ভ সমান দীর্ঘ মাপদণ্ড দ্বারা আপনাদের ভূমির পরিমাণ হইল কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে পারিত। গৌড়ের ইতিহাস ২০৬ পৃষ্ঠা।

মৃত্যুর পর এসিয়াটিক সোসাইটির অধিকারভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে এই তাম্রশাসন সম্পর্কে প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রতিলিপি ও পাঠ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।[৩]

৫। শক্তিপুর শাসন– মুর্শিদাবাদ সদরের অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামের এক বিধবা এই তাম্রশাসনখানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ইহা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি শক্তিপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহা "শক্তিপুর তাম্রশাসন" নামে পরিচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় সর্বাগ্রে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে এই শাসনের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটির নাম– 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিস্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ।" ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে তাম্রশাসনোক্ত ভূ-ভাগের স্থান নির্দেশ করিতে যাইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তৎসম্পর্কে গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন।

শাসন পরিচয়

এই তাম্রফলকখানির দুইদিকেই খোদিত লিপি আছে। শাসনখানি অন্যান্য লেখারই অনুরূপ। সেনরাজগণের মুদ্রা সদাশিব, ইহার উর্ধ্বভাগে সংযোজিত রহিয়াছে। শাসনখানি মোট ৫৮ পংক্তিতে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া লিপি রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট। পড়িতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

শাসনখানির ভাষা সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে বিরচিত। তাম্রশাসনখানা হইতে জানা যায় যে, হেমন্ত সেনের প্রপৌত্র বিজয়সেনের পৌত্র এবং বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কুবের নামক ব্রাহ্মণকে ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছেন। সেই ভূমি কঙ্ক গ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত। অর্থাৎ, এই শাসনদত্ত ভূমিগুলি কঙ্কগ্রাম ভুক্তির দক্ষিণাংশ উত্তর-রাঢ় প্রদেশে কুম্ভীনগর (বিষয়ে?) মধুগিরি মণ্ডলে কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত জমি দুই খণ্ডে মোট ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ছিল। প্রথম খণ্ড ৩৬ দ্রোণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ দ্রোণ।

এই তাম্রশাসনে দূতকের নাম "সান্ধিবিগ্রহিক ত্রিপুরিনাথ। গোবিন্দপুর শাসনের সংবতের অঙ্ক ২, ২৮শে ভাদ্র, আনুলিয়ার সংবত ৩, ৯ই ভাদ্র, তপনদীঘির ও মাধাইনগর শাসনগুলি দ্বিতীয় সংবৎসরের। এই চারিখানি শাসনেই দূত মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত। কিন্তু এই শক্তিপুর শাসনখানির মধ্যে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম ত্রিপুরারি রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি নারায়ণ দত্তের পরে সান্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই

---

২. ৩. ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, খ্রীঃ ২৮৭, Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 1907 Part I P. 61 J.A.S.B. Vol. VII, Part II P. 43 Epigraphia Indica Vol. X. J.A.S.B. Vol. 1896 Pt. I. P. 6.

তাম্রশাসন-খানিও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। যথাঃ "সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারাত্। মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত। পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক-পরম-বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবঃ কুশলী ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্মণসেন দেবের পাঁচখানি তাম্রশাসনই শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। **গোবিন্দপুর শাসন**— এই তাম্রশাসনখানি ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন-কালে উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঐ শাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রশাসনখানি প্রদর্শন করেন।

তাম্রশাসনখানির আয়তন ১৩$\frac{১}{২}$ × ১২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। ইহার শিরোদেশে দশভুজ সমন্বিত সদাশিব মূর্তি তাম্রফলকের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মূর্তিটি খোদিত নয়— ছাঁচে ফেলা বলিয়াই বোধ হয়। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনেও এইরূপ রাজমুদ্রা আছে, তাহাতে "শ্রীসদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা" বাক্যে রাজমুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। এই তাম্রশাসনের রাজমুদ্রা রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ তাম্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনখানি "পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনের পাদানুধ্যান তৎপর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমনারসিংহ (নরসিংহদেবের উপাসক) মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত [স্থাপিত] শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] হইতে শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিমবাটীকাতে বেঠড্ডচতুরকে পূর্বে জাহ্নবী অর্ধ সীমা, দক্ষিণে লেঘদেবমণ্ডপী সীমা, পশ্চিমে ডালিম্ব-ক্ষেত্র সীমা, উত্তরে ধর্মনগর সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন তদ্দেশীয় ব্যবহারিক ৫৬ হস্ত পরিমিত নল দ্বারা সপ্তদশ উন্মানাধিক, ৬০ দ্রোণ পরিমিত এক প্রত্যেক দ্রোণে ১৫ পুরাণ উৎপত্তি নিয়মে বৎসরে ৯০০ উৎপত্তিবিশিষ্ট বিড্ডরশাসন, সসাটবিটপ, জল ও স্থলের সহিত, খাত ও উষর অর্থাৎ, অনুর্বর ভূমির সহিত গুবাক, নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষসম্পন্ন সহ্যদশাপরাধসর্বলোকের পীড়ারহিত অচট্টভট্ট প্রবেশ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য স্তৃণপুত গোচর পর্যন্ত, গোস্বামী দেবর্শার প্রপৌত্র হলদেব শর্মার পৌত্র, শ্রীনিবাস দেবশর্মার পুত্র বাৎস্য গোত্র বাৎস্য আপ্নুবান্ ঔর্ব জামদগ্ন্যাপ্রবর সামদেবের কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠানপর উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেবশর্মাকে পুণ্যদিনে বিধিবৎ উদকস্পর্শ পূর্বক ভগবান্ নারায়ণ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতা-পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য রাজ্যাভিষেককালে উৎসর্গীকৃতত্বহেতুক, চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর অস্তিত্বকাল যাবৎ, ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আপনারা সকলে অনুমতি করুন। ইত্যাদি।

গোবিন্দপুরের তাম্রশাসনখানিও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতেই প্রদত্ত হইয়াছ।

এই তাম্রফলকখানি ক্ষৌণীন্দ্র [পৃথিবীপতি] শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ব্যসশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তকে দূত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুরের শাসনেও আমরা লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের পরিচয় পাই। যথা:

"ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সুজনগণনাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন বল্লালসেনের অপত্য। ইনি বাহুবলে শত্রুগণের সমরস্পৃহা নিবারণ করিয়াছিলেন; ইনি এমন শক্তিসম্পন্ন যেন মনে হয় দিগীশবৃন্দ স্ব স্ব অধিকৃত দিগাঙ্গনাগণের সম্ভোগ-লালসায় আপনাদিগের অংশ প্রদান করিয়া এই লক্ষ্মণসেনকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, সমস্ত দিক ইহার বীর্যে বশীভূত ছিল।"[১]

এই ফলকখানারও প্রথম শ্লোক- ওঁ নমোনারায়ণায়। বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুঃতি ফণিপতের্ব্বালেন্দু-রিন্দ্রায়ুধং ॥ ইত্যাদি।

আমাদের এই সমুদয় তাম্রশাসন সম্পর্কে আর অধিক বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নানা ভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পত্র ও পত্রিকাতে আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্নরূপ মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন।

১। তপনদীঘির তাম্রশাসন, ২। সুন্দরবনের নিকটে প্রাপ্ত শাসন, ৩। আনুলিয়ার প্রাপ্ত শাসন, ৪। শক্তিপুর তাম্রশাসন,[২] ৫। গোবিন্দপুর শাসন এই পাঁচখানি তাম্রশাসনই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল মাধাইনগর তাম্রশাসন শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয় নাই। মাধাইনগর তাম্রশাসনখানি ধার্য্যগ্রাম-পরিসরসমাবাসিত স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি প্রায় প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রথম ভাগে দেখা যায়। শ্লোকটি এই:-

"বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলীঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃস ভবার্ত্তিতাপভিদুরং শম্ভোঃ কর্পদ্দাম্বুদঃ। ইত্যাদি

লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব বিশেষণে বিশেষিত

বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন আরম্ভ হইয়াছে- "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া। আর লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসনের আরম্ভ হইয়াছে- "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া। তপনদীঘির তাম্রশাসনে, সুন্দরবনের তাম্রশাসনে, আনুলিয়ার তাম্রশাসনে, শক্তিপুরের তাম্রশাসন প্রভৃতিতে তাঁহাকে "পরমবৈষ্ণব" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

১. লক্ষ্মণসেনের নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যাচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতবর্ষ ১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড-৩য় সংখ্যা ৪৪১-৪৪৫ পৃষ্ঠা। ফাল্গুন ১৩৩২।

২. Saktıpur Copper Plate of Lakshmansena Epıgraphıa Indıca Vol. XI. No. 37 Page 211-213

সেনরাজবংশ ও লক্ষ্মণসেন

"লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বকালে সেন রাজবংশের চরম উন্নতির সময়। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন,– "বল্লালসেনের পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। কাহারও মতে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনই তাহার প্রবর্তক। তিনি কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপের রাজাও পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশেষে প্রভুত্বের চিহ্ন স্বরূপ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে তিনি একটি বিশাল জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন।"[১]

কেশবসেনের তাম্রশাসনের আছে :

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ।
ন গগনতলে এব শীতরশ্মির্নকনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিধুবপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজি।
বাহুবারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গন প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধবা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধাচক্রে হনুরূপোরিপুঃ ॥

লক্ষ্মণসেন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। বিশ্বের বন্দ্যনীয় ছিলেন তিনি। পৃথিবীতলে কল্পশাখা সদৃশ এমন দানবীর কোথায়! তিনি দেখতে কিরূপ ছিলেন?–

লক্ষ্মণসেনের বাহুদ্বয় ছিল রাবণ-হস্তকাণ্ড সদৃশ, বক্ষঃদেশ ছিল শিলাবৎ সংহিত, বাণ ছিল তাঁহার শত্রু প্রাণহর, লক্ষ্মণসেনের হস্তিগণ মদজল ক্ষরণ করিত। বিধাতা এ সকলকে সময়োপযোগী করিয়া তাঁহার অনুরূপ রিপু যে কোন্ স্থানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কে জানে!"

লক্ষ্মণসেন যে ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন, তাহা "সেক শুভোদয়া" গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। তিনি গঙ্গাতীরে যাইয়া শরাভ্যাস করিতেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর অপর তীরে যাইয়া পড়িত।

লক্ষ্মণসেন কামরূপ এবং আরাকানরাজকে যে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা শাসন-লেখ হইতে পাইতেছি। লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কাশিরাজের [কান্যকুব্জ রাজের] পরাজয়ের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানিতে পারি যে, বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন :–

---

১. ভারতবর্ষের ইতিহাস, ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(২) Lakshmanasena, to whom the inscriptions give imposing titles which suggest great military achievments, A literary source states he reached the hills of Malaya (Travancore) in his "conquest of the world". Inscription also record that he erected pillars of victory at puri' Benares, and Prayaga, to mark the limits of his conquests, and that he overcame Kamarupa... He seems to have swept away the last remnants of Pala power, and so to have come into contact with the Gahadavalas, who, in the twelfth century, had been advancing gradually into Magadha. The Cambridge shorter History of India. P. 148.

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্চরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজিং।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেস্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপুতে।
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযুপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভ মালান্যধায়ি ॥

লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয় সমর জয়স্তম্ভ

ইহা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও গদাপাণির সংবাসবেদীতে, অতি করুণার গঙ্গা-সঙ্গম বারাণসীক্ষেত্রে ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণতিতে, যজ্ঞযুপের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, লক্ষ্মণসেন একদিকে ত্রিবেণী এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র [বারাণসী] এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথ ক্ষেত্র [মুষলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং] পর্যন্ত তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১]

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল

লক্ষ্মণসেন যেমন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন, তেমনি তিনি গুণগ্রাহী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজে সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহর সভার গৌরব-বর্ধন করিয়াছিলেন– গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী এই পঞ্চ রত্ন। লক্ষ্মণসেনের অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্তৃক সংগৃহীত "সদুক্তিকর্ণামৃতে" তাঁহার রাজত্বকালের কবিগণের বহু শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রামপাল দেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয়-শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি এখন পালসাম্রাজ্যের শিল্প-নিদর্শন-সমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেব প্রায় ত্রিংশবর্ষ-কাল গৌড়সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।[২]

উমাপতিধর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরস্থিত যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহার বিষয় আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জয়দেবের সুবিখ্যাত "গীতগোবিন্দের" তৃতীয় শ্লোকে আছে,–

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরয়াং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরুহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন–
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়িকবিস্মপতি।

---

১. J.A.S.B. 1896, P. I. P. II.
(২) জয়দেব, শরণ, গোবর্ধনাচার্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ, লক্ষ্মণসেনের সভায় বিরাজ করিতেন। রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ দ্বারে–
"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চেতে লক্ষ্মণস্য চ।"
২. J.A.S.B. 1906, P. 174.

লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

পবনদূত :

ধোয়ী কাশ্যপ গোত্রীয় পালধী গ্রামীণ ছিলেন। তিনি কালিদাসের "মেঘদূতের" অনুকরণ করিয়া পবনদূত রচনা করেন। কবির কাব্যের বিষয়-বস্তু এই– লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া ভারতের দক্ষিণভাগে মলয় পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অপূর্ব রূপ-লাবণ্য দর্শনে কুবলয়বতী নামক এক গন্ধর্ব-কন্যা মুগ্ধা হন। তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও পথের নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ধোয়ী কবির পবন দূতে সুম্মের বর্ণনা আছে।

গৌড় দেশের বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন– "সেখানে মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্ধ গৌরীশ্বর মূর্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্প দূরস্থ।" অর্ধ গৌরীশ্বর মূর্তির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে অর্থাৎ, সেন রাজাদের রাজত্বকালে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও পবনদূতের বর্ণনা হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা অবগত হইতে পারি।

লক্ষ্মণসেনের সময় রাজ্যের অবস্থা

লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর-নিক্কনে চমকিত হইত।* * * নিশীথে স্বেচ্ছা-বিহারিণী অভিসারিকগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত হইত! প্রেমালিঙ্গ কামিণীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সেকালে কিরূপ বিলাস-স্রোতে নগরী ভাসমান ছিল।

লক্ষ্মণসেন যে শ্রীবিক্রমপুরের [বঙ্গে-পূর্ববঙ্গে] রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নানারূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের "সূক্তিকর্ণামৃতে" আছেঃ

শাকে সপ্তবিংশত্যাবিকশতোপেত দশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং "মুক্তকর্ণামৃতং চক্রে ॥

অর্থাৎ, শ্রীধরদাস ১১২৭ শকের ২০শে ফাল্গুন "সুক্তিকর্ণামৃত" রচনা করেন। তখন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের আনুমানিক ৩৭ বৎসর অতীত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র গৌড়রাজ্যের কিয়দংশ হস্ত-বহির্ভূত হইলেও, তিনি তাঁহার দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভবতঃ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন

সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সচারাচর ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় নগর মুসলমানদের অধিকৃত হয়, এইরূপ বলা হয়। মুসলমানেরা ঐ অব্দে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। লক্ষ্মণসেনের কোন পুত্র গৌড়ে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬০২-৩ হিজারায়) গৌড় নগর সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদের অধিকৃত হয়।

হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ছিলেন। তিনি স্বকৃত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" লিখিয়াছেন,– লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন। যথা :

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল–
চ্ছত্রোৎসিক্ত– মহামহত্ত্বানুপদং দত্ত্বনবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষ যোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপালংনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতি ধর্মাধিকারং দদৌ ॥

এইরূপ হইলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বোধহয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্য-সহ রাজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, গৌড় ও নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড় ও নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজার সঙ্গী হন। এইজন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে সদব্রাহ্মণের সংখ্যা এত বেশী। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের যতটুকু রাজ্য ছিল, হলায়ুধকে তাহার ধর্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। হলায়ুধ আপনাকে "গৌড়েন্দ্র ধর্মাপরাধিকারী" বলিয়াছেন। গৌড় হইতে তাড়িত হইলেও, সেন-বংশ গৌড়েন্দ্র পদবী হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হ'ন নাই।

হলায়ুধ পণ্ডিত

হলায়ুধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম ছিল উজ্জ্বলা। তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ, শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "মৎস্যসুক্ত" রচনা করেন। সে সময় গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দু সদাচার রক্ষা হয়, তান্ত্রিকতারও প্রতিকূল না হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই "মৎস্যসুক্ত" রচিত হইয়াছিল। "মীমাংসা–সর্বস্ব", "বৈষ্ণব-সর্বস্ব", "শৈব-সর্বস্ব", "পুরাণ-সর্বস্ব", "পণ্ডিত-সর্বস্ব" হলায়ুধের রচিত। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম পশুপতি। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। পশুপতির "পশুপদ্ধতি" নামক স্মৃতি-গ্রন্থ বিখ্যাত। হলায়ুধের অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান, স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই তিন ভ্রাতাই বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ পরম পণ্ডিত ছিলেন।

শূলপাণি

সে সময়ে শূলপাণিও একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "দীপকলিকা" নামক যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা সম্পাদন করেন।

পুরুষোত্তম দেব ও ত্রিকাণ্ড শেষ

পুরুষোত্তম দেব নামক বিখ্যাত পণ্ডিত "ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক অভিধান রচনা করেন। পুরুষোত্তমদেব বৌদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া ভাষাবৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। পুরুষোত্তম দেবের রচিত এই বৃত্তির নাম "লঘুবৃত্তি।" জয়দেব, গোবর্ধন, শরণ, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ প্রভৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেন দেবের মাতার নাম ছিল রামদেবী। রামদেবী চালুক্যবংশের কন্যা ছিলেন। মাধাইনগরে আবিস্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে :

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নাচালুক্যভূপালকলেন্দুরেখা
তস্য প্রিয়াভুদ্বহমানভূমির্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দেববংশীয় নৃপতিগণের সহিত দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ বরাবরই অক্ষুণ্ন ছিল। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে :

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণমজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ইত্যাদি। ইহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন আপনার বংশকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলিয় পরিচয় দিয়াছেন।

তাম্রশাসনের কাল-নির্দেশ

লক্ষ্মণসেনের, ১। সুন্দরবনের তাম্রশাসনখানি তাঁহার রাজ্যাব্দের দ্বিতীয় বর্ষ মাঘ মাসের দশমদিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ২। লক্ষ্মণসেন দেবের দিনাজপুরের তপনদীঘির তাম্রশাসনখানি তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ভাদ্রমাসের তৃতীয় দিবসে হেমশ্বরথ দানের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ৩। আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানিও বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্র মাসের নবম দিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ৪। মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানি ৫৭। ৫৮ পংক্তি অস্পষ্ট থাকায় কোন্ বৎসরে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। ৫। গোবিন্দপুরের তাম্রশাসনখানি তাঁহার রাজত্বের ৩য় সংবৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঢাকা নগরের ডাল বাজারে আবিস্কৃত লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্তি

আমরা বাল্যকালে যখন ঢাকা বাঙলাবাজারের মেসে কিছুদিন ছিলাম, তখন প্রতিদিন বুড়ীগঙ্গা নদীতে স্নান করিবার জন্য জীবনবাবুর প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে এক দেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়াছি। সুন্দর কারুকার্যখচিত প্রস্তরনির্মিত তোরণের ভিতর দিয়া মন্দির প্রবেশ করিতে হইত। কতবার এ মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তখন কিই বা বুঝিতাম! কিন্তু একদিন পাষাণের ঘুম ভাঙ্গিল! পাষাণ কথা কহিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে পাষাণময়ী-দেবী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অন্ধ ঢাকাবাসীর চোখ খুলিল, তাঁহারা দেখিল দেবী পাষাণের মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন! এই দেবী চণ্ডীর মূর্তি, লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাখাল বাবু এবং ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করেন। তাহা এই– প্রথম পংক্তি :– শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবস্য সং ৩

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি :

২। মালদেই সুতঅধিকৃত শ্রীদামোদ্র

৩। ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমাবণা তদ্‌ভ্রাদকন্ধা"

তৃতীয় অংশ প্রথম পংক্তিতে আছে– শ্রীনারায়ণেন প্রতিষ্ঠিতেতি ৪র্থ ॥

অর্থাৎ, **শ্রীমল্লক্ষ্মণ** সেন দেবের [রাজত্বের] তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই [দেব?] সুত অধিকৃত দামোদর চণ্ডীদেবীর [মূর্তি] আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এই মূর্তিটি শ্রীবিক্রমপুর [রামপাল] হইতে আনীত হইয়াছিল।[২]

এই লিপি সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক চলিয়াছে, তবে আমরা ঢাকার এই লিপিখানি যে তাঁহার জীবিত কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার যে-কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এমন কোন কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেজন্য নৃপতি লক্ষ্মণসেন আনন্দে ও উৎসাহে দান-দ্যান কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সংবৎ

"লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল 'লক্ষ্মণাব্দ' ' লক্ষ্মণ সংবৎ' নামে পরিচিত। এই অব্দটি সম্বন্ধে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপ্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাসের" একাদশ পরিচ্ছেদে [২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠা] আলোচনা করিয়াছেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবু- 'পরগনাতি সন, সন বল্লালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চলে হিন্দু নরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং, এই অব্দটি কেশবসেনের পরবর্তী কোনও সেন রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগনা যদি "পারসী শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরগনা-বিভাগ-সময়ে এই সনটিকে পরগনাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।" ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের মত এই যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দ বর্তমান সময়ে পরগনাতিসন নামে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।" আমরা সম্ভবতঃ সকলের আগে 'আরতি' পত্রে ও 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণে পরগনাতি সন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলাম।[৩]

১. The unique four armed image of Chandi * * was found in the ruins of Rampal in the Dacca District. It was obtained by the late Babu Baikunthanath Sena along with a number of other images, and presented to the late Babu Jivana Chandra Raya who erected a temple for this fine image and installed it there.

2. Iconograply of Buddhist and Brahmanical Sculpture. Page 202-4 বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৪৮ পৃষ্ঠা; ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯১-৩৯২ পৃষ্ঠা। Journal & proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol IX. P. 299 P. I. XXII-&c.

৩. (1) Indian Antiquary, Vol XIX, P. I.
(2) The Era of Lachmana Sen-H. Beveridge, J.A.S.B. Pt. 1. Page 2.
(3) Indian Antiquary vol. XIX. P. I.

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত ডাঃ কিলহর্ণের মত গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে; এই অব্দ ১১১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। ডাঃ কিলহর্ণের মতই সমীচীন বোধ হয়। তাঁহার মত অনুসারে লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেককাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে।[১]

বিক্রমপুরের ইতিহাস

লক্ষ্মণ সংবতের সূচনা ও প্রচলন সম্পর্কে নানারূপ মতামত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরব্ধ-কাল সম্বন্ধে পূর্বে মতভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ ও ডাক্তার কিলহর্ণ মনীষীগণ 'আকবর নামার' উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে স্থির করিয়াছেন যেন, লক্ষ্মণ সংবৎ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতেই গণিত।

আবার কেহ কেহ বলেন, বল্লালসেনের মিথিলা আক্রমণ-কালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম এবং বিজয় এই উভয় ঘটনা স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি পুত্রের নাম লক্ষ্মণ সম্বৎ নামে একটি অব্দ প্রচলন করেন। কাহারও কাহারও মত এই যে, মিথিলা বিজয়-কালে চতুর্দিকে বল্লালের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত নবজাত লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছিলেন; এজন্যই উক্ত অব্দ বল্লালের নামে প্রচলিত না হইয়া তদীয় পুত্রের নাম প্রচলিত হয়। "লঘুভারতকার" বলেন :

প্রবাদঃ শ্রুয়তে চার পারস্পরীণ বার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালে হ ভূন্মৃতধ্বনি ॥
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ ॥

লঘুভারত ২য় খণ্ড ১৪০ পৃ :।

লক্ষ্মণাব্দ যেরূপেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক না কেন তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পর আর আমাদের পক্ষে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কৌতূহলী পাঠকগণ আমাদের পাদটিকায় লিখিত গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলেই নিজ নিজ মতামত সংগঠন করিতে পারিবেন। আমরা যে মত গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

"লক্ষ্মণাব্দ," "লক্ষ্মণ সংবৎ" "ল সং" নামে পরিচিত। মুসলমান-বিজয়ের পরেও ঐ অব্দ বহুকাল পর্যন্ত মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই এই অব্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করা আবশ্যক।

১. শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎ প্রণীত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস'– শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্টে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইল। "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও একই সময়ে পরগনাতি সন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

"লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক"

লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী ছিলেন এবং নানা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, আমরা তাম্রশাসনের খোদিত-লিপি হইতে তাহাই জানিতে পারিতেছি। আমরা তাম্রশাসনে তাঁহাকে বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপ' রূপে বর্ণিত হইতে দেখিতে পাইতেছি, আবার তাঁহাকে' 'কাশিরাজ বিজেতা' রূপেও দেখিতে পাইতেছি। "লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়ের অধিপতি, তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহড়-বার-রাজ-জয়চন্দ্র এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় য়াজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইঁহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং, ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য-সাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অবাধে মগধ ও বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।'[১]

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি লক্ষ্মণসেন মুসলমান আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। বাল্যকালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময় আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছি :

"তুমি কেহে নবদ্বীপ অন্তঃপুর দ্বারে,
রমণী অঞ্চল ধরি কম্প থরে থরে
কালামুখ ভীরু বৃদ্ধরাজ কুলাঙ্গার
চঞ্চল হৃদয় তার বাক্‌শক্তিহীন
গাঢ় অমা– অন্ধকারে বদন মলিন
নিশ্বাসে প্রবল বায়ু নয়নে আসার।
কে তুমি গঙ্গার এই গভীর উরসে
তরি যোগে পলাইছ ঘন ঊর্ধ্বশ্বাসে
চাহিয়া পশ্চাৎ পানে তিলে শতবার
একি ঘোর কোলাহল তোরণ দুয়ারে
গরজে কি কাল মেঘ প্রলয় সঞ্চারে?
* * * * *
দাঁড়াও দাঁড়াও বৃদ্ধ ভয় অকারণ
এ কলঙ্ক ধৌত তব না হবে কখন
করি সর্বনাশ বঙ্গে জীবনের আশ
অশীতি বৎসরে পুনঃ বাঁচিতে প্রত্যাশ।
ভীমবল বল্লালের তুমি কুলধর
বারেক * * সহ করহ সমর।

১. গৌড় রাজমালা ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

একি মন্ত্রী পশুপতি তোমার উচিত
নারকি বিশ্বাসঘাতী জেনিছি নিশ্চিত।
ডাকি আনি দস্যুগণে নিজ গৃহ দ্বার
খুলে দেয় শুনি নাই জানিলাম তবে,
এখনি সে প্রতিফল পদে পদে হবে
ইতিহাসে এ কলঙ্ক ঘুষিবে তোমার।
হলায়ুধ পণ্ডিতের মিথ্যা অভিমান,
ভীরুতার পরিচয় করি শাস্ত্র জ্ঞান,
একি উপদেশ হায়, স্বাধীনতা নাশে
* * হস্তগত বঙ্গ ভূমি হবে?
রাজ অন্ন খেয়ে একি ব্যবহার তবে?
হিন্দু লক্ষ্মী ছেড়ে দিলে কোন্ সুখ আশে?
চিরদিন তরে বঙ্গ সুখ রবি গত,
উদিবে কি; রাহুগ্রাসে হইলে পতিত।
অধীনতা তমোজাল ক্রমেতে ঢাকিল
হায়রে বঙ্গের লক্ষ্মী...করে
সপ্তদশ জন মাত্র স্বাধীনতা হরে
ধন্যমানি বক্তিয়ার তব ইন্দ্রজাল।[১]

ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেনে পলায়ন কলঙ্কের কথা কিভাবে জনসমাজের কাছে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন যখন নিশ্চিন্ত মনে পণ্ডিতগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতেছিলেন।

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুইজউদ্দীন ঘুরী দ্বিতীয়বার বহু সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তরাইন নামক স্থানে ঘুরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলেন।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর ঘুরী আজমীর অধিকার করিলেন। একজন হিন্দু, করদ নৃপতিরূপে আজমীরের শাসনকার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘুরী এই বিজয়ের পর গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তুরস্ক ক্রীতদাস কুতবুদ্দীন আইবেককে ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন।

১. প্রিয়পাঠ, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। কলিকাতা সেন্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটির অনুমোদিত। অষ্টম সংস্করণ Printed by Jadunath Seal, Hare Press 23/1, Bechu Chatterjee Street. Published by the Students Library, Dacca 1889. অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বের ছাত্রগণ লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন কলঙ্কের কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে। আমার আজও এই কবিতাটি স্মরণ আছে।

কুতুবুদ্দীন স্বীয় রণনৈপুণ্য-প্রভাবে শীঘ্রই দিল্লী এবং অন্যান্য অনেক স্থান জয় করিলেন (১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এই বৎসরই কুতুবুদ্দীন, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে চন্দাবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এইরূপে ইসলামের বিজয়-গৌরব বারাণসী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিজয়ের অত্যল্পকাল পরেই, কুতুবুদ্দীনের জনৈক কর্মচারী বক্তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ বঙ্গ ও বিহার জয় করেন। এই সময়ে বিহারের পাল বংশের একজন রাজা রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গদেশে সেন বংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৮৫-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাই জনপ্রবাদ।[১]

মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার কর্তৃক যে ভাবে বঙ্গ-বিজয়-কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিল! ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন– "সপ্তদশ অশ্বারোহী-লইয়া-বক্তিয়ার খিলিজী বাঙলা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার!"

এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজ-ই-সিরাজ কর্তৃক লিখিত "তবকাৎ-ই"–নাসেরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া বীর্যবান লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কে করিয়া আসিতেছিলেন। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্বীয় অতুল্য গবেষণা দ্বারা সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের পরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎপ্রণীত "গৌড় রাজমালা" নামক গ্রন্থে, প্রথম ভাগে, এবং আমি মৎ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসেও" লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন-কলঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং "ঢাকার ইতিহাসেও" যতীন্দ্র বাবু এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম। দীর্ঘ

১. In 1192 Muhammad Ibn Sam had avenged Prithiviraja's defeat of the Muslims in the previous year, and had crushed the Chahumana opposition to his advance. In 1193 Delhi had fallen, and in 1194 Kanauj, and in the same year Muhammad Ibn Bakhtiyar, one of Kutb-ud-din Aibak's generals, advanced repidly, conquered Bihar, took Nadiya and overthrew Lakshmanasena who escaped with his life. *If the Muhammadan historians are to be believed*, the invaders met with no organised opposition, and the conquest was extraordinarily easy. The Gahadavalas seem to have withdrawn and left open the way through Magadha. In Bihar itself three were no armed men, and the capital, Nadiya (afterwards Lakhanuti), was taken by only eighteen horsemen Lakshmanasena escaped acrose the river into Eastern Bengal, where early in the thirteenth century his sons succeeded him. Literature seems to have flourished at his court, the most notable names being of Javadeva, author of the Gitagovindo, Halayudha, and Dhoyi, author of the Pavanduta, an imitation of the celebrated Meghaduta. Inscriptions surviving from the reigns of his sens, Visvarupasena and Kesavasena, tell us only that these kings granted certain lands in the Vanga region and ruled for about fourteen and three years respectively. But, although the progress of the Muhammadans was slower in eastern than in western Bengal, by the middle of the thirteenth century all trace of Hindu rule and disappeared. The Cambridge Shorter History of India. Edited by H. H. Dodwell. Pages 148 & 149.

হইলেও এ বিষয়টি সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যক।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক লিখিয়াছেন– "বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্ঠিবর্ষ পরে' সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক "মিনহাজ-ই-সিরাজ" এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি 'তবকাৎ-ই-নাসেরী' নামক দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া" নামক রাজধানীতে উপনীত হইবা মাত্র, রায় লছমানিয়া' নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। * * ইহার মূল প্রমাণ, নিম্হাজের গ্রন্থে, তাহার একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-গমনের ষষ্ঠিবর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিনহাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব ঘোষণা প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগে যাঁহারা এদেশের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, সেই সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন-লিপি আবিস্কৃত হইয়া আমাদিগের নিকটে যে-সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

* * * বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে রাঢ়, মিথিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগড়ী নামক ভাগ-পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকাল এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষৌর নামে তিন স্থানে তিনট রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায় ছিল, তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা– রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম– এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনের পশ্চিমে কাশী এবং পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীর-কীর্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ বলেন– এই নরপতির নামানুসারেই পুরাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্যন্ত এদেশের মুসলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবতীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপ সেনের শাসন-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিন্হাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গে গমনের ষষ্ঠবর্ষ পরেও) পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুন্ন অধিকার বর্তমান ছিল, তদ্দেশে তখনও পর্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাসনলিপির ও মুসলমান লেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই,– তিনি কোন স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগনা মাত্র, এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন– "দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটি সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ার যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত ছিলেন, এবং সেই সেনানিবাসই তাঁহার বিজয় রাজ্যের পূর্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল।"

মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই; রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমরাই অর্থ নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায়লখ্-মণিয়াকে' লক্ষ্মণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি।"

'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ, 'নোদিয়া বিজয়ের' কথা আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন– "লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গালা তুরুষ্কের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু মিনহাজুদ্দীন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লখমনিয়াকে বা লক্ষ্মণসেনকে "কাপুরুষ" না বলিয়া বীরাগ্রগণ্য বলাই সঙ্গত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও বঙ্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লখমনিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও নড়িলেন না, একটি জনশূন্য রাজধানীতে একটি বৎসর শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শত্রু আসিল, তখন যে অপাত্রের হস্তে নগর দ্বার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা তুরুস্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শত্রুর প্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার রক্ষকগণ সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগরে প্রবেশ করিতে দেয়, মিনহাজুদ্দীন ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক এরূপ অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা সরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যায় না।"

"লক্ষ্মণসেনের "নোদিয়া" হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না– তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা মাত্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য দুইটি পুত্র ছিল; তিনি যাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদ, যৌবনে প্রধান মন্ত্রিপদ, এবং যৌবনান্তে যৌবনশেষ যোগ্য ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলায়ুধের ন্যায় এরূপ হাতে-গড়া অমাত্য ছিল; এবং তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামরূপ পর্যন্ত যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন, এরূপ সৈন্যসামন্তও ছিল। মিন্হাজ লখ্মনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বার্ধক্যে সকলে দল বাঁধিয়া শত্রুর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য "নোদিয়ায়" ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজখবর লইবে না; ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনুমান হয়– যখন "ব্রাহ্মণগণ" এবং ব্যবসায়িগণ নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, "নোদিয়ার" অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক এরূপ নির্বিবাদে পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে,– যখন মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পঁহুছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিবর্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন (পূর্ব)

বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরুষ্ক নায়কের "দোয়ম সালে," নোদিয়া আক্রমণের পূর্বে] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে তাহার একখানিতে লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে, এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণসেন– পাদানুধ্যাত কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়,– লক্ষ্মণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে, এই ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি প্রধূমিত হইবার সময়ে,– মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন।"

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : "মগধজয়ের পরে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের যশঃ, বঙ্গ ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তিনি দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দীন কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। "দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যবহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক্ মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখমনিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধন-রত্ন-সম্পদ; দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন।" ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজের বিবরণ। মিন্‌হাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমসামউদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখতিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেনরাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কোন পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কুল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনও অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের গৌড় বিজয়-কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড় জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা,

লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া বিজয়-কাহিনী অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্বার হিন্দুরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অর্ধ শতাব্দী পরে বাঙলার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দীন য়ুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রার মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্বে কথিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমসুদ্দিন আলতামস এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এবং বাঙলার স্বাধীন সুলতান সিকন্দর শাহ কামরূপ বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেন বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল; কোন্ সময়ে কিরূপে গৌড় দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়রাজ্য বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মনিহাজ-উস্-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"[১]

লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের বিক্রমপুরে পলায়ন

এ প্রসঙ্গে "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন, – মগধ অধিকার পূর্বক মুসলমানগণ গৌড়বাজ্যে দেখা দিল। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুত্র বিশ্বরূপসেন গৌড়ে অবস্থান করিয়া "গর্গ যবনান্বয়" দিগকে বারংবার পরাজিত করেন। অবশেষে হিন্দু সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যায়। মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করে। কেশবসেন বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। মুসলমান সেনা নবদ্বীপাভিমুখে ধাবিত হয়। গদাপানি মুহম্মদ-বিন্-বক্তিয়ার-খিলিজি নবদ্বীপের নিকটবর্তী জঙ্গলে অধিকাংশ সেনা লুক্কায়িত রাখিয়া অত্যল্প সেনাসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী আক্রমন্ত হইলে নগর-মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। কেহ কেহ বলেন রাজবংশীয়েরা 'নীলাচল' গমন করেন। মেল মালা নামক গ্রন্থে আছে :

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দু রাজ্য শেষ হইল যবনের বলে।"

"তবকৎ-ই-আকবরীর' মতে রাজা জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন! ইহা কল্পিত-কাহিনী মাত্র।

১. স্বর্গত দুর্গাচরণ সান্যাল তৎ-প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে" লিখিয়াছেন– "রাজা লক্ষ্মনসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া 'লছমনিয়া' বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙলা ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখনও রাজধানী ছিল না। এবং লাক্ষ্মণ্যসেন নামে কোন রাজা ছিল না। ৪১ পৃষ্ঠা।

এ সম্বন্ধে রিয়াজ-উস্-সলাতিন, 'তবকৎ-ই-নাসিরি' এবং 'তবকৎ-ই-আকবরি' ভিন্ন ভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ্ বলেন,– "রাজা যখন আহার করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় বক্তিয়ার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণসেন ধন-রত্নাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনাবৃত পদে গুপ্তপথে পলায়ন করেন।" ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন :

Probably in A. D. 1199 not long after his facile conquest of Bihar, Muhammad the son of Bakhtyar equipped an army for the subjugation of Bengal. Riding in advance of the main body of his troops, he suddenly appeared before Nudiah with a slender follwoing of eighteen horsemen, and boldly entered the city, the people supposing him to be a horse dealer. But when he reached the gate of the Rai's palace, he drew his sword and attacked the unsuspecting house-hold. The Rai who was at dinner, was completely taken by surprise. Rai Lakhmaniya as the auther calls him, fled to Bikrampur in the Dacca district where he died, and the conquereor presently destroyed the city of Nudiah, establishing the seat of his government at the ancient Hindu city of Lakhnauti, or Gour, Early History of India Page 405.

বলাবাহুল্য যে, ইংরাজ লেখকগণও সেই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিনানুসন্ধানে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কেহই লক্ষ্মণসেনের নাম করেন নাই। এবং Rai Lakhmaniya as the author calls him! বলিয়াছেন।

সে যাহাই হউক না কেন– লক্ষ্মণসেনের নামে যে পলায়ন-কলঙ্ক বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, কবি যাহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, চিত্রকর যে পলায়ন-কলঙ্কের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা যে কতখানি সত্য তাহা পাঠক মাত্রেই উল্লিখিত বিবরণীসমূহ পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে অলীক কাহিনী মাত্র!

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের মতে বক্তিয়ারের 'নদীয়া' আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না। আমরা রাখালবাবুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমারের মত সমর্থন করি এবং উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করি যে– "গৌড়জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক।"

আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেনের নগ্নপদে পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী মাত্র। ঐতিহাসিক সত্য নহে। এইরূপ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া আমরা অন্যায় ভাবে একজন স্বাধীন বীর নৃপতির ললাটে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া আসিয়াছি। ভবিষ্যতবংশীয় বাঙালী ও ভারতীয়গণ এই মিথ্যাকে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বিশ্বাস করি।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন– "৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব কোনও সময়ে লক্ষ্মণসেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনীয়াকে" লক্ষ্মণসেন ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রলিপি : ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে Indian Historical Quarterly Vol. III Page 88-96 "Lost Bhwal Copper-plate of LaksmanSena Deva of Bengal" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছিল যে, তিনি ঐ তাম্রলেখের সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি 'The Indian Historical Quarerly Vol. XV. No. 2. June, 1939 সংখ্যায় Mr. H. N. Randle "The Lost Bhwal Copper plate of Laksman Sen" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :– ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে India office লাইব্রেরীর কার্যে যোগদান করিবার পরে আমি একটি আলমিরা হইতে ২৪ খানা তাম্রশাসনের সন্ধান পাই। অনুসন্ধানে দেখিলাম যে, তাহার মধ্যে ৪ খানা ছাড়া আর সব কয়খানির সম্বন্ধেই প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। [I found that three of them at least had never been noticed so far as I have been able to ascertain] তাহার একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন [a complete inscription on a single copperplate] মাধাইনগর তাম্রশাসনের-সহিত ইহার প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়। রাজ্যাঙ্ক ২৭...কা দিনে ৬। প্রথম ২৪ পংক্তি পদ্যে লিখিত প্রশস্তি। ঠিক মাধাইনগর-লিপির অনুরূপ। ২৫-২৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেনের নাম এবং উপাধি রহিয়াছে এবং পরম নারসিংহ এবং বল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত [Lines 26-29 give Laksman Sena's name and titles– the latter including Parama-Narasinha-and describe him "meditating on the feet of Vallalsewnadeva"] পরম বৈষ্ণব কথাটিও খোদিত আছে। ২৯-৩৩ পংক্তিতে অন্যান্য তাম্রশাসনের ন্যায় রাজকর্মচারীদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ৩০-৪৪ পংক্তিতে দানোক্ত গ্রামের নাম, সীমা ইত্যাদি। ৪৫-৪৭ পংক্তিতে দানগ্রহীতার পরিচয় আছে, তাহা এইরূপ : "সামবেদকৌথুমশাখার ঔর্ব, চ্যবন্ ভার্গব এবং জামদগ্ন্য [অন্য শব্দ অস্পষ্ট] প্রবর [গোত্র-অস্পষ্ট-সম্ভবতঃ মৌদগল্য বুদ্ধদেব শর্মার প্রপৌত্র জয়দেব শর্মার পৌত্র, মহাদেব শর্মার পুত্র পদ্মনাভদেব শর্মন। এই দান [৪৮. পংক্তি] দুইজন মহাদেবী, একজনের নাম কল্যাণদেবী। ৫০-৫৭ পংক্তিতে এই দান সম্বন্ধে কেহ যাহাতে কোনরূপ স্বত্ব বিলোপ না করেন তৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন অন্যান্য তাম্রশাসনে আছে। (৫৮-৫৯ পংক্তিতেও ঐ সমুদয় উক্তিতেই পূর্ণ) ৫৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেন অরি-রাজ-মদন-শঙ্কর-নরপতি এবং গৌড়-মহা-সান্ধি-বিগ্রহিক শঙ্করধর-দূত রূপে পরিচিত আছেন। ৫৯ পংক্তিতে রাজ-পরিচয়, দূত' কথা এবং তারিখ আছে।

এই তাম্রশাসনখানির আকার ও অন্যান্য তাম্রশাসনেরই অনুরূপ। দশভুজ-সমন্বিত সদাশিব মূর্তি শীর্ষদেশে সংযোজিত আছে। এই তাম্রলেখখানির অপর পৃষ্ঠার অক্ষর ইত্যাদিও বেশ সুস্পষ্টই রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় কোথাও কোথাও অক্ষর পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। উপরের দিকে ও নীচের দিকে ততটা না হইলেও মাঝামাঝি একটু বেশী ক্ষয় পাইয়াছে কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদন সম্পর্কে কোনরূপ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল গ্রামের নাম ও সীমা ইত্যাদি রহিয়াছে তৎ-সম্বন্ধে Mr. Randle বলেন : "Unknown place names, however must remain dubious : and so far I cannot feel certain of my tentative readings of any of place-names with the exception of Paundravardhana". তাঁহার মতে এই তাম্রশাসনখানাই ডাক্তার ভট্টশালী লিখিত "Lost Bhowal plate"- আমরা লক্ষ্মণসেনের এই হারানো তাম্রশাসনখানা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। ভবিষ্যতে এই তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে এবং উহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে সেনরাজাদের সম্বন্ধে হয়ত আরও কিছু না কিছু নুতন কথা জানিতে পারিব।

লক্ষ্মণসেনের চরিত্র :

লক্ষ্মণসেন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। একথা মুসলমান ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,– "এই নৃপতি ব্যক্তিগত হিসাবে নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ নৃপতি, ভূম্যধিকারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সেনবংশীয় নরপতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি খলিফাদের ন্যায় ধর্মজগতের নেতা ছিলেন।" ঐতিহাসিকেরা বলেন– "লক্ষ্মণসেনের নিকট কেহ নির্যাতিত কিংবা বিচারে কেহ কোনও অবিচার লাভ করেন নাই। তাঁহার দানশীলতা জনপ্রবাদের মত প্রচলিত ছিল।"[১]

লক্ষ্মণসেন পিতৃপ্রবর্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন বলিরা কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে। সেনরাজ বংশের কোন তাম্রশাসনে কৌলিন্য প্রথার কথা নাই। তিনি প্রথম বয়সে শৈব ও শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন। তপদীঘি, সুন্দরবন, আনুলিয়া, মাধাইনগর, শক্তিপুর, এবং গোবিন্দপুরের ও ভাওয়ালের তাম্রশাসনে তিনি **"পরমবৈষ্ণব"** ও **"পরম নারসিংহ"** বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁহার প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই আমরা মহাদেবের বন্দনা দেখিতে পাই। **পরম-নারসিংহ** শব্দ দ্বারা তিনি নরসিংহ বা নৃসিংহ দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়াও

---

১. The ruler of Eastern Bengal in those days was Lakshmansena, described by the Muhammadan writer as an aged man and reputed, though erro-neously, to have occupied the throne for eighty years. The protents which were said to have attended his birth had been justified by the monarch's exceptional personal qualities. His family we are told, was respected by all the Rais or chiefs of Hindusthan, and he was considered to hold the rank of hereditary Khalif (Caliph) or spiritual head of the country. Trustworthy persons affirmed that no one, great or small, ever suffered injustice at his hands, and his generosity was proverbial. V. A. Smiths' Early History of India. Page 405.

অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, কেননা বিক্রমপুরের নানা গ্রামে অনেক নৃসিংহ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানির প্রারম্ভে লিখিত আছে "ওঁ নমো নারায়ণায়" আর প্রথম শ্লোকটি রহিয়াছে :

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখের গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্‌যস্যাতি চিত্রংবপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানোমুখং
দেবত্রাসনিরস্ত দানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ ॥

এই তাম্রশাসনেরও প্রথম দিক্ দিয়া মহাদেবেরই বর্ণনা রহিয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক শৈব ধর্মকেও কোথাও অশ্রদ্ধা করেন নাই। তাঁহার তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমে মহাদেবের বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মণসেনের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি।

লক্ষ্মণসেনের অনুরোধে [অনেক পণ্ডিতের মতে] বিক্রমপুরের অধিবাসী "ব্রাহ্মণসর্বস্ব"-প্রণেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন গৌড়বঙ্গের সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্বক "মৎস্যসুক্ত" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন কদাচারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

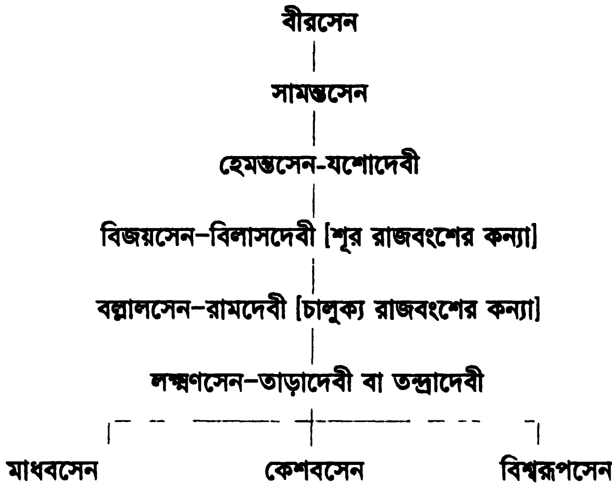
'কুলপঞ্জীর' মতে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের সমীকরণ করেন। লক্ষ্মণসেন সম্ভবত ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মাধবসেন

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মাধবসেন রাজা হন। মাধবসেন সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। কাজেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ভাবে কিছু বলা অসম্ভব। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা মাধবসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "লক্ষ্মণসেনের পরলোকের পর মাধবসেন রাজা হন। মুসলমানদের হস্ত হইতে অবশিষ্ট রাজ্যের রক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। হরিমিশ্রের কারিকা পাঠ করিলে জানা যায়—মাধবসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিবার সমীকরণ করেন। মাধবেসন-ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্য দিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শিলালিপিতে মাধবসেনের কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে। মাধবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণও তীর্থ-ভ্রমণে যান। কেদারভূমির বাণেশ্বর মন্দির-মধ্যস্থ তাম্রশাসনে ভট্টনারায়ণের বংশীয় রুদ্রশর্মর নাম দৃষ্ট হয়। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত কবিতা পাওয়া যায়। মাধবসেন দশ বৎসর রাজত্ব করেন এইরূপ শুনা যায়।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ-প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাসের" পরিশিষ্ট [ঞ] ভাগে সেনরাজবংশের একটি বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও মাধবসেনের নাম রহিয়াছে।

সেনরাজ বংশ :



রাখালবাবু বলেন,– ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয় গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের এক-একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন– 'কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে।" রাখালবাবু বলেন– "Atkinson' রচিত N. W. P. Gazetteer, Vol XII Himalayan Districts, ৫১৬ পৃষ্ঠায় ঐরূপ তাম্রশাসনের কোন উল্লেখ নাই।

মাধবসেনের রচিত কয়েকটি কবিতা "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব সেন এবং মাধব এই দুই নামই উহাতে রহিয়াছে। কাজেই মাধবসেন একই ব্যক্তি কিনা তাহা বিচারসহ।

বিশ্বরূপসেন : বিশ্বরূপের মদনপাড় তাম্রশাসন

বিশ্বরূপসেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার মদনপাড় গ্রামে বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই তাম্রশাসনখানি হইতে অবগত হই যে– তিনি "শিবপুরাণোক্ত" ভূমিদান ফলপ্রাপ্ত কামনায় বৎসগোত্রীয়, ভার্গবচ্যবন-আপ্লুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্য প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, বনমালি দেবশর্ম্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে শিবপুরাণোক্ত ভূমিদান ফল কামনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গালভূঃসীমা, দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রামভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপী জঙ্গালাসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পোজীকাপী গ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পা শঙ্করাস ভূমি ও নারাস্তর্প গ্রামে স্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৬ বা

৫৪৭। এই তাম্রশাসনে গৌড় মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নাম রহিয়াছে শ্রীকোপিবিষ্ণু।[১]

এই তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ অতি চমৎকার। * * সত্যব্রত গাঙ্গেয়-শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরম-সৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেনদেবপাদানুধ্যাত-অশ্বপতি-গজাপতি রাজ্য-ত্রয়াধিপতি- সেনকুলকমলবিকাশ-ভাস্করসোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণসত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরাণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর- গৌড়েশ্বর শ্রীমদবিশ্বরূপসেনপাদা বিজয়িনঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বরূপ সেনের সহিত তুরস্কগণের-যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল তাহা কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসন হইতেও অবগত হওয়া যায়, তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেন "গর্গ যবনান্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও বিশ্বরূপসেনের মদনপুরের তাম্রশাসন হইতে ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে, বিশ্বরূপ সেন কেশব সেনের অগ্রবর্তী ছিলেন। [The Edilpur grant contains several additional verses, consequently it might be stated that Visvarupasena was Kesavsenas Predecessor] মদনপুর তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিশ্বরূপ সেন কিছু বেশী দিনই রাজত্ব করিয়াছিলেন।[২]

বিশ্বরূপ সেনের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। একখানি মদনপাড় নামক গ্রামে। স্বর্গত ঐতিহাসিক নগেন্দ্রবাবু বসু মহাশয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের [pt. I. page 6-15] Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ উহার পাঠ প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি এই তাম্রশাসনখানার প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "কোটালিপাড় পরগনার অন্তর্গত মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনখানি ঈশ্বর দেবশর্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দিবশর্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, দুইখানি ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্ত গ্রামের নাম পিঞ্জকাঠি। মদনপাড় তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পিঞ্জকাটি গ্রামের বর্তমান নাম পিঞ্জরী। ইহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূত।"

এই তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন :– "In the village MADANPADA Post office pinjuri, Parganah Kotalipada of the Faridpur district a peasant whilst digging his field found a copper plate and made it over to the land-holder who kept it in his house. This plate was made over to me by Pandita Lakshmi Chandra Sankhyatirtha in 1892. এই তাম্রশাসনখানি কোন সন্ধান এখন মিলে না।

এই ফলকখানির আকার ১২½'' × ১০'' ইঞ্চি। শীর্ষ দেশে সদাশিব মুদ্রা সংযোজিত। ইহাতে ৬০ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। একদিকে ৩০ পংক্তি এবং বিপরীত দিকে ৩০ পংক্তি। লিপির ভাষা সংস্কৃত। "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" প্রারম্ভ-ভাগে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রশস্তি শ্লোকগুলি কেশব সেনের তাম্রশাসনের অনুরূপ।

---

১. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, Part I. P. P. 15.

২. J.A.S.B. March 1914; Edilpur Grant of Kesavsena by R.D. Banerji M. A. "ঢাকার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৬ পৃষ্ঠা। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড।

এই তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম হইতেছে কোপিবিষ্ণু। ইনি কেশব সেনেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক। ইঁহার পূর্ব-পুরুষের নাম লোমপাদ বিষ্ণু। বিশ্বরূপের রাজত্বের সং ১৪।১ আশ্বিন দিনে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। শুনা যায় বিশ্বরূপ সেন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি প্রায় বার শত খানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল– বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] শ্রীবিক্রমপুরে। আর যে ভূমি দান করিয়াছেন তাহাও (পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে। [The village was situated in the VIKRAMPUR division (ভাগ) of Vanga which lay within the Paundravardhuan-bhukti.]

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন :– Of the localities mentioned in the inscription Mr. Vasu' identifies pinjokshthi with Pinjari a postal village in the Parganah Kotalipada, near the village of Madanpada, where the grant was found. *In view of the this identification it is impossible to agree with those who regard Vikrampur of the copper plates as different from the modern Vikrampura in Eastern Bengal and propose to locate it elsewhere.* ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এই কথা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক সত্য তাহা যে কোনও সুধীপাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসন

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রাম হইতে বিশ্বরূপ সেনের আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা সুসঙ্গ রাজপরিবারের হস্তগত হয় এবং তাঁহারা উক্ত তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় দান করিয়াছেন। বর্তমানে এই শাসনখানি "সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায়" সংরক্ষিত আছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Indian Historcial Quarterly, Vol 11. No 1 (March 1926) p. p. 77-86. এ এই শাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। তৎপরে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহোদয় Inscriptions of Bengal vol 111. p. 147. প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানির আকার ১০″ × ১২½″ ইঞ্চি। উভয় দিকেই খোদিতলিপি সংযুক্ত। মোট ৬০ পংক্তি লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। অক্ষর বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপির অক্ষর-অপেক্ষা অধিকতর বঙ্গাক্ষর সদৃশ। প্রারম্ভ ভাগে "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" লিখিত।

সদাশিব মুদ্রা যে শীর্ষ দেশে সংযোজিত ছিল তাহা বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু [The seal of Sadasiva, which was affixed to it is missing] উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।[১]

১. ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ করিয়াছেন। ননী-বাবু তাঁহার গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন : – So far as Mr. Nalinikanta Bhattasali of Dacca has been able to ascertain, this plate was found in the year 1925, in the village of Madhyapada, in Vikrampur pargana, about 14 miles direct south of Dacca town. It passed through Dacca town to Susang, in Mymensing District and was acquired there by Maharaja Bhupendra Chandra Singh who presented it to the Sahitya parishat at Calcutta. Before this a strip had been cut away from the bottom of the plate. inscriptions of Bengal page 194.

মদনপাড় তাম্রশাসন ও মধ্যপাড়া শাসনে বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিশ্বরূপসেন পাদ বিজয়িনঃ রহিয়াছে। ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, সেনরাজগণ পরবর্তীকালে পরম সৌর-সূর্যের পরম উপাসক ["The devout worshipper of the sun"] নামে বিঘোষিত হইয়াছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই বিক্রমপুরের সর্বত্র বিবিধ বৌদ্ধ-মূর্তির প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,– বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট সংগৃহীত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে জানা যে, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন ১১৯৪ শকে এবং ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

এই মধুসেনের পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে, সেনবংশ বৌদ্ধ সমাচ্ছন্ন পূর্ববঙ্গে গিয়া কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশ প্রথমে পরম মাহেশ্বর বা গোঁড়া শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন মধ্যে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত তৎপুত্রের তাম্রশাসনখানি হইতে জানিতে পারি যে, নদীয়া পরিত্যাগের পর পূর্ববঙ্গে গিয়া লক্ষ্মণসেন "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যথা:– পরমসৌর-মহারাজাাধিরাজ-অরিরাজ-মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিন জনেই শ্রুতি-পাঠককে ভূমিদান করিলেও স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'পরম সৌর' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ সময় তাঁহার কোন প্রকার রাজনীতিক কারণে পালরাজ সম্মানিত সৌর-ব্রাহ্মণগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন।" পালবংশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সৌর-ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্ত্রিত্ব বা সেনাপতিত্ব বলিয়া নহে, বৌদ্ধ-পাল নৃপতিগণের পৌরোহিত্যও করিতেন। সম্ভবতঃ পালবংশ ধ্বংসের পর ঐ সকল ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গে আসিয়া পূর্ববৎ কেহ কেহ সম্রান্ত বৌদ্ধগণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সৌর ও সৌগত সংস্রবে থাকিয়া ঐরূপ বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৌদ্ধ-প্রজা সাধারণের প্রভাবে অবশেষে সেনবংশও 'সৌগত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মনে হয় পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ সমাজের আনুকুল্যে সেনবংশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানগণের সহিত বিরোধ করিয়াও বঙ্গাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" এই অনুমান একেবারে অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

তবে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে হইতে যে সমুদয় বিরাটাকার বৃহৎ এবং সুন্দর ক্ষুদ্র ও অপূর্ব কারুকার্য-সমন্বিত সূর্য-মূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা হইতে এবং বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] সর্বত্র যেরূপ সূর্যব্রত এবং সৌর-প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা হইতে মনে হয় যে, রাজাদের প্রভাব ব্যতীত কখনই সৌর-প্রভাব ঐরূপভাবে পরিব্যপ্তি হইতে পারে না। 'মাঘমণ্ডলের ব্রত ও তাহার ছড়াগুলি এখনও বিক্রমপুরের সৌর-প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে যে কত দূর অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। এজন্যই পরমসৌর উপাধি গ্রহণে মনে হয় যে, নগেন্দ্রবাবুর অভিমত কতকাংশে প্রণিধানযোগ্য।

বিক্রমপুরের এমন গ্রাম অতি বিরল বিশেষতঃ শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী-র [বর্তমান রামপাল] সমীপবর্তী স্থান-সমূহে অনেক সূর্য-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাশালী মহাশয় লিখিয়াছেন : "Most of the sena kings called themselves great devotees of the sun-god (parama-saura) and Sive (param-Saiva) but Laksmana Sena was particularly a worshipper of Vishnu."

পরবর্তীকালে পরম সৌর সেন নৃপতিগণের উৎসাহেই যে সূর্যদেবতা তাঁহার পূজার আসনখানি বিক্রমপুর-বঙ্গের গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিয়াছিলেন তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

আমরা বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড় ও মধ্যপাড়া তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেন "শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয় গহণ করিয়া [মুসলমান-অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসন হইতে ইহাও জানিতে পারিতেছি যে, "বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এবং উভয়েই "গর্গযবনান্বয়–প্রলয়-কালরুদ্র' এবং "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : "কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা উভয়ে মুসলমানগণের [গর্গযবন] সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ রাজ্যের অধঃপতনের পরে দলবদ্ধ মুসলমান সেনা যখন মগধ, অঙ্গ ও গৌড়ে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত তখন তাহাদিগেরই একদল বোধ হয়, সেনবংশীয় গৌড়রাজা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।"[১]

বিশ্বরূপসেনের রাজত্বকাল

বিশ্বরূপসেন আনুমানিক চৌদ্দ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। [১২০৬-১২২০] এবং তাহার পর কেশবসেন প্রায় তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।– বিশ্বরূপসেন যখন শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন সে সময়ে 'লক্ষ্মণাবতীর তুর্কী মালিক ছিলেন গিয়াসউদ্দীন ইউয়জ্। ইনি হিজরা ৬০৮-৬২৪ এবং খ্রীঃ ১২১১-১২২৬ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গের [পূর্ববঙ্গের নৃপতি] বিশ্বরূপসেনের এবং কেশবসেনের সমসাময়িক ছিলেন।

"তবকাৎ-ই-নাসিরি" পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতীর চতুর্দিকস্থ রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। জাজ্নগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ, বিক্রমপুর-সুবর্ণগ্রাম, কামরূপ এবং তিরহুত্তের [তীরভুক্তি বা মিথিলার] রাজগণ তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।"[২]

১. বাঙ্গালার ইতিহাস ৩২৩ পৃষ্ঠা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. পঞ্চপুষ্প–অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত বাংলার ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৬২-১৭৫ পৃষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন– "মিনহাজের এ উক্তি যদি সত্য হয়, তবে অনুমান করিতে হয় যে, লক্ষ্মণাবতীর গিয়াসউদ্দীনের সহিত বিক্রমপুরের বিশ্বরূপ সেনের সংগ্রাম হইয়াছিল। অনুমান যদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা হয়, তবে বিশ্বরূপসেনের "গর্গযপসেনের "গর্গযবনাম্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" এই বিশেষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই বিশেষণ হইতে মনে হয়, বিশ্বরূপসেন স্বীয় রাজত্বের চতুর্দশ বছরেও [আনুমানিক ১২২০ খ্রীঃ] তুর্কীর সহিত যুদ্ধে নিজেকে জয়ী বলিয়া দাবী করিতেছেন। পক্ষান্তরে, মিন্হাজের উক্তিতে গিয়াসউদ্দীনকেই জয়ী বলিয়া দাবী করা হইতেছে। এই দুই বিরোধী উক্তি হইতে মনে হয় যে, কোনো পক্ষেই নিশ্চিত-রূপে জয় লাভ ঘটে নাই। বিশ্বরূপ যদি সত্যই পরাজিত হইতেন তাহা হইলে বোধ করি নিরর্থক ভাবে অত বড় বিশেষণ ব্যবহার করিতে ভরসা পাইতেন না। আবার পক্ষান্তরে গিয়াসউদ্দীন যদি সত্যই বঙ্গরাজ্যের উপর স্থায়ী ভাবে জয়ী হইয়া থাকেন তবে কয়েক বছর পরেই আবার বঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইত না; কারণ মিন্হাজ অন্য স্থানে আবার বলিতেছেন যে, গিয়াসউদ্দীন স্বীয় রাজত্বের শেষ বছর [৬২৪ হিঃ ১২২৬ খ্রীঃ] বঙ্গরাজ্যের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গ রাজ্যের সহিত গিয়াসউদ্দীনের কোনো সংঘর্ষ হইয়াছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে তবকাৎ হইতে এই ধারণা হয় যে, এই দ্বিতীয় অভিযানে বঙ্গরাজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পূর্বেই গিয়াসউদ্দীনের লক্ষ্মণাবতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল, কারণ ঠিক এই সময়েই দিল্লীর সুলতান আলতামাসের [ইলতুৎমিস] জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মহমুদ গিয়াসউদ্দীনের অনুপস্থিতির সময়েই লক্ষ্মণাবতী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীন পরাজিত ও অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন [১২২৬ খ্রীঃ]* * * যাহা হোক, গিয়াসউদ্দীনের দ্বিতীয় অভিযানের সময় বঙ্গ দেশে কে রাজা ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। আমাদের মনে হয় যে, ঐ দ্বিতীয় অভিযানের সময় [১২২৬ খ্রীঃ] লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনই বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও সে-সময় পর্যন্ত বিশ্বরূপ সেনের পক্ষেও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে বিশ্বরূপের ন্যায় কেশবসেনেরও "গর্গযবনাম্বয়" ইত্যাদি বিশেষণ আছে এবং বিশেষণ নিতান্ত অর্থহীন নয় বলিয়াই মনে হয়।"

কেশবসেন

কেশবসেনের ইদিলপুরের তাম্রশাসন

কেশবসেন সম্ভবতঃ বিশ্বরূপসেনের পরে শ্রীবিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন[১] পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনখানি বাখরগঞ্জ জেলার কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারি ইদিলপুর পরগনায় এক কৃষক মৃত্তিকা খননের সময় প্রাপ্ত

১. J.A.S.B. Vol VII p. p. 43-46, 47-51.

হয়। কানাইলাল ঠাকুর উহা আনিয়া প্রিন্সেপ সাহেবকে দেন, পণ্ডিত গোবিন্দরাম উহার পাঠোদ্ধার করেন। সে যাহা হউক, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেব [James Prinsp] ইহার প্রশস্তির পাঠ এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে 'গর্গযবনান্বয় প্রলয়-কালরুদ্র' বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত মিঃ জয়সোয়াল বলিয়াছেন– কেশবসেন গরঝা (Garjha) নামক ঘার্জিস্থানের একটা জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তাম্রশাসনে "গর্গযবনান্বয় প্রলয়-কালরুদ্র' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। [Mr Jayswal equates garga with Garjha. Gharjisthan and is of opinion that this verse records a victory of Kesavsena over a party of raiders led by Muhammad Ghori. But there is nothing else in support of the statement.] স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষেই জয়সোয়ালের এই যুক্তি প্রমাণসহ নহে।

বিক্রমপুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশি কেন?

অনেকে বলেন– "কেশবসেন গৌড় রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। কেশবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ গৌড় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে গমন করেন। তাঁহার সভাসদ এডুমিশ্রের গ্রন্থে আছে, মুসলমানেরা গৌড় ও নদীয়া অধিকার করিলে, কেশবসেন পিতামহ প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে এক সেন-রাজার সভায় পলায়ন করেন। এডুমিশ্র সেই রাজা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বল্লালী কুল-নিয়ম প্রণয়ন করেন, কিন্তু সেই রাজার নাম কি– তাহা এ-পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

কেশবসেন কোন্ রাজার সময়ে বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে আমরা "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম :– বিশ্বরূপসেন উদার চরিত্র, দানশীল এবং ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন।* * কেশবসেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। ইত্যাদি। "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন :– "এডুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, কেশবসেন সৈন্যসামন্তসহ পূর্ববঙ্গে এক রাজার নিকট আশ্রয় লন। সে রাজার নাম পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন তিনি বিশ্বরূপ সেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ এই রাজা, কেশবের নিকট বল্লালী কৌলিন্য সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সে তথ্য অবিদিত থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের সময়ে জ্যোতিবর্মা সেনরাজগণের সামন্তস্বরূপ চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিবর্মদেব। এই হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব-বালবল্লভীভুজঙ্গ। সম্ভবতঃ কেশবসেন এই হরিবর্মার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন।" আমাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া মনে হয়, কেননা বিজয়সেনের বঙ্গাধিকারের বহু পূর্বেই হরিবর্মদেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি : সেনরাজগণের রাজ্য সীমা

কেশবসেনের তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে ছিল। আমরা পালরাজাদের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, তীরভুক্ত ও শ্রীনগরভুক্তি এই তিনটির নাম পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[১] এবং কঙ্কগ্রামভুক্তি, নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় সেনরাজগণেরে রাজ্য ও পালরাজগণের ন্যায় তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এ বিষয়ে সেনরাজগণের আবিস্কৃত বিভিন্ন তাম্রশাসনগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারি। এবং সেনরাজগণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে স্বীয় বংশের গৌরব বিশেষভাবে যে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহারও বহু নিদর্শন রহিয়াছে। কেশবসেনের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তিনি "গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালো রুদ্রো নৃপঃ" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সহিতও তুর্কীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন যে, কেশবসেনের সময় কেবল বিক্রমপুর প্রদেশ সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল; অন্য অংশ মুসলমানেরা করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাও সত্য নহে।

হরিমিশ্রের কারিকায় আছে– কেশবসেন সর্বদা তুর্কীদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। তজ্জন্য তিনি পূর্বপুরুষগণের কুল-বিধির কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। আমাদের নিকট কুল-বিধির এই উক্তি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি তুর্কীদের ভয়ে ভীত হইতেন তাহা হইলে কখনই 'গর্গযবনান্বয়' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতেন

১. ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী এম, এ, পি, এইচ, ডি বলেন– From the records of the early Sena Kings, we know of only two Bhuktis in Bengal. Viz Paudra Vardhana and Vardhamana, গুপ্ত ও পালরাজাদের সময় পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি কেবলমাত্র বর্তমান রাজসাহী জেলা লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু সেনরাজাদের সময় উহার সীমা পরিবর্ধিত হইয়া অন্য কয়েকটি প্রদেশেও সীমা-ভুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ [approximately the Dacca Division]-ও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের কতকাংশ অর্থাৎ, ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী কতকাংশও বঙ্গের সীমান্তবর্তী ছিল। বর্ধমানভুক্তি গঠিত হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলা [ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থান] এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী এবং হাওড়া জেলাও বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বল্লালসেনের সীতাহাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায় যে, [আনুমানিক ১১৭১ খ্রীঃ] উত্তর-রাঢ়া বর্ধমানভুক্তির মধ্যবর্তী একটি মণ্ডল ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসন হইতে জানা যায় যে, ড়১১৮৩ খ্রীঃ অঃ] উত্তর-রাঢ়া কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায়, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাঁহার বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিবার ফলে বর্ধমানভুক্তির বিস্তার আবশ্যকীয় হইয়াছিল। [* * It is probable that the conquests of Lakshmanasena in the dircection of Bihar must have made this an administrative necessity. It seems to have taken over the Northern Radha tract from Vardhamana-bhukti, although we know from the Govindpur grant, that the latter *bhukti*, was in existence in the 2nd year of Lakshman Sena. The Ajaya which was the boundary between nothern and southern Radha must then have been the boundary between the two *bhuktis*. The Kankagrama-*bhukti* appears to have extended into the Santal parganas and Bhagalpur on the north-west of Uttara-Radha. On the north cost it could have extended very little beyond the river Ganges.

Epigraphia Indica, vol. XXI, no 37. Saktipur copper-plate of Lakshman-Sena Page 213-2 by Dhirendra Chandra Ganguli, M.A., Phd. Benares.

না। নানারূপ কিংবদন্তীর সহিত কুল-পঞ্জিকার কাহিনী এমন ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে, উহা হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে।

কেশবসেনের কবিত্ব

কেশবসেন সুকবি ছিলেন। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) "কৈলাসো নিহ্নুতশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্ব্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন্ন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বু রাশি প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্ত্তু
যৎ কীর্ত্তিনাং বিবর্ত্তে রজনি স ভগবানেকদন্তোঽপ্যদন্ত ঃ।

(২) লীলা সদ্ম প্রদীপ স্ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদা কেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাস বীজং রতিরসকলসহ ক্লেশ বিচ্ছেদ, চক্রম্
কহ্লারা দৈত্যবন্ধুস্তিমির জল নিধেরুচ্ছিখো বাড়বাগ্নি
র্লক্ষ্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি ভুজভুবাংবংশ কন্দঃ সুধাংশু।

অষ্টম অধ্যায়

সেনরাজত্বের শেষযুগ– মুসলমান-বিজয়

কেশবসেনের পরে শ্রীবিক্রমপুরের সিংহাসনে কে বসিলেন তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না। কেশবসেনের পুত্রের নাম কোনও তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় না। বৈদ্যকুল-গ্রন্থে কেশবসেনের পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণের নাম রহিয়াছে। বিশ্বরূপ সেনের কুমার সূর্যসেন ও কুমার পুরুষোত্তম সেন নামে দুইটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা কখনও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আইন-ই-আকবরীতে কেসুসেনের [কেশবসেনের] পর সুরসেন বা সদাসেন নামে একজন রাজার নাম দেখিতে পাই। আইন-ই-আকবরির মত কতটা বিচারসহ তাহা বলা কঠিন। আইন-ই-আকবরির মতে সেনবংশীয় সাতজন রাজা একশত নয় বৎসর রাজত্ব করেন। সুখসেন ৩ বৎসর, বল্লালসেন ৫০ বৎসর, লক্ষ্মণসেন ৭ বৎসর, মাধবসেন ১০ বৎসর, কাষসুসেন ১৫ বৎসর, সদাসেন ১৪ বৎসর, নওজে ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। নওজে বা দনৌজাকে অনেকে সেনবংশীয়দের শেষ রাজা বলিয়া থাকেন। কথিত আছে, দনৌজ-মাধবের সভায় পঞ্চমহাবংশ সম্ভূত ছাপ্পান্ন গ্রামীণ ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে গুণানুসারে কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও কষ্ট শ্রোত্রিয় এই কয়ভাগে বিভক্ত করেন।

কেশবসেনের পরেও যে বঙ্গরাজ্যে শ্রীবিক্রমপুরে পূর্ব বঙ্গে সেন রাজগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল এইবার সেই কথা বলিব। ব্লকম্যান সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন :–

"The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahamedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Ballal's descendents till the end of the 13th century when Sonargawn was occupied by the second son of the Emperor Bulbon. [Blochman's History and Geography of Bengal."]

সুন্দর সেন সুবর্ণগ্রাম

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা বলেন,– "বিশ্বরূপের সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ তনয় সুন্দর সেন সুবর্ণগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুন্দরসেন কুমারসুন্দর নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজনন্দনের নামানুসারে সুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমঃ কুমার সুন্দর এবং পরে কোঙরসুন্দর বা কয়ার সুন্দর নামে অভিহিত হয়। এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। বিশ্বরূপ-তনয় কোনও সময়ে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এবং তাঁহার নাম সুন্দর সেন ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে শাসন কার্যের সুবিধার

জন্য সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় সেন-বংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব নহে।[১]

এই অনুমান কত দূর সত্য তাহা বলা কঠিন।

লক্ষ্মণনারায়ণ

বিশ্বরূপ সেনের পরে লক্ষ্মণনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মণনারায়ণ নাম যেমন বৈদ্যকুল-পঞ্জীতে পাওয়া যায় তেমনি "আইন-ই-আকবরীর" কোন কোন সংস্করণেও লক্ষ্মণ নারায়ণের নাম আছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন :– "কোন কোন লেখক এই লক্ষ্মণনারায়ণকেই লক্ষ্মণের নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং ইঁহারই সময় নদীয়া মুসলমান-কবলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই ধারণা সমীচীন নহে। আইন-ই-আকবরী- মতে লক্ষ্মণারায়ণ ১০ বর্ষ রাজত্ব করেন।"

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : ইঁহার [লক্ষ্মণ নারায়ণের] সম্বন্ধে অপর কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই।

মধুসেন

লক্ষ্মণনারায়ণের পরে মধুসেন নামক আর একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আ. ই. 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার পাদটিকায় লিখিত আছেঃ– "মহারক্ষা মহামন্ত্রানুসারিণী মহাবিদ্যা সমাপ্তা যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদ্যৎ তেষাং চ যো নিরোধো এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ ॥ দেয় ধর্ম্মোহয়ং প্রবর-মহাযানযারিনঃ পরমোপ [া] সক সাধু বীয়োকস্য যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্যোপাধ্যায় মাতা-পিতৃ-পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্ব [।] সকলঃ

পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমমহারাধিরাজ-শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বরমধুসেন-দেবকানাং প্রবর্দ্ধমানাবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩ ॥"

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মধুসেন নামক নরপতি ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ' আইন-ই-আকবরীতে' ইঁহার নাম নাই, কারণ উক্ত গ্রন্থে কেশবসেনের পূর্বে

---

১. ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৭ পৃষ্ঠা।

(১) পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব সীমায়, হিমাচলের ক্রোড়দেশে অবস্থিত কতকগুলি পার্বত্যরাজ্যের অধীশ্বর এখনও সেনরাজবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়ে থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজ্যের কুলপঞ্জিকা অনুসারে লক্ষ্মণসেনের বংশধর, সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সম্বৎসরে মুসলমান কর্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া, প্রয়াগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরসেনের পুত্র রূপসেন, পিতার মৃত্যুর পরে, প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে রূপর নামক স্থানে, একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রূপসেন বাঙলার সেনরাজবংশ-সম্ভূত কিনা এবং মুসলমান বিজিত গৌড়দেশ হইতে পলায়ন করিয়া, সুলতান কুতবউদ্দীন ইবকের রাজ্যভুক্ত, প্রয়াগে, গৌড়রাজের আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য, কিন্তু এই সকল তথ্যের সত্যানুসন্ধান এখন সম্ভব নহে, কারণ এবিষয় সম্বন্ধে প্রমাণাভাব। পঞ্জাব গেজিটিয়র ও শ্রীমতী সরলা দেবী সঙ্কলিত বিবরণ অনুসারে, কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী ও জুম্মার বর্তমান অধীশ্বগণ গৌড়রাজ রূপসেনের বংশজাত। বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড। ২০-২১ পৃষ্ঠা। ঢাকার ইতিহাস–২য় খণ্ড ৪২৬-২৭ পৃষ্ঠা। নব্যভারত ১২৯৯ অগ্রাহায়ণ, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

মধুসেন নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ মাধবসেন; কিন্তু কেশবসেনের পরে সদাসেন বা সুরসেন এবং নৌজা ব্যতীত অন্য কোন রাজার নাম নাই।

রাজা দনুজ রায়

৬৮২ হিজরায় সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন, বাঙলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা, মুগীশউদ্দীন তোগ্রলকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন, – এই দনৌজমাধব যে সময় সম্রাটের সহিত সন্ধি করেন সে সময়ে সোনার গাঁ পৈনাম নামে অভিহিত হইত। দনৌজ মাধব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। ইঁহার দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলিন্য-মর্যাদা এবং নূতন নূতন কুলনিয়মাদি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

এই দনুজ রায় ও মধু সেন ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ববঙ্গের আর কোনও হিন্দুরাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিস্কৃত হয় নাই। এখন কথা হইতেছে– এই দনুজ রায় কে?[১]

আমরা জিয়াউদ্দীন বরণীর "তারিখ-ই ফিরোজ-শাহীতে" পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাজাদের বিষয় জানিতে পারিতেছি। এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা মুগীসউদ্দীন তোগ্রল খাঁ দিল্লীর সুলতান বলবন তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে বাঙলাদেশে উপস্থিত হন, এবং কিছুকালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়া সুবণগ্রামের রাজা দনুজ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুলতান বলবন ও দনুজ রায়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা হইল যে, বিদ্রোহী তোগ্রল খাঁ নদী-পথে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে দনুজ রায় তাঁহাকে আটকাইবেন। সুলতান বলবনের সহিত দনুজ রায়ের সাক্ষাৎকারের তারিখ ৬৮১ হিঃ অর্থাৎ, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও পূর্ববঙ্গ লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসকদের অধীন হয় নাই।[২]

এই দনুজরায় কে ছিলেন তাহা এতদিন পর্যন্ত একটা অমীমাংসিত তথ্য ছিল, এজন্যই সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একখানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হওয়ায় পূর্ববর্তী লেখকগণের সিদ্ধান্ত ভূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রায় সকলেই সেনবংশীয় নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নবাবিস্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে, দনুজরায় সেনবংশীয় নৃপতি ছিলেন না।

অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসনখানি আমাদের বাসগ্রাম মূলচরের পার্শ্ববর্তী আদাবাড়ি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসনখানার সংবাদ পাইবা-মাত্রই আদাবাড়ি গ্রামে যাইয়া ঢাকা চিত্রশালার জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির পর উহা ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে

১. বাঙ্গালার ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ। পঞ্চপুষ্প [অগ্রাহায়ণ ১৩৩৭ দ্রষ্টব্য]

২. রেভার্টিকৃত তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবাদ ৫৫৮ পৃষ্ঠা। (১) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী। (২) Elliot's History of India, Vol P. 116.

মুন্সিগঞ্জে যে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে ভট্টশালী মহাশয় উহা পাঠ করেন। পরে এই তাম্রশাসন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ১৩৩২ সালের "ভারতবর্ষ" ১৩শ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়।

তাম্রশাসন-পরিচয়

এই তাম্রশাসনখানির আকার ১১$\frac{৩}{৪}$″ ×৮$\frac{৩}{৪}$″ ইঞ্চি। "তাম্রশাসনের উপরে রাজকীয় মুদ্রা সংযুক্ত থাকে, ইহা সকলেই জানেন। পূর্ববঙ্গে এ-পর্যন্ত চারিটি বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই লাঞ্ছন ভিন্ন ভিন্ন। কান্তিদেবের বংশের লাঞ্ছন সর্পবেষ্টিত নরসিংহ মূর্তি, চন্দ্রদের লাঞ্ছন ধর্মচক্র, দুই দিকে দুই মৃগ। অর্থাৎ, মৃগাদাব-বিহারে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র প্রবর্তন। বর্মদের লাঞ্ছন বিষ্ণুচক্র। সেনদের লাঞ্ছন দ্বাদশ-হস্ত-বিশিষ্ট সদাশিব মূর্তি। আদাবাড়িতে প্রাপ্ত শাসনখানির লাঞ্ছন-চারিহস্ত-বিশিষ্ট-যোগাসনস্থ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্তি।

এই শাসনখানি ৫৫ পংক্তিতে খোদিত। প্রথম কি ২৬ পংক্তি এবং বিপরীত দিকে ২৯ পংক্তি। এই শাসনখানি শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহ-খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমত্ বিজয় স্কন্ধাবারাত্ শ্রীমন্নারায়ণ চরণকৃপা-প্রসাদমাসাদিত গৌড় রাজ্য অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্র... য়াদিপতি দেবাম্বয় কমলবিকাশভাস্কর-সোমবংশ প্রদী [প] প্রতিপন্ন কন্ন সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমে.......শ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেব পাদা-বিজয়িনঃ

তাম্রশাসনগুলির বিষয়ে আমরা পূর্বে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাম্রশাসনের প্রথম ভাগে দাতা রাজার বংশ-গৌরব কীর্তন, পরে থাকে রাজধানীর নাম, যেখানে রাজা বাস করেন এবং সাময়িক ভাবে থাকেন তাহার নাম, পরে যাঁহাকে ভূমি প্রদত্ত হয় সেই দানগ্রহীতার নাম ও বংশ-পরিচয়।

বিক্রমপুরের সেনরাজ বংশ

এই তাম্রশাসনখানি হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, নৃপতি দশরথ। দেববংশ-সম্ভূত- দেবাম্বয় কমলবিকাশভাস্কর। তারপর আমরা জানিতে পারিলাম যে, রাজধানী বিক্রমপুর হইতে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

এই রাজার রাজত্বের তৃতীয় বৎসর কার্তিক মাসের ২১শে তারিখে, প্রদত্ত রাজা অশ্বপতি,-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি ইত্যাদি বিশেষণ, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনেও প্রযুক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন:- "প্রদত্ত ভূমির সঠিক বিবরণ এখনও বুঝিতে পারি নাই, তবে উহা অন্তর্বাটী বান্দিখাণ্ডা নবসংখহ পরিচ্ছারই বর্তমান বাইনখাড়া। বর্তমানে বাইনখাড়া প্রকাণ্ড মৌজা, আদাবাড়ি উহারই অন্তর্গত নাতি-বৃহৎ পাড়া।

ভূমির আয়

প্রদত্ত ভূমির চারিদিকের গ্রামগুলির নাম চৌহদ্দি নির্ণয়কালে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে নয়নাব ও মূলদাব,– বর্তমান নয়না ও মালদা। দক্ষিণে বড়াইলা ও ভাঙ্গনিয়া, আজিও ঐ নামেই পরিচিত। বড়াইলা শব্দের উৎপত্তি বড়হাবেলি বা বাটি হইতে হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। গণাগ্রাব বর্তমানে গণাইসার বলিয়া পরিচিত। মাস্তহটা বর্তমানে কোন্ গ্রামের নাম তাহা ভট্টশালী মহাশয় স্থির করিতে পারেন নাই, আমার মনে হয় উহা বর্তমান মিতারা গ্রাম। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রদত্ত ভূমির গ্রামগুলি পরস্পর সন্নিহিত। মাস্তহাটা মিতারা হওয়াই আমি নানাদিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

"প্রদত্ত ভূমির আয় বোধ হয় প্রতি বৎসর পঞ্চশত পুরাণ, বর্তমানের প্রায় আড়াই শত টাকার সমান। এই আয়ের ভূমি অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে গাঞী উল্লেখ করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যাকর ৭৫, ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিণ্ডী গাঞ্চীশ্রী মাত্রী ৪৫,...শ্রীশক্র ৮৫, পালী গাঞী শ্রীসুগন্ধ ২৭, সেউ গাঞী শ্রী সোম ৩০, পালি গাঞী শ্রীবাদ্য ৩০, মাসচটক শ্রীপণ্ডিত ৫০, মূল শ্রীমাণ্ডী ৫০, দিণ্ডী শ্রীরাম ২০, সেহণ্ডায়ী শ্রীলেভু ২৫, পুতি শ্রীদক্ষ ৭, সেউ শ্রীভট্ট ২৪, মহান্তিয়াড়া শ্রীবালি ২৫, করঞ্জ গ্রাম শ্রীবাসুদেব ৫, মাসচড়ক শ্রীমিকো ৫, মাসচটক এবং মাস চড়ক এই দুই বানানই দুই স্থানে আছে।

তাম্রশাসনখানা শ্রীমন্নারায়ণ-মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল, ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

ডাক্তার ভট্টশালী ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উভয়েই একবাক্যে এই শাসনখানার সহিত দেশের ইতিহাস এবং রাঢ়ী-ব্রাহ্মণগণের সাময়িক ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। [** copper plate makes us acquainted with some of the 56 gains of the Radhiyja-Brahmanas which is of considerable interest to the social history of this period]

এই তাম্রশাসনে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। রাজা দশরথদেব হইতেছে তাঁহার প্রকৃত নাম। দনুজমাধব বিরুধ বা বিরুদ মাত্র।

দশরথ-বিরুধ দনুজ রায়

'দশরথ দেবের সময় নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। তিনি বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের তাম্রশাসনের পাঠ হুবহু নকল করিয়াছেন, তাম্রশাসন প্রচারের যেন অচিরকাল পূর্বে নারায়ণের প্রসাদে গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। সহজেই বুঝা যায়, তিনি সেনদের পতনের পরে বিক্রমপুরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 'তবকৎ-ই-নাসিরির'তে ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই আপাততঃ ধরিয়া লওয়া যায়, দশরথ দেব ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নারায়ণ-চরণ-কৃপা-প্রসাদে বিক্রমপুরের রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরেই কুলগ্রন্থে যখন প্রাচীন কুলাচার্য হরিমিশ্রের উক্তি দেখি–

পাদুরবভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্ব ভূপৈঃ সেব্য পদাম্বুজম্ ॥

[বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা]

---

১. Inscriptions of Bengal, Vol III by N. G Majumdar M.A. p 182.

তখন সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের প্রসঙ্গই হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দনুজ মাধবকে সেনবংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু "সেনবংশদান্তরম্" কথাটিতে "সেন বংশ লুপ্ত হইলে তাহার পরে এই অর্থও বুঝাইতে পারে। তাম্রশাসনের প্রচারে দেখা যাইতেছে, তিনি স্পষ্টই দেব বংশজ, সেনবংশের নহেন।"

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসে, কি করিয়া কেমন করিয়া দনুজমাধব দশরথদেব সেনবংশের স্থানে আসিয়া দেববংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন? এ বিষয়ে কোনরূপ মীমাংসায় পৌঁছান সহজসাধ্য নহে, যতদিন পর্যন্ত না অন্য প্রামাণিক উপকরণ হস্তগত না হয়। তবে একথা সত্য যে: the identity of Danujmadhava Dasaratha with Danujamadhava who, according to a dynastic account by Harimisra flourished after the sena rule, and with Danuj Rai the Raja of Sonergaon in Eastern Bengal, who according to Zia-ud-din Barni, entered into an agreement with Ghiasuddin Bulban that he would guard against the escape of the rebellious Tughril Khan by water. (1283 A.D.)* আমরা এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

"কানিংহাম বলেন– *Sunargaon* the, Capital of Eastern Bengal under the Muhammadans, is traditionally said to have been the residence of one of the twelve *Bhumihar* chiefs. Its name of *Suvaran-gram* or "Gold Town" proves that it must have been a Hindu City, although there are only a few fragments of Hindu work now left to attest the fact. The earliest notice of the place that I have been able to find is during the reign of the Emperor Balban, when the rebel Governor of Bengal, Mughis-ud-din Tughral, retreated beyond Sunargaon, near with he was overtaken and killed. The district was then ruled by a Hindu Chief named Danuj Rai, with whom the Emperor made an arrangement to prevent the escape of Tughral by water. This *Danuj Rai is said to have been one of the Bhumihar chiefs*. After the death of Balban, Sunargaon formed part of the Kingdom of Bengal which then became an independent State under Bughra Khan and his descendents.[১]

এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন:– "আইন-ই-আকবরীতে আছে তিনি [দনুজমাধব দশরথদেব] মাত্র তিন বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ তাঁর তাম্রশাসনটিই রাজত্বের তৃতীয় বছরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।"[২]

"চন্দ্রবংশের রাজা শ্রীচন্দের সময় হইতে কেশবসেনের সময় পর্যন্ত বিক্রমপুরেই পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। দশরথ দেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই, সে সময়ও (আনুমানিক ১২৮৩ খ্রীঃ অঃ) বিক্রমপুরই পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁকে সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের সর্বপ্রথম রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই

১. Archaelogical Survey of India, Vol XV Page 135-136, J. R. A. S. B. Page 83.

২. Notes on Sonargaon, Eastern Bengal by Dr. J. Wise.

বোধ হয় ইতিহাসে সুবর্ণগ্রামের সর্বপ্রথম উল্লেখ এবং এই সময় হইতে বহুকাল পর্যন্ত সুবর্ণগ্রাম ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কোন্ সময় হইতে কিরূপে বিক্রমপুরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল তা জানা যায় না।"

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে শ্রীমদ্‌দশরথদেব ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" বারণী দনুজরায়কে পূর্ববঙ্গের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট বল্‌বন্ যখন সুবর্ণগ্রামে যান- "সুবণগ্রামের রাজা তখনও স্বাধীন, দূত প্রেরণ করিলে তিনি আদেশ গ্রাহ্য না করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া বল্‌বন্ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের অধীশ্বর দনুজরায় জলপথে তোগ্রলের পলায়ন নিবারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।[৩]

আদাবাড়ি তাম্রশাসনঃ রাজা দনুজমাধব ও মধুসেন

"আদাবাড়ি তাম্রশাসন ও জিয়াউদ্দীনের উক্তির বলে আমরা জানি যে, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দনুজমাধব বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন। দুই জনের মধ্যে মাত্র ছয় বৎসরের তফাৎ দেখিতেছি। খুব সম্ভবতঃ দনুজমাধব ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন এবং মধুসেনও ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব, এই দুই জনকেই সমসাময়িক এবং পূর্ববঙ্গের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলিয়াই বোধ হইতেছে। একজন সেনবংশীয় রাজা গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত; আর একজন দেববংশীয় রাজা, নারায়ণের কৃপায় অল্পকাল হইল গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দুইটি তথ্য হইতে মনে হয় যে, ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় গৌড় রাজ্যের (এই সময় বোধ হয় গৌড় রাজ্য পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল) আধিপত্য লইয়া সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে সেনবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া দশরথ দেব গৌড় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। হরিমিশ্রের কারিকার "প্রাদুরভবৎ ধর্মাত্মা সেনবংশাদ্ অনন্তরম্ দনৌজমাধবঃ" এই কথায়ও পূর্বোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। দশরথদেব কর্তৃক পরাভূত সেন-রাজা কে ঠিক বলা যায় না,- তিনি মধুসেন নিজেও হইতে পারেন অথবা মধুসেনের পূর্ববর্তী অন্য কেহ হইতে পারেন, কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে, দশরথ দেব কর্তৃক গৌড়-সিংহাসন অধিকারের কিছুকাল পরেই (১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে) মধুসেন, সেনবংশের পক্ষ হইতে দশরথের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন এবং পরিশেষে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে দনুজমাধব দশরথদেবকে পরাভূত করিয়া গৌড় রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন; কারণ, ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দেববংশীয় কোন রাজার পরিবর্তে মধুসেনকেই গৌড়ের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দনুজ যখন গিয়াসউদ্দীন বলবনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্রোহী তোগ্রল খাঁর নদীপথে পালয়নের পথ রোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তখন ঐ চুক্তি বা সন্ধিবন্ধনের (agreement-এর) মধ্যে সেনবংশের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু অনুমান আর ঐতিহাসিক তথ্য এক কথা নয়। অথচ

৩. বাজলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা।

প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় স্থানে স্থানে অনুমানের আশ্রয় লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।"

"দনুজ রাজার আর এক উল্লেখ পাই বাঙলার বাল্মীকি কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয়ে। কৃত্তিবাস বলিতেছেন–

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥"

এই বিবরণে উল্লিখিত "বেদানুজ" মহারাজাটী কে? কেহ কেহ 'বেদানুজ স্থরে 'বেদনুজ পাঠ করিয়া তাঁকে দনুজমাধব দশরথদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে কিন্তু দেখিতে পাই, বেদানুজ স্থানে লেখা রহিয়াছে শ্রীদনুজ এবং শ্রীদনুজই প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয়; কারণ বেদানুজ কথার কোন মানে হয় না। যাহা হোক, এই দনুজ মহারাজা বঙ্গদেশে অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং কবি কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা তাঁরই পাত্র ছিলেন। বঙ্গদেশ বলিতে যে তবকাৎ-ই নাসিরী বা বা তারিখ-ই ফিরোজশাহীর রঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, এই বঙ্গদেশ যে গঙ্গঅতীর হইতে দূরবর্তী কোন দেশকে বুঝাইতেছে তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণেও গৌড়-রাজ্যকে বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃত্তিবাসকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদের লোক বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। নরসিংহ ওঝা কৃত্তিবাস হইতে পঞ্চম পরুষ। সুতরাং, নরসিংহ ওঝাকে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ পাদের লোক বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পাদে (১২৮৬ খ্রীঃ) দনুজমাধব দশরথদেব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব, নরসিংহ ওঝার সমকালীন শ্রীদনুজ মহারাজা এবং আদাবাড়ি তাম্রশাসন, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ও আইন-ই-আকবরীর দনুজমাধব দশরথদেব, দনুজরায় বা রাজা দনৌজাকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।"

বঙ্গদেশ অশান্তি

"এখন প্রশ্ন হইতেছে, বঙ্গদেশে কি প্রমাদ হওয়ার দরুন নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান রাজার দ্বারা পূর্ববঙ্গের দনুজমাধবের রাজ্য অধিকারই ঐ প্রমাদ; যার ফলে সকলে অস্থির হইয়াছিল। মুসলমান কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিজয়ের কথা একটু পরেই আলোচিত হইবে। এই স্থানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের আগে পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্ব অবসান হওয়ার কোন প্রমাণই নাই। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশক ও চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে পূর্ব-বাঙলা বিজিত হইয়াছিল। সুতরাং, মুসলমান কর্তৃক দনুজমাধবের রাজ্য জয়ের ফলেই বঙ্গদেশে প্রমাদ হইয়াছিল, এরূপ মনে করার

যথার্থ হেতু নাই ; কারণ, ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দনুজমাধব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তাঁর রাজত্বের অবসান হয় এবং গৌড়েশ্বর মধুসেনের রাজত্বের আরম্ভ হয়– এ-রকম মনে করার হেতু আছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। যদি দনুজমাধবের সময়ে মুসলমানের আক্রমনে পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হওয়ার কথা সত্য না হয়, তবে দনুজমাধবের সময়ে বঙ্গদেশে কি প্রমাদ হইল তার সন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আনুমানিক ১২৮০ হইতে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দেববংশের দনুজমাধব এবং সেনবংশের মধ্যে গৌড় রাজ্যের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের) আধিপত্য লইয়া বেশ বিরোধ চলিয়াছিল, এ-রকম মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় দনুজমাধব সেনবংশীয় কোন রাজার মধুসেন কিংবা তৎপূর্ববর্তী অন্য কারও হাত হইতে রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সময়ের পরেই মধুসেন (কিংবা অন্য কেহ) আবার সেনরাজ্য পুনরাধিকার করিয়াছিলেন এবং ১২১১ শকে (১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসেনই গৌড়েশ্বর রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে কয়েক বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকেই কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের প্রমাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর কোন সময় মধুসেন কিংবা অন্য কোন সেনরাজা কর্তৃক দনুজমাধবের পরাজয় ও রাজ্যচ্যুতির পর নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলেন।"১

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। দশরথদেব দনুজমাধবের সহিত অনেকে এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন দেবকে এক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন। দনুজমর্দন গৌড় প্রদেশ হইতে কায়স্থগণকে আনাইয়া স্বীয় রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করেন। দ্বিজবাজচম্পতির "বঙ্গজ-কুলজীসার-সংগ্রহে" আছে :–

"দনুজ মাধব (মর্দ্দন) রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হৈল বঙ্গজ-কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ॥
সেন-পদ্ধতিতে তার মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হৈল চিন্তাপর ॥
গৌড় হইতে আনাইয়া কায়স্থ কুলপতি।"
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি ॥

নামের সাদৃশ ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমর্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ কারণ নাই।" বলবৎ কারণ যে নাই তাহা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীদনুজমর্দনদেবের প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রাখাল বাবুর মতে "সেনরাজবংশীয় দনুজমাধব দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের সমসাময়িক, সুতরাং, তিনি ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১২৮৭

১. প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩১৯ দনুজমর্দনদেব– সতীশচন্দ্র মিত্র– ৩৮০-৩৮৪ পৃষ্ঠা। দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব–রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ–৩৮৫–৩৮৯ পৃষ্ঠা। যশোহর-খুলনার ইতিহাস– প্রথম খণ্ড– ২৭৩–২৮১ পৃষ্ঠা।

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন সময় জীবিত ছিলেন, সুতরাং, তাঁহার সহিত ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপের হিন্দু রাজ্য স্থাপনকারী দনুজমর্দন দেবের সহিত অভিন্নত্ব ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনরাজবংশের কোনও সম্পর্ক প্রমাণ করান যায় না, প্রমাণ করিতে হইলে নূতন কুলগ্রন্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুতরাং, সেনরাজগণ যে দাক্ষিণাত্যবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক ছিল না ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহাও বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, সম্রাট বলবনের সময়ে দনুজরায় নামক এক ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন, ইহা জিয়াউদ্দিন বার্ণী প্রণিত "তারিখ-ই-ফিরোজ-সাহী" নামক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি সেনবংশীয় ছিলেন কিনা বা তাঁহার নাম দনুজমাধব ছিল কিনা তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থের "প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টির পর ব্যক্তি-বিশেষের আবশ্যকমত বহু কুলগ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।" আমরা সম্রাট বলবনের সমসাময়িক দনুজরায় সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।– এই দনুজমর্দন সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন :– "বিক্রমপুরের দনজুমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বিক্রমপুরের সেনবংশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ-কায়স্থ কুলোদ্ভব দেববংশীয় দনুজমর্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং, যাঁহারা এই দুইজনকে একই ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহারা মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবে।" বলা বাহুল্য যে, পূর্বে ঐতিহাসিকগণ দনুজমর্দন সম্বন্ধে যে তর্ক দ্বারা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এমত ব্যর্থ হইবে। কেননা এখন অরিরাজ-দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট জানা যায়তেছে যে, দনুজমাধব সেনবংশীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেব বংশীয়।

"যাহা হোক, আমরা দেখিলাম যে, দনুজমাধবের সময় মুসলমান কর্তৃ পূর্ববঙ্গের হিন্দু রাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, এ-রকম মনে করার বিশেষ হেতু নাই। দনুজমাধবের পর মধুসেন অন্ততঃ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববাঙলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং, মধুসেন কিংবা তৎপরবর্তী কোন সেন-রাজার আমলেই মুসলমানের হাতে বাঙলার শেষ হিন্দু রাজত্বের অবসান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"

"দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পৌত্র রুক্‌নুউদ্দীন কৈকাউস্ ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই একটি মুদ্রায় সর্বপ্রথমে বঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, তাঁরই আমলে ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্য মুসলমানের হস্তগত হয় এমন মনে করা যাইতে পারে। কৈকাউসের পরে তাঁর ভাই শমস্উদ্দীন ফিরোজ ১৩০১ হইতে ১৩২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁরই আমলে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলা বিজিত হয় এবং ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে মুদ্রিত শম্স-উদ্দীন ফিরোজ শাহের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেও এই অনুমান দৃঢ় হয় যে, রুক্‌নু-উদ্দীন কৈকাউসের (১২৯১-১৩০১ খ্রীঃ) সময়েই পূর্ববাঙলা হইতে হিন্দু-স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়।"

"রুক্‌ন্‌-উদ্দীন কৈকাউস কিরূপে কার হাত হইতে পূর্ববাঙলা অধিকার করেন.তা বলার উপায় নাই। তবে মধুসেন যখন ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত তখন মধুসেনের সময়েই সেনরাজ্য পরহস্তগত হওয়া বিচিত্র নয়; অথবা মধুসেনের পরবর্তী অন্য কোন সেনরাজার সময়েও পূর্ববাঙলা পরাধীন হইয় থাকিতে পারে। যা হোক, আমাদের জানা বাঙলার হিন্দু রাজাদের মধ্যে মধুসেনই শেষ রাজা এবং তাঁর রাজত্বের সময় কিংবা তার কিছু পরেই পূর্ববাঙলার বিজেতার পদানত হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সম্ভবতঃ সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী আত্মঘাতী কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তার ফলে বাঙলার রাজশক্তি যখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই সুযোগ বুঝিয়া লক্ষ্মণাবতীর সুলতান রুক্‌ন্‌-উদ্দীন কৈকাউস মর্মান্তিক আঘাত করিয়া বাঙলার স্বাধীতার শেষ রশ্মিটুকুকে চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণাবতীর মালীক গিয়াসউদ্দীন ইবজ্‌ যে-দিন (১২২৬ খ্রীঃ) পূর্ববাঙলার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, সেই দিন হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান অধিপতিরা সুযোগ পাইলেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্যকে আক্রমণ করিতে ক্রটী করিতেন না। প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া বিক্রপপুরের সেন রাজবংশ হিন্দু স্বাধীনতাকে বিজেতার কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুর চিরন্তন সুযোগ প্রতীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া যখন দারুণ আত্মকলহ পূর্ববঙ্গের রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল, তখনই কৈকাউস রুক্‌নউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণের প্রায় শতাব্দী-ব্যাপী আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে সফল করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলেন।"

"মধুসেনই বাঙলার শেষ হিন্দুরাজা; তাঁর পর হইতে বাঙলার হিন্দু স্বাধীনতা চিরকালের মত অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। তবে পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে রাজা দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব আবার কিছুকালের জন্য বাঙলায় হিন্দু-স্বাধীনতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাও আবার ক্ষণিক-বিদ্যুৎ প্রকাশের মত বাঙলার আকাশকে চমকাইয়া দিয়া চকিতের মধ্যেই অধীনতার অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া গেল। সে ক্ষণপ্রভার বিষয় আমাদের এস্থানে আলোচ্যও নয়।"

পরবর্তী সেনরাজবংশ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই মতামত আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রকৃত ভাবে বিচার করিতে গেলে মাধবেন, বিশ্বরূপসেন, ও কেশবসেনের পর সেনবংশীয় কোন নৃপতির পরিচয় তেমন ভাবে পাওয়া যায় নাই, কিংবা তাহাদের কোনও তাম্রশাসনও আবিস্কৃত হয় নাই। পরবর্তী সেনবংশীয় রাজাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। সে সময়ে মুসলমানেরা নব-বিক্রমে নিকটবর্তী হিন্দু রাজাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেন।

মুসলমান রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশে যে সকল হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল, সে সমুদয় রাজ্য ঘন ঘন মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে নিরীহ অধিবাসীগণ নানাদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। লক্ষ্মণাবতীর পরাক্রান্ত মুসলমান নৃপতির পূর্ববঙ্গের সেন রাজাদের আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই-প্রসঙ্গে

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেনঃ– "লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসনকর্তৃগণ ও বাঙলার স্বাধীন মুসলমানরাজগণ ধীরে ধীরে, পূর্ববঙ্গের সেনরাজগণকে হীনবল করিয়া, অবশেষে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। আরাকানের মগ জলদস্যুগণ, সমুদ্রপথে আসিয়া, নদী-তীরবর্তী গ্রাম ও নগর-সমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিত, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের সেনবংশীয় রাজাদিগের, কোন দিক হইতে সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা ছিল না; আর্যাবর্ত তখন মুসলমানের করকবলিত, আর্যাবর্তের যে সমস্ত হিন্দুরাজা তখন পর্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকার বহু দূরে অবস্থিত ছিল। চেদী, চান্দোল ও পরমার রাজগণের পক্ষে, পূর্ববঙ্গের সেনরাজকে সহায়তা করা অসম্ভব ছিল, কারণ, মুসলমান অধিকার অতিক্রম না করিলে তাঁহারা পূর্ববঙ্গে আসিতে পারিতেন না। কলিঙ্গের গাঙ্গবংশীয় রাজগণের সহিত সেন রাজবংশের বন্ধুত্ব ছিল না। সেন রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে কলিঙ্গরাজগণ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উত্তরে কামরূপ রাজ্যের সীমা, পূর্ববঙ্গের উত্তর সীমার সংলগ্ন ছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গে হিন্দুর অধিকার লুপ্ত হইবার বহু পূর্বে– প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। ১২৩৭ ও ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, পূর্ববঙ্গরাজ, আরাকানের মগগণক কর প্রদান করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন"।[১]

মধুসেনের পরবর্তী সেন রাজগণের প্রকৃত পরিচয় জানিবার কোনও উপায় নাই একথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তবে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ– পরবর্তী সেনবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে (১) লবসেন, (২) বুদ্ধসেন, (৩) হারীতসেন, (৪) প্রতীতসেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম করিয়াছেন। ইঁহারা তুরুস্ক নৃপতিদের অধীনে করদ-রাজা ছিলেন। পাগ্-সাম্- জোন্-জঙ্গেও কয়েকজন সেন রাজার নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলক্ পূর্ববঙ্গ মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হন; এবং সমস্ত বঙ্গদেশকে লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও এবং ঢাকা সহ সোনার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।[২] পূর্ববঙ্গ-বিজয়ের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের হিন্দু-স্বাধীনতা-সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

১. বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড– ১২-১৪ পৃষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌড়ের ইতিহাস– দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০, ৩৫। ভারতবর্ষ–১৩৩২ পৌষ।

২. In 1330, Muhammad Tughluk conquered Eastern Bengal also, and divided into three Provinces- Lakhnwati, Santgaon and Sonargaon including Dacca. (Hunters' Statistical Account of Bengal. p. 119)

নবম অধ্যায়
রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর–রামপাল

শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] কোথায়, বিক্রমপুরের কোন্ স্থানে তাহা অবস্থিত ছিল, এইবার সেই কথা বলিতেছি।

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সেই অতি সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া সেনরাজ বংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর সম্পর্কে সমুদয় কথা আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি।

আমরা বিবিধ তাম্রলেখ এবং প্রমাণিক গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে দেখাইয়াছি যে, চন্দ্র, বর্ম, সেন সকল রাজাদের রাজধানীই ছিল শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুরে গুপ্তরাজাদের প্রভাবও বিদ্যমান ছিল, তবে কত দিন, কত কাল, কি ভাবে তাহা ছিল, জনপ্রবাদ ব্যতীত তাহা তেমন ভাবে গ্রহণ করিবার মত প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।[১]

শ্রীবিক্রমপুর বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমানে তাহা রামপাল নামে পরিচিত। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই রাজধানী হইতেই বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। বিজয়সেনের বারাকপুরের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মহারাজ বিজয়সেনের সময়েই প্রথম বিক্রমপুর সেনরাজাদের হস্তগত হইয়াছিল। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতির সময়েও বিক্রমপুরেই রাজধানী ছিল। আমরা সমুদয় তাম্রলেখই দেখিতে পাইয়াছি যে, প্রত্যেক বিভিন্ন বংশের নৃপতিরাই শ্রীবিক্রমপুরবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন, কাজেই বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুর ছিল, তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে না।

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়?

সে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৩২৩-২৪ সালে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নানারূপ ঐতিহাসিক যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের

---

১. শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তৎ-প্রণীত "মানস সরোবর ও কৈলাস" নামক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন– আসকোট নামক স্থানের রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিয়াছিলাম। ইহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর "কুতুর" রাজবংশ বলিয়া ইহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহে বলিয়া থাকেন, ঢাকা বিক্রমপুরের পালবংশীয়ের রাজাগণ....বখতিয়ার খিলিজির আমলে বিতাড়িত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষণে তাহাদেরই বংশধর"। বলা বাহুল্য যে, ইহা কিংবদন্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না বলা কঠিন।

তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তাহা একরূপ অজ্ঞাত বলিয়াই মনে হয়। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন বর্ধমানে হয়। সে সময়ে স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দেবগ্রামের "দমদমের ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে "বর্তমানের ইতিকথা" এবং 'বর্ধমানের পুরাকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ সম্বন্ধে নানারূপ বাদ-প্রতিবাদ হইতে থাকে। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ঐ সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' 'প্রতিভা' প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে সময়ে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিয়াছিল বর্তমান সময়ে সে বিষয়ে কেহই কোন তর্ক উপস্থিত করিতে অক্ষম, কেননা শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর সমীপবর্তী নানাস্থান হইতে বিবিধ শ্রীমূর্তিসমূহ এবং তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ অলকি তর্কের শেষ হইয়াছে।[১] 'ঢাকার ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :–

"গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিক্রমপুরের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নদীয়া জেলার বিক্রমপুর যে কোন কালে রাঢ় দেশে অবস্থিত ছিল না এবং উহা যে চন্দ্র, বর্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনসমূহে উল্লিখিত বিক্রমপুর হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি ভূমিষ্ট হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে; অতএব, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর আলাদিনের দৈত্যের সাহায্যে এক রাত্রিতে নদীয়া জেলায় উঠাইয়া আনার প্রয়োজনও অন্তর্হিত হইয়াছে। (প্রবাসী ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।)

রামপালের নামোৎপত্তি

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্বের নিদর্শন-স্বরূপ যাহা কিছু দেখিবার আছে, তৎসমুদয়ই রামপাল ও তৎসন্নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহে অবস্থিত। বিক্রমপুরের ক্ষমতাশালী রাজাদের রাজধানী হইবার মত স্থান হইতেছে রামপাল। শ্রীবিক্রমপুরের নাম রামপাল কিরূপে হইল সে সম্বন্ধে অনেক-কিছু প্রচলিত কাহিনী চলিয়া আসিতেছে।

আমরা এখানে তাহার দুই-একটি উদ্ধৃত করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারে এস্থানের নাম 'রামপাল' হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ও উল্লেখ করিয়াছি। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে; "পূর্ব দিকের অধিপতি বর্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়াছিলেন।" বেলাব-তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্মাকেই এই প্রাদেশীয় বর্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত নগেন্দ্র বাবুর মতে–"সামলবর্মার পিতা জাতবর্মা দিব্য নামক কৈবর্ত-নায়কের সহিত যুদ্ধ

১. ঢাকার ইতিহাস– দ্বিতীয় ভাগ, ৪১৫–৫২০ পৃষ্ঠা। বিক্রমপুর মাসিক পত্রিকা– যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নবাবিষ্কৃত (বিক্রমপুরের) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা–শ্রীকামিনীকুমার ঘটক–৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১২৫–১৩৬ পৃষ্ঠা। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা– দ্বাবিংশ ভাগ।

করিয়াছিলেন। হয়ত কৈবর্তপতি রাবণরূপী ভীমের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের অনুসরণ করিয়া রামপাল কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, রাজকবি যেন তাহারই আভাস দিয়োছেন। যেখানে সামলবর্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় একণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে।"[১]

এ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত 'রামপাল' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন- "I am of opinion that the prince who gave his name to this city and lake of Rampal was a king of the Pal dynasty".

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "লঘুভারত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :-

"রাম নামৈকা বৈদ্যরাজ মহাধনী
তৎপালিতা সানগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন- "বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ির মুদীর নাম ছিল রামনন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণত রামপাল বলিত। রাজবাড়ি তণ্ডুলাদি যোগাইয়া রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লাল যখন দীঘি খনন করেন, তখন তাঁহার দীঘি সংবর্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ির নিকট যাইয়া পৌছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দীঘি নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটি গ্রাম্য উপকথা আছে, তাহার প্রথম পংক্তি এই,-

"বল্লাল কাটায় দীঘি নামে রামপাল।"

এই সমুদয় কাহিনীর কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। ইহা অলীক গ্রাম্য-প্রবাদ মাত্র। বিক্রমপুরের সর্বত্রই এইরূপ নানা কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

রামপালের অবস্থান

রামপাল বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘনা) নদের পশ্চিম তটে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্তী। মুন্সীগঞ্জ হইতে উহা দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ২৩° ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯০° ৩২ ১০´´ পূঃ। বিক্রমপুরের সাধারণ ভূমির উচ্চতা অতি কম। কিন্তু রামপালের চতুর্দিকের ভূমি অনেক উচ্চ। "দিল্লী যেমন ভারতের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান, রামপাল সেইরূপ বিক্রমপুরের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান। প্রায় পঁচিশ বর্গ-মাইল-ব্যাপী স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজধানী ছিল।"

রামপাল ও তাহার চারিদিকের বহু পল্লী লইয়া রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে তাহাদের কয়েকটির নাম করিলাম। রামপালের মানচিত্রের সহিত পাঠকবর্গ গ্রামের নাম মিলাইয়া দেখিবেন। রামপাল, সুবাসপুর, [সুখবাসপুর] বজ্রযোগিনী, আটপাড়া, সুয়াপাড়া, নাহাপাড়া, রঘুরামপুর, শঙ্করবান্দ, জোড়াদেউল, মানিকেশ্বর, মীরকাদিম, কাজিকসবা, পানাম, পঞ্চসার, চাঁপাতলী, চূড়াইন, মহাকালী,

১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজকন্যাকাণ্ড ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা।

কেওয়ার, নগরকস্‌বা, কাগজিপাড়া, শাঁখারিবাজার, সিপাহীপাড়া, কামারনগর, দেওসার, সোনারঙ্গ, টঙ্গিবাড়ী, পুরাপাড়া, ঘাসীর পুকুরপাড়, মাকুহাটি প্রভৃতি গ্রাম লইয়া প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর-রামপাল নগরী সুবিস্তৃত ছিল।

ঢাকা নগরীতেও বর্তমান সময়ে শাঁখারিবাজার, কামারনগর প্রভৃতি নামীয় পল্লী বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপ নাম সাদৃশ্যের মধ্যে যে একটা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা প্রাচীন রামপাল গ্রাম পর্যবেক্ষণ করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, প্রাচীন রামপাল-নগরী ভগ্ন-হতশ্রী এবং ভস্মীভূত হইলে ঐ সমুদয় ব্যবসায়ীগণ নব প্রতিষ্ঠাপিত ঢাকা নগরীতে যাইয়া বাস করেন।

রামপালে ধন প্রাপ্তি

"রামপালে মৃত্তিকার উপরিভাগে দালানাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেকানেক ইষ্টকালয় ও ঘাটলা ইত্যাদি যে মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে রামপাল হইতে সুবচনী খালের পূর্বপার পর্যন্ত যে সকল গ্রাম অবস্থিত আছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মৃত্তিকার নিম্নদেশে বহুল পরিমাণে ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি দেশেও অনেক ইষ্টকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে, পূর্বে এ-সকল স্থানে অনেক আঢ্য লোকেরা বাস করিতেন। যাহা হউক, বর্তমান সময়ে রামপাল ও এতৎসমীপবর্তী কতিপয় গ্রামে ভূমি খনন করিয়া অনেকে স্বর্ণপাত ও রৌপ্যপাত ও ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ইংরেজ রাজত্বকালে রামপালের সন্নিহিত জোরার দেউল গ্রামে এক ব্যক্তি মাটির নীচে প্রচুর-পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়াতে সে "সোনাকপালিয়া" নামে খ্যাত আছে। অনেক দিন বিগত হইল বজ্র-যোগিনীর অন্তর্গত সুয়াপাড়া নামক স্থানে বারৈ জাতীয় এক ব্যক্তি ভূমি চাষ করিতে করিতে একখানি পাথর প্রাপ্ত হইয়াছিল। জনৈক কর্মকার উহা দেখিতে পাইয়া ইহা যে মূল্যবান পদার্থ ইহা জানিতে পারিল এবং আপন কোন কর্ম সাধনের ভান করিয়া কিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান-পূর্বক গ্রহণ করতঃ স্থানান্তরে বিক্রয় করিয়া ৮০ হাজার টাকা লাভ করে। কথিত বারৈ ইহা অবগত হইয়া ঐ প্রস্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য কর্মকারের নামে দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ করে, সেখানে সে-পরাজিত হইয়া সদরে আপিল করে, সেখানে সে পরাজিত হইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হয়।"

এই হীরক প্রাপ্তির সম্বন্ধেই টেলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন– "A few years ago a ryott while ploughing a field in this place and found a diamond of the value of Rs 70,000 (£ 7,000) it afterwards gave rise to a law suit before the provincial court of Appeal," এই হীরকখণ্ড রামপালের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। একজন মুসলমান একবার সুবর্ণ-নির্মিত একটি তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণ গোলক পাইয়াছিল, এ-সমুদয় স্বর্ণের ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সালে রামপালের নিকটবর্তী রতনপুর নামক স্থানের একজন মুসলমান প্রাচীন কালের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কতকগুলি ধূর্ত লোক তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। বক্রী যাহা ছিল তাহা মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর গভর্নমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। জনরবে প্রকাশ যে, তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এতদ্ সম্পর্কে বলেন :– "I personally know of several cases of the find of Treasure. A book of 24 thick golden leaves bound together by a copper wire was found from Dhamdaha tank and melted down. A copper vessel full of treasure was foundf in the Deul at Sonerang. The finder went to calcutta to dispose of his find secretly, fell into the clutches of swindlers and lost everything, and was brought home, a raving lunatic, Fifteen solid bricks of gold were found in Panchasar and secretly disposed of. The silver image of Vishnu come from the Deul at churain, from which also hails the splendid pedestal of the image Nataraja " অর্থাৎ, আমি নিজেও রামপালের নানাস্থান্ হইতে নানারূপ ধনরত্ন প্রাপ্তির কথা জানি। ধামদার দীঘির ভিতর হইতে ২৪ খানি সোনার পাতাওয়ালা তার দিয়া বাঁধা একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল– কিন্তু উহা গলাইয়া ফেলায় আর কিছুই জানিতে পাবা যায় নাই। একবার সোনারঙ্গের দেউল হইতে এক ব্যক্তি একটি ঘটিভরা মুদ্রা পাইয়াছিল। সে কলিকাতা গিয়া উহা গোপনে হস্তান্তরিত করিতে গিয়াছিল, কিন্তু জুয়াচোরদের পাল্লায় পড়িয়া সর্বস্ব খোয়াইয়া বাড়ি ফিরে। আর একবার পঞ্চসার গ্রামের এক ব্যক্তি ২৪ খানা সোনার ইট বা ফালি পায়, সে গোপনে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। রজত-নির্মিত বিষ্ণু মূর্তিখানিও চূড়াইন গ্রামেই পাওয়া যায়–নটরাজ মূর্তির প্রস্তর-নির্মিত পাদপীঠও চূড়াইন গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

রজত নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি

ইংরেজী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাঙলা ১৩১৬ সালে চূড়াইন গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে রজত-নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের বারুজীবীদের মধ্যে কেহ কেহ একটি বোরোজ [বিক্রমপুরে বোরো শব্দ ব্যবহৃত] নির্মাণের জন্য নিকটবর্তী একটি শুষ্ক পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া উহা প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় মূর্তিটি এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, ইহা কোন্ ধাতু-নির্মিত তাহাই প্রথমে কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই, পরে ঢাকা নগরীতে নীত হইলে সেখানকার কর্মকারগণ উহার মলিনত্ব দূর করিতে সমর্থ হয়। তখন প্রকাশ পায় উহা রজত-নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি।

'চূড়াইন' বা চূড়ামণি গ্রাম বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণের রাজধানী রামপালের অন্তর্ভূত। এই গ্রামস্থ 'দেউল বাড়ি' [দেবালয়] নামক স্থানে অদ্যাপি বহু ইষ্টক স্তূপ– এবং ভগ্ন দেবমন্দিরের কঙ্কাল-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্ত র হইতেই আর একটি প্রাচীন অট্টালিকার একটি অভগ্ন কক্ষও প্রকাশিত হইয়াছে। এই রজত-নির্মিত মূর্তির সম্বন্ধে ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন– [A silver image of Vishnu, discovered in 1909 from a ditch by the District Board road, a little to the South of the Deul at Churain. Now in the Indian museum, cal-

cutta Exquisiteworkmanship] আমি এই বিষ্ণু-মূর্তির সম্বন্ধে ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এই বিষ্ণু-মূর্তিখানি চালীসমেত উচ্চতায় ১১ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোলা। পাদপীঠের নীচে গরুড় করযোড়ে উপবিষ্ট। বেদীর উপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বাসুদেব দণ্ডায়মান। বাসুদেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, সৌম্য-হাস্যময় বদনমণ্ডল অপূর্ব প্রভায় বিভাসিত। দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই মূর্তিখানি কলিকাতা যাদুঘরের ললিতকলাবিভাগে [Arts section] রক্ষিত আছে। এই ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্তিখানির শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। মূর্তিখানির মাথায় কিরীট, কর্ণভূষা প্রভৃতি শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শতবর্ষ পূর্বের প্রত্যক্ষদর্শী বলেন : 'রামপাল ও এতৎ নিকটবর্তী কতিপয় স্থানে মৃত্তিকার নিম্ন দেশে এত ইষ্টক দৃষ্ট হয় যে, তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এমন কি তন্নিমিত্ত সহজে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। প্রায় দশ বৎসর বিগত হইল [সে অর্থে বর্তমান কাল হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্বের কথা] পূর্বোক্ত রাজবাটির সন্নিহিত বহু ভদ্রলোক-সমাকীর্ণ বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে, ভগবান রায় নামক জনৈক সৎকুলোদ্ভব মহাশয় স্বীয় বাটির এক স্থানে একটি পুষ্করিণী ও একটি গর্ত খনন করিয়া তাহাতে এত ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি আপন বাটীতে একতালা, দুতালা ৫/৬ খানা দালান ও ঘাটলা ইত্যাদি নির্মাণ করিতে আর বড় ইট ক্রয় করেন নাই। তিনি প্রায় আট লক্ষ ইট প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্ত সকলের দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক দেড় হাত ও বিস্তার প্রায় আঠার অঙ্গুলি হইবে। এইরূপে অনেকেই মাটির নীচে অসংখ্য ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইতেছেন। সকলেই প্রায় ১$\frac{১}{২}$, ২$\frac{১}{২}$, ৩$\frac{১}{২}$, ৪$\frac{১}{২}$, ৫ হাত মাটির তলে পাইয়া থাকে। অনেকে আবার তন্মধ্যে প্রস্তর এবং ধাতু ও যৌগিক-পদার্থ নির্মিত অদ্ভুত মূর্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ উহাব নামাদি নিরূপণে সক্ষম নহে।...রামপালের যে- সকল ইষ্টকালয় ছিল তদ্দারা ঢাকা নগরীর অনেকানেক ইষ্টকালয় নির্মিত হইয়াছে। রামপাল একটি বৃহৎ স্থান। উহার এক অংশের নাম শাঁখারীবাজার। পূর্বে তথায় অনেক শাঁখারী-জাতি বাস করিত। পরে যখন ঢাকা নগরীর পত্তন হয় তখন তাহারা [শাঁখারীরা] তথা হইতে ঢাকায় যাইয়া বাস এবং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। রামপালের পশ্চিমাংশের নাম রঘুরামপুর।

রঘুরামপুর

রঘুরামপুরের একটি পুরাতন পুষ্করিণী খননে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীটি পঞ্চসার গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুযায়ী খনিত হয়। আমরা এই খনন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে এ খনন-কার্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কৌতূহলি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ ১৯১২ ডিসেম্বর ১৯১৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত

"আমি গণনা করিয়া জানিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে রঘুরামপুর নামক পল্লীতে একটি পুরাতন বুজা-দীঘির গর্ভে বহু মাটির নীচে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পাকা বাঁধান স্থান [brick structure] আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব-পদার্থ [Metalic goods] নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় ধাতু বলিতে সোনা, রূপা, লোহা, তামা পিত্তল, কাঁসা, রাঙ্গ, সীসা, টিন ইত্যাদিই বুঝায়, অধিকন্তু মণি-মাণিক্য এবং সাধারণ প্রস্তরও বুঝাইয়া থাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় আমি বিভাগীয় কমিশনার মহাশয়কে গণনার অব্যর্থ ফল দেখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম, এবং এ কার্যে যে ব্যয় লাগে, তাহা সম্পূর্ণ নিজে দিতে স্বীকার করায়, এ বিষয়ের প্রতি মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, পরে ম্যাজিস্ট্রেট-বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন। তাহার পর সরকার-বাহাদুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়া গণনার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া খনন করাইয়াছি। খননকালে চারি মাস পর্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্তমান ছিল। ১৪/১৫ হাত মাটির নিম্ন হইতে যথার্থই পাকা বাঁধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতু-নির্মিত বহুসংখ্যক দেবমূর্তি এবং ত্রিশূল, খড়ম, থালা, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতকী ইত্যাদি বিবিধ পূজোপকরণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভর্নমেণ্ট ঢাকাতে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ সকল পুরাদ্রব্য পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন। ভূমি খননকালে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে. সি. আই.আই. সি. এস. মহোদয় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া মুন্সীগঞ্জ থানায় আসিয়া আবিস্কৃত জিনিসগুলির অনেকগুলি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা লাট-বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাড়াতাড়ি ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন। গত ১৬ই জুলাই, ১৯১৩ তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুন্সীগঞ্জ পদার্পণ করিয়া লোকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

"As you may have heard I was much interested in the valuable archaeological finds lately made with the assistance of Pandit Pareshanath of Panchashar and in February last, I went with my friend Khan Bhadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca cuthery." ইহাই রঘুরামপুরের দীঘি খননের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

রঘুরামপুর নাম কেন হইল

এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। রঘুরামপুর রামপালের অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটি প্রাচীন হইলেও নামটি খুব প্রাচীন

বলিয়া মনে হয় না। রঘুরামপুর এ নামটি সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এ স্থানের এইরূপ নানা পরিবর্তনের পূর্বে ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এতকাল পরে সম্ভবপর না হইলেও, কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে এই মাত্র। রঘুরামপুরের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি, সত্য রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাধার কারণ নাই। বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর চাঁদরায়- কেদাররায়ের পতনের পর তাঁহাদের মন্ত্রী রঘুরামরায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। ইনি রাজ্য বা জমিদারী প্রাপ্তির পর প্রাচীন রাজধানী রামপালের নিকটবর্তী স্থানে স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করিয়া উহার নাম রঘুরামপুর রাখেন। 'ডাকের' নামক কুলগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :-

"ভরদ্বাজ গোত্রে দাস আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥
ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রম যার রাজস্ব যোগায় ॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥
দ্বারে দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর ॥
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান।
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান পাইলা ॥"

রঘুরামরায় মোগলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজস্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরাম রায় বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রিয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোগলের দুই একবার যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতে জয় লাভ করেন। রঘুরামরায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্তীকালে নপাড়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া পরিশেষে নপাড়ার চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে অদ্যাবধি ইঁহাদের পুরোহিতবংশধরগণ বাস করিতেছেন। রঘুরামরায়ের কীর্তি সম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহা আলোচনার স্থান নহে। রঘুরামরায়ের অভ্যুদয়কার ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ; কাজেই "রঘুরামপুরের" নামোৎপত্তি [৩০০/৩৫০] তিন শত-সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক নহে।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুসারে যে পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছে, ঐ দীঘির পানি সেচন করিয়া পায় ১৫/১৬ হাত নীচে ইষ্টক-নির্মিত খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক-নির্মিত অংশ বাহির হইয়াছে তাহার চতুর্দিক খনন করিয়া উহা কি তাহা আবিষ্কৃত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। বাঁধান অংশটি প্রস্থে আট ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ, মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইহা কত দূর পর্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে

তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ উহা ঘাটলার উপরকার ছাত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। খনন-কার্য যদি আর কিছু দূর অগ্রসর হইত তাহা হইলে প্রকৃত-সত্য প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা আর হয় নাই।

খননে প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

এই খননের ফলে যে-সকল শ্রীমূর্তি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, আমরা এখানে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। **লোকনাথ মূর্তি** ৩″ × ২″, বোধ হয় এই মূর্তিটি স্বর্ণখচিত ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। অতি সুন্দর মূর্তি এই লোকনাথদেবের– ললিতাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণ পদ আসনাপরি বিন্যস্ত। বাম পদ পাদপীঠের নিম্ন দিকে শতদলাসনেব নিম্নভাগে প্রলম্বিত। বাম হস্ত দ্বারা দীর্ঘ মৃণাল সংযুক্ত বিকশিত শতদল ধৃত। দক্ষিণ হস্তে অভয় বা বরদ মুদ্রা। ডক্টর ভট্টশালীর মতে– it is very beautiful miniature. দ্বিভুজ লোকনাথের ধ্যান এইরূপ :

"পূর্ব্ববৎ কর্ম্মযোগেন লোকনাথম্ শশিপ্রভম্।
হ্রীকারক্ষররসম্ভূতম্ জটামুকুটমণ্ডিতম্।
বজ্রধর্ম্ম জটান্তহস্তম্ অশেষ রোগনাশনম্।
বরদম্ দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরম্ তথা ॥
ললিতাক্ষেপমস্থস্তু মহাসৌম্যম্ প্রভাশ্বরম্।
বরদেৎপালকা সৌম্যা তারা দক্ষিণংতং স্থিতা ॥
বন্দনাদণ্ডহস্তস্তু হয়গ্রীবোথ বামতং।
রক্তবর্ন্নোং মহারৌদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর প্রিয়ং ॥ [সাধনমালা]

২। **মৃত্তিকাফলকে খোদিত বুদ্ধদেবের মূর্তি**। ৫″×৩″ ইঞ্চি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। শিখর সংযুক্ত। বজ্রাসন বিহারের [বুদ্ধগয়া] অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন, এই মূর্তিতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দুই পার্শে দুইটি স্তূপ। আর দক্ষিণে ও বামে আরও ছয়টি ক্ষুদ্র স্তূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যমান। নিন্মে খোদিত-লিপি "যে ধর্ম হেত প্রভব" ইত্যাদি। এই মৃত্তিকা-ফলক-খোদিত মূর্তি একাদশ শতাব্দী-কালের বলিয়া অনুমিত হয়।

৩। **জম্ভল**– ২$\frac{১}{২}$″ ×১$\frac{১}{২}$″ ইঞ্চি আকারের একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। জম্ভল–মূর্তি অতি প্রাচীন মূর্তি। "সাধনমালা" হইতে জানা যায় যে, জম্ভল-মূর্তির শীর্ষদেশে "রত্নসম্ভব, অক্ষোভ্য" প্রভৃতি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ বা বজ্রসত্ত্ব মূর্তি অবস্থিত থাকেন। জম্ভল-মূর্তি গান্ধার, মথুরা, সারনাথ, মগধ, নেপাল এবং বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়েছে। আমরা বিক্রমপুরেও জম্ভল-মূর্তি পাইতেছি। জম্ভল বৌদ্ধদের ধন-দেবতা– যেমন হিন্দুদের কুবের। সাধনানুযায়ী– জম্ভল হইবেন স্বর্নাভ, লম্বোদর, বিল্বফল এবং বামে স্ত্রী নকুল বমন করিতেছে এইরূপ। জম্ভল-মূর্তি ত্রিমুখও হইয়া থাকেন। পাইকপাড়া-দেউলের পূর্বদিকস্থ চৌগাড়া হইতে একটি জম্ভলের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্তিটির

পিছনে "ও-জম্ভল-জলেশায়-স্বাহা।" এইরূপ খোদিত লিপি আছে।

৪। **প্রজ্ঞাপারমিতা**–হাল্কা বালু-পাথরের একটি প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫। **বিষ্ণুমূর্তি** ৫" ইঞ্চি পরিমিত।

৬। **বিষ্ণুপট্ট**– চারিখানি বিষ্ণুপট্ট পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরে উহা রক্ষিত আছে। একটির আকার ৫$\frac{১}{২}$" × ৫$\frac{১}{২}$" × $\frac{৪}{৫}$" উহাতে নয়টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। এক দিকে বিষ্ণু-মূর্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ঐ ভাবে খোদিত, অপর দিকে পরশুরামের পরিবর্তে ত্রিবিক্রম-মূর্তি খোদিত। বামন-মূর্তি আকাশের দিকে পা তুলিয়া রহিয়াছেন। এই পট্টটি কালো-কাদার মত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত।

৭। **কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত একটি ফলক**–আকাব ৪$\frac{৪}{৫}$" × ৪$\frac{৪}{৫}$" × ১$\frac{১}{২}$" । একটি শিখর-মধ্যে দেবী-মূর্তি, উর্ধ্বাংশ ভগ্ন। দশটি দল-বিশিষ্ট শতদল-মধ্যে–১। মৎস; ২। কূর্ম; ৩। বরাহ; ৪। নৃসিংহ; ৫। বামন। বামনের-এক পা উর্ধ্বদিকে সমুত্থিত; ৬। পরশুরাম–হস্তে কুঠারের পরিবর্তে গদার মত অস্ত্র; ৭। রাম; ৮। বলরাম; ৯। বুদ্ধ; ১০। কল্কি। এই ফলকখানির অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রঘুরামপুর খননে যে বিষ্ণুপট্ট এবং খোদিত প্রস্তর-নির্মিত ফলক আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার একখানিও অভগ্ন নহে।

৮। **গরুড়-মূর্তি**– রঘুরামপুরের এই খনন দ্বারা কাষ্ঠ–নির্মিত যে গরুড়-মূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাকে অতুলনীয় শিল্প-বৈভব বলিতে পারা যায়। গরুড়ের যুগ্ম-হস্ত দুইখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত থাকিয়াও এই কাষ্ঠ-নির্মিত গরুড়–মূর্তিটি যেরূপ রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য বলিতে হয়। গরুড়ের দৃষ্টি, গরুড়ের উপবেশন–ভঙ্গী, গরুড়ের মস্তকোপরি বিক্ষিপ্ত–কুঞ্চিত কুন্তলরাজি শিল্পীর গঠন-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। গরুড়ের মুখমণ্ডল হাস্যময় অপূর্ব দীপ্তিযুক্ত।

পঞ্চসার গ্রাম-নিবাসী শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতেও একটি প্রস্তর নির্মিত গরুড়-মূর্তি আছে। উহার আকার ২০" ।

৯। **বটুকভৈরব**– পোড়া-মাটির তৈয়ারী একটি বটুকভৈরব-মূর্তিও এখানে পাওয়া গিয়াছে। দেবতার উদরটি বেশ স্ফীত, দীর্ঘ নরকপাল-মালা কণ্ঠে দোলায়মান। চক্ষু দুইটি গোলাকার। ওষ্ঠাধর বিভক্ত এবং বীভৎস হাস্যযুক্ত। চতুর্ভুজ। দক্ষিণ দিকের এক হস্তে তরবারি, অপর হস্ত ভগ্ন। বামদিকের উর্ধ্ব হস্তে ধৃত দণ্ড। উহার উপরের দিকটা ভগ্ন বলিয়া উহা ত্রিশূল কি দণ্ড তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে না। বাম দিকের নিম্ন হস্তে নরকপাল-পাত্র ধৃত। এই মূর্তি উলঙ্গ নহে–বস্ত্রপরিহিত-কুকুরও নাই। পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকাও নাই। মূর্তিটি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় ধ্যান-নির্দিষ্ট কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইতেছে। [The figure not naked and does not wear wooden sandals like the Indian Museum Image. The dog is also absent. The smallness of the image is perhaps responsible for some of these omissions]

---

* Buddhist Iconography, Page 39, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এম, এ,।

১০। (ক) গণেশ– ২" ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। মহারাজ রাজলীলাসনে উপবিষ্ট। মূর্তিখানি ভালই আছে। ইঁদুরটি গণদেবের পদতলে বসিয়া আছে।

(খ) গণেশ–এই ক্ষুদ্র মূর্তিটিও ২"– রঘুরামপুরের মৃত্তিকা খননেই পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি বিশেষভাবে ক্ষয় পাইয়াছে। নিম্নস্থ দক্ষিণ হস্তে একটি মোদক– অন্যান্য হস্তে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে আরও অনেক গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মুন্সীগঞ্জের হেরম্বগণেশ-মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যশোহর–খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন : "সেন রাজগণের পূর্বে এতদঞ্চলে মূর্তি দ্বারা গণেশ পূজা ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যত্র আবহমানকাল এই গণেশ-মূর্তির পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেন রাজগণের আমলেই উহা প্রচলিত হয়। আবার সে রাজত্বের শেষেই উহার বিলোপ হইয়াছিল।" ইহা সত্য কিনা বলা যায় না। আমরা এই মূর্তির বিষয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সঙ্কল্পের" ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা (১৩২১ সাল ২২৪ পৃষ্ঠা) "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন শ্রীমূর্তি–পরিচয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। এই অপূর্ব মূর্তিটি রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। পরে উহা মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্তী বৈষ্ণবদের একটি আখড়ায় সুরক্ষিত আছে। এই মূর্তির পাঁচটি মুখ। ইহার ধ্যান এইরূপ :–

"মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ
নার্গাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তংদানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোক্ষাত্মিকাং
পাশং মুদগরমঙ্কুশং বিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে ॥

আমরা এই মূর্তিটিকে হেরম্ব-গণেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলাম। সর্ববিঘ্ননাশন গণপতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন, গণেশ, মহাগণেশ, হরিদ্রাগণেশ, বিঘ্নরাজ, লক্ষ্মী, গণপতি, শক্তি, গণেশ, ক্ষিতি, প্রসাধন-গণেশ, বক্রতুণ্ড, হেরম্ব-গণেশ, মহাগণপতি, বিঘ্ন গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি ইত্যাদি। এই হেরম্ব-গণেশ মূর্তিটির আকার ৩$\frac{1}{2}$ × ২$\frac{1}{2}$ ফিট। উর্ধ্বে কীর্তিমুখ। কীর্তিমুখের নিম্নভাগে ছয়টি এক শুণ্ড-বিশিষ্ট দ্বিভুজ গণেশ-মূর্তি পদ্মোপরি উপবিষ্টরূপে খোদিত। চালির দুই পার্শ্বে পার্শ্বখোদিত গণেশ-মূর্তি দুইটির নীচে মাল্য হস্তে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী উপবিষ্ট। এই গণেশ-মূর্তির পঞ্চমুখ পঞ্চ শুণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক বদনে তিনটি নয়ন। হস্তে ধ্যানানুমোদিত দ্রব্যাদি সংরক্ষিত। ইঁহার দক্ষিণ দিকের প্রথম হস্তে মুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা, চতুর্থ হস্তে অভয় (মুদ্রা); বাম দিকের প্রথম হস্তে দন্ত, দ্বিতীয় হস্তে টঙ্ক, তৃতীয় হস্তে ত্রিশূল এবং চতুর্থ হস্তে মোদক। ইনি ত্রিনয়ন, সিংহের উপর ললিতাসনে আসীন। সারদা-তিলক তন্ত্রের সহিত এই মূর্তির ধ্যান বহু মিলিয়া যায়। প্রত্যেক গজেন্দ্র বদনে এক একটি দন্ত। 'মৎস্যপুরাণ', 'অগ্নি পুরাণ', হেমাদ্রি এবং সারদা-তিলক গ্রন্থে গণেশের ধ্যান ও বর্ণনা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। বিক্রমপুরে বহু গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। নটরাজ গণেশ-মূর্তিও বিক্রমপুরে কয়েকটি আছে। ইহা হইতেও মনে হয় যে, বিক্রমপুরের সেন

রাজগণের প্রভাব বিশেষভাবে এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

রামপালের অনতিদূরবর্তী গ্রাম রানীহাটি হইতে যে-সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেও একটি নটরাজ গণেশ-মূর্তি আছে– সে বহু বৎসর পূর্বের কথা। এই গণেশ-মূর্তিটি আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্তের বাড়িতে আছে। তাহারও কতকটা ভগ্ন। আকার ২ ফিট ৮" × ১ ফিট ৭"। উর্ধ্বে কীর্তিমুখের পরিবর্তে পঞ্চ আম্র ফল ও পঞ্চ আম্রপাত্র।[১]

১১। লিঙ্গ– লিঙ্গ এবং গৌরীপট্ট– সেই অতি আদি যুগ হইতেই ঐ লিঙ্গ-পূজা চলিয়া আসিতেছে। রঘুরামপুর হইতে–লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট-সংযুক্ত দুইটি লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। (ক) লিঙ্গের নিম্নভাগ কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরে খোদিত। ৩"। (খ) লিঙ্গের নিম্নভাগ ১"। দ্বিপাড়া গ্রামের অতি প্রাচীন পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গটি ও বেজগাঁ গ্রামের শিবলিঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২। সূর্য-মূর্তি– একটি অতি সুন্দর সূর্য-মূর্তিও রঘুরামপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ৪ ২" × ১ ১১"। এই মূর্তির উপরে কীর্তিমুখ আছে। অরুণ-মূর্তির নীচে নাগনাথ।

১৩। চামুণ্ডা– কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত এই চামুণ্ডা মূর্তিটির আকার– বর্তমানে যেরূপ আছে, তাহা ৩" × ৪"। দাড়িওয়ালা। এক শবোপরি দেবী চামুণ্ডা উপবিষ্টা। সম্ভবত দেবীর চারিখানি হাত ছিল। উপরিস্থিত দুইখানি হাত মাত্র আছে। দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরি, বাম হস্তখানি হাঁটুর উপর ন্যস্ত। একটা শৃগাল শবের দক্ষিণ-ভাগ দংশন করিতেছে।

১৪। মনসা– এক সময়ে মনসা পূজা বিশেষভাবে বাঙলা দেশে প্রচলিত ছিল। বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বহু মনসাদেবীর মূর্তি, মনসার-ঘট ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রপুরের নানা গ্রাম হইতে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত মনসামূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে– "The large number of Stone images of Manasa of the 10th-12th century, that have been found throughout Bengal-testify to the established character of her cult during the period." রঘুরামপুরের এই খনন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মনসার-ঘট, বিভিন্ন কলস ও ঘটের গায়ে সর্পাঙ্কিত এইরূপ অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। আমার সংগৃহীত কোরহাটির মনসা-মূর্তির চিত্র 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মূর্তিটি এখন ফরিদপুর জেলার কোনও গ্রামে উহার মালিকের সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছে।

রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে পিত্তলের নির্মিত একটি প্রদীপাধারও উল্লেখযোগ্য। চারিটি মাটির কলস, ইহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রের রঙ এখনও আবিস্কৃত

---

১. আউটসাহী গ্রামের অনতিদূরে একরূপ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম বলুই। বলুইয়ের পূর্ব নাম "রানীহাটি।" রানীহাটি কোন্ রানীর নাম–স্মৃতি বহন করিতেছে, এত কাল পরে সে কথা কে বলিবে? রানীহাটি গ্রামের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ইষ্টকসমূহ প্রাচীনের কীর্তি বিভূষিত জনবহুল নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এই গ্রামের একটি পুষ্করণী খনন করিতে বহু দেব-দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে সকলের অধিকাংশই লুপ্ত, যে কয়েকটি মূর্তি সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে গণেশ, বরাহবতার, নটরাজ, পরশুরাম, বিষ্ণু-মূর্তি ইত্যাদি। আমি বলুই গ্রাম হইতে একটি বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান পাইয়া উহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই মূর্তিটি আউটসাহী বাল্যাশ্রমে আছে। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য-কীর্তি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ও লিখিত– বিক্রমপুর [১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩০]

রহিয়াছে। একটি মৃত্তিকা-নির্মিত ও অপর একটি প্রস্তর-নির্মিত সম্পূটক। প্রস্তর-নির্মিত সম্পূটকটির আকার ৪" × ৩"। লৌহ-নির্মিত ক্ষেপনী, ২ ৮"। হস্তীদন্ত-নির্মিত পাশার গুটি। ঐ গুটির যে চিহ্ন রহিয়াছে তাহা বর্তমানকালের মত নহে। লোহার চিমটা ৪" কাঁসার থালা। উহার বেড় ১ ৩"।

রঘুরামপুরের খননের কথা বলিলাম। এইবার রামপালের অন্তর্গত স্থানসমূহে আরও যে-সমুদয় প্রত্ন-চিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে সে-সকলের কথা বলিতেছি।

রামপালের নিকটবর্তী দেউলবাড়ি

দেউলবাড়ি বলিতে যে দেবালয় বুঝায় তাহা আমরা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। রামপালের নিকটবর্তী স্থান-সমূহ ঘিরিয়াই দেউলবাড়িগুলি বিদ্যমান। দেউলবাড়িগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ধীপুরের দেউল খনন ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ

টঙ্গিবাড়ি থানার অন্তর্গত ধীপুর গ্রাম। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাটি তুলিতে যাইবার সময় সমান্তরালভাবে দুইটি প্রাচীরের চিহ্ন আবিস্কৃত হওয়ায় ইতিহাসানুরাগী অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহাশয় ঢাকা মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে উহা খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। ঢাকা যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ খনন-কার্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং খনন-কার্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসম্পন্ন করিবার ভার ঢাকা যাদুঘরের কৃতী অধ্যক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভট্টশালী মহোদয়ের উপর সমর্পিত হয়। তিনি ধীপুর দেউলের খনন-কার্য ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই খননে তিনটি চতুষ্কোণ অট্টালিকার চিহ্ন আবিস্কৃত হয়। অট্টালিকা তিনটি পাশাপাশিভাবে সন্নিবেশিত ছিল এবং দীর্ঘ প্রাচীরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

অর্থাভাবে উক্ত কার্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঐ দালানের একটির মধ্যে একটি নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কঙ্কালটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বমানভাবে শায়িত ছিল। আর একটি দালানের মধ্য হইতে দুইটি 'জালা', মৃত্তিকা নির্মিত সুবৃহৎপাত্র পাওয়া যায়। জালা দুইটি খালি ছিল। দেউলের নিকটবর্তী পুষ্করিণী হইতে-প্রস্তর-মূর্তির পাদপীঠ, খোদিত কাষ্ঠ ও কতকগুলি কড়ি পাওয়া যায়। এ-সমুদয় দ্রব্যাদি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রামপালের নিকটবর্তী স্থানসমূহের দেউলবাড়ি, খালের পাড়, প্রাচীন পুষ্করিণী, ডোবা, গড়, খাদ ইত্যাদি খনন করিয়াই বিবিধ দেবমূর্তি পাওয়া যাইতেছে। আমি এ বিষয়ে বহু পূর্বে নানা প্রবন্ধেও আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীবিক্রমপুর ও রামপাল অঞ্চলের চারি দিকটা যদি খনিত হইত তাহা হইলে প্রাচীনের অনেক কীর্তি গৌরবমণ্ডিত প্রত্ন-চিহ্ন আবিস্কৃত হইত। কে রামপালের নিকটবর্তী স্থানসমূহের খনন কার্য করিবে? কোন দেউলবাড়িই আজ পর্যন্ত যথোপযুক্তভাবে খনিত হয় নাই।

১। **সোনারঙ্গের দেউল**— রামপালের অদূরেই সোনারঙ্গের দেউল অবস্থিত। এই দেউলের নিকটে একটি বৃহদাকার সূর্য-মূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে। এবং উহা উক্ত গ্রামের

মুন্সীবাড়ির দীঘির পাড়ের মন্দির-প্রাচীরের সহিত গ্রথিত আছে। এই মঠ দুইটি দেউলবাড়ির অল্প পশ্চিমেই অবস্থিত। দেউলবাড়ির উত্তর ভাগের দীঘির মধ্য হইতে গ্র্যানাইটি প্রস্তর গঠিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল, উহার আকার ১৭" –৪ ½" উচ্চ। উহার নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। একটি গণমূর্তি-সম্বলিত প্রস্তর খণ্ডও উল্লেখযোগ্য। সোনারঙ্গ গ্রামে দুইটি দেউলবাড়ি আছে। একটি গ্রামের পূর্বদিকে অপরটি গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। সোনারঙ্গের পূর্বদিকস্থ দেউলবাড়ি হইতেও বহুদিন পূর্বে একখানি বৃহৎ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশ-ভুজ অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি

সোনারঙ্গ গ্রামের দেউলে দ্বাদশ-ভুজ অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মূর্তিটি আমি সোনারঙ্গ গোঁসাইবাড়ি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই মূর্তিটির বিস্তৃত পরিচয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় কার্তিক, ১৩১৬, ৯ম ভাগ ৭ম সংখ্যায় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম এবং "বিক্রমপুবেব ইতিহাস" প্রথম সংস্করণেও এই মূর্তির উল্লেখ করিয়াছি এবং পরিশিষ্টেও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল।

অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ মূর্তিগুলি দুই হাত, চারি হাত, ছয় হাত, দশ হাত, বারো হাত এমনকি সময় সময় সহস্র-হস্ত-সমম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ-বিশিষ্ট। অবলোকিতেশ্বর সাধারণত বিষ্ণুর ন্যায় মানবের শোক-দুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চিত হইয়া থাকেন। যুয়নচয়ঙের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে, তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের মূল মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এবং বীজমন্ত্র 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্তির অর্চনা ও অভ্যুদয় কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সময়ের নির্ণয় এখনও পর্যন্ত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম-প্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়ায় তেমন বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

২। **নাটেশ্বরের দেউল**– এই দেউলবাড়ি হইতেও অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দেউলবাড়িটি আমরা পূর্বে উচ্চ-স্তূপ রূপে দেখিতে পাইয়াছি।

৩। **জোড়া দেউল**।

৪। পাইকপাড়ার দেউল।

৫। খিলপাড়ার দেউল।

৬। সোনারঙ্গের দেউল।

৭। **ধীপুরের দেউল**- প্রভৃতির খনন-কার্য সুসম্পন্ন হইলে অনেক কিছু প্রাচীন কীর্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে জোরার দেউলের সংলগ্ন একটি রাস্তার পার্শ্বের মাটি খুঁড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট, প্রস্থে ২"–৮" দুই ফুট আট ইঞ্চি পুরু। দেখিলে মনে হয় যে, এই বৃহৎ প্রস্তরখানিকে বাঁটালির সাহায্যে চাঁচিয়া পাতলা করা হইয়াছে। বাঁটালির দাগগুলি এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীবিক্রমপুর ও রামপালের প্রাচীনত্ব

রামপাল বা শ্রীবিক্রমপুর ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ৭০০ বৎসরের প্রাচীন নগরী, [Rampal, or Sri Vikrampur was a city about 700 years ago] আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মৃত্তিকা পরীক্ষায় এবং শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন যদি দশম শতাব্দীর বলিয়া ধরা যায়, [পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী] তাহা হইলে শ্রীবিক্রমপুরের বয়স প্রায় ১০০০ বৎসর হইবে। আমাদের মনে হয় সাভার ও শ্রীবিক্রমপুর এবং তৎ-সংলগ্ন স্থানসমূহ একই সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। শ্রীবিক্রমপুরের মৃত্তিকাভ্যন্তরে এখনও কত কি প্রাচীন কীর্তি গুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কতটুকুইবা আবিস্কৃত হইয়াছে![১]

রামপাল ও তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আবিস্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

কাষ্ঠ-নির্মিত স্তম্ভ

রামপাল হইতে কারুকার্য-শোভিত কাষ্ঠ-নির্মিত দুইটি স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপালের বিখ্যাত দীঘির দক্ষিণ ভাগ হইতে এই কাষ্ঠ-স্তম্ভ দুইটি আবিস্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভ-দুইটি সেখ আবদুল গণি এবং আবদুল রহমান প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা যাদুঘরে উপহার দিয়াছেন। এই স্তম্ভ দুইটি ৯ʹ ৫″ × ১১″ ×১১″ পরিমিত। এই স্তম্ভ-দুইটির গাত্রে বিবিধ মূর্তি খোদিত আছে। একটি স্তম্ভে দেখা যাইতেছে– এক দেবী-মূর্তি। দেবী তরবারির দ্বারা একজন দৈত্যকে বধ করিতেছেন। অপর স্তম্ভে–একটি বৃক্ষের নীচে বিষণ্ণ-বদনে সম্ভবতঃ একজন রাজপুত্র বসিয়া আছেন, তাঁহার তীর-ধনু মাটিতে পড়িয়া আছে। একটি উট, একজন ঋষি ও মৃগীর যৌনমিলন-দৃশ্য ইত্যাদি খোদিত। রাজপুত্র সম্ভবতঃ মহাভারতের নৃপতি পাণ্ডু।[২]

গণদেব-মূর্তি নিম্নভাগে খোদিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় স্তম্ভটির গাত্রে খোদিত-কীর্তিমুখ, নৃত্যপরায়ণা নারী-মূর্তি, দুইটি নারীমূর্তি পাখির দিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছেন।

নাটেশ্বর দেউলের কাঠের চৌকাঠ

নাটেশ্বর দেউল-বাড়ির সংলগ্ন একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর কাদামাটির নিম্নভাগ হইতে কাঠের চৌকাঠ আবিস্কৃত হইয়াছে। ১০″ ১০″ × ৮″ × ৯″। উর্ধ্বাংশের দিকটা চওড়া হইবে ৮ʹ ৭″। কারুকার্যের মধ্যে তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠ সম্পর্কে, সত্য-সত্যই–"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত চরণ তলে" বলা যাইতে পারে।

বল্লাল-বাড়ি

আমি যখন প্রথম রামপাল দেখিয়াছিলাম আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর। আমার মাতামহীর মুখে রামপাল সম্পর্কে অপূর্ব রোমাঞ্চকর কথা শুনিয়াই সেই বাল্যকালে আমাকে রামপাল দেখিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমার মনে পড়িতেছে, আমার বাল্যবন্ধু সিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীকামাখ্যামোহন গুপ্ত আমাকে রামপাল দেখাইতে সঙ্গে

১. Iconogaphy of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum- p. 273-74.

২. প্রাগুক্ত।

করিয়া লইয়াছিলেন। তখন সে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে যে জঙ্গলাকীর্ণ, স্তূপীকৃত ইষ্টকরাজি, বিক্ষিপ্ত বিরল বসতি– যে রামপাল দেখিয়াছিলাম, সে রামপাল কি এখনও তেমনি থাকিতে পারে? তখন বাবা আদমের মসজিদটি ছিল জঙ্গলের মধ্যে আর তাহার ছিল ভগ্ন জীর্ণ অবস্থা। এমনিভাবে বল্লাল-বাড়ি, অগ্নিকুণ্ড, মিঠাপুকুর ইত্যাদি নানা দর্শনীয়-স্থান দেখিতে যেরূপ ভয়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল– এখনকার জনবহুল রামপালের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, এবং বর্তমানের তরুণ বিক্রমপুরবাসীদের কাছে তাহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইবে। কানিংহাম বলেন;–

"Bikrampur was the residence of the early Sena Rajas before the aggrandisement of the family by the conquest of Barendra and Rarh. The site of the old capital is still pointed out near the great lake of Rampal Dighi, to the north of which is the Ballallbari, or place of Ballal Sen. To this place the Hindu Raja retired on the invasion of the muhammadans and the consequeut capture of his chief cities of Gaur and Nadiya. The people of the country know only the one name of Ballal Sen, who they say was the opponent of the Musalman invaders. According to Taranath this king was named Lava Sema, While the Muhammadan historians call him Lakhmaniya. But his true name was most probably the same as that of his grand-father Lakhmana Sena, and as this is frequently pronounced Lakhan Sen, I believe that it is really the Same name as the Lava Sen of Taranath. Ballal Sen was the great aggrandiser of the family, to whom several places are attributed, as well as the foundation of the famous city of Gour. The place of Ballal-Bari at Bikrampur was qutie sufficient to preserve the name of Ballal, while the name of Lakshmana, having been forgotten, all the events of cousequence of the history of the Senas would naturally be referred to the family."

প্রায় শতবর্ষ পূর্বের রামপালের বর্ণনা : খিড়কির দ্বার

বল্লাল-বাড়ি– এই কথাটি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে নৃপতি বল্লালসেনের বাড়ি ছিল। অদ্যাপি ইহার প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যদিও কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ উপরে নাই, তথাপি ইহার চারিদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে চতুঃপার্শ্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখা ইত্যাদি দেখিলে বিশাল রাজবাড়ির গৌরব উপলব্ধি হইয়া থাকে। রাজবাড়ির পরিমাণ ৭৫০ × ৭৫০ ফিট। এই স্থানের চতুর্দিক বেড়িয়া ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে। ১২৭৪ সাল, ইংরাজী ১৮৬৭ সালে– সে প্রায় আশী বৎসর বা অনায়াসে পূর্বে বল্লাল-বাড়ি কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম : "বল্লালসেন রামপালে বাস করিবার নিমিত্ত বৃহৎ এক অন্তঃপুরিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ন্যূনাধিক ছয় হাজার হস্ত দীর্ঘ ও ৮ শত হস্ত বিস্তৃত বৃহৎ এক পরিখায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ঐ স্থান বল্লাল-বাড়ি নামে খ্যাত। ঐ স্থানেই মহারাজের আবাস-বাটী ছিল। অধুনা তথায় ইষ্টকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। মৃত্তিকার নীচে ইষ্টকাদি থাকিবার সম্ভব। বল্লাল-বাড়ির পূর্বদিকে যে বৃহৎ এক খিড়কির দ্বার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধুনা তথায় কতিপয় মুসলমান বসতি করে। উহা রাজধানী বলিয়া গভর্নমেন্ট তাহার কর গ্রহণ করেন না।"

পরিখার অবস্থা

"উপরে যে পরিখার কথা উল্লেখ করা হইল উহা এক্ষণে প্রায় শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মধ্যস্থলে এক হাত কি অর্ধ-হস্ত স্থানে কিঞ্চিৎ পানি দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা তাহাতে বোরোধান রোপণ করিয়া থাকে।"

বল্লাল-বাড়ির বহির্বাটি

"বল্লাল-বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান বিদ্যমান আছে, উহা বল্লালসেনের বহির্বাটি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটি গজারি বৃক্ষ অবস্থিত আছে, লোকে তাহাকে বল্লালের হস্তি-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।"

"এরূপ কিংবদন্তী যে, উক্ত গজারি গাছটি পূর্বে মৃতাবস্থায় ছিল, ঋষিগণ অমর বর দেওয়াতে উহা সঞ্জীবিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।"[১]

বল্লাল-বাড়ির দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ ভাগের পরিখার নিকটবর্তী ছোট একটি পুকুর হইতে একখানি অতি সুন্দর নটরাজ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনরাজারা শৈব ছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাজেই হয়তো রাজধানীর অন্তর্গত কোনও দেব-মন্দিরে এক সময়ে এই নটরাজ দেবের মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং সেনরাজারা ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনা করিতেন।[২]

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে অনেক নটরাজ-শিব পাওয়া গিয়াছে। আমি নটরাজ-শিব সম্বন্ধে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' 'ভারতবর্ষ', 'সঙ্কল্প এবং' অন্যান্য বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।[৩]

১. পল্লী-বিজ্ঞান– প্রথম ভাগ ৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ-১৮৬৭ জুন।

২. "The place where the Hindu Princes resided is still pointed out at Rampal a little to the west of Firinghibazar The site of the palace of King Ballalsen consists of quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand square feet wide There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity and in the country for many miles around mounds of bricks and wall foundations at a great depth below the surface are met with, and were formerly used as building materials for the constrution of house in the city Near the site of Ballalsen's place there is a deep excavation called Agni Kundu, where it is said that the Hindu Prince of Vikrampur and his family burned themselves to the approach of the Muslaman [Hunter's Stastical Account of Bengal (Dacca Division), Page 70]

৩. বিক্রমপুরের প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে "বিক্রমপুরের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রসহ আলোচিত হইবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি মাত্র। সেজন্যই মূর্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল না।

* মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীগণ (Subdivisional Officer) অনেকেই রামপাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কিংবা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যে সমুদয়ই প্রামাণিক এমন কথা বলা চলে না। আমরা এখানে তাঁহাদের কয়েকজনের ও অন্যান্য লেখকগণের নাম করিলাম।

(১) Ruins and Antiquities of Rampal-by Asutosh Gupta Esq. C. S. I. R. A. S. B. & I 1889.
(২) Arch Survey of India Reports Vol XX Bihar & Bengal. শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রামপালের বিবরণ ইত্যাদি।

মিরকাদিমের খালের পূর্বদিকে নাটেশ্বরের প্রকাণ্ড দেউল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি যখন উহা প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন উহা ইষ্টক-পরিপূর্ণ একটি বিরাট স্তূপের মত দেখিয়াছিলাম। এখন উহার সে অবস্থা নাই। 'নাটেশ্বর' নাম হইতেই এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই দেউল বা দেবালয়টিতে খুব সম্ভব নটরাজ মূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। কিন্তু উহার ভিতর হইতে আজ পর্যন্তও কোনও নটরাজ বা নটেশ-মূর্তি আবিস্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন- "এই দেউলটি বৈষ্ণব বর্মরাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং সেনরাজগণ কর্তৃক শৈব দেউলে পরিণত হয়। এই দেউলের অল্প দূরেই সোনারঙ্গের দেউল বিদ্যমান। দেউলটি বেশ বড়। ঐ দেউলের পূর্বভাগ এখনও সিংহদরজা নামে পরিচিত। ঐ সিংহদরজার সম্মুখেই মেদিনীমণ্ডলের দীঘি। এই দীঘিটি বেশ বৃহদাকার। এই দীঘি ও সিংহদরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে লোকে এখনও লুড়াইতলি বলে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক পথিক খড়কুঠা দিয়া একটা লুড়া বানাইয়া সময় সময় অগ্নি দিয়া এবং অনেক সময় তাহা অগ্নি সংযুক্ত না করিয়াই দেউলের উদ্দেশে লুড়া বানাইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে নিক্ষেপ করিয়া যায়, এই প্রথাটি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা সূর্য পূজার স্মৃতি বলিয়া মনে হয়।" বিক্রমপুরের বহু গ্রামেই লুড়াইতলি আছে। এ-বিষয়ে মৎ-সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল।

আমরা পূর্বেই একথা বলিয়াছি যে, চন্দ্র-বর্ম-সেন প্রভৃতি বিভিন্ন রাজাদের রাজধানী রামপালের চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। আমরা প্রথম বল্লালবাড়ি যেমন দেখিয়াছিলাম এবং শতবর্ষ পূর্বে উহা যেমন ছিল, এখন যদি কেহ ঠিক তেমনিভাবে দেখিতে পাইবেন বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। পূর্বে দিল্লী যেমন দেখিয়াছি নতুন দিল্লীর পর তাহার কত-কি রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বের বল্লালবাড়িতে চৌগাড়ার অন্ত ছিল না। "তত্রস্থ সুগভীর চৌগাড়া-সকল সন্দর্শন করিলে ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" অধুনা ইহার অনেকানেক স্থান মৃত্তিকায় ভরাট হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাতে নানা প্রকার শস্য রোপণ করিয়া থাকে। রামপাল অতি উচ্চ ও উর্বরা ভূমি। সেখানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। * * * এখানে তেঁতুল ও শিমূল তুলা অনেক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।"

রামপালের বা কাচকির দরজা

বল্লাল-বাড়ি ও রামপালের দীঘির পশ্চিম পাড় হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর তীর হইতে দক্ষিণে পদ্মা বা কীর্তিনাশা নদী পর্যন্ত গিয়াছে, উহার নাম কাচ্‌কীর দরোজা।" রামপালের দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর খাঁড়ি (রিকাবিবাজারের খাঁড়ির সম্মুখস্থ গুদারঘাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ি থানা পর্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম **রামপালের দরজা**। উক্ত দরজার পরিসর অন্যূন ৪০ হাত হইবে।" আমরা শতবর্ষ পূর্বে রামপাল ও তাহার এই পথের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

এই রামপালের দরজা আমরা দক্ষিণ দিকে ২০০/২৫০ হাত প্রশস্তও দেখিয়াছি, কৃষকেরা উহা জমির চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসাৎ করিয়া উহাকে খর্বাকার করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন পরে উহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। এই রামপালের দরজা হইতে আরও অনেক রাস্তা চারিদিকে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন ঐ-সমুদয় রাজপথ ডিস্ট্রীক্টবোর্ড ও লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির রাস্তার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে Main Circuit Map-এ উত্তর দিকের পথের দিক্‌টা 'কপাল দুয়ার' নামে পরিচিত ছিল। [In the Main Circuit Map of 1859, a place on its northern end is designated *kapal Duar* and this may have been also the name by which the northern end of the road was known.]

মিঠাপুকুর

বল্লালবাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে **মিঠাপুকুরটি** অবস্থিত। মিঠাপুকুরের পার্শ্বেই অগ্নিকুণ্ড। বল্লালসেন বাবা আদম নামক ফকিরের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বল্লালসেনের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করেন, সেই জন্য ইহার নাম অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ড একটি সুগভীর গর্ত বিশেষ। এখানে এক সময় প্রায় বারো মাস পানি থাকিত। আমি প্রথম যেবার রামপাল দেখিতে যাই, তখন আমাদের পথ-প্রদর্শক কৃষক একটি কোদালী দ্বারা খনন করিয়া উহা হইতে প্রচুর-পরিমাণে কয়লা বাহির করিয়াছিল, আমি সে সময়ে তাহার কিছু সংগ্রহও করিয়াছিলাম। আমরা সেস্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারি নাই, কেননা সেখান হইতে এত অধিক পরিমাণে "জুঁইয়া" নামক এক প্রকার বিষাক্ত কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা নির্গত হইয়াছিল যে, তথায দাঁড়াইয়া থাকাই ক্লেশকর হইয়াছিল। কাজেই ওই স্থানে এক সময়ে কোনও রূপ একটা বড় রকমের শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এ বিষয়ে যে কিংবদন্তী বা কাহিনীটি প্রচলিত তাহা "বল্লালচরিতম্" নামক গ্রন্থে আছে। "বল্লালচরিতম্" নামে দুইখানি সংস্কৃত পদ্য-গ্রন্থ আছে। উহার একখানি আনন্দভট্ট কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বিরচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে বল্লালসেনের রাজধানী গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রাম বলিয়া লিখিত আছে। আর একখানি "বল্লালচরিতম্" গ্রন্থ উহা গোপালভট্ট কর্তৃক বিরচিত এবং তাঁহার বংশধর আনন্দভট্ট লিখিত পরিশিষ্ট সংবলিত এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালচরিতে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালসেন বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে একটি সংবাদবাহী পারাবত লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যদি পারাবতটি প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে পুরবাসিনীগণ বুঝিবেন যে, তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সুতরাং, তাঁহারাও যেন অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিয়া নিজ সম্ভ্রম ও মান রক্ষা করেন। দৈবের বিচিত্র লীলা। বল্লাল রণে জয়ী হইয়া শোণিত-সিক্ত কলেবর ধৌত করিবার জন্য যেমন নদী-পানিতে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি পারাবতটি উড়িয়া আসিয়া রাজবাড়িতে পৌঁছে, রানী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ আত্মবিসর্জন করিলেন।

এ বিষয়ে সুধী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত

আমরা এক মত :–

"এ দেশে বেদব্যাসের আমল হইতে সাধারণত যে ভাবে ইতিহাস রচিত হইয়া আসিয়াছে বল্লালচরিত দু'খানাতেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উপরন্তু আমরা এখানে কয়েকটি তারিখ পাইতেছি যাহার কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লালসেন ১০২৮ শকে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য বল্লাল-চরিতের মতে স্বয়ং বল্লালের আদেশে তাঁহার গৃহশিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে তাঁহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং আনন্দভট্ট ১৫০০ শকে তাঁহার পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দ ভট্টের নিজের বল্লাল-চরিত কিন্তু ১৪৩২ শকে লিখিত। ঐতিহাসিক গবেষণায় বল্লালসেনের রাজত্বের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পরে এবং ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বে।

"আবার বায়াদুম্ব বা বাবা আদমের সমাধি ও তাঁহার স্মরণার্থ মসজিদ এখনও সশরীরে রামপাল হইতে কিছু দূরে বর্তমান। এই মসজিদের উপর উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, ইহা খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত।"

"নহ্য মুলা জনশ্রুতি :– এইরূপ একটা কথা আছে। জনশ্রুতি এক মূল সাধিতে পারে, কিন্তু সেই মূলকে বিকৃত আকারে বিপথে লইয়া যাওয়াও জনশ্রুতির একটি কার্য।"

"প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ বল্লালসেন যে এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত। ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই এবং তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমানগণ এতটা বিক্রান্ত হয় নাই যে, হঠাৎ রামপাল রাজধানীতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যে দেশে রাজার সমকালে ইতিহাস রচিত হয় না সেখানে পরবর্তীকালে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী স্তূপীকৃত হইয়া ঘটনাগুলিকে বিকৃত আকারে উপস্থিত করে। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া এবং কিংবদন্তী খুব প্রবল বলিয়া কোন কোন লেখক পরবর্তীকালের দ্বিতীয় বল্লালসেন নামক এক রাজার উপর এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিত ব্যাপার চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস এত বিকৃত, সেখানে এরূপ কিছু করিয়া থাকিলে, রাজার নামটাই যে বিকৃত হয় নাই এ কথা কে বলিতে পারে? বল্লালসেন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া অনেক ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র কার্য তাঁহার উপর আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের পরও পূর্ববঙ্গ অনেককাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। হয়তো কোন পরবর্তী রাজার সাহায্যে রাজপুতানার সুপরিচিত জহরব্রত বিক্রমপুরে ক্ষুদ্র আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব থাকায় পরবর্তীকালে বল্লালসেনের উপর সমগ্র ঘটনাটি চাপাইয়া দেওয়া কিছু অসম্ভব নহে।'

কপোতের পলায়ন ও তদৃষ্টে পুরমহিলাগণের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন এদেশে এত অধিক স্থানে রাজাদিগের প্রাণত্যাগের কাহিনীর সহিত জড়িত যে, ঐতিহাসিক এই সব কাহিনী গ্রহণ করিতে একটু অতিরিক্ত সাবধান হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমরা দশরথ দনুজমাধবের বিষয় পূর্বে বলিয়াছি। বিশ্বেশ্বর বাবু বলেন– "ইনিই মুসলমান ঐতিহাসিকের দনৌজা বা নুজ্যা। বিক্রমপুরে যদি মুসলমানের ভয়ে জহরব্রত

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সম্ভবত উহা তাহারও পরে।" গিয়াসউদ্দীন বলবন্ [১২৬৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ] যখন দিল্লীর সম্রাট তখন ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার শাসনকর্তা তুগ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হন। সে সময়ে দশরথ দনুজমাধব বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। বল্‌বন্ তাঁহার সহিত ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি করেন, বাবা আদমের স্মৃতিরক্ষা মসজিদ দনুজমাধবের বহু পরবর্তী।[১]

অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে মিঠাপুকুর অবস্থিত। এই পুকুরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ হস্ত ও প্রস্থে ১০০ হাত হইবে। এই পুষ্করিণীর মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড হইতে চিতাভস্মসমূহ ফেলা হইয়াছিল বলিয়া জন-প্রবাদ প্রচলিত। মিঠাপুকুরে এখনো বার মাস জল থাকে। এস্থানে বহু কৃষকের বাড়ী অবস্থিত। ডাক্তার টেলার সাহেব মিঠাপুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন- "In the entre of Balla-baree, there is a tank called "Meetha Pukhur" in which the remains of the Rajaa and his family are said to have been deposited. It is regarded as a place of great sanctity by the Hindoo in the neighbourhood, who carefully abstain from using its water, or removing the soil from its banks." এখন আর সেদিন নাই। এই পুষ্করিণীর তীরে যে সকল মুসলমান কৃষকগণের বাড়ি অবস্থিত, তাহারাই এক্ষণে ইহার জল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাবা আদমের মসজিদ

বল্লালবাড়ি হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে বাবা আদমের মসজিদটি অবস্থিত। এই স্থান রামপালের সীমান্তর্ভূক্ত। রামপালের এই অংশের নাম দুর্গাবাড়ি। মসজিদটি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। মসজিদের গাত্রস্থিত প্রস্তর-ফলক হইতে জানিতে পারা যায় এইটি ৮৮৮ হিজরীতে অর্থাৎ ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাতা মালিক কাফুর। সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহার সময় ইহা নির্মিত হয়। ব্লকম্যান, হঁরিনাথ দে প্রভৃতি মনীষিগণ নিম্নলিখিতরূপ ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন "God Almighty says"; The mosque belong to God. Do not associate any one with God. The prophet, may God bless him, says; He who builds a mosque will have a castle built for him by God in paradise. This Jami masjid was built by the great Malik, Malik Kafur, in the time of the king, the son of the king Jalal-ud-diny wauddin Fateh shaha, the king son of Mahammad Sahah, the king, in the middle of the month of Rajab 888 Hijri 1483 A.D. বাবা আদমের সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যে স্থানে বাবা আদম নামাজ পড়িতেন- ঠিক সেই স্থান নির্বাচিত হইয়াই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে। মসজিদটির ইষ্টক মসৃণ ও পাতলা এবং কারুকার্য-খচিত। পূর্বে ছয়টি গুম্বজ ইহার পুরোভাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত। বর্তমানে মাত্র তিনটি গুম্বজ আছে। বক্রী তিনটি ভূমিকম্পে ছাতসহ ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে। মসজিদ মধ্যস্থিত দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদে প্রবেশ করিলেই দ্বারের দুই পার্শ্বে এই স্তম্ভ দুইটি দেখিতে

১. বিক্রমপুর শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য- প্রবাসী ১৩৪২।

পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা ৭ হাত এবং পরিধি ৩ হাত। স্তম্ভদ্বয় ধূসরবর্ণ। কথিত আছে, মসজিদের গাত্রে মূল্যবান মণিরত্ন সংযোজিত ছিল, মগেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। এক সময়ে ফৈজদ্দিন খন্দকার, মফিজদ্দিন দেওয়ান এবং আইনদ্দিন খন্দকার প্রভৃতি এই মসজিদের খাদেম ছিলেন। এই মসজিদটি মেরামত হওয়ায় ইহার প্রাচীন রূপ আর নাই।

বাবা আদমের সমাধি

মসজিদটির সন্নিকটে বাবা আদমের সমাধি বিরাজিত। সমাধিটি মধ্যযুগে একেবারে জীর্ণাবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল– কয়েক বৎসর হইল মেরামত হওয়ায় ইহার কতকটা নবজীবন লাভ হইয়াছে। এই সমাধিটিও প্রাচীন। বাবা আদমের মসজিদ ও সমাধিই পূর্বাঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্যের প্রথমাবস্থার সূচনা করিতেছে। সে হিসাবে দেখিতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে থাকে। বাবা আদমের মসজিদের অনতিদূরে কাজিকস্‌বা, রিকাবিজার প্রভৃতি গ্রামেও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত আছে। সে-সকলগুলির আলোচনার স্থান এখানে নহে, আমরা বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনার করিব।

কোদালধোয়ার দীঘি

বাবা আদমের মসজিদ হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, সে পথ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দিকে একটি দীঘি পাওয়া যায়। উহার নাম কোদালধোয়ার দীঘি। কিংবদন্তী এই যে, যে সমস্ত মজুর রামপালের দীঘি-খননকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রতি দিনই কার্য শেষে একস্থান হইতে এক কোদাল মাটি কাটিয়া কোদাল ধুইয়া ফেলিত, এইরূপে একস্থান হইতে মাটি কাটিতে ঐ স্থানেও একটি বিশাল দীর্ঘিকা খনিত হইয়া গেল, উহারি নাম কোদালধোয়ার দীঘি। বাঙলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ কোদালধোয়া দীঘির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন বল্লালরাজের কোতোয়ালের বাড়ি এই দীঘির তীরে ছিল। সেজন্যই কোতোয়াল-দহ হইতে দীঘির নাম হইয়া গিয়াছে কোদাল ধোয়া। এই সকল জনপ্রবাদের সুমীমাংসা হওয়া এখন অসম্ভব। এই দীঘিও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০০০ × ৫০০ হাত হইবে।

বাবা আদমের মসজিদটি রামপালের অদূরবর্তী কাজীকসবা নামক স্থানে অবস্থিত। কস্‌বা পার্শী শব্দ, নগর বুঝাইয়া থাকে। রামপালের একটি ভাগের নাম নগরকস্‌বা। নগর বলিতে শহর বুঝায় এবং কস্‌বা শব্দের অর্থ হইতেছে নগর। অতএব এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইলে-পর প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরের বিভিন্ন পল্লীর নামও পরিবর্তিত হইতে থাকে– যেমন নগরকস্‌বা, কাজি-কস্‌বা, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি।

রামপালের তেঁতুল গাছ

রামপাল দীঘি– বা বল্লাল দীঘি। রামপালের দীঘি এক সময়ে বিক্রমপুরের একটি প্রধান দর্শনীয় জিনিস ছিল; শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর চারিদিকে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে

অনেক বৃহদাকার দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সমুদয় দীঘি খননের প্রধান কারণ দীঘির ভিতর হইতে মাটি তুলিয়া ভূমি উচ্চ করিয়া বাড়ি নির্মাণ করা। রাজধানীর উপযুক্ত নিরাপদ উচ্চস্থানের জন্যই এইরূপ বিশালকায় দীঘি খনন এবং পানীয় জলের জন্যও দীঘি খনন সেকালে একটি আবশ্যকীয় পুণ্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। রামপালের চতুর্দিকস্থ ভূমির ন্যায় উচ্চ ভূমি বিক্রমপুরে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুবিখ্যাত ভৌগোলিক এবং সেকালের ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার সি.বি. ক্লার্ক (C.B. Clarke) রামপালের দীঘির তীর এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি বর্ষাকালে কোন দিন এ স্থানে জল উঠে, তাহা হইলে সমস্ত ঢাকা জেলা একেবারে পানিতে ভাসিয়া যাইবে। 'রামপালের দীঘির পূর্বতীরে তিভিড়ী বৃক্ষের নিম্নস্থ মৃত্তিকার স্বাদ লবণাক্ত, জনপ্রবাদ, এখানে এক সওদাগরের সুবৃহৎ লবণ বোঝাই তরণী নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই দীঘি রামপালের দীঘি এবং বল্লাল-দীঘি এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই দীঘির দৈর্ঘ্য ২২০০ ফিট এবং প্রস্থ ৮৪০ ফিট। মহারাজা বল্লালসেন এই দীঘিটি খনন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। Main Cricuit map-এর নির্দেশ অনুসারে এই রামপাল দীঘি ২২০০ × ৮৪০ ফিট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম এই দীঘির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :– Half a mile to the south of Ballal-bari there is one of the largest and finest sheets of water that I have seen. It is called Rampal Dighi, and is about 1,800 feet in length from north to south by 800 ft in breadth. The water is deep and clear and the banks are covered with large old trees. The Royal Elephants are said to have been kept at the northern end. The land at the south end is still held by the descendants of the old Rajas. অর্থাৎ, বল্লালবাড়ির আধ মাইল দক্ষিণে আমি বিখ্যাত রামপালের দীঘি দেখিয়াছিলাম। এই দীঘি উত্তর ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১,৮০০ ফিট এবং প্রস্থ ৮০০ ফিট। দীঘির পানি নির্মল ও গভীর। দীঘির তীরে বড় বড় সব পুরানো গাছ রহিয়াছে। রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে ছিল রাজাদের হাতীশালা। দক্ষিণ দিকের ভূমি এখনও প্রাচীন রাজাদের বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে। এইখানে কানিংহাম কোন্ রাজার বংশধরগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ জুন মাসে "রামপালের বিবরণে" তদানীন্তন ঢাকা কলেজের ছাত্র প্রসন্নচন্দ্র গুহ রামপাল দীঘির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :– "বল্লাল বাড়ির বহির্বাটির দক্ষিণাংশে ন্যূনাধিক দুই সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও নয় শত হস্ত পরিসর-বিশিষ্ট প্রায় শুষ্কভাবাপন্ন বৃহৎ একটি দীর্ঘিকা বর্তমান আছে। উহা রামপালের দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, মহারাজা বল্লালসেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহার জননী একাদিক্রমে যতদূর পদব্রজে যাইতে পারিবেন রাজা বল্লাল ততদূর দীর্ঘ এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিবেন। তদনুসারে তাঁহার মাতা এক দিবস বৈকালে বাহির-বাটীর দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি অধিকদূর গমন করিলে পর বল্লালসেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে, তাঁহার মাতা অনেক দূর অতিক্রম করিয়াছেন, আরও

গমন করিলে তিনি অত বড় দীর্ঘিকা অত্যল্প সময়ের মধ্যে খনন করিতে পারিবেন না। রাজার ইঙ্গিতানুসারে একজন অনুচর তাঁহার জননীর চরণে অলক্ত-চিহ্নিত করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আপনার চরণে শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, এ শোণিত চিহ্ন কিসের? একথা শুনিয়া বল্লাল জননী চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাওয়া মাত্রই, সেই স্থানে এক খোটা গাড়িয়া চিহ্নিত করত দীঘি খনন-কার্য আরম্ভ হইল।"

এই দীঘির নাম রামপালের দীঘি কেন হইল তৎসম্বন্ধেও বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন 'অনেক দিন পর্যন্ত দীঘিতে জল উঠিয়াছিল না, রাজা বল্লালের পরম স্নেহাস্পদ ভৃত্য রামপাল স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অশ্বারোহণ পূর্বক সে দীঘিতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালীন উহার চতুস্পার্শ্বে লোক রাখিয়া বলে ইহা জলেতে পরিপূরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রামপালের দীঘি বলিয়া আখ্যাত করিও। এতদ্বচন প্রয়োগান্তে, রামপাল প্রান্ত দীঘিতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা কল কল স্বরে জলপূর্ণ হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নয়ন পথাতীত হইয়া কোথায় গেল, কেহই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই সময়ে সকলের মুখ হইতে 'রামপাল! রামপাল' এই শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল। তদবধি উহা রামপালের দীঘি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।[১]

"এই দীঘি এমন সুবৃহৎ হইয়াছিল যে, উহার এক পারে দণ্ডায়মান হইয়া অপর পারের প্রতি ভালরূপে দৃষ্টি সঞ্চালন হইত না। আধুনা উক্ত দীঘির অনেক স্থান ভরাট হওয়াতে উহা পূর্বাপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ হইয়াছে, এই-ক্ষণে কৃষকেরা উহার স্থানে স্থানে বোরো ধান রোপণ করিয়া তদুৎপন্ন যথা পরিপালিত ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"মধ্য যোগে রামপালের দীঘিতে মৎস্যের বড় আড়ম্বর ছিল। তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সময়ে সময়ে লোকেরা রামপালের দীঘিতে মাছ ধরিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অস্ত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইত। সকলে দীঘিতে না নামিয়ে তাহার পারে দণ্ডায়মান থাকিত। এবং আপন আপন অস্ত্রগুলি উর্ধ্বমুখে ধরিয়া কোলাহল করিত। তাহাতে প্রকাণ্ড মৎস্যসকল লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইত। উল্লম্ফিত মৎস্যাঘাতে অনেকানেক লোক আহত হইত।"

রামপালের দিঘি কে খনন করিল?

বর্তমান সময়ে রামপাল দীঘির তীরে সেই– "প্রাচীনকালীয় বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, সিমূল ও খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ অবস্থা আর নাই।" এখন এই দীঘির মধ্যে স্থানে স্থানে জল থাকে, আর অন্যান্য স্থানে কৃষিকার্য হইতেছে। ক্রমশ চারিদিক ভরাট হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় পূর্বের সেই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপও হ্রাস পাইতেছে। অনেকে বল্লালসেনের দীঘি নৃপতি বল্লালসেন খনন করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বর্গত আশুতোষ গুপ্ত বলেন,– "বল্লাল সেনের রাজধানী এবং তাঁহার খনিত দীঘির নাম রামপাল হইবে কেন? ইহা কি আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় না? আমার মনে হয় বল্লালসেনের পর পাল বংশীয় কোন নৃপতি রামপাল রাজধানীতে বাস করিবার সময় এই দীঘি খনন করেন এবং পরে উহা বল্লালসেনের নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। কেননা বুড়ীগঙ্গার উত্তরাংশে যে এক সময়ে পালরাজারা রাজত্ব করিতেন

১. J A S B ১৮৮৯

এবং তাঁহারা সেনরাজাদের পূর্বে ও পরে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু জনগণ তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেও যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, তাহারই ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃপাবান হইয়া বৌদ্ধনৃপতিদের কীর্তিও সেনরাজাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। কেননা দীঘি খনন করা পালরাজাদের একটা বিশেষত্ব ছিল। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি আজও বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে। বোধ হয় বাঙলাদেশে মহীপাল দীঘিই বৃহত্তর দীঘি। এজন্য আমি মনে করি পালরাজাদেরই কোন নৃপতি এই শহরের নাম ও দীঘির নাম রামপাল রাখিয়াছেন।"

আমরা গুপ্ত মহাশয়ের এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে অক্ষম। দীঘি খনন করা কেবল যে পাল রাজাদেরই একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালের হিন্দু নৃপতি মাত্রেই দীঘি খনন একটা পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন। বল্লালসেন-খনিত গৌড়ের "সাগরদীঘি" যিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন তিনিই জানেন যে, মহীপাল দীঘি এবং সাগর দীঘি আয়তনে প্রায় একই প্রকার। আমি নিজে বল্লালসেনের খনিত বিশাল সাগরদীঘি দেখিয়াছি। ঐ দীঘির চারি তীরে ছয়টি ঘাট ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। –"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন: – "সম্ভবত বল্লালসেনই একডালা দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গ নির্মাণার্থ যে প্রভূত মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল, বোধ হয় তাহা সাগরদীঘি খননের দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। বল্লালসেন বাগবাড়ির মধ্যে দুটি পুষ্করিণী খনন করান। তাহার নাম টামনা দীঘি ও ভাতশালা দীঘি। টামনা দীঘি অতি বৃহৎ। উহাতে চারিটি ঘাট ছিল। উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি এবং পশ্চিম দিকে দুটি। ঘাটের ইট লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ ঘাটগুলি রঙ্গিন ইটে বাঁধানো হইয়াছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেও যে হিন্দুরা রঙ্গিন ইটের ব্যবহার করিতেন, তাহা জানা যাইতেছে।" গৌড়ের বড় সাগর দীঘি একটি প্রকাণ্ড হ্রদ, ১,৬০০ × ৮০০ গজ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদীঘি নামে একটি দীঘি আছে। প্রবাদ যে, উহা বল্লালসেন খনন করাইয়াছিলেন। আবার কাহারও কাহারও মতে উহা লক্ষ্মণসেনের কীর্তি। তিনি পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য উহা খনন করাইয়াছিলেন। দীঘি খনন করাইবার হেতু সম্বন্ধেও অনেকে এইরূপ বলনে যে, বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপের উত্তরে একটি রাজবাড়ি করেন। যথা :

মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান,
জহ্নুনগরোত্তরে করে সে বাসস্থান।"

কাজেই বল্লালসেন বা সেনরাজারা দীঘি খনন করিতেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কোন কারণই বিদ্যমান নাই– অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই দীঘি সম্ভবত বল্লালসেনই খনন করিয়াছিলেন। এস্থানের নাম রামপাল কেন হইল, সে বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি বিশেষভাবে রামপাল পর্যবেক্ষণ করিয়া যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমারও বিশ্বাস "সেনবংশের সময় শ্রীবিক্রমপুর নগরের সকলের চেয়ে বেশী বিস্তৃতি হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল এই বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছিল।" এইজন্যই আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, এই দীঘি বল্লালসেনের খনিত নতুবা 'বল্লাল কাটায় দীঘি' এই জনপ্রবাদ

এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।[১]

রামপাল দীঘির ন্যায় বৃহৎ না হইলেও তাহার তুল্য বা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের আরও কয়েকটি বিক্রমপুরের দীঘির পরিচয় আমরা এখানে দিতেছি। এইসব দীঘি কে বা কাহারা খনন করিলেন তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, বিক্রমপুরের বিভিন্ন রাজবংশীয়েরাই এই-সব দীঘি খনন করাইয়াছিলেন।

রামপাল দীঘি –২২০০ ফিট × ৮৪০ ফিট।

ধামারণ দীঘি –২২০০ ফিট × ৮০০ ফিট।

ধামারণ– ধর্মারণ্য শব্দের অপভ্রংশ। ধামারণের দীঘির আয়তন ঠিক রামপাল দীঘির মত– প্রস্থে মাত্র ৪০ ফিট কম। এই দীঘির তীরে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের বসতি রহিয়াছে।

নৈয়ের পুকুর –২০০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

মামাসার দীঘি –১৪০০ ফিট × ৬০০ ফিট।

ধামাদা দীঘি –১১০০ ফিট × ৫০০ ফিট।

সুখবাসপুর –৯০০ ফিট × ৫০০ ফিট।

শানের দীঘি –৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

দেওর-চুড়াইন দীঘি [রামপাল দীঘির ঠিক পশ্চিমে] ৮০০ ফিট × ৮০০ ফিট।

সুয়াপাড়া দীঘি –৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।

টঙ্গীবাড়ি দীঘি –৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।

মগা দীঘি [চারপাড়া] ৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

রামপালের উপকণ্ঠে এবং আশেপাশেই এইরূপ কয়েকটি বৃহৎ দীঘি অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ছোট-বড় দীঘি আছে, সে সমুদয়ের উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

হরিশ্চন্দ্রের দিঘি

রামপালের পশ্চিম ভাগের একটি দীঘি হরিশ্চন্দ্রের দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরের অদূরেই হরিশ্চন্দ্রের ভিটার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ঐ ভিটার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দুই শত হস্ত দীর্ঘ এবং ৮০/৯০ হস্ত প্রশস্ত দীঘিটি বিরাজিত আছে। "উহা তারা ও বড় বড় জঙ্গল সহকৃত ভীটাবলীতে পরিপূর্ণ। উক্ত দীঘির ১০/১২ হস্ত পরিমিত স্থানের ভীট সকল মাঘি পূর্ণিমা দিবস জলমগ্ন হইয়া পড়ে। ক্রমে ভাসিতে থাকে। এই আশ্চর্য অনেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই উহার কারণ উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই।"

এই দীঘির সম্পর্কিত আশ্চর্য ব্যাপার আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহার উপর দিয়া মানুষ এবং গোরু-বাছুর অবলীলাক্রমে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু

১. J.R.A.S.B 1889 The Antiquities of Rampal, by A.T.Gupta. গৌড়ের ইতিহাস ১০২ পৃষ্ঠা। শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ– শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী। প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২২ ১৫শ ভাগ, ১ম ভাগ ৩য় সংখ্যা।

নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে ভিট ইত্যাদি কি জানি কোন্ নৈসর্গিক কারণে নিম্নে নাবিয়া গিয়াছে এবং জল বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এ বিষয়ে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে ইহার কারণ কি তৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবত এই দীঘির তলভাগের সহিত কোনও উৎসের যোগ আছে, তাই বিশেষ কোন সময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। আশ্চর্যের কথা এই যে, আজ পর্যন্তও এ বিষয়ে কেহ কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

এই দীঘি সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। এই রাজা হরিশ্চন্দ্র কে ছিলেন? 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় রামপাল শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক স্বর্গত আশুতোষ গুপ্তের মতে এই হরিশ্চন্দ্র- বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ পাল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন :- "বর্মবংশের বিষয়ে আমরা প্রধান এই একটি বিষয় অবগত আছি যে, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। হরিবর্মদেব স্বীয় রাজধানী হইতে মাতার পদব্রজে কাশী যাইবার জন্য এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। * * পাইকপাড়া আবদুল্লাপুরের সীমায় অবস্থিত বৃহৎ ইষ্টক-নির্মিত পোলটির উপর দিয়া যে দীর্ঘ রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্মের নির্মিত রাস্তা।"

এখন দেখা আবশ্যক যে, রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠের কোন্ স্থান হইতে বৈষ্ণব কীর্তি-চিহ্ন বাহির হইয়াছে, হরিবর্মের রাস্তা কোন্ স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং বর্মবংশের স্মৃতি-বিজড়িত আর অন্য কোন কীর্তি রামপালের কোন অংশে আছে কিনা।

সুয়াসপুর বা সুখবাসপুর

"রামপালের দক্ষিণে সুখবাসপুব গ্রামের আশে-পাশে বহু বৈষ্ণব-কীর্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখবাসপুর গ্রামে বহুকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, এখানে রাজার বাটি অবস্থিত ছিল। সুখবাসপুর মনসাবাড়িতে সুখবাসপুরের প্রকাণ্ড দীঘি হইতে উত্থিত এক বিপুলায়তন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। আর একখানা প্রায় ছয় ফুট উচ্চ অতি সুন্দর কারুকার্য-খচিত বামন আবতারের মূর্তি এই গ্রাম হইতে আবদুল্লাপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নীচে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "নমো বা-" পর্যন্ত লিখিত আছে। লিপিটি বোধ হয় 'নমো বামনায়' বলিয়া আরব্ধ করা হইয়াছিল- কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।[১] এই দুইটি প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়াই মনে হয় যে, এরূপ বিপুলায়তন মূর্তি কোন প্রতাপশালী রাজা ভিন্ন অন্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

১ (1) Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, x

(2) There is a comparatively small tank in the south-west part of Rampal, which deserves a passing notice It is called Raja Haris Chandra s dighi It is overgrown with trees and shrubs which are flooded over with water for a week once a year of the time of the full moon in the manth of Magh Before and after this period the tank is dry * * * the tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the Kings of the Pal dynasty P 22 J.A S B 1889 সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস- ৪১ পৃষ্ঠা। 'বিক্রমপুর' পত্রিকা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৩২০ সাল, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। মিরকাদিমের খাল- ৭৭-৮৯ পৃষ্ঠা। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

হরিবর্ম হরিশ্চন্দ্র কি?

"সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দীঘি। আমার মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। নামসাদৃশ্য ভিন্ন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত হরিবর্মের রাস্তাও যে হরিশ্চন্দ্রের দীঘির উত্তর পাড় ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সুখবাসপুরেই বর্মবংশের রাজধানী ছিল। সুখবাসপুরের উত্তর প্রান্তে দেবসার গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘি এবং তাহার পাড়ে এক উচ্চ দেউল আছে। দেবসার গ্রাম রামপালের বিখ্যাত দীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। আমার মনে হয় এই দেবসার দেউলে বর্মরাজাদের অনেক কীর্তি লুকাইয়া আছে। সুখবাসপুরের পূর্বে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে– তাহার নামটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার নাম সরস্বতী দেবীর সম্মানে কোন্ অতীতকালে বর্মরাজাদের সময় হয়তো এখানে সারস্বত-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রাচীন গৌরবযুক্ত নামটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর মাঠের পূর্বপ্রান্তে কেওয়ার গ্রাম। কেওয়ার গ্রাম বর্মদের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেওয়ার দেউল হইতে একখানা বিষ্ণুমূর্তি বাহির হইয়াছে– তাহার পাদপীঠে চারি লাইন লিপি আছে। তাহার যতদূর পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

লিপি-পরিচয়

১। অয়মানুষমেয়েন সযোগাঙ্গভুবা বিভুঃ [।]

২। বঙ্গোকেন কৃতোবিষ্ণ-র্বিষ্ণুসালোক্য-কাম্যয়া [।।]

৩। ববেন্দ্রীতটকীয়েন শাণ্ডিল্যকুলজন্মনা পিতাম- [।]

৪। হস্য পৌত্রেন প্রণপ্তা শৌরিশর্ম্মণঃ ॥

লিপির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। নীচের দুই লাইনের শেষ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয় পাঠ দিতে পারিলাম না। প্রথম দুই লাইন বেশ পরিষ্কারভাবে খোদিত থাকিলেও তাহারও তিন-চারিটি অক্ষরের পাঠ অশুদ্ধি-হেতু সংশয়যুক্ত। লিপিটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, গৌরীশর্মার পূতি, পিতামহশর্মার নাতি, কলশমার ছেলে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বরেন্দ্রীহট্ট নিবাসী বঙ্গোকশর্মা ৯১০ শকে কহোরি অর্থাৎ, বর্তমান কেওয়ার গ্রামে সালোক্য কামনায় বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শকাব্দের ৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯৮৮-র সমান। সময়টি ঠিক বর্মবংশের অভ্যুত্থানের সময়।"

হরিবর্মের তাম্র-শাসন

ভোজবর্মের বেলাব-লিপি ব্যতীত হরিবর্মদেবেরও একখানি তাম্র শাসনের কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই শাসনলিপিখানা বিক্রমপুরের রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনের একখানি অস্পষ্ট চিত্র নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনের ব্যাখ্যা দিয়াছেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২১৫-২১৭ পৃষ্ঠায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে,

এই হরিবর্মদেব মূল বর্মবংশেরই কোন শাখা বা স্বগোত্রা-সম্ভূত হইতে পারেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [Palas of Bengal, P.P 97-98] নামক গ্রন্থের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায়ও এই তাম্রশাসনখানির বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে এই তাম্রশাসনখানির অতি অল্প অংশ-মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। "এই তাম্রশাসনখানির ২৭শ পঙ্ক্তি....ইহ খলু বিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্মপাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরভমট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরি বর্মদেবঃ কুশলী।

বর্তমান সময়ে এই তাম্রশাসনখানির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার Inscriptions of Bengal Vol III-এর Appendices-এ এই শাসনখানির উল্লেখ করিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছে– "I am afraid is too conjectural to be utilized for historical purposes."

এই হরিবর্মের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। নগেন্দ্রবাবুর মতে "শাসনখানি খ্রীষ্টিয় ১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫½ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৩¼ অঙ্গুলি ছিল। তাম্রশাসনের উর্ধ্বভাগে রাজা হরিবর্মদেবের লাঞ্ছন (emblem) ছিল।"

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা এখনও প্রকৃতভাবে বলা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র ও হরিবর্মা একই ব্যক্তি কিনা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এ বিষয়টি নূতন আবিষ্কার-সাপেক্ষ। আবার জনপ্রবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যাইতে পারে না। আমরা যতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিব, ততদিন পর্যন্ত এ সমুদয় কিংবদন্তী ও অনুমানকে একেবারে উপেক্ষা করিতে কিংবা গ্রহণ করিতে পারি না।

গজারী বৃক্ষ

গজারী বৃক্ষ–রামপালের গজারী বৃক্ষটি এক সময়ে ঐ স্থানের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ গাছটি মরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে যখন ঐ গাছটিকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহার উচ্চতা প্রায় ষাট হাত ছিল। দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইত। বৃক্ষটির বিশাল দেহ ছিল না। ইহার গোড়ার বেড় ছিল ৪–৪½ হাত মাত্র। প্রায় ৪/৫ হাত উর্ধ্বে গাছটি দুইটি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল। ঢাকা জেলায় এক ভাওয়ালের গজারি-বন ব্যতীত আর কোথাও শাল বা গজারী গাছ দেখা যায় না। এই একটি মাত্র গজারী গাছ কি ভাবে কেমন করিয়া এই স্থানে জন্মিয়াছিল তাহা আলোচ্য বটে। এক সময়ে নানাবিধ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ও হরিৎপত্ররাজি সুশোভিত হইয়া ইহা অতি সুন্দর দেখাইত। নিকটবর্তী স্ত্রী ও পুরুষগণ বিশেষ মৃতবৎসা স্ত্রীগণ ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণতা অনুভব করিতেন বলিয়া কথিত হইত।

গজারী বৃক্ষতলের মেলা

আমি যে সময়ে গাছটিকে প্রথম দেখি তখন উহার তলদেশে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দেখিয়াছিলাম। বংশ পরম্পরা-বিশ্রুত জনপ্রবাদ হইতে ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। 'পল্লবিজ্ঞানে' লিখিত আছে– "বল্লাল বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান

বিদ্যমান আছে, উহা বল্লাল সেনের বহির্বাটি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির-বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটি গজারি তরু অবস্থিত আছে, লোকে তাহা বল্লালের হস্তি-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। * * * অধুনা কতিপয় বৎসর হইতে চৈত্র মাসে অষ্টমী দিবস প্রাগ্-বর্ণিত দীর্ঘিকার উত্তর পাড় সুপ্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্রতর মেলা মিলিয়া থাকে। ঐ দিবস মুন্সীগঞ্জের পূর্বদিকস্থ যোগিনীঘাটে অষ্টমী-স্নান করণার্থ অসংখ্য যাত্রী সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম-কর্ম সমাপনান্তে অনেক যাত্রিক বল্লাল রাজার কীর্তিকদম্ব সন্দর্শন জন্য রামপালে উপস্থিত হয়। সে উপলক্ষে তথায় নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে।"

গজারী বৃক্ষের সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী

এই গজারী বৃক্ষের সম্বন্ধে বিক্রমপুরে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই মৃত তরু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদবারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়াছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত। এবং তাহার সহিত আদিশূর নামক একজন নৃপতির নাম বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা প্রয়োজন-বোধে এখানে সংক্ষেপে সে সমুদয় উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

আদিশূর

বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত যে, আদিশূর নামে এক নৃপতি ছিলেন, তিনি অতি সৎলোক, সদ্বিচারক, তত্ত্ববেত্তা ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে সমুদয় শত্রুকুল নির্মূলপ্রায় হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধদিগকে গৌড়-রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। এই মহাত্মা আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নগরীতে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের চরণে চর্মপাদুকা ও সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত ছিল। তাঁহারা এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে রাজবাড়ির দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারবানকে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিবার জন্য বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাদের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া শিঘ্রই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই মহারাজকে আশীর্বাদ করিবার জন্য জল-গণ্ডুষ-হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশূর, এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন হয়তো রাজা তাঁহাদের বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব দেখাইবার জন্য করস্থিত আশীর্বাদ-বারি নিকটবর্তী মল্লকাষ্ঠে স্থাপিত করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ দেখিতে দেখিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিল।" এই অমর গজারী বৃক্ষ এক সময় বিক্রমপুরবাসী নর-নারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। ইহার তীরে মেলা বসিত, গাছটির গা মহিলারা সিন্দুর-

* ভারতবর্ষের ইতিহাস–ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ৯৩ পৃষ্ঠা, আদিশূর সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিবেন–ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, শূরবংশ, ৯১-১৩৮ পৃষ্ঠা। বাঙ্গালার ইতিহাস-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১০৩-১১৭। গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ৬৯-৮৪ পৃষ্ঠা। গৌড়রাজমালা, আদিশূর, ৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা। গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, ১৭-৮০ পৃষ্ঠা ও বিবিধ পুস্তকাবলী।

দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া দিতেন।

কয়েক বৎসর হইল গজারি গাছটির মৃত্যু হইয়াছে, আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে আমার নিজের হাতে তোলা উঁহার আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার পূর্বে কেহ গজারী বৃক্ষের কোন চিত্র প্রকাশ করেন নাই।

আদিশূর-রাজা কে ছিলেন?— শূরবংশ

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর-রাজা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। 'আদিশূর' নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা, এবং কোথায় কোন্ সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ অনেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আদিশূর নৃপতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তবে বর্তমান ঐতিহাসিকেরা সকলে একবাক্যে এই কথা স্বীকার করেন যে, পশ্চিম বঙ্গের শূর-রাজ্য বা দক্ষিণ বাংলায় শূরবংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শূর-বংশের বিখ্যাত রাজা আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন– "পশ্চিমবঙ্গের শূর-রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশ-শাসিত রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শূর-বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আদিশূর সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, সমসাময়িক কোনও লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে একথা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শূরবংশ নামে একটি প্রতাপশালী স্বাধীন রাজবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করিতেন। এই শূর-বংশের কন্যা বিলাসদেবী বল্লাল সেনের জননী ছিলেন। কিন্তু তিনি শূর-বংশীয় কোন্ নৃপতির কন্যা ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সীতাহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে কিছুই জানিতে পারি না। আদি-প্রথম এই দিক দিয়াও হয়তো অজ্ঞাতনামা শূর-নৃপতিকে "আদিশূর" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।"

শূর-বংশীয়রা কোথা হইতে আসিলেন?

'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন– "শূর-বংশীয়দের সময় হইতে গৌড়রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে, শূরবংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্তী দরদ দেশ (বর্তমান দর্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন : যথা –

আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্।"

আদিশূর এই বংশীয় সর্বপ্রধান নরপতি। কাশ্মীর-রাজ অবন্তীবর্মার শূর নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সম্ভবত শূর-বংশের স্থাপনকর্তা।** আইন-ই আকবরীতে আদিত্য শূর বংশীয় রাজগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল আদিশূরকেই আদিত্যশূর

বলিয়াছেন কি না বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন– আদিত্যশূর কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ সিংহেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ** কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্–বিধৌত গৌড়নগরে আগমন করেন;–কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডুয়ার হোমদীঘি ও ধূমদীঘির তীরে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঘটককারিকা মতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। আদিশূর পৌণ্ড্রনগরে রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরের কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল না। যে সময়ে সেনরাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করেন, সেই সময়ের পূর্ববর্তী কোন ঘটককারিকা নাই। পরবর্তী কুলাচার্যগণ সেন রাজগণের বিক্রমপুরের রাজধানীকে বাড়াইবার জন্য তথায় সেনরাজগণের রাজধানী কল্পনা করিয়া, পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে সেই স্থানে আনিয়া প্রথম উপস্থিত করিয়াছেন ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য এসব বিষয়ে বিতর্ক একান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন আমরা সন্দিহান, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না তাহাই যখন নিরাকরণ হয় নাই, তখন কিংবদন্তী লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে না।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন– হর্ষ তাঁহার প্রাধান্যকালে সমুদয় বঙ্গদেশ, এমন কি কামরূপ বা আসাম, এবং সম্ভবত পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের উপরও তাঁহার প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল। হর্ষের মৃত্যুর পর স্থানীয় নৃপতিরা যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। বাঙলা দেশে বংশপরম্পরাগত এইরূপ জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বাঙলা দেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশীয়দের পূর্ব-পুরুষেরা আদিশূর নামক একজন নৃপতি কর্তৃক হিন্দু ধর্মের ও সমাজের সংস্কারের জন্য আনীত হন। কেননা সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই নৃপতি আদিশূর সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক বিবরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মনে হয় যে, যে আদিশূর নামে একজন নৃপতি সম্ভবত গৌড় ও তাহার কাছাকাছি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহারও কিছু পূর্বে রাজত্ব করেন। ** হরিমিশ্র এবং এড়ুমিশ্রের কারিকা অনুযায়ী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে– আদিশূর সম্ভবত পালরাজাদের অব্যবহিত-পূর্বে রাজত্ব করিতেন। পঞ্চ-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-পঞ্চকের আগমনের অল্প পরেই গৌড় পালরাজাদের করতলগত হয়। কাজেই আদিশূরকে পালরাজগণের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।[১]

** গৌড়ের ইতিহাস, ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

১. Up to date to authenitic account of Adisura has been obtained. The oldest writers on Brahmanical generalogy whose writings have come down to us-I refer particularly to Hari Misra and Eru Misra-place Adisura shortly before the Palas; and they state that shortly after the arrival of the five Brahmans from Kanauj, the kingdom of Gaur became subject to the Palas (U.C. Batavyal, in J.A.S.B. Part. I Vol. lviii (1894, p. 41).

Ranasura of Souhern Radha (the Burdwan Division) seems to have belonged to Sura dynasty of Bengal who are said to have brought the five Brahmanas from Kanaj. That they were disposed of the greater part of their dominions by the Palas is also asserted by the Bengal generalogists. *Ranasura* was one of the chiefs who helped Mahipal to repel the invasion of Rajendra Chola, king of Kanchi, about A.D. 1023. (H.P. Sastri, Mem A.S.B. Vol. iii (1910, p. 10). The site of the palace of Adisura is pointed out at the northern end of the ruins of Gaur. (E. India, Vol. III, 72).

কুলপঞ্জিকা ও আদিশূর

'গৌড়রাজ মালায়' রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বলেন :- "কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবেরকালের অনেক পরে রচিত। পরবর্তীকালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদান-ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থ নিচয়ে আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এ যাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক, এবং জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতিমাত্রই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয় এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।"

"এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতিহাসিকতা কতদূর। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিধিবদ্ধ আছে–

"আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্ ॥"

এখানে পাওয়া গেল,–আদিশূর ছিলেন (আসীৎ)। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা–

"জাতো বল্লালসেনো গুণি-গণিত স্তস্য দৌহিত্র-বংশে।"

"আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন [পঞ্চ-ব্রাহ্মণের পরিচয়] এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ ॥ তদন্তে কিছু কালানন্তর তত দহিত্রকুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লান সেন [বল্লাল সেন কর্তৃক কুল-মর্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগ] ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লাল সেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন, সুনহে বল্লাল সেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রান্ত দেশে বাস করি, আমারদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমারদিগের দেশ পবিত্র করি।"

"আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলী রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই

জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। "গৌড়-ব্রাহ্মণ"-কার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,-"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বর্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬/৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে ৩১/৩২/৩৩/৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে ঊর্ধ্বতন সমাজের লোক বিরল। বাৎস্যগোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্তমানকালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪/৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্বে [১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতঃ" [৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিংবদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের তিরুমলয়লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না।"[১]

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের মূল্য শীর্ষক" একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবত আরও করিবেন। [২৭ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা কার্তিক-১৩৪৬]

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের সঙ্কলিত কুলপঞ্জিকা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত। তাঁহার মতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে এবং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনের জন্য কুলগ্রন্থ জাল করা হইয়াছে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং, যে সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থের বহুল প্রচলন ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাহার পুঁথি আবিস্কৃত ও পরিচিত হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে- প্রধানত তিনি সেই সমুদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল কুলজী-শাস্ত্রের প্রধান যুগ বলিয়া মনে করি। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকখানি হস্তলিখিত কুলপঞ্জির পুঁথি আছে এবং গীতাচার্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নিকটও কতকগুলি পুঁথির সন্ধান মিলিবে। অন্যত্র প্রাচীন পুঁথি খুঁজিলে আরও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষত যে যে কুলপঞ্জীতে কুলীনগণের বংশ পরিচয় আছে তাহার সন্ধান বঙ্গদেশের নানা স্থানেই মিলে, তাহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ বিশেষ নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। জানিনা তাহা কতদূর সত্য।

আমাদের মনে হয় ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গীয়-কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া খুবই ভাল করিয়াছেন। তিনি আদিশূর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মহেশকৃত নির্দোষ কুলপঞ্জিকা আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠিকথা অনুসারে মহেশ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। কিন্তু ইহা সত্য কি না এবং সত্য হইলেও এই দুই মহেশ অভিন্ন কি-না এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি পুঁথি আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া

১. গৌড়রাজমালা, ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা।

মনে হয় না। এই গ্রন্থে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।"

আমরা আদিশূর সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। কুলগ্রন্থ এবং প্রচলিত জনপ্রবাদ ব্যতীত যখন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিস্কৃত হয় নাই, তখন এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিস্প্রয়োজন। গজারীগাছ সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা কে বলিতে পারে?

ময়নামতীর পুঁথি ও শ্রীবিক্রমপুর

ময়নামতীর পুঁথিতে, ময়নামতী ও রাজা গোপীচাঁদের গানে বিক্রমপুরের নাম রহিয়াছে। ময়নামতীর গান আনুমানিক ১১শ-১২শ শতাব্দীর বিরচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ময়নামতীর চারিদেশে চারিটি বাড়ি থাকার বিষয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। যথা :-

"অব্রেথা হইলে শিষ্যা খ্যেতীর উপর।
এক নাম রাখি জাব মেহ্লাকুল সহর ॥
আদ্ধামাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে ॥
নিজ মাটি আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে ॥
আর আছে আদ্ধামাটি তরফের দেশ।
ছাটি গ্রাম পূর্বমাটি জানিবা বিশেষ ॥

রামপালের পূর্বদিকস্থ গ্রাম পঞ্চসার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবিবাজার হইতে দক্ষিণে মাকুহাটির খাল পর্যন্ত ২৫ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া শ্রীবিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তি-চিহ্ন কতক বাহিরে কতক মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। এ সমুদয় কীর্তি-চিহ্ন হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীবিক্রমপুর একদিন সত্য-সত্যই বহু সৌধরাজি-সমাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে, নব নব আবিষ্কারের দ্বারা বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উজ্জ্বলতর হইবে।

পরিশিষ্ট [ক]

প্রথম অধ্যায় : বিক্রমপুর নামোৎপত্তি– "সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই পরগনার নাম "বিক্রমপুর" হয়। এমত কিম্বদন্তী যে, নৃপবর বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুত একথা অপ্রামাণিক বোধ হয় না, এখনও বজ্রযোগিনী, রামপাল, প্রভৃতি স্থানে সুরম্য হর্ম্যাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ আছে, যখন নৃপবল্লভ বিক্রমাদিত্য আগমন করেন তখন এস্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎ ছিল, পরে ক্রমোন্নতি সহকারে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণতা এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী স্রোতস্বতী, পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিম সীমা ফরিদপুর জেলা ও বড়বাজু পরগনা ও কতিপয় গ্রাম। সোমপ্রকাশ। ৩০শে মাঘ, ১২৭৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

মূল গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি :–কীর্তিনাশা– কানিংহাম বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চলের ঢাকা বিভাগের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন– "The chief town in this division was Bikrampur. This place is now to the north of the Ganges; but in former days, when the river flowed down the Dhaleswar Channel, *Bikrampur* was on the southern bank." এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক নদীর নামের সহিতই একটা না একটা কাহিনী জড়িত আছে। যেমন–করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির নামোৎপত্তির সহিত এক একটি গল্প আছে। কিন্তু কীর্তিনাশার সম্বন্ধে বলেন– There must also be some story attached to the *Kirtinasa* river or "Fame destroyer" but I failed to learn anything about it. It is said however, that the two cities of Sripur and Koteswar were destroyed by the Kirtinasa river, and if the name is not an old one it may refer to this event. It is the local name of the lower course of the Ganges, just above the junction of Meghna. Archaelogical survey of India Reports Vol. XV. Bihar & Bengal, page 146-147.

(b) The river system. p. 4-9 দ্রষ্টব্য–Final Report on the survey and settlement *operations in the District of Dacca,* 1910-1917, দ্রষ্টব্য। –মূল গ্রন্থ ১৮-১৯ পৃষ্ঠা। At the time of Major Rennell's survey in the years 1764-66, the *Padma* joined the *Meghna* at a point near *Mehendiganj* in the district of Bakarganj, more than 45 miles in a straight line south the present junction. In the year 1794 there is definite evidence to show, that it had joined the *Meghna in* close proximity to its present junction under the name of the river *Kirtinasa,* the name by which this part of the river is still know. There is a strong presumption that the change was due to the great floods of the river *Tista in* 1787, which finally drove the main waters of the *Brahmaputra* down the *Jamuna* channel. The Padma has shown a continuous tendency to cut

towards the north and east, as can be seen from a comprison of the new maps with those of Major Rennell, the revenue and the diara survey.* * In the 94 years that elapsed between the work of Major Rennell and that of the Revenue surveyors, the average "cut" of the river was 4 miles, in some places exceeding 10; in the 56 years that have elapsed since the revenue survey, the average "cut" has been 2 miles with a maximum of 5.* * At every attack, however, it should be noted that the mouth of the *Padma* moves further north. The action of the Padma is very violent; and changes in its banks are rapid."

ইছামতী নদী– ইছামতি বর্তমানে মরা নদী। বিগত ১৫০ দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহার গতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। F.D. Ascoli সাহেবের মতে–

* * "Probably an older course of the Ganges, it's course lies nearly due west and east, and is an indication of what may be the ultimate direction of the Padma. * * Originally the main drainage channel and water-supply of the area through which it flows, it has now become a source of danger and disease.

২১ পৃষ্ঠা :– খাল ও কূমের বিবরণ– নদী বা খালের বাঁকে প্রবল স্রোতের আঘাতে প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত যে গভীর খাত হয় তাহাকে 'কূম' বলে। কূপের ন্যায় গভীর হয় বলিয়াই বোধ হয় কূপ হইতে 'কূম' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। **হলদিয়ার কূম**– গ্রামের উত্তর দিকে খালের বাঁকে একটি গভীর খাত আছে; এটিকে কূমেরঘাট বলে।

২। **শ্রীনগরের কূম**– শ্রীনগরের খালে, থানার পূর্বদিক হইতে ঐ স্থানে প্রচুর বালুকা উত্থিত হইয়া এই কূমের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এখানে গভীর জল থাকে এবং প্রচুর মৎস্য থাকে।

২৫ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি :– বিল– জিয়াস বিল-শ্রীনগর থানার তন্তর ইউনিয়নের পাড়াগাঁয়ের পশ্চিম হইতে তারাটিয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিলের তীরে একটি হিজল গাছ আছে। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তেল, সিন্দুর দেয় এবং মানস করিয়া সিং-মৎস্য ও মোরগ ছাড়িয়া দেয়। কয়েক বৎসর যাবৎ কয়েকটি নূতন বিলের সৃষ্টি হইয়াছে- কাইলানীর বিল– রাড়িখালের দক্ষিণ হইতে মাওয়া পর্যন্ত অবস্থিত। পদ্মার নিকটবর্তী বলিয়া ইহা তাড়াতাড়ি ভরাট হইয়া যাইতেছে। ঘাটার বিল–দক্ষিণে আউটসাহী, উত্তরে কান্দাপাড়া, পূর্বে চান্সরী, পশ্চিমে কাইচাইল। ভাঙ্গনীর বিল– দক্ষিণে মালদা, উত্তরে ধীপুর, পূর্বে দশলং পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরী।

২৭ পৃষ্ঠা : ঢাকা জেলা বা বিক্রমপুর ধান চাষের জন্য বিখ্যাত নহে। বিক্রমপুর রামপালের কলার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে ঢাকা জেলায় একটি ছড়া প্রচলিত আছে। তাহা এই :–

ভাওয়ালের তাল, কাঠাল ব্যক্ত বহুদূর।
সোনারগ্রামেতে প্রচুর কাফুরি পান মিলে সুমধুর ॥

ইক্ষুগুড় মহেশ্বরদী চাঁদপ্রতাপ মহিষাদধি।
বিখ্যাত পূর্বাবধি কলা বিক্রমপুর ॥

[The number of plantains grown in Dacca is very great, especially in the neighbourhood of *Rampal* in Thana Munshiganj; where the plantain is grown as a field crop, peculiarity of this area. The number of varieties of plantain grown is very great, the most notabel being Agniswar, Amritasagar, Kanai Basi, Bhanguli, Nepali, Dudhsagar, Chini Campa, Martaban, Sabri and Kabri. The reddish coloured Agaiswar and the thick·skinned amritasagar with its peculiar flavour are the specialities of Rampal, and are sold at prices which occasionally exceed Rs. 4-8 per hundred.] * * By the end of the 18th century the best cotton was grown in Bikrampur. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুর কার্পাস চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল।

তালতলার খাল– Taltalakhal from the Dhaleswari to the Padma are *probably* partly artificial canal of ancient origin, but neither of them is now naviable throughout the year.

৩০ পৃষ্ঠা :– বিক্রমপুর পরগনা– The Parganas of Hazratpur and Isakabad lying on the route followed by the Mughal armies to Dacca are military grants and colonies, and the series of petty estates and ancient tenures-the same in origin, but only differing in the fortune of development-abounding in *Bikrampur* and the surroundings of Dacca constitute the gifts on the Nawab or the depredations of his couriers.* * * *Bikrampur pargana* was in existence at the time of Raja Todarmal's settlement in the sexteenth century with a revenue of Rs. 83,376. By 1728 the revenue had increased to Rs. 1,03,001, to decrease again in 1763 to Rs. 24,5654. This extraordinary decrease is partly accounted for by the carving out of two new *parganas*, Rajnagar and Baikunthapur, though it was not until the year 1777 that the latter was recognised as a separate fiscal unit. Pages 54-57, Final Report on the Survey and Settlement operations 1910-1917.

পথঘাট ও যাতায়াত– Of old road, however, now unused traces of many still to be found. In Bikrampur there are three running north and south-one from Wari north-wars, the other two, the *Mukutpur* and *Kachhkikata Darjas*, running east and west in the north of Bikrampur the remnants of *Badshahi* Rasta are still in places.

৩৮ পৃঃ তৃতীয় প্যারার– লুপ্ত বন্দরের আলোচনায় অধুনালুপ্ত ভোজগাঁও হাটের নাম উল্লেখযোগ্য; ইহা নৌকা বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট ছিল। এখন ইহা পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ধানকুনিয়াও একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মীরকাদিমে একটি ব্যাঙ্ক

আছে।

৩৯ পৃষ্ঠা– বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে বাঘরা বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ভাগ্যকুলের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে এবং বিক্রমপুরের শেষ উত্তর সীমা। বাঘরা পদ্মাতীরে অবস্থিত, এখানে কতকগুলি স্থায়ী দোকান আছে। প্রত্যহ বাজার মিলে। এখানে উৎকৃষ্ট খেজুরে-গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেরটিয়া– পদ্মার ভাঙ্গনে এই গ্রাম এখন পদ্মাতীরে অবস্থিত। মুন্সী উপাধিধারী দত্ত ভূম্যধিকারীগণ এই বাজারের স্থাপয়িতা। এখানে প্রত্যহ বাজার হয় এবং কয়েকখানা স্থায়ী দোকান আছে; তেওটিয়ার মঠ প্রসিদ্ধ।

কাটিয়াপাড়া– ভাগ্যকুলের মাইল খানেক উত্তরে অবস্থিত। প্রত্যহ বাজার মিলে, উৎকৃষ্ট খেজুরে-গুড় প্রস্তত্ হয়।

কামারগাঁও– কাটিয়াপাড়ার আরো উত্তরে প্রত্যহ বাজার হয়, উৎকৃষ্ট খেজুরে-গুড় হয়।

ঝাউটিয়া– নূতন বাজার। বিশ্বাস ভূম্যধিকারীগণ সিদ্ধেশ্বরী নামক পল্লীতে ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যহ বাজার মিলে। $\frac{১}{৪}$ মাইল উত্তরে। **দিঘলী–** বর্তমানে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র আছে। ভাগ্যকুলের রায় পরিবারেরা ইহার মালিক। এতদ্ব্যতীত কনকসার খরিয়া, হলদিয়া, সৈদপুর, বরাম, কুইচামোরা, বয়রাগাদী, কমলাঘাট, দোগাছি, চুরাইন, রুজদি, পুরা, কয়কীর্তন, বজ্রযোগিনী, ধানের খোলা প্রভৃতি স্থানে রীতিমত বাজার মিলিয়া থাকে এবং বিবিধ দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানি হইয়া থাকে। কমলাঘাট– ব্রহ্মদেশ হইতে আগত কাঠের কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়–৬১-৬৬ পৃষ্ঠা– জাতির পরিচয় বিস্তারিত ও ব্যবসায় ইত্যাদি সম্পর্কে 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। তবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানের জনসংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে :– It may be roughly stated that the rate of natural increase of the Muhammadan population is double that of the Hindus. তবে শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানার হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

[Hinduism is strongest in the south of the district, especially in thanas Munshiganj and Srinagar; in Srinagar only are the two religions found in equal.]

হাজার (১০০০) করা জন্ম-মৃত্যুর হার এইরূপ :–

থানা	**জন্মহার**	**মৃত্যুহার**	**হারের তারতম্য**
মুন্সীগঞ্জ	৩১	২৪	+ ৭
শ্রীনগর	৩৬	৩৪	+ ২

উত্তর বিক্রমপুরের জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানায়, বিশেষ শ্রীনগর থানার জনসংখ্যা এত বেশী যে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়। Mr. F.D. Ascoli তাঁহার কৃত Survey and settlement operations in the District of Dacca নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :–"The density of population varies considerably in different parts of the district (DACCA), from 2,061 per square mile in *than*a Srinagar to 526 in thana Kapasia; in Srinagar 1/6 of the *thana* is covered by an uninhabited *bil,* and the density of the population in the remaining area of approximately 150 square miles is 2,500 per square mile; in the *asali* portions of thana Munshiganj the densely populated rural area in the world. ইহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীনগর থানার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :- The very heavy increase in thana Srinagar; the most densely *populated rural tract in India,* is due very largely to the increase of cultivation on the borders of the Arial Bil; the increase in mainly Muhammadan and affects the *Bhadralok Hindu* classes to a small extent. This accounts for the fact that, while in Srinagar the population increased by 12 per cent, in the decade previous to 1911, the increase in Munshiganj, a kinddred area, amounted to only 7 per cent, in the same period.

পরিশিষ্ট [খ]

বিক্রমপুরের পুষ্করিণী ও দীঘি– সার্ভে ও সেটেলমেন্ট হইতে জানিতে পারি–

"In the area of Srinagar and Munshiganj *thanas* surveyed in 1911-12,an area of approximately 200 square miles, no fewer than 13,629 tanks were recorded covering an area of 8 1/2 square miles; tanks averaged 608 to the square mile or nearly one to the acre, one twenty-fourth of the whole area being covered by tanks. It may be imagined that this indicates a liberal water-supply, but this is not the case. The *majority* of the tanks are of great antiquity. Many of them no doubt were excavated as acts of charity, but the charitable intentions of the excavator have not been imitated by the successors in interest; many of them are completely dried up; a large number are overgrown with grass and noxious weeds; there is hardly a single one maintained in a clean and sanitary condition. A few of the tanks are very extensive, the famous *dighı* of Rampal covering an area of 35.64 acres, but the majority of the tanks are extremely small, the average size being one-third of an acre. page 97.

চতুর্থ অধ্যায়– দীপঙ্কর সম্বন্ধে বাঙলার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি নিজ নিজ গ্রন্থে দীপঙ্কর সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন:– "সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয়; ইঁহার নাম বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত। * * শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয় তিব্বত হইতে দীপঙ্করের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে, বজ্রাসনের পূর্বস্থিত বিক্রমপুরে বৌদ্ধগুরু দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি দ্বাদশবর্ষকাল "বজ্রাসন বিহারে" অধ্যয়ন করেন। * * বুদ্ধগয়ায় যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন তাহাকেও সেকালে বজ্রাসন বলিত, কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহা এতদূরে অবস্থিত যে, "বাজাসনের পূর্বস্থিত বিক্রমপুর" বলিয়া বিক্রমপুরের পরিচয়ে যে বাজাসনের উল্লেখ তাহা যে বুদ্ধগয়ার সন্নিহিত বাজাসন তাহা মনে হয় না। যে বাজাসন হইতে বিক্রমপুর মাত্র ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই বাজাসনের অস্তিত্ব না জানিয়াই রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল–

"In my *Indian Padits in the Land of Snow* I remember to have alluded to a place cllaed Vajrasana lying to the west of the *Vikrampura*, the birth

place of Dipankara Srijnana, the famous Atisa of Tibet. Had I then any knowledge of the existence of any locality called *Vajasana* close to Vikrampur, I would hardly have conjectured that *Vajasana* to have been Gaya and not *Bajasana. Bajasana* is evidently a corruption of the name *Vajrasana.* In the mounds of Bajasana, it is said 'their existed ruins of a Buddhist 'Bihar' of old and there Atisa must have got his early education."

অর্থাৎ, যদি বিক্রমপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমস্থিত বাজাসন নামক স্থানের অস্তিত্ব আমি জানিতাম, তবে কখনই আমার ইণ্ডিয়ান পণ্ডিতস্ ইন দি ল্যাণ্ড অব্ স্নো নামক পুস্তকে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া বিক্রমপুরের পশ্চিমস্থিত বাজাসনের উল্লেখ না করিয়া বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিতাম না। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি এই বাজাসনের স্তূপেই একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল এবং দীপঙ্কর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।" ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান। প্রবাসী–আষাঢ়, ১৩১৯ [১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা]।

পঞ্চম অধ্যায়– ১৮৩ পৃষ্ঠা–শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। চন্দ্রবংশের চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনখানি ১৯২৫ সালে ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই তাম্রফলকখানিও বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। রামপাল এবং কেদারপুর শাসনখানির ন্যায় এই খানিও উভয় দিকেই খোদিত-লিপি সংযুক্ত। শীর্ষদেশে ধর্মচক্রমুদ্রা রহিয়াছে। লিপিখানিতে মোট ৪৭ পংক্তি খোদিত অক্ষর রহিয়াছে।

সম্মুখ পৃষ্ঠার ২৩ পংক্তি বিপরীত পৃষ্ঠার ২৪ পংক্তি। বন্দ্যো জিন স্ম ভগবান্ ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। লিপিখানি (৪৬) পংক্তি রাজত্বের ৩৫ বৎসর ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই শাসনখানি হইতে জানা যায় পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার এতৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :–

(1) In the village of Durvvapattra in Vallimundamandala situated in Khediravavalli-Vishaya 4, halas. (2) In Loniyajodaprastara (Prantara ?)-3 halas. (3) In Tıvarvilli village-2 halas. (4) In the village of Parkadimunda in Yolamandala in Ikkadasivishaya-2 halas and 6 dronas. (5) In the village of Malahpatra (?) 7 halas : thus in all (?) halas and 6 dronas (lines 20-23).

This land was granted by king Srichandra in the name of *Buddhabhattaraka* (line 37) to the *Santivarika Vyasagangasarmman* who belonged to the Varddhakausika *gotra and the Pravrra* of the three Rishis, and was a student of the *Kanvasakha.* He was a son of Vibhuganag, grandson of *Nandaganga* and greatgrandson of Jayganga. The gift was made on account of his having conducted the *Adbhutsanti* ceremony on the occasion

of the performance of the Four Homas (lines 33 to 36). The seal *Dharmmachakramudra,* attached to the copper plate, is mentioned in line 38.

"It should be noted that like the Rampal copperplate this one also was granted in favour of *Santivarika,* or 'the priest in charge of propitiatory *rites.'* The former gift was made on the occasion of Kotihoma ceremony; and the latter on performance of a certain propitiatory rite called *Adbhut Santi,* during the *Hamachatushtaya* or the Four Hoams. That a Buddhist like Srichandras could take active part in Brahmanical observances of this nature is a fact of paramount *inierest for the history* of Buddhism in Northern India during the Pala period. Inscriptions of Bengal Appendices 165-166. N.G. Majumdar M.A.

২০২০৪ পৃষ্ঠাঃ সিংহপুর– সিংহপুরের অবস্থান সম্বন্ধে গ্রন্থ-মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সিংহপুরকে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সিংহপুর বা সিংহপুরকে [Sihapura] 'মহাবংশে উল্লিখিত রাঢ়ার অন্তর্গত স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এই মতাবলম্বী।

আমরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি যে, রাঢ়া এবং বঙ্গ পাল রাজাদের অন্তর্ভূত ছিল কিনা। তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দী হইতে পাল রাজাদের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ঐ সময়েই বঙ্গে বিক্রমপুরে এবং পশ্চিমবঙ্গে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। প্রথম মহীপালের সময়ই পাল রাজাদের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা অনুভূত হয়। কৈবর্ত-বিদ্রোহের সময়ই সম্ভবত বর্ম-নৃপতিরা পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তবে পাল নৃপতিরা রাঢ়া ও বঙ্গ রাজ্যের উপর আপনাদের প্রভুত্ব বিশেষ করিয়া উত্তর বঙ্গে এবং বিহারে প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। তাঁহাদের প্রদত্ত প্রায় সমুদয় খোদিত লিপিই মগধ এবং বারেন্দ্র হইতেই পাওয়া গিয়াছে। বর্ম-নৃপতিরা, কম্বোজ-নৃপতিরা এবং সেন-নৃপতিরা প্রথমে রাঢ় অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গ এবং রাঢ়ের স্বাধীন-নৃপতিরা পাল নৃপতিদিগকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই প্রবাসী হইয়াছেন। –The History of North-Eastern India, by Dr. R. G. Basak. The Early History of Bengal by Pramode Lal Paul M. A. বাঙ্গালার ইতিহাস– প্রথম ভাগ, 'ঢাকার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড; গৌড়ের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট [গ]

বিজয়সেন শ্রীবিক্রমপুর–২৪১-২৫১ পৃষ্ঠা
বিজয়সেনের দেবপাড়া লিপি
মূল প্রশস্তি ও ইহার বঙ্গানুবাদ

ওঁ নমঃ শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলি-

মাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।

দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাবি–

র্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ ॥ ১ ॥

১। স্বামী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হরণ করিবেন এই ভয়ে মস্তকস্থিত মাল্যগুচ্ছদ্বারা রমণ-ভবনের প্রদীপ-জ্যোতিঃ (যিনি) নির্বাপিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দেবীর (পার্বতীর) লজ্জামুকুলিত মুখ (মস্তকস্থিত) চন্দ্রের আলোকে নিরীক্ষণ করিয়া (পঞ্চমুখ) শম্ভুর সহাস্য বদনাবলী জয়যুক্ত হউক।

লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজদয়িতয়োরদ্বৈত-লীলাগৃহং

প্রদ্যুম্নেশ্বর-শব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে ॥

যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো–

র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেহন্তরায়ঃ কৃতঃ ॥ ২ ॥

২। লক্ষ্মীপতি (হরি) ও পর্বত-পতি (হরের) অদ্বৈত-লীলার গৃহস্বরূপ 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' নামে প্রখ্যাত এই অধিষ্ঠানকে (দেবনিবাস বা দেবমূর্তিকে) নমস্কার করিতেছি, যাহাতে দেবীদ্বয় স্ব-স্ব কান্তের বা স্বামীর আলিঙ্গন ভঙ্গ হইবে এই কাতরতায় তাঁহাদের মধ্যবর্তিনী থাকিয়া কোনও প্রকারে তাঁহাদের এক-শরীরতার নির্মাণ বিষয়ে বিঘ্ন বিধান করিতেছেন।

যৎ-সিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং

গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।

শ্বেতোৎফুল্ল-ফণাঞ্চলঃ শিব-শিবঃসন্দানদামোরগ–

শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥ ৩ ॥

৩। মহাদেবের কনক-প্রায় জটামণ্ডল যে রাজার সিংহাসন, গঙ্গার শীকর-মঞ্জরী-সমূহদ্বারা যাঁহার চামর-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং শ্বেতবর্ণের উৎফুল্ল বা সুবিস্তৃত ফণাপ্রান্ত-বিশিষ্ট শিবমস্তকের বেষ্টন-মাল্য-রূপী সর্প যাঁহার ছত্র– সেই আদি রাজা অমৃত-কিরণ (চন্দ্রদেব) জয়লাভ করুন।

বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-

ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।

যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ

পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥ ৪ ॥

৪। দেবস্ত্রীগণের সহিত সম্পাদিত রতিকলার সাক্ষীভূত সেই চন্দ্রদেবের বংশে, চতুর্দিকে কীর্তিমান্ বীরসেন-প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরাশর-তনয় (ব্যাসদেব) বিশ্বজনের কর্ণ পরিসরের প্রীতির জন্য যাঁহাদের চরিত্রকথার সতত স্মরণের পরিচয় হেতু পবিত্র সূক্তিমধুধারা রচনা করিয়াছেন।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী

স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম-সামন্তসেনঃ।

উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ

কচ্ছান্তেষবপ্সরোভি র্দশরথতনয়-স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ ॥ ৫ ॥

৫। শত শত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোদ্ধার উন্মূল করিয়া পারদর্শী, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণের কুলশেখর, সামন্তসেন নামক ব্যক্তি সেই সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন- দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের তুলনায় যাঁহার যুদ্ধগাথা, সেতুবন্ধের স্খলদ্জলধিজলের উত্তালতরঙ্গ-সম্পর্কে শীতল কচ্ছপ্রদেশসমূহে, অপসরোগণ-কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত।

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটতূর্য্যোপহূতদ্বিষ-

দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।

দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটা-বিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী-

মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥ ৬ ॥

৬। যে যুদ্ধ-চত্বরে পটুনিনাদশীল তূর্য্যের (ধ্বনিতে) শত্রুবর্গকে আহ্বান করিয়া তিনি (সামন্তসেন) নিজ পাণিদ্বারা কৃপাণরূপ কালসর্পকে খেলাইতেন। সেই (যুদ্ধচত্বর) অদ্যাপি দ্বিধাচ্ছিন্ন শত্রু-গজঘটার বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থল হইতে বিনির্গত স্থূল বরাটিকাসদৃশ মুক্তাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-

দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।

গিরেগিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়ধে-

র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্টলগ্নং যশঃ ॥ ৭ ॥

৭। শত্রু বনিতাদিগের সরক-পৃষ্ঠে (গমনাগমনের অবিচ্ছিন্ন পংক্তিতে) সংলগ্ন হইয়া যদীয় যশঃ গৃহ হইতে গৃহে উপস্থিত হইতে, (পত্তন) নগর হইতে নগরে চলিয়া যাইত, বন হইতে বনে দৌড়াইত, পাদপ হইতে পাদপে ভ্রমণ করিত, গিনি হইতে গিরিতে আশ্রয়ে লইত এবং সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তর পার হইয়া যাইত। .

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ-কর্ণ্নটলক্ষ্মী-

লুণ্টাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।

যস্মাদাদ্যাপ্য বিহিতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজনিত ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥ ৮ ॥

৮। একাঙ্গীর (অ-চতুরঙ্গবলান্বিত) অর্থাৎ, অসহায় বীর (সামন্ত সেন) অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটরাজলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণের এরূপ বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রেতভর্ত্তা (কৃতান্ত) হর্ষান্বিত পুরবাসীগণ সহ অদ্য পর্যন্ত বাস, মাংস ও মেদঃপিণ্ডের অনিঃশেষিত ভাণ্ডারযুক্ত দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

উদ্গান্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন-বৈখানস-স্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত-ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভাস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরাণ্যপুল্যাশ্রমণি ॥ ৯ ॥

৯। যে স্থানগুলি আজ্যধূমে সুগন্ধ, যেখানে মৃগশিশুরা অখেদযুক্ত বৈখানস-স্ত্রীগণের স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদ করিত, যেখানে কীর (শুক) পক্ষিগণ বেদপারায়ণে অভ্যস্ত থাকিত এবং যেখানে প্রান্তপ্রদেশগুলি ভবভয়তিরস্কারী মস্করীন্দ্রগণদ্বারা (সন্ন্যাসীগণদ্বারা) পরিপূর্ণ থাকিত, গঙ্গার পুলিনপরিসরের অরণ্যে অবস্থিত সেই পুণ্যাশ্রমসমূহ তিনি (সামন্তসেন) শেষ বয়সে আশ্রয় করিয়াছিল।

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীস্মাদমুস্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কঃ বীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণিক্তবত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥ ১০ ॥

১০। আদ্য পরমাত্মার জ্ঞানবশত (লোকের) ভয়োৎপাদক সেই (সামন্তসেন) হইতে, নিজবাহুদর্পে শক্ত শত্রুকুলের ধ্বংসসাধনে প্রখ্যাত বীর, নিরন্তরবিকাশী নির্মল সর্ব-প্রকার গুণনিবহের মাহাত্ম্য-গৃহস্বরূপ, হেমন্তসেন-নামক ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়াছেন।

মুর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দু চূড়ামণি-চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবি বুজয়োঃ ক্রুরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরস্রক্কনকবলয়মপ্যস্য ভৃত্যাঙ্গনানাম্ ॥ ১১ ॥

১১। অর্দ্ধেন্দুশেখর (মহাদেবের) চরণধূলি যাঁহার মস্তকে, সত্যবাক্য যাঁহার কর্ণভিত্তিতে, শাস্ত্রকথা যাঁহার কর্ণে, (পদানত) শত্রুর কেশগুচ্ছ যাঁহার পদভূমিতে, কর্কশ জ্যাঘাতের কিণ-চিহ্ন যাঁহার ভুজদ্বয়ে— এইগুলিই কেবল সর্বদা যাঁহার ভূষণরূপে পরিগণিত হইত, (হেমন্তসেনের) সেবকজনের রমণীদিগের, কিন্তু, (মস্তকে) রত্নপুষ্পসমূহ, (কর্ণভিত্তিতে) হারাবলী, (কর্ণে) কর্ণপুর, (পদস্থলে) নূপুরমালা এবং (ভুজদ্বয়ে) কনকবলয় (ভূষণরূপে) শোভমান ছিল।

যদ্দোর্ব্বল্লিবিলাস-লব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্ব্বিদীর্ণৈরিসাং
বীরাণাং রণতীর্থ বৈভববলাদ্দিব্যং বপুর্ব্বিভ্রতাম্।
সংসক্তামরকামিনীস্তনটীকাশ্মীর পত্রাঙ্কিতং।
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতম্ ॥ ১২ ॥

১২। যাঁহার বাহুবল্লীর বিলাসে উৎক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা বিদীর্ণবক্ষাঃ বীরগণ রণতীর্থের মাহাত্ম্যবশত দিব্য শরীর ধারণ করিয়া (স্বর্গে) অনুরাগবর্তী দেবকামিনীগণের স্তনতটে শোভিত কুঙ্কুমপত্রের রক্তিমায় নিজ নিজ বক্ষস্থল অঙ্কিত করিলে পর, মুগ্ধ সিদ্ধমিথুনগণ পূর্বের ন্যায় (রক্তাঙ্কিত মনে করিয়া) ইঁহার প্রতি আতঙ্কের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
রেতস্যৈতনসেশ্চ কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতম্।
শত্রোঃ কোপিদধে-বসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদৎ ব্যধা
দেকো হারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাম্ ॥ ১৩ ॥

১৩। সম্মুখে সহাস্য বদন ধারণ করিয়া প্রত্যর্থিবর্গের (রাজপক্ষে প্রার্থয়িতাদের, আর অসিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীদের) ব্যয়রূপ (রাজপক্ষে অর্থব্যয়রূপ, আর অসিপক্ষে বিনাশ-রূপ) ক্রীড়া করিবার সময়ে, এই ব্যক্তির (হেমন্ত সেনের) ও তাঁহার অসির (এই উভয় বস্তুর) দান বিষয়ে (একতঃ দান করা কার্যে, অন্যতঃ ছেদন কার্যে) অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হইত। এক বস্তু (তদীয় অসি) শত্রুর অবসাদ বিধান করিত ও অপর বস্তু (হেমন্ত সেন স্বয়ং) মিত্রের প্রসাদ বিধান করিতেন; আবার এক বস্তু (তিনি নিজে) সুহৃদ্বর্গের হার উপহার দিতেন ও অন্য বস্তু (তদীয় অসি) অরাতিকুলের প্রহার উপহার দিত।

মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূঃ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাক ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥ ১৪ ॥

১৪। যাঁহার চরণযুগল নিজের ও পরের সমগ্র অন্তঃপুরস্থিত বধূগণের শিরোরত্ন শ্রেণীর কিরণপুঞ্জে রঞ্জিত হইয়া সহাস্যবৎ প্রতীয়মান হইত, কান্তির আধার যিনি সাধ্বীব্রত দ্বারা নিত্যোজ্জ্বল যশোরাশি বিস্তার করিতেন, ত্রিলোকসুন্দরাকৃতি সেই যশোদেবী নামক দেবী তাঁহার (হেমন্ত সেনের) মহারাজ্ঞী ছিলেন।

ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো-
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বল-কুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধিমেখলাবলযসীমবিশ্বম্ভরা-
বিশিষ্টজয়সাম্বয়ো বিজয়সেন-পৃথ্বীপতিঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। যাঁহার কুমার-কেলি-ক্রিয়া শত্রুবলের উচ্ছেদসাধনে জাজ্জল্যমান থাকিত এবং যিনি চতুঃসমুদ্র-মেখলাবলয়বেষ্টিত পৃথিবীর বিশিষ্ট জয়লাভ করিয়া সার্থকনামা

হইয়াছিলেন, সেই বিজয়সেন ভূপতি সেই (ত্রিজগদীশ্বর হেমন্তসেন) ও সেই দেবী (যশোদেবী) হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

গণয়তু গণশ= কো ভূপতীংস্তানননেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। প্রতিদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কত কত ভূপতিকে পরাজিত বা নিহত করিযাছিলেন, কে তাহা গনে গণে গণনা করিতে সমর্থ? তিনি এই জগতে তদীয় নিজ বংশের পূর্ব (প্রথম) পুরুষ বলিয়া একমাত্র চন্দ্রেই রাজশব্দের প্রয়োগ সহ্য করিতেন।

সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমুনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভূজামাত্রসং যেনার্জ্জিতং।
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। যিনি একমাত্র অসিলতাবিভূষিত ভুজমাত্রের সাহায্যে সপ্তসমুদ্রতটবেষ্টিত বসুধাচক্রের ঐকরাজ্যরূপ ফল অর্জন করিয়াছিলেন- সেই শত্রুবিজেতা (বিজয়সেনের) তুলনা কি অসংখ্য বানরসেনার অধিনায়ক রামচন্দ্রের সহিত, কিংবা পাণ্ডবসেনাপতি পার্থের (অর্জুনের) সহিত করা যাইতে পারে?

একৈকেন যৈঃ গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতীর্থে ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থানপুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮ ॥

১৮। যে তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) কেবল এক একটি গুণবশত পরিণাম (স্বস্বকার্যে উন্নতি) লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিনা বিবেচনায়, এক দেবতা (শিব) কেবল সমগ্র জগতের নাশ কার্য, এক দেবতা (বিষ্ণু) কেবল ইহার রক্ষাকার্য ও অপর দেবতা (ব্রহ্মা) কেবল ইহার সৃষ্টিকার্য পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু, গুণবাহুল্যে দেবরূপে পরিণত হইয়া এই ব্যক্তি (বিজয়সেন) ধী বা বিবেচনা সহকারে অরাতির বিনাশ, সমাজমর্যাদার অনুল্লঙ্ঘনকারীদের পোষণ ও শত্রুচ্ছেদ করিয়া দিব্য (স্বর্গীয়) প্রজার সৃষ্টি, এই তিন কার্যই (একসঙ্গে) সম্পন্ন করিতেন।

দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুর্ব্বীকুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্‌লিপিলাঞ্ছিতোহসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ ॥ ১৯ ॥

১৯। এই নরপতি ইতিপূর্বেই প্রতিদ্বন্দ্বীরাজগণকে দিব্য ভূমি (স্বর্গ) দান করিয়া (অর্থাৎ, তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়া, (তৎপরিবর্তে) তাঁহাদের ভূমি নিজে অধিকার করিয়া, বীররক্তে (লিখিত) লিপিদ্বারা লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত তদীয় অসিকে শাসন বা পত্ররূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি তাহাই না হইত, তবে কেন তিনি আকৃষ্ট-কৃপাণ-ধারী হইয়া (অগ্রসর হইলে), বসুমতীর ভোগবিষয়ে বিবাদোন্মুখ শত্রুসন্তানগণ পলায়ণ-পর হইয়া যাইবে?

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং

শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়-নিগূঢ়- রোষঃ।

গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ-

ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥ ২০ ॥

২০। "তুমি নান্য-বীর-বিজয়ী" (অর্থাৎ, নান্য ও বীর নামক রাজদ্বয়ের পরাজয়কারী) কবিগণের এই (স্তুতি) বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ অন্যথা ভাবিয়া (অর্থাৎ, "তুমি ন-অন্যবরি-বিজয়ী বা অন্য বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও নাই" এরূপ নিন্দাবাক্য মনে করিয়া) মনে রোষভাব লুক্কায়িত করিয়া তিনি গৌড়েন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপ ভূপতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নরপতিকে বলপূর্বক পরাজিত করিয়াছিলেন।

শূরংমন্য ইবাসি নান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে

স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।

ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং

যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ ॥ ২১ ॥

২১। 'হে নান্য, যেন এখনও তুমি নিজকে শূর মনে করিতেছ', 'হে রাঘব, এখানে কেন নিজের শ্লাঘা করিতেছ', 'হে বর্ধন, 'স্পর্ধা ত্যাগ কর', 'হে বীর, অদ্যাপি তোমার দর্প বিরামলাভ করিতেছে না'- এইরূপে (কারারুদ্ধ) রাজগণের পরস্পরের প্রতি দিবারাত্রি প্রজল্পিত কোলাহলদ্বারা তাঁহার (বিজয়সেনের) কারাগারের যামিক বা প্রহরিগণ নিদ্রাচ্ছেদজনিত ক্লান্তির উপশম করিয়া লইত।

পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাব-

দ্গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।

ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক-

লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥ ২২ ॥

২২। যাঁহার নৌবিতান (নৌ-বহর) পাশ্চাত্য (রাজ) চক্রের জয়রূপ কেলি-ক্রিয়াতে গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করিলে পর, শিবের মস্তকস্থিত নদীর (গঙ্গার) পানিতে ভস্ম-পঙ্কে লগ্ন হইয়া পরিত্যক্ত ইন্দুকলার ন্যায় তরীসমূহ শোভা পাইতেছিল।

মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু-

পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্।

কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্ ॥ ২৩ ॥

২৩। যাঁহার দানানুগ্রহে বহুবিভবভোগকারী শ্রোত্রিয়দিগের পত্নীগণকে নাগরিক স্ত্রীরা কর্পাসবীজদ্বারা মুক্তার, শাকপত্রদ্বারা মরকতমণিখণ্ডের, অলাবুপুষ্পদ্বারা রৌপ্যের, পরিপক্ব হইয়া স্ফুটনোন্মুখ দাড়িমকুক্ষি দ্বারা (অর্থাৎ, দাড়িমের অন্তঃস্থিত বীজদ্বারা) রত্নের এবং কুষ্মাণ্ডীলতার বিকসিত কুসুমদ্বারা সুবর্ণের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপ-
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোপি ধর্ম্মঃ ॥ ২৪ ॥

২৪। কালক্রমে (কলিকালে) ধর্ম একপদবিশিষ্ট হইলেও, যাঁহার (বিজয় সেনের) প্রভাবে সতত প্রদত্ত যজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীকে তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন।

মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গর্গস্য মর্ত্তস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মিভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। যিনি যজ্ঞকারী হইয়া (যুদ্ধে তাঁহার ভুজবলে) আহত শত্রু দ্বারা পূর্ণতট মেরু-পর্বত হইতে দেবগণকে (পৃথিবীতে) আহবান করিযা স্বর্গের ও মর্ত্যের পুরবাসীগণের স্থান-বিনিময় বিধান করিয়াছিলেন; এবং যিনি অত্যুচ্চ দেবভবনও বিস্তৃত তল্ল বা তড়াগ দ্বারা কৃতাবশেষ স্বর্গ ও পৃথিবীর দেহকে পরস্পরের সমান (পরিমিত) করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দিক্‌শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীপং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ সৌধমচ্চৈঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। সেই পৃথ্বীন্দ্র (বিজয়সেন) প্রদ্যুম্নেশ্বরের জন্য দিক্‌শাখার মূলকাণ্ডস্বরূপ, গগনতলরূপ মহাসাগরের মধ্যস্থিত অন্তরীপতুল্য, পূর্ব-পশ্চিম-পর্বতে অবস্থান করিয়া উদয় ও অস্তলাভকারী সূর্যদেবের মধ্যাহ্নপর্বতসদৃশ, ত্রিভুবনরূপ ভবনের একমাত্র আশ্রয়স্তম্ভ ও গিরিসমূহের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট পর্বতরূপী এক উচ্চ সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বা নিরুদ্ধো মুধা
ভানোদ্যাপি কৃতোহস্তি দক্ষিণাদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।

অন্যামুচ্ছপথোয়মৃচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥ ২৭ ॥

২৭। হে সূর্যদেব, এই প্রাসাদ দ্বারাই তোমার (রথের) অশ্বগণের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, তবে কেন অদ্যাপি বৃথাই (অগস্ত্য) মুনি দক্ষিণ দিকের এক কোণে বাস করিতেছেন? তিনি যদি তাঁহার শপথ ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিন্ধ্যপর্বতও যদি যথাশক্তি বর্ধিত হয়, তথাপি (সেই বর্ধিষ্যমান বিন্ধ্য) এই সৌধের উচ্চপথ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না।

স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে
সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্
সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥ ২৮ ॥

২৮। প্রজাপতি স্বয়ং যদি পৃথিবীরূপ চক্রের উপর সুমেরু পর্বতরূপ মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়া তদ্বিবর্তন বা তদঘূর্ণন দ্বারা (একটি ঘট) নির্মাণ করেন, তাহা হইলে সেই ঘটই এই সৌধে তদ্বারা (বিজয়সেন দ্বারা) অর্পিত সুবর্ণকুম্ভের একমাত্র উপমান হইতে পারে।

বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর–
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপুরং পুরঃ।
চখান পূরবৈরিণঃ স জলমগ্নপৌরাঙ্গনা–
স্তনৈণমদসৌরভোচ্চলিতচঞ্চরীকং সরঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। তিনি ত্রিপুরারি (শিবের) জন্য (সেই সৌধের) সম্মুখে একটি সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন– যে সরোবরের জলৌঘ (জলান্তবর্তিনী) নাগবধূদিগের মুকুটাগ্রের রত্নাঙ্কুর হইতে স্ফুরন্ত কিরণমঞ্জরীদ্বারা রঞ্জিত ছিল এবং যাহার উপরিভাগে (স্নানার্থ) জলমগ্ন পৌর রমণীদিগের স্তনতটে ব্যবহৃত মৃগদের সৌরভে ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইত।

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজোস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরনে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

৩০। (শিব) দিগম্বর (নগ্ন) হইলেও তাঁহার জন্য নানা বর্ণাকৃতি বসনের, অর্ধ-নারীশ্বর হইলেও তাঁহার জন্য রত্নালঙ্কারে শরীরশোভাবর্ধনকারিণী একশত সুভ্রূ রমণী (সেবাদাসী), শ্মশানবাসী হইলেও তাঁহার জন্য পৌরজনপরিপূর্ণ অনেক পুরী এবং ভিক্ষাজীবী হইলেও তাঁহার জন্য অক্ষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন– যেহেতু সেনবংশীয়গণ সবিশেষ জানেন কেমন করিয়া দরিদ্রভরণ করিতে হয়।

চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মা করমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।

বেষস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতাগোনসঃ কান্তমুক্তা-

নেপথ্য-ব্রহ্মিরিচ্ছাসমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য ॥ ৩১ ॥

৩১। তিনি (বিজয় সেন) এই কল্পকাপালিক (শিবের) জন্য এইরূপ স্বেচ্ছারচিত বেশের ব্যবস্থা করিলেন, যে বেশে বিচিত্র ক্ষৌমবস্ত্র গজচর্মের, বক্ষঃস্থলবিনিহিত স্থূলহার সর্পরাজের, চন্দনচূর্ণ ভস্মের, করধৃত মহানীলমণি অক্ষমালার, গরুড়মণি-(মরকত)-লতা (অন্যান্য) সর্পসমূহের এবং রমণীয় মুক্তাভূষণ নরকপালের, কার্য সম্পাদন করিত।

বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং

কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনেহিতম্।

কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং

স্বং সাযুজ্যমসাবপশ্চিমদশাশেষে পুনর্দ্দাস্যতি ॥ ৩২ ॥

৩২। বাহুদ্বয়ের কেলি দ্বারা তিনি পৃথিবীতলে একচ্ছত্রাধিপত্য স্বয়ং বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আর অন্য কিছু করণীয় অবশিষ্ট রহিল না। প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানকারী চন্দ্রশেখর (শিব) তাঁহাকে আর কি দেবেন? কিন্তু তিনি অন্তিম দশার শেষে তাঁহাকে নিজ সাযুজ্য (মুক্তি) প্রদান করিবেন।

প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ

প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।

তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন

বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে বাল্মীকি অথবা পরাশরতনয় ব্যাসদেবই তাঁহার চরিতের স্তুতি সম্পূর্ণভাবে করিতে সমর্থ হইবেন। তবে তাঁহার কীর্তি রাশিরূপ সুরনদীতে (গঙ্গাতে) অবগাহনদ্বারা নিজের বাণীকে পবিত্র করার জন্য এই বিষয়ে (এই প্রশস্তি রচনায়) আমাদের প্রযত্ন।

যাবদ্বাস্তোস্পতিপুরধুনী ভূর্ভুবঃস্বঃ পুনীতে

যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।

যাবচ্চেতো গময়তি সতাং শ্বেতিমানং ত্রিবেদী

তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তত্তদেবাস্য কীর্ত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। যতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রপুরীর (স্বর্গের) নদী (মন্দাকিনী) ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক পবিত্রিত করিবে, যতদিন পর্যন্ত চান্দ্রমসী কলা ভূতভরণকারী শিবের শিরোভূষণের কার্য করিবে, এবং যতদিন পর্যন্ত বেদত্রয় পণ্ডিতজনের চিত্তে শুদ্ধি আনয়ন করিবে– ততদিন পর্যন্ত ইহাদের (অর্থাৎ স্বর্গগঙ্গা চন্দ্রকলা ও ত্রিবেদীর) সখীরূপে এই (রাজার) কীর্তিই সেই সেই ক্রিয়া (অর্থাৎ, ত্রিলোক পবিত্রকরণ, শিবশিরোভূষণ ও পণ্ডিতগণের চিত্তসংশোধন) বিধান করুক।

নির্ণ্ণিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা-

মগ্রন্থিলগ্রথনপল্বলসূত্রবল্লিঃ।

এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধঃ-

বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৫। এই প্রশস্তি পদ ও পদার্থের বিচার দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি কবি উমাপতিধরের রচনা- ইহা যেন নিষ্কলঙ্ক সেনকুলভূপতিগণরূপ মুক্তাসমূহের গ্রন্থিরহিত গ্রথনকার্যের একটি মসৃণ সূত্রবল্লী।

ধর্ম্মপ্রণপ্তা মনদাসনপ্তা

বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিম্।

চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী-

চূড়ামণী রাণক-শূলপাণিঃ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। ধর্মের প্রণপ্তা, মনদাসের নপ্তা, বৃহস্পতির পুত্র, বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠীর চূড়ামণি রাণক (উপাধিধারী) শূলপাণি এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা-২৩৬। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকোর নামক গ্রামের মনসা-মূর্তি-খোদিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভের গাত্রে...রাজেন শ্রীবিজয় সে (সেন) খোদিত লিপি আছে। এই লিপির প্রথম অংশের ও শেষ দিকের কতকটা অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। [হেতমপুরের কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী প্রণীত "বীরভূমের বিবরণ" দ্বিতীয় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা। (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ)] Mr. K. N. Dikshit...annual report of the Archaeological survey of India, 1921-22 pp. 78-79; and 80 and PL XXVIII, b. N. G Majumdar M.A. Inscriptions of Bengal. Vol. III. page 167.

বিজয়সেনের তাম্রশাসন-বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্তী স্থানে এই তাম্রশাসনখানি পাওয়া যায়। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে ইহার সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। ১৯২০ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় *Epigraphia Indica,* Vol. XV. p.p 278-এ ইহার একটি পাঠ প্রকাশ করেন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক 'সাহিত্য' পত্রিকার ৩১শ বর্ষের (১৩২৮ বাঙলা সালে) ৮১ পৃষ্ঠায় ইহার পাঠ প্রকাশ করেন। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় Inscriptions of Bengal Vol. Page, 57-67 পৃষ্ঠায় এই শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের "The expression *Surakulambhodikaumudi* used in regard to Vallalsena's mother Vilasadevi has led to much controversy. It denotes that Vallalsena was born of a daughter of the Sura family."

সেন রাজাদের সম্পর্কে স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী "Notes on the Geography of old Bengal নামক প্রবন্ধে [J.A.S.B. May 1938 Vol. IV No. 6-Page 267-291] লিখিয়াছেন :-

From about the middle of the twelfth century, the Sena kings, originally of Vanga and Suhma, gradually encroached on the territories of the Palas, and eventually ousted them from Gauda. During the reign of Laksmanasena Deva, the whole of Gauda appears to have passed into his hands. In the

Madanpada plate of his son Visvarupasenadeva, Laksmanasen is said to have carried his victorious arms southwards as far as Puri in Orissa, and westwards as far as Benares and Prayag. Naturally he came to be called the Gauda king e. g. in the *Pavana-dutta* Dhoy Kaviraja, Similarly in the Bakarganj and Madanapada plates, Visvarupasenadeva, his son is called lord of Gauda.

সদাশিব মূর্তি ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা।– বাঙলা দেশে আরও কয়েকটি সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরেও একটি সদাশিব মূর্তি আছে–

1. Black stone (Pt. M. 1. 37) representing Sadasiva seated in meditation was acquired by the Dacca Museum. The deity has ten arms, carrying various weapons, and five faces, four of which are visible. It must belong to the twelfth century and to the reign of Gopala III of the Pala dynasty, as appears from an inscription in two lines engraved on the pedestal. The sculpture exhibits the highly decorative style peculiar to the period. It was found at the village of Rajibpur under the Gangarampur police station in Rajshahi (Annual Bibliography of Indian Archaeology volume XII For the year 1937. Leyden. Printed by E. J. Bill Ltd.-1939 Page 15.

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত "Sriharsa Misra and Vijayasena নামক একটি প্রবন্ধে বিজয় সেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন Indian Culture Vol. No. 3 দ্রষ্টব্য।

২৭১ পৃষ্ঠা–লক্ষ্মণ সংবৎ-পরগণাতিত সন–পরগণাতি সন সম্পর্কে ও লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে কিছু দিন বাঙলার ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করেন। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" পরগণাতি সন সম্পর্কে একখানি দলিল প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই চিত্রখানি বর্তমান সংস্করণেও মুদ্রিত হইয়াছে। দলিলের অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

/৭ ইয়াদি জমা ষুর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র মিদং শ্রীভবানীপ্রসাদ শর্মা ওলধে অনন্তরাম শর্মা যুচরিতেষু শ্রীরামগঙ্গা শর্মণে ওলধে রামকেশব বান্নুডি ইবনে রাজীব বান্নুডি লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোনারগাঁও তপে নহাটা হিস্যে রামরাম চৌধুরী আমার ঘরে নিজ তালুক বনামে বামচন্দ্র বান্নুডি লিখা যায় এতাহ...কিসমত কামারখাড়া স্থান পশ্চিম নাথের দরজার পশ্চিমের আমার নিজ অংশের যোত যাহা মূল্য এক কোঠা ও বরুইতলা জোত * * * * এক কোঠা একুনে ২ কোঠা কাত মাপ জমি ১৬ পন্তুনে সতর গণ্ডির রসি কানি ২৫ পচিস রূপাইয়া পরে ১৪। চৌর্দ গণ্ডায় এক কোণ... জমি বসত...মবলগ ২০ কুড়ি রূপাইয়া তের আনা তোমার স্থানে পাইয়া... বেচিলাম। আমি তোমার. এই ভূমি মাফিক চিঠা দরোবস্ত সোমঝ করিয়া দান-বিক্রয়াধিকারী হইয়া পুত্রাপৌত্রাধিকারী হইয়া সনে সনে...আমল করিয়া যথিষ্ট বিয়োগ করহ এহার জমার কসিসিন কালে তোমার ঠাই কিছু দায় নাহি এই লিখনে জমা ষুর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র...সন ১১৬২ এগারশ বাষাঠ্য বাংলা পরগণাতী সন ৫৫৪ পাছশ চৌপার্ন্ন সহরে ১৪ রবিকুরি মাহে ৩ মাঘ রোজ বুধবার।

এই দলিলের বানান সাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া দিলাম, কারণ দলিল-মধ্যে কোন স্থানেই র-এর নিম্নস্থ বিন্দু লিখিত ছিল না, প্রত্যেকটি ব-এর মত লিখিত ছিল। /৭ এইরূপ চিহ্ন সেকালে মঙ্গল চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই দলিলখানার পঞ্চাশ বৎসর পরবর্তী যে কয়েকখানা দলিল পাইয়াছি তাহাতে /৭ এইরূপ চিহ্ন কিংবা পরগণাতি সনের কোনও উল্লেখ নাই, ইহার কারণ কি? আবার ১১৬২ সন হইতেও প্রাচীন যে দুই-একখানি দলিল দেখিয়াছি তাহাতেও এইরূপ /৭ চিহ্ন ও পরগণাতি সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, কোন্ সময় হইতে এই পরগণাতি সনের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পরগণাতি সন অদ্যাপি প্রচলিত থাকিত তবে আমাদিগকে দলিল-পত্রে ৭৩৮ পরগণাতি সন এইরূপ উল্লেখ করিতে হইত।

দুঃখের বিষয় দেড়শত বৎসর পূর্বেও যাহা প্রচলিত থাকিয়া একটা প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছিল, নূতন রাজশক্তির আবির্ভাবে নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ স্মৃতি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৯৪-৩৯৭ পৃষ্ঠায় পরগণাতি সন সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'গৃহস্থ' পত্রের 'পরগণাতি সন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন– "এই পরগণাতি সনের উল্লেখ প্রথম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিক্রমপুরের ইতিহাসে পাই।" অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় আবদুল্লাপুরের আখড়ার পুরাতন পুঁথির স্তূপের মধ্যে "স্বপ্নাধ্যায়" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন খণ্ড পুঁথিতে সন বলালি দেখিতে পান। যতীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন–"এই পুঁথির শেষ পাতায় লিখিত আছে : রচিল নারায়ণে ইতি স্বপ্ন-অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত। ইতি.সন ১১৭৬ সন তিরিখ ২২ ভাদ্র, রোজ মোঙ্গলবার রাত্রি দুই দণ্ড গত কালে মোকাম হব্রবতনগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক ন্যাস্তি দোসকঃ। সকীয় পুস্তক মিদণ্ড শ্রীযুগলকিশোর দাষক "সন বলালি ৫৭০ সন সকাব্দা ১৬৯২ তিথি পূর্ণিমা।"

আউটসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন– বাল্লালি-সন-যুক্ত একখানি দলিল মুন্সীগঞ্জের কোনও আদালতে তাঁহারা দাখিল করিয়াছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে "সন বলালি ও পরগণাতি সন" অভিন্ন এবং ইহার আরম্ভকাল ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে–"লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাতীতাব্দ মুসলমান আমলে "পরগণাতি সন" বা "পরগণাতীত সন" নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কাগজপত্রে এই পরগণাতি সনের উল্লেখ রহিয়াছে।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া এই "পরগণাতি সনের" বর্ষ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এই অতীত রাজ্যাঙ্ক মুসলমানের গৌড়-বিজয় নির্দেশক ছিল বলিয়া "লক্ষ্মণ সেনের নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই "পরগণাতি সন" নামে চালাইয়া দিয়াছেন।" [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা]।

যতীন্দ্রবাবু 'ঢাকার ইতিহাসে'র ৩৯৬ পৃষ্ঠায় কয়েকখানা পরগণাতি সন বা সন

বল্লালির সহিত বঙ্গাব্দ বা শকাব্দ মিলাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের 'গৃহস্থ' পত্রিকায় "পরগণাতি সন" নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩১৮ সালের নবম সংখ্যায়ও এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় ১৩২২ সালের শ্রাবণ, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় "বিজয়া" নামক পত্রে "পরগণাতিসনরহস্য" নামক একটি প্রবন্ধে পরগণাতি সন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের প্রকাশিত পরগণাতি সন সংযুক্ত দলিলখানার আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায়ও পরগণাতি সন প্রচলিত ছিল। ঈশানবাবু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকখানি "পরগণাতি সন" যুক্ত দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পাঁচ খানায় কেবলমাত্র পরগণাতি সন আর দুই খানায় বাঙলা ও পরগণাতি এই উভয় প্রকার সন ছিল। ঈশান বাবু বলেন– "যতদূর চিন্তা ও আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পরগণাতি সন, যে কোনও বিশেষ ঘটনাধীনেই হউক, মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে প্রবর্তিত হইয়া কিছুকাল প্রচলিত ছিল। পরে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের কোনও দলিলে পরগণাতি সনের উল্লেখ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। বাঙলা একাদশ শতাব্দীর (খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ) পূর্ববর্তী কোন পরগণাতি সনের নাম পাই নাই। পরগণাতি সনের ইহাও এক রহস্য।"

কিন্তু একথা সত্য নহে। আমরা পরগণাতি সন সংযুক্ত অনেক দলিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেরও প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার কাছে বর্তমানে বহু পরগণাতি সন যুক্ত দলিল সংগৃহীত আছে। ঐরূপ দলিলগুলির প্রতিলিপি দেওয়া সম্ভবপর হইল না বলিয়া দিলাম না। বিক্রমপুর কাউলীপাড়া বা কালীপাড়ার জমিদার চন্দনধুল নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান ইছাপুরানিবাসী সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইজপাড়া গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় ঐরূপ অনেক দলিল আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই ঈশানচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে বরং বিচার সাপেক্ষ। ঈশানবাবু এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী তৎপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণ সেনই তাহার প্রবর্তক। আবার Sir Asutosh Jubilee Volume; Orientalia Pt. 2. P. 1. লিখিয়াছেন :–

"Its origin is to be sought in the Sena dynasty of Pithi and not in the Sena dynasty of Bengal, because it was never used by the Senas of Bengal and its earliest use was confined to Bihar where there is epigraphic evidence of the Zia existence of a line of Sena kings who actually used the era. There are two epigraphs of Ashokavalla known as Bodh-Gaya inscriptions and another of Jayasena found at Janibigha, a place close to BodhGaya, and the dates of these three epigraphs ar expressed as follows :-

(1) Srimal-Lakhvana (Ksmana) Senasya-atitya-ıajye. S.51. II. Srimal-Laksmansenadevapadanam-atita-rajye. S.74. III Laksmansensya-atita-rajya. S.83.

"The uniform manner of the expression of these three dates in the records of two kings of Pithi shows that they refer clearly to the post-regnal year of a king or an era. Calculating these dates according to La Sam, Dr. Roy Chowdhury says that the king whose reign was a thing of the past in the year 51 (= 1170 A.D.) can not be identified with Laksmansena of Bengal who ruled in the last quarter of the twelfth century. Therefore he concludes, "If the founder of Laksmansena-Era was not identical with Laksmana Sena of Bengal, he must have been the founder of the Sena dynasty of Pithi." ......Curiously enough Dr. Roy Chowdhury does not mention any king of Pithi of in the name of Laksmana Sena. The Early History of Bengal Page 102-103. Pramode Lal Paul M.A.

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "অনেকে মনে করেন, ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লক্ষণ-সংবৎ নামক যে অব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ হইতেই প্রবর্তিত হয়। এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময়ে আর্যাবর্তের পশ্চিমাংশ মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল।" এই সম্বন্ধে এখন পর্যন্তও আমরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এবিষয়টি এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক– কাহারও কাহারও মত এইরূপ– মাধব সেনের সময় খিলিজি বঙ্গ-বিজয় করেন :

It is certain that the descedants of Laksmansena ruled in Eastern Bengal for a long time after the event. It is even possible that Nadiya may have been attacked after the death of Laksmansena during the reign of Madhavasena whose name appears to have been erased from this Bukerganj Copper-plate. We, therefore, think that if we put the two records together, the reasonable inference would be that Bengal fell after resistance and not as ignominously as depicted in the account. Laksmanasen's Flight from Nadiya. C. V. Vaidya. Indian Historical Quaterly. Edited by Narendranath Law. Vol. 1. No. 4. December 1925.

নবম অধ্যায়– ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রে ৬৫১-৬৫৭ পৃষ্ঠায় "প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য" নামক প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর নগরীর নালা পুষ্করিণী হইতে প্রাক্ মুসলমান যুগের দারু-ভাস্কর্যের যে সকল নমুনা ঢাকার চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিচয়

দিয়াছেন। রামপাল হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠস্তম্ভ, মূর্তি, ইত্যাদি "প্রাক্ মুসলমান যুগের দারু-ভাস্কর্য, বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা তাহার কয়েকটির চিত্র প্রকাশ করিয়াছি।

একটি বৌদ্ধমূর্তি (স্থির চক্রমঞ্জুশ্রী?) ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :- "১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মূর্তি তাহার পূর্ববর্তী। * * * আনুমানিক ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেন-বংশের পতনের পর ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর রাজধানীতে "নারায়ণকৃপাপ্রসাদসমাপাদিত গৌড়রাজ্যং" অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের বংশের রাজত্ব। এই অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট দনুজ রায় বলিয়া পরিচিত। ইনি পরম বৈষ্ণব, নারায়ণের কৃপায় গৌড় রাজ্য- অর্থাৎ, বিস্তৃত সেন-রাজ্যের পূর্ববঙ্গস্থ অংশে অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া নিজের আদাবাড়ি তাম্রশাসনে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশের অধিকারকালে রাজবাড়ির অভ্যন্তরে, অথবা অব্যবহিত বাহিরে বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। দনুজরায়ের বংশের পূর্ববর্তী সেনবংশ ও বর্মবংশের অধিকারকাল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে এক কথা আছে। সামলবর্মের বজ্রযোগিনী শাসনে দেখা যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতি কামনায় বিষ্ণুচক্রমুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত তাম্রশাসন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে ভূমি দান করিতেছেন। কাজেই বর্ম-যুগে রাজবাড়ির নিকটেও বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান অসম্ভব নহে। বর্ম বংশের পূর্বে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর রাজধানী হইতে পূর্ববঙ্গ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে (আনুমানিক ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবাড়িতে বৌদ্ধমন্দির থাকাই স্বাভাবিক এবং অপূর্ব কলানৈপুণ্যমণ্ডিত মূর্তি ঐ আমলেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নির্ধারণ করা যায়।

নৈর পুকুর-ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় নৈর পুকুর সম্বন্ধে বলেন- নৈ একজন অজ্ঞাত কুলশীল রাজার নাম বলিয়া মনে হয়। পুকুরের আয়তন দেখিয়া মনে হয়, ইনি বেশ বড় রাজা ছিলেন। ভাগীরথীর উত্তর কূলেও নৈহাটি অভিধের গ্রামগুলির নামে, এই রাজারই নাম বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অপর পক্ষে বক্তব্য এই যে, নৈ-নদীর শব্দের অপভ্রংশ হওয়াও অসম্ভব নহে।"

আমরা ভট্টশালী মহাশয়ের নৈ-রাজার নাম হইতে নৈর পুকুর নাম হইয়াছে এই উক্তি সমর্থন করি না। নৈ-সংস্কৃত নদী, প্রাকৃ-নেঈ, নৈ-নদী-কটক দেখি স্নান করি মহা নৈ-কূলে চৈ-ভা। (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিদান) কাজেই নদীর সহিত তুলনায় বিশালকায় দীঘি কিংবা নৈ-শব্দে নূতন খনিত দীঘি অর্থেও বুঝাইতে পারে। নৈ-রাজা অপেক্ষা নৈ-নদী বা নূতন পুকুর অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা- বিক্রমপুরের যে শোকাবহ জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কোন্ নৃপতি? তাহা অদ্যাপিও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা.ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও "বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,-

"আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত রাঘব-পঞ্জী নামক কুলগ্রন্থ আমার নিকট রক্ষিত আছে। সেই পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় দিগম্বর, নীলাম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার নামক দাশবংশীয় তিন ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারাই "বাজাসনের দাশ।"

এই তিন ব্যক্তি সামান্য বা নগণ্য ছিলেন না। ইঁহারা প্রসিদ্ধ পদ্মদাশের বংশধর, এবং পদ্মদাশ হইতে দশম স্থানীয়। পদ্মদাশ মহারাজ বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; চন্দ্রপ্রভায় ইহার সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,–

'সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো গৌড়েশ- সেবার্জ্জিত পৌরুষঃ শ্রীঃ।

দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্ স বালিনছ্যাং বসতিং চাকর॥"

(মুদ্রিত চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩১৫)

এবং বংশীয় ভূতপূর্ব পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কলিকাতা নিবাসী জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের বাড়িতে বল্লাল সেন কর্তৃক পদ্মদাশকে প্রদত্ত সনন্দ সেদিন পর্যন্ত রক্ষিত ছিল। পদ্মদাশকে বল্লাল সেন মহাকুল প্রদান করেন। কিন্তু চণ্ডালিনী-দোষ-সম্পৃক্ত বল্লালের প্রদত্ত কুল বৈদ্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই।

"বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ

বল্লালের কুল না লইল তিনজন॥"

এই প্রবাদ অতি প্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বৈদ্যগণ কুল গ্রহণ করেন কিন্তু সে সময়েও বল্লালী কুল এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীনতর-আভিজাত্য-দৃপ্ত বরেন্দ্র-দেশবাসীরা এই নূতন কুলীন সৃষ্টির বিপক্ষে প্রবল-প্রভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বল্লালী কুল ক্রমে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া দেশময় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কিন্তু বল্লালী কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্মণ সেনের প্রায় সার্দ্ধশতবৎসর পরে বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। পদ্মদাশ হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবর এইভাবে স্বজাতি-সমাজে অবিসম্বাদ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাঢ়দেশে মৌড়েশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। বিদ্যা-বুদ্ধি এবং মর্যাদায় যাঁহারা তৎকালে বৈদ্য সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীবর অন্যতম। চণ্ডীবরের প্রপিতামহী সেন-ভূমের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা ছিলেন। চণ্ডীবরের পিতামহের দুই সহোদরা বিক্রমপুরের বৈদ্যরাজবংশে বিবাহিতা হন। বিক্রমপুরের ২য় বল্লালসেন (যিনি পোড়ারাজা নামে খ্যাত হন) এই দুই সহোদরার জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া সহোদরা উক্ত রাজবংশের কাহ্নু খাঁর সহিত পরিণীতা হন। দ্বিতীয় বল্লালের এই মহিষীই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর অগ্রগামিনী হন। সকলেই অবগত আছেন, নিদারুণ মর্মপীড়ায় বল্লাল তাঁহার মহিষী ও অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। [প্রবাসী–আষাঢ়, ১৩১৯। ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান]

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা স্বরূপচন্দ্ররায়ের মতে–

দ্বিতীয় লক্ষণ সেন

সুষেণ, বা সুর সেন

দনুজ রায়

পোড়া রাজা বা দ্বিতীয় বল্লাল সেন।

গোপালভট্ট রচিত বল্লাল চরিত মতে–

বৈদ্যবংশাবতংসোহয়ং বল্লালোনৃপ-পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্॥
গোপাল ভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অব্দরাজজমানে বসুভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
রুদ্রেশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মান সম্মিতৈঃ॥

অর্থাৎ, ১৩০০ শকাব্দে (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) বৈদ্য বংশোদ্ভব রাজা বল্লালের অনুজ্ঞায় তদীয় শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্লালচরিত রচিত হইল। এই বল্লালচরিত পাঠেও জানিতে পারা যায় যে, বৈদ্যরাজ বল্লাল বাবা আদম নামক মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাবা আদম সম্বন্ধে Arch, Survey of India 1927-1928-এর রিপোর্টে বাবা আদমের মসজিদের সংস্কার-কার্য সম্পর্কে লিখিত আছে :–

"An important monument in Eastern Bengal where an expenditure of Rs. 3,780 on special repairs was recorded during the year is the mosque of Baba Adam or Adamsahid at Kazi Kasba in the village of Rampal in the Dacca district. From an inscription preserved in its front wall, the mosque was built by Malik Kafur in the year 888 A. H. (1483 A. D.) in the reign of Jalaluddin Fateh Shaha, Sultan of Bengal, although the saint in whose name. It was erected and part of whose remains are enshrined in the adjoining tomb is supposed to have lived sometime in the 12th century A. D. The story goes that the aid of this renowned saint of Arabia was sought by some oppressed Mahammadan subject of king Ballal sena of Rampal and in the struggle that ensued, both the saint and the king lost their lives."

Whatever the historical truth underlying the tradition, it seems clear that Baba Adam must have been one of the earliest pioneers of Islam in Vikrampur, the most important stronghold of Hindu and Buddhist influences

in Eastern Bengal in the times immediately preceding the Mahammadan invasion.

The mosque is a typical specimen of the early pathan style architecture in Bengal. It has two octagonal pillars apparently Hindu origin supporting the springs of arches of six domes. The front facade shows the typical curved cornice, being probably the earliest known example of this style in a Mahammadan building. The three miharbs in the western wall were ornamented with beautiful moulded brick wall. The building seems to have suffered much by natural decay and from the invasion of pirates from the Arracan coast, the latter being probably responsible for the denundation of the stone capitals of the pilasters in the walls. Conservation included rebuilding all spalled and disintegrated brick work in the interior walls and arches of the facades, underprinning the foundations of the exterior walls, reconstruction of the cornice in accordance with the old construction and the water proofing of the rood, pages 43-44.

জৈনধর্ম– বিক্রমপুরের কোন কোন স্থান হইতে অতি সামান্য দুই-একটি জৈনপ্রভাব-সূচক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। আর জৈনসার গ্রাম নামটি জৈনপ্রভাব-সূচক বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

হরিআনন্দ বাড়রী*[১]
বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস

বিক্রমপুরের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের, অর্থাৎ বিক্রমপুরবাসীদের মনে একটা গভীর ভালবাসার অনুভূতি রয়েছে। আমাদের অতি প্রিয় এই জায়গাটির গৌরবময় অতীত আমাদের কল্পনায় যেন সুদূর স্বপ্নলোকের সুন্দর একখানি ছবির মতো সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা, দীর্ঘকালের ব্যবধান বা রূঢ় বাস্তবের স্পর্শ তাকে যেন একটুও মলিন করতে পারেনি। অতীতের বিক্রমপুরের কী এক অপরূপ মায়াবী আকর্ষণ আছে, সে যেন সেই প্রবাদবাক্যের ইন্দ্রধনুর শেষ প্রান্তের স্বর্ণকলসের মতো, তাকে মনশ্চক্ষে বুঝি দেখা যায় কিন্তু ধরাছোঁয়া যায় না।

খ্রি.পূ. দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীর গ্রিক ও লাটিন সাহিত্যে গঙ্গাবন্দর নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, এটি নাকি ছিল গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী। এই জায়গা অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ এবং এর কাছাকাছি নাকি একটি স্বর্ণখনিও ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর অঞ্চলে বহু স্থানের নামে সোনা বা সুবর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন, সুবর্ণবীথি, সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও), সোনারং, সোনাকান্দি ইত্যাদি। টলেমির বিবরণে যে-স্বর্ণখানির কথা বলা হয়েছে তা হয়তো সত্যিই মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গে কোথাও ছিল, এ রকম সম্ভাবনা একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[১]

সম্প্রতি পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য[২] আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা হচ্ছে যে বিক্রমপুর অঞ্চলে আদিম এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের বসতি ছিল। বিক্রমপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাথরেব তৈরি অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র পাওয়া গেছে যাতে প্রমাণিত হয় যে পদ্মা ও বুড়িগঙ্গার তীরে তীরে আদিম প্রস্তরযুগেও মানুষ বাস করত। মধ্যপ্রস্তরযুগের কিছু কিছু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে বাঘরা এবং সিরাজদিখান গ্রামে। আবদুল্লাপুর, বেতকা, শ্রীনগর, কনকসার প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে চিহ্ন পাওয়া গেছে প্রায় খ্রি. পূ. চার হাজার বছর আগে নবীন প্রস্তরযুগের মানব বসতির। কোথাও কোথাও পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে নবীন প্রস্তরযুগ এবং তার পরবর্তী তাম্রযুগের কিছু কিছু চিহ্ন। সোনাকোটি (লোহাজং) এবং আরও কিছু স্থানে খনন করে পাওয়া গেছে খ্রি. পূ. একুশ শতকের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, মাটির বাসন এবং আদি মানব বাসস্থানের কিছু কিছু নিদর্শন।

* হরিআনন্দ বাড়রী[১] (১৯২৯) বিক্রমপুরের সন্তান। তিনি ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো মহাপরিচালক এবং হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। তাঁর 'ইনসান অ্যান্ড শাওয়ার' গ্রন্থের নন্দিতা মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদগ্রন্থ 'আমার বিক্রমপুর' (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুন ২০০৬) থেকে প্রবন্ধটি গৃহীত। এটি গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'মহান বিক্রমপুর'।

রামপাল, বেতকা, মুনশিপাড়া ইত্যাদি কিছু কিছু জায়গায় খননকার্য চালিয়ে পাওয়া গেছে যেসব মানব বসতির চিহ্ন সেগুলি খ্রি. পূ. তিন থেকে চার হাজার বছরের পুরনো এবং হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে তার মিল আছে। ব্রোঞ্জ (কাংস) যুগের সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া গেছে বিক্রমপুরে। পুরাতত্ত্ব গবেষকদের মতে বিক্রমপুর অঞ্চলে আদি প্রস্তরযুগের শেষে এবং মধ্য প্রস্তরযুগে বাস করত নিগ্রয়েড্ জাতীয় মানুষরা, এরপর পশ্চিম বিক্রমপুরে এসে পৌঁছোয় ককেশীয় মানুষরা এবং পূর্ব বিক্রমপুরে দেখা দেয় মোঙ্গল জাতীয় মানুষের দল।

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখলে[৩] আর্যদের এদেশে বসতিস্থাপন এবং তাদের সংস্কৃতির বিস্তারের সময়কার বিক্রমপুরের ইতিহাস আলাদা করে খুব সুসংলগ্নভাবে জানা যায় না, তার কারণ এ-বিষয়ে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়নি। অল্পবিস্তর যা জানা যায় তার উল্লেখ করছি। যেমন, গৌতম বুদ্ধ সম্ভবত দুই বা তিন বার বিক্রমপুরে এসেছিলেন। বিক্রমপুরের সাদাসিধা গঠনের কুটিরগুলি তাঁর ভালো লেগেছিল, শ্রমণদের তিনি ওই রকম কুটিরে বাস করতে উৎসাহিত করেছিলেন।[৪] এই তথ্য যদি সত্য হয় তা হলে বুঝতে হবে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধ বিক্রমপুরে এসেছিলেন, কারণ ওই শতকেই তিনি জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেনিনের মতে,[৫] খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে বিক্রমপুরের কিছু অংশ লিচ্ছবি রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনি আরও বলেন নন্দবংশের এক রাজা মগধ জয় করেন এবং বিক্রমপুরেরও কিছু অংশ এই রাজ্যভুক্ত করেন।[৬] রমেশচন্দ্র মজুমদার[৭] এবং নীহাররঞ্জন রায়[৮] দু'জনেই মনে করেন এই নন্দবংশীয় রাজা ছিলেন বাঙালি। কয়েকজন গ্রিক লেখকের রচিত ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় খ্রি. পূ. ৩২৭-এ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে বিয়াস বা বিপাশা নদীর পূর্ব দিকে ছিল দুটি শক্তিশালী রাজ্য। প্রথমটির নাম গঙ্গারিডি (Gangaridai) বা গঙ্গারাষ্ট্র, এর রাজধানী ছিল গঙ্গে (বা গঙ্গানগর) এবং দ্বিতীয়টি প্রাসিওই (Prasioi) (প্রাচ্য), এর রাজধানীর নাম পলিবথ্র (বা পাটলিপুত্র)। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ মনে করেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে ছিল গঙ্গারাষ্ট্র, এবং প্রাচ্য রাজ্য ভাগীরথীর পশ্চিমে প্রায় সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ আবার এও মনে করেন যে খ্রি. পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে এই দুটি রাজ্য ছিল একই রাজার অধীনে এবং দুইয়ে মিলে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল যুক্তরাজ্য। বিক্রমপুর ছিল গঙ্গারাষ্ট্রের মধ্যে।

এই যুক্তরাজ্যের শক্তিশালী রাজার নাম ছিল আগ্রামেস (Aggrams বা Xandrammes) (ইনি ছিলেন উগ্রসেনের পুত্র)। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন পুরাণে উল্লিখিত 'মহাপদ্ম নন্দ' আর এই আগ্রামেস সম্ভবত একই ব্যক্তি। শোনা যায় এক নাপিত পরিবারে তাঁর জন্ম, পুরাণকারের মতে মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন শূদ্রবংশজাত। আর্যরা বঙ্গদেশের লোকদের শূদ্র বলতেন এই তথ্য এখানে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। বঙ্গদেশের এ ছিল এক স্বর্ণযুগ, কারণ সম্রাট মহাপদ্ম নন্দর রাজ্য বাংলা ছাড়িয়ে মগধ ও আর্যাবর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে রাজা শশাঙ্ক এবং রাজা ধর্মপালও এই

কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। আলেকজান্ডার যে বিপাশা নদীর পূর্ব দিকে আর অগ্রসর হতে চাননি তার অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে, নন্দ রাজাদের বিশাল সৈন্যদল ও অগাধ ঐশ্বর্যের খবর শুনে তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

নন্দবংশের পতন ঘটে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে, খ্রি. পূ. ৩২২ অব্দে। চন্দ্রগুপ্ত বিশাল এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলকে অধীনে আনতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল যথেষ্ট।[৯] আলেকজান্ডারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি সেলুকাস আলেকজান্ডারের জয়-করা কিছু কিছু রাজ্য পুনরাধিকার করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পরাজিত সেলুকাসকে মাথা নত করে চন্দ্রগুপ্তের শর্ত অনুযায়ী সন্ধি করতে হয়। এরপর সেলুকাস মেগাস্থিনিসকে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নিজের রাজদূত নিযুক্ত করেন। মেগাস্থিনিস পাঁচ বছর পাটলিপুত্রে বাস করেন এবং এই সময়ের মধ্যে বিক্রমপুরেও এসেছিলেন। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার যে বিবরণ তিনি লিখে গেছেন তার মধ্যে শোনা যায় বিক্রমপুরের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।[১০]

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে বসেন। ২৫ বছর (খ্রি. পূ. ২৯৮-২৭৩) তিনি রাজত্ব করেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেনিন লিখেছেন,[১১] একবার বিক্রমপুরের লোকেরা রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বিন্দুসার নিজ পুত্র অশোককে পাঠিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। বিক্রমপুরের আবদুল্লাপুর অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের (খ্রি. পূ. ১৮৫-৩২০) অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে, তথা বিক্রমপুরে সময়টা কেমন যাচ্ছিল সেই ঘটনাবলির কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। রোম ও গ্রিসের পণ্ডিতদের লিখিত বিবরণী থেকে ইতিহাসবিদেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গঙ্গারিডি (বিক্রমপুর যার অংশ ছিল) এক সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ছিল।

গুপ্তবংশের প্রথম রাজার নাম শ্রীগুপ্ত তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। এরপর ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। ইনি বহু যুদ্ধ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, 'বঙ্গ' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনও কোনও ইতিহাসবিদের মতে মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যের চতুর্থ সর্গে রাজা রঘুর দিগ্বিজয়ের যে-বর্ণনা আছে তা প্রকৃতপক্ষে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তেরই বিজয় অভিযানের ইতিবৃত্ত।[১২]

রঘুবংশম্ কাব্যের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হলো—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥"

অর্থ— বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) রাজগণ তাঁদের যুদ্ধপোতগুলি নিয়ে দেখা দিলেন

প্রতিপক্ষ রঘুর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে, কিন্তু রঘু বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের পরাজিত করলেন এবং গঙ্গার স্রোতধারার মধ্যে যে-দ্বীপগুলি আছে সেখানে নিজের বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করলেন। রাজাদের প্রথমে উচ্ছেদ করে তারপর তাদের আবার প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁরা তাঁর (সমুদ্রগুপ্তের) চরণে যেন রোপণ করা ধানের চারার মতো শুয়ে পড়ে প্রণাম করলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে পূজা করলেন।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই বর্ণনা পাঠ করে এই সিদ্ধান্ত করছেন যে এভাবে যে-অঞ্চল জয় করা হয়েছিল তা হলো বিক্রমপুর। এলাহাবাদের কেল্লায় একটি স্তম্ভে খোদিত লিপি থেকে তিনি নিজের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পেয়েছেন। এই লিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয়েছে সমতট দাবক (সমতট বিজয়ী)। বিক্রমপুর সমতটেরই অংশ। দিল্লির মেহেরৌলিতে কুতুবমিনারের কাছে এক লৌহস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, চন্দ্র নামে এক রাজা 'বঙ্গ' দেশের একগুচ্ছ রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ এই রাজার পরিচয় নিয়ে বিতর্ক তুলেছেন। কারও কারও মতে শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপিতে যে-চন্দ্রবর্মণের নাম আছে তিনি আর এই চন্দ্ররাজা অভিন্ন ব্যক্তি। আবার অন্য অনেকে বলেন এই চন্দ্র হচ্ছেন গুপ্তবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। যিনি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময় বঙ্গের কয়েকজন রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। পুরাতন তাম্রপটে বিক্রমপুরের নাম 'বিক্রমপুর' বলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য, তার থেকেই 'শ্রীবিক্রমপুর' নামটির উদ্ভব এটাই এঁদের অনুমান। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এ-বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি, তবে ওই অনুমানকে একেবারে বাতিলও করে দেননি তিনি।

বিক্রমপুরের স্থানীয় মানুষজন অনেকেই বিশ্বাস করেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নাম থেকেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়েছে এবং এই বিক্রমাদিত্যেরই সভাকবি ছিলেন মহাকবি কালিদাস। তবে 'বঙ্গ' অথবা বিক্রমপুর অঞ্চল গুপ্তরাজাদের কতটা নিয়ন্ত্রণে বা অধীনে ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশের এক গ্রন্থকার দাবি করছেন যে কবি কালিদাস নাকি বিক্রমপুরে এসেছিলেন।[১৩]

বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রাচীন পুথিতে বাংলার এক রাজা আদিশূরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিক্রমপুরের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে, কোন স্থানে তিনি রাজত্ব করতেন সে-সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারও মতে আদিশূর ছিলেন রাজা শশাঙ্কের বংশধর, কিন্তু এ-তথ্যের পিছনেও ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। আদিশূরের রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল তা নিয়ে অনেক সম্ভাব্য স্থানের নাম করা হয়, কেউ বলেন বিক্রমপুরের রামপাল এলাকা, কেউ বলেন সোনারগাঁও, যা বিক্রমপুরের খুবই কাছে এবং এককালে বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। আর একটি মত, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ছিল আদিশূরের রাজধানী। কিন্তু এইসব অনুমানের কোনওটিরই নিশ্চিত ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।[১৪]

শোনা যায়, ৫৩০ খ্রি. বা তার কাছাকাছি কোনও সময়ে হুন রাজা মিহিরকুল

বিক্রমপুরের অংশ শাসন করতেন এবং এঁর রাজ্যসীমানা আবদুল্লাপুর ও ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে স্থানীয় রাজারা হুনদের পরাস্ত করেন। বাইরে থেকে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিক্রমপুরে এসে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে। মৌর্যরাও এইভাবে এসে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং পদ্মাতীরে লোহাজং ও ভাগ্যকুলে বসতি স্থাপন করেছিল। মৌর্যদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের মিশ্রণের ফলে এক নতুন জাতের উদ্ভব হলো যারা নিজেদের বলত রাজপুত।

কয়েক দশক আগে ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) কোটালিপাড়া ও ঘাগরাহাটিতে চারটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি থেকে জানা যাচ্ছে। ৫২৫-৬০০ খ্রি.-র মধ্যে গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব এই তিনজন রাজা 'বঙ্গ' বা সমতটে রাজত্ব করতেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের ঠিক পরবর্তী সময় এটি। এই রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি এবং বিক্রমপুর তাঁদের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল কি না তাও বোঝা যায় না। তবে আমার মতে এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বিক্রমপুর ছিল সমতটেরই মধ্যে। তাছাড়া, আগেই বলেছি যেখানে এই শিলালিপিগুলি পাওয়া গেছে সেই কোটালিপাড়া জায়গাটি বৃহত্তর বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। কোটালিপাড়ায় এবং কাছেই ঢাকা জেলার সাভারে সমাচারদেবের নামাঙ্কিত যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে সেটিও আমার অনুমানের সপক্ষে একটি প্রমাণ বলা চলে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফলে সমাচারদেবের রাজত্বের পতন ঘটে। প্রথমত, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ[১৫] অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেন। দ্বিতীয়ত, এই সময় গৌড়ে রাজা শশাঙ্কের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তিনি আশেপাশে অনেক অঞ্চল নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম চার দশক (৬০৬-৬৩৭ খ্রি.) শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সম্রাট, যিনি ওড়িশা এবং মগধ পর্যন্ত রাজ্য নিজের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীনে আনতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম বাঙালি সম্রাট যিনি বাংলার সীমান্ত পার হয়ে নিজের রাজ্যের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত করেছিলেন। যদিও শশাঙ্ককে গৌড়েশ্বর বলেই উল্লেখ করা হয় কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ এবং বিক্রমপুরও[১৬] তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। এক বিবরণে জানা যায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুর, লোহাজং, সিরাজদিখান, রামপাল, শ্রীনগর এইসব স্থানের শাসকবৃন্দের নিজেদের মধ্যে ছোটখাটো লড়াই চলত অবিরাম। রাজা শশাঙ্ক এখানে এসে গজারিয়া টঙ্গিবাড়ি ও আরও কয়েকটি জায়গা দখল করেন এবং তারপর সমগ্র মুনশিগঞ্জ এলাকা (অর্থাৎ বিক্রমপুর) নিজ রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এই বিবরণে এ-কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে চীন দেশ থেকে হিউয়েন সাং ভারত পর্যটনে এসেছিলেন এবং তিনিও বিক্রমপুর দেখে গেছেন। এই লেখক এও জানিয়েছেন যে ফা হিয়েন নামে আরও একজন চৈনিক পর্যটক বিক্রমপুরে এসেছিলেন[১৭] তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় বিক্রমপুর প্রায় তিরিশ বছর হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল।[১৮] তারপর বিক্রমপুর অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শোনা যায় বহু শতাব্দী পূর্বে পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অংশে রাজত্ব করতেন

খড়্গবংশীয় রাজারা। কিন্তু তাঁরা ঠিক কোন সময়ে বা কোন অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম খড়্গোদ্যম, তাঁর পর যে-বংশধরেরা সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁদের নাম জাতখড়্গ, দেবখড়্গ এবং রাজ রাজভট। ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও আরও কেউ কেউ মনে করেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়ের মতে সম্রাট যশোবর্মণের পতনের বহুকাল পরে নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে পূর্ববঙ্গে একটি বিশেষ স্থানের রাজা হন খড়্গোদ্যম, এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা। তাঁরা নবম শতকের শেষপর্যন্ত রাজত্ব করেন।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচয়িতা ইতিহাসবিদ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একটু অন্যরকম মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এই তথ্য পেয়েছেন যে, ৬৪৭ খ্রি. রাজা হর্ষের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। এইরকম সময়েই পূর্ববঙ্গে দেবখড়্গ ও তাঁর বংশধরেরা রাজত্ব করেছেন। এঁর মতে দেবখড়্গের রাজত্বকাল ৭৪০-৭৬০ খ্রি. পর্যন্ত। কিন্তু আবার অন্য আর একটি সূত্রে দেখেছেন যে পালবংশীয় রাজাদের একেবারে শেষপর্বে রাজা নারায়ণপালের শাসনকালের শেষদিকে (৮৭০-৯২৫ খ্রি.) খড়্গোদ্যম পূর্ববঙ্গে তাঁর রাজত্ব আরম্ভ করেন।

খড়্গবংশের শাসনকাল সম্বন্ধে আর একটি মত পাওয়া যাচ্ছে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৯] সম্পাদিত গ্রন্থে। হিউয়েন সাং-এর বিবরণী উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র ছিলেন এই বংশজাত। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের পতন ঘটিয়ে এক বৌদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন খড়্গোদ্যম। জাতখড়্গ দেবখড়্গ ও রাজা রাজভট যথাক্রমে এরই পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং (I tsing) লিখেছেন রাজা রাজভট নামে সমতটে এক রাজা ছিলেন। খড়্গবংশীয় রাজা রাজভট আর তিনি একই ব্যক্তি হতে পারেন। শোনা যায় এই বংশ রাজত্ব করেছিলেন সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খড়্গবংশের রাজত্বকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু আরও কোনও কোনও বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের মতে খড়্গ রাজারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন না, এঁরা ছিলেন পালবংশের অধীন সামন্ত রাজা। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন খড়্গবংশীয়েরা স্বাধীন রাজা ছিলেন। ড. রমেশ মজুমদারও এই মতটি সমর্থন করেন।[২০]

যতীন্দ্রমোহন এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দু'জনেই মনে করেন, খড়্গবংশীয়দের রাজ্যের এলাকা ছিল অতি ক্ষুদ্র, সর্বগ্রামের কয়েকটি গ্রাম এবং ঢাকা জেলার ভাওয়াল, এইটুকুই ছিল তাঁদের রাজ্যের অন্তর্গত। "হিস্টরি অ্যান্ড কালচার অফ ইন্ডিয়ান পিপল" গ্রন্থে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার কিন্তু বলেছেন খড়্গবংশীয় রাজারা শুধু পূর্ববঙ্গে নয় দক্ষিণ এবং মধ্যবঙ্গেরও বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজত্ব করেছেন।

খড়্গরাজাদের রাজধানীটি কোথায় ছিল? এ-প্রশ্নের উত্তরেও প্রচুর মতবিরোধ।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে খড়্গবংশীয়রা ছিলেন সমতটের রাজা, আর তাঁদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার কাছে 'কামতা' বা 'কারমানতা' নামক স্থানে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন রায় এ মতের বিরোধিতা করেছেন। কামতা বা কারমানতায় খড়্গদের রাজধানী ছিল এ-কথা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তও মানতে রাজি নন। তিনি বলছেন, বিক্রমপুরের সঙ্গে খড়্গরাজাদের সম্পর্ক ছিল এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় যে প্রাচীনকালে বিক্রমপুরকেই সমতট বলা হতো এবং সেনবংশীয় রাজাদের সময় থেকেই সমতট বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আবার এমন কথাও বলেছেন যে সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল 'সমতট' নামে এক নগরী। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কোথায় ছিল এই সমতট নগরী? রেনেল (Rennel) সাহেবের তৈরি একটি মানচিত্রে সমকোট[২১] নামে একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন এইটিই ছিল সেই 'সমতট' নগর, এখন এই জায়গা তলিয়ে গেছে পদ্মা বা কীর্তিনাশার গর্ভে। সে জন্যই সমতট রাজ্যের রাজধানীর এখন আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি উল্লেখ করেছি যে অনেকে সোনারগাঁওকেই সমতটের রাজধানী বলে মনে করেন এবং যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, সমতটের রাজধানী বিক্রমপুরের খুব কাছেই ছিল আর সোনারগাঁও থেকেও তার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে রাতবংশ নামে আর এক বংশের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই বংশের জীবধারণ এবং শ্রীধারণ সমতটে রাজত্ব করেছেন। শ্রীধারণ ছিলেন এক দয়ালু বৈষ্ণব, তিনি কবি, চিত্রকর এবং শিল্পকলারসিকও ছিলেন। তাঁর পুত্র বলধারণ ছিলেন প্রতিভাশালী মানুষ, শিল্পকলা ও অশ্বারোহণে ছিল তাঁর অনুরাগ।[২২] ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে খড়্গ এবং রাতবংশ প্রায় একই সময়ে সমতটে রাজত্ব করে গেছেন, তবে কে আগে আর কে পরে সেটার কিন্তু কোনও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর মতে রাজা শশাঙ্ক বাংলাদেশে যে-বিস্তৃত এলাকায় আধিপত্য করেছেন তারই ভিতরে এঁরা ছিলেন সামন্ত রাজবংশ।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ও বিহার অঞ্চলে চলেছিল চূড়ান্ত অরাজকতা। তার কারণ, এই সময় অনেকবার ঘটেছে বিদেশি আক্রমণ এবং প্রচুর ছোটখাটো রাজত্বের উত্থান ও পতন। সেই সময় দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে শৃঙ্খলা ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণ নিজেদের মধ্যে থেকেই একজনকে নেতা বা রাজা নির্বাচন করলেন, এঁর নাম গোপালদেব। তিনিই পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালরাজত্বের আরম্ভ হয় সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে।

এই সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অরাজকতায় যুগটিকে বলা হয় 'মাৎস্যন্যায়'। এই সংস্কৃত শব্দটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ করা কঠিন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মাৎস্যন্যায়ের যুগকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, বড়মাছ যেমন ছোট ছোট মাছগুলিকে গিলে ফেলে, তেমনিভাবেই অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগুলি ছোটখাটো রাজ্যগুলিকে গ্রাস করছিল। এই

পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই দেশের জনসাধারণ গোপালদেবকে নিজেদের নেতা বলে নির্বাচিত করে।

সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ একটি প্রাচীন তাম্রপটে এই তথ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"মাৎস্যন্যায়ম্ অপোহিতুম প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রী-গোপালঃ।"

এর অর্থ, মাৎসন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্য জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত গোপালদেব ভাগ্যনিয়ন্তা হলেন।

'মাৎস্যন্যায়' কথাটির উল্লেখ রামায়ণেও পাওয়া যায় "নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ, মৎস্যাইব জনা নিত্য ভক্ষরতি পরস্পরম" অর্থাৎ অরাজক রাজ্যে কারও সম্পত্তি নিরাপদ নয়, মানুষ মাছের মতো পরস্পরকে ভক্ষণ করে।

'মাৎস্যন্যায়' জাতীয় পরিস্থিতির উল্লেখ শেকসপিয়রের রচনাতেও আছে। তিনি পেরিক্লিস, প্রিন্স অফ টায়ার (Tyre)-এ লিখেছেন :

"Third Fisherman : Master, I marvel how he fisher live in the sea.

First Fisherman : 'Why as men do a-land, the great ones eat up the little ones."

বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং নিজেদের দেশটিকে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা, এই দুটি উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে থেকেই গোপালদেবকে নেতা নির্বাচন করে তাঁর হাতে তুলে দিল সারাদেশের কর্তৃত্বভার। সেই কতকাল পূর্বের মানুষর অনেকেই অনেক স্বার্থত্যাগ স্বীকার করে নিয়েও এমন সুচিন্তিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে দেশরক্ষার কথা চিন্তা করেছিলেন, একথা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "সেই সময়কার বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় মানুষেরা কতখানি সুস্থ, পরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী ছিলেন, যার জন্য তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজেদের সমস্ত স্বার্থদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের মধ্যে থেকেই একজনকে বাংলার একচ্ছত্র নেতার পদে বরণ করে নিয়ে সকলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এ কথা ভাবলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে হয়, এইভাবে 'সংসারধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া',[২৩] প্রাচীন ভারতে এই ব্যাপারটি একেবারে অজানা ছিল না। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মমিন চৌধুরী গোপালদেবের রাজপদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাটা অদ্ভুত এবং ঠিক নাকি নির্ভরযোগ্য তথ্য নয়, এরকম মন্তব্য করেছেন।[২৪]

শোনা যায় ৭৮০-৭৯৫ খ্রি. পর্যন্ত গোপালদেব রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু এই হিসাব সঠিক কি না সে-বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে (The History and Culture of Indian People, চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৪৫ বলা হয়েছে গোপালদেবের রাজত্বকাল সম্ভবত ৭৫০-৭৭০ খ্রি. পর্যন্ত। তিনি বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর রাজ্যের মধ্যেই ছিল বঙ্গ বা বাঙ্গালা অর্থাৎ

পূর্ববঙ্গ। তিনি নিজে ছিলেন বৌদ্ধ এবং নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপালদেবের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৯৫-৮৩০ খ্রি. পর্যন্ত।[২৫]

ধর্মপাল ছিলেন এক সুদক্ষ ও শক্তিশালী সম্রাট, উত্তর ভারতেরও অনেকখানি তিনি নিজের অধিকারে এনেছিলেন। এর আগের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেকে মনে করেন বিক্রমপুরের বিক্রমপুর বিহার তাঁর প্রতিষ্ঠিত। কথিত হয় যে ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশিলা বিহার এবং উত্তরবঙ্গে সোমপুরী বিহারও ধর্মপালেরই কীর্তি। পশ্চিম ভারতে প্রতিহার রাজ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হয়। এইসব যুদ্ধে জয়লাভ করে শেষপর্যন্ত ধর্মপাল হয়েছিলেন ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। কনৌজের শাসক ইন্দ্রযুদ্ধকে পরাস্ত করে তার জায়গায় তিনি চক্রযুদ্ধকে কনৌজের রাজপদে বসিয়েছিলেন। সম্রাট ধর্মপালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ উত্তর-ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যের সম্মান লাভ করেছিল। রাজা শশাঙ্ক একদিন যে বিশাল গৌড় সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলেছিলেন সম্রাট ধর্মপাল। ধর্মপাল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রজাসাধারণের হৃদয়ের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ এবং আশার মূর্ত প্রতীক। এক আদর্শ রাজ্য গড়েছিলেন তিনি।[২৬] ধর্মপালের পুত্র দেবপাল রাজত্ব করেন ৮৩০-৮৬৫ খ্রি. পর্যন্ত। কিন্তু এখানেও সাল তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ইনিও ছিলেন সুদক্ষ এবং দয়ালু, দানবীর রাজা। অনেক বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। পিতা ধর্মপালের মতো দেবপালও প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যুদ্ধ করেন হুন এবং কম্বোজদের সঙ্গে। দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট রাজকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পাল রাজাদের সম্বন্ধে ড. রমেশ মজুমদারের মন্তব্য, "বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। এর পূর্বে অথবা পরে, ব্রিটিশদের আগমনের আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আর কখনও ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেনি।" (The History and Culture of the Indian People, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫২)

সম্রাট দেবপালের মৃত্যুর পর থেকেই পালবংশের গৌরব ম্লান হতে শুরু করে। এরপর একে একে রাজা হন প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল ইত্যাদি। দেবপালের পরে প্রথম মহীপালই ছিলেন পালবংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। বিক্রমপুরে থাকতে সেখানকার লোকসংগীত ও লোকগাথায় আমি এই মহীপালের নাম শুনেছি।[২৭] বিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকেও এসব গাথা প্রচলিত ছিল। তাঁকে বাংলাদেশে পালবংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। দশম শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর আর পরবর্তী শতকের প্রথম পঁচিশ বছর নিয়ে তাঁর রাজত্বকালেও একটি স্মরণীয় সময়।[২৮]

প্রথম মহীপালের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র নয়পাল। এঁরই সময় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বৌদ্ধজগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। নয়পালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৫

বছর রাজত্ব করেন ইনি। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র– দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় সুরপাল এবং রামপাল। পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন দ্বিতীয় মহীপাল (সম্ভবত ১০৭০ খ্রি.) তাঁর সময় কয়েকজন সামন্তরাজা বিদ্রোহ করেছিলেন। এরপর সন্দেহের বশে তিনি দুই ভ্রাতাকে কারাগারে বন্দি করেন, ফলে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৈবর্ত শ্রেণীর এক রাজকর্মচারী ছিলেন দিব্য। দিব্য বিদ্রোহী হয়ে দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন এবং বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গে নিজের রাজত্ব স্থাপন করেন।

শোনা যায় এইরকম সময়েই পালরাজারা তাঁদের রাজধানী সমতট অথবা বিক্রমপুরে সরিয়ে আনেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের গোলযোগের মধ্যে সুরপাল এবং রামপাল বন্দিশালা থেকে পালিয়ে যান। দু'বছরের জন্য রাজা হন সুরপাল, তারপর তাঁর স্থানগ্রহণ করেন রামপাল। সেটা হলো ১০৭৭ খ্রি.।

উত্তরবঙ্গে কয়েক বছর রাজত্ব করেন দিব্য, এরপর রাজা হন দিব্যের পুত্র রুদক এবং তারপর তাঁর পুত্র ভীম। সংস্কৃত গ্রন্থ 'রামচরিত'-এর রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছেন ভীমের শাসনকালে উত্তরবঙ্গ ছিল বেশ সমৃদ্ধিশালী, প্রজারা সুখে থাকত।

রামপাল তাঁর অনুগত সামন্ত রাজাদের সহায়তায় ভীমকে পরাজিত করেন। ভীম যুদ্ধে নিহত হন এবং রামপাল উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন। গঙ্গা, অর্থাৎ পদ্মা এবং করতোয়া এই দুই নদীর মধ্যবর্তী কোনও স্থান রামাবতীতে রামপাল রাজধানী স্থাপন করেন। বিখ্যাত লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, রাজা রামপালের এই রামাবতী নগর ছিল বিক্রমপুরের মুনশিগঞ্জে, কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদ এর সঙ্গে একমত নন। তাঁরা বলেন, এখনকার মালদহ[২৯] শহরের কাছাকাছি কোথাও ছিল ওই রামাবতী। বিমলচন্দ্র দত্ত তাঁর 'বৌদ্ধ ভারত' গ্রন্থে (পৃ. ৪০) বলেছেন বামাবতী ছিল উত্তরবঙ্গে এবং সেখানে রামপাল জগদ্দল বৌদ্ধবিহারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বামচরিতের প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করেন। এই পুথিতে রামাবতী নগরীর সৌন্দর্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুথির রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী এ-গ্রন্থকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক কাব্য'। কবি নিজেকে বলেছেন 'কলিকাল বাল্মীকি'। কাব্যটি দ্ব্যর্থবোধক, রামায়ণের কাহিনীর আবরণে এখানে পালবংশীয় মহাবাজ রামপালের কীর্তিকাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

রামপাল ছিলেন শক্তিমান শাসক, পূর্বপুরুষদের হৃতরাজ্য উদ্ধাব করতে তাঁকে অনেক লড়াই করতে হয়। তাঁর রাজত্বকালকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। ছোটবেলায় মুনশিগঞ্জের কাছে রামপাল নামক স্থানে পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যেসব প্রাচীন অট্টালিকাব ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলাম তাতেই সেই গৌরবময় যুগের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়েছিল। মুনশিগঞ্জ এবং রামপালে এইসব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরাই এগুলি আমাকে দেখিয়েছিলেন। এইগুলি দেখার পর স্বভাবতই বিক্রমপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে আমি গর্ববোধ করতাম।

রামপালের শেষজীবন বড় করুণ। তিনি নিজপুত্র রাজ্যপালের হাতে শাসনভার

তুলে দিয়ে নিজেই অবসর জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১১২০ খ্রি. সহসা একদিন সংবাদ পান তাঁর প্রিয় মাতুল মথনদেবের মৃত্যু হয়েছে। এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেননি , মুঙ্গেরের কাছে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এ যেন এক নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি।[৩০]

রামপালের আর-এক পুত্র কুমারপাল রাজা হন সম্ভবত রাজ্যপালের মৃত্যুর পর। তাঁকে অনেকবার শত্রু-রাজাদের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল। এরপর তাঁরই পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মৃত্যু ঘটে তাঁর। তখন রামপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ তৃতীয় গোপালের কাকা মদনপাল রাজ্য সভার গ্রহণ করেন ১১১৪ খ্রি.। মদনপালকেও শত্রুদের হাত থেকে রাজ্যরক্ষার জন্য অনেক যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু সেনবংশীয় বিজয়সেনের হাতে শেষপর্যন্ত পরাজয় ঘটে তাঁর। ক্রমশ বিজয়সেন সমগ্র বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) অধিকাব করেন এবং মদনপাল বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেন অঙ্গদেশে (ভাগলপুর)। ১১৬১ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন মদনপাল। প্রায় এই একই সময়ে গয়াতে এক শাসক ছিলেন যাঁর নাম ছিল গোবিন্দপাল। তিনি রাজত্ব করেন ১১৬২ খ্রি. পর্যন্ত। ইনি সম্ভবত মদনপারের আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। মোটের ওপর বলা চলে ১১৬১ বা ১১৬২ খ্রি. পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

পালরাজারা ছিলেন সর্বতোভাবে বাঙালি, বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গের মানুষ। এঁদেরই রাজত্বকালে বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ইতিহাসবিদরা কেউ কেউ পালদের ক্ষত্রিয়, কেউ-বা বলেছেন কায়স্থ। তবে সাধারণভাবে এটাই স্বীকৃত যে তাঁরা তিনটি উচ্চবর্ণের মধ্যে পড়েন না। এই রাজারা বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী ছিলেন। তবে সম্প্রতি প্রাপ্ত কোনও পুথি থেকে জানা গেছে, একজন পালরাজা নয়পাল শিবের ভক্ত ছিলেন, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না। তবে নিজেরা বৌদ্ধ হলেও পালরাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে এবং ব্রাহ্মণদের আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দ্বিধা করতেন না। মন্ত্রী, সেনাপতি বা অন্যান্য উচ্চ রাজপদে হিন্দুদের নিযুক্ত করতেও তাঁদের কোনও আপত্তি ছিল না। এইভাবে পালরাজারা ধর্মীয় এবং সামাজিক ভেদাভেদ উচ্ছেদ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের বন্ধনে বাঁধতে পেরেছিলেন। সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে পারাটাই পালরাজাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। আজকের বাঙালি জাতি এই মানসিকতাই লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে।